গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা

বাংলাদেশে 'র'

আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপ সন্ধান



আবু রূশ্‌দ

গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা

বাংলাদেশে 'র'

আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপ সন্ধান

আবু রুশ্‌দ

জিনাফ

প্রকাশক
জিনাফ
ভাসানী ভবন
৫১, শান্তিনগর
(পুরাতন-৮০, নয়াপল্টন)
ঢাকা-১২১৭

প্রথম সংস্করণ
১ ফেব্রুয়ারী ২০০১
দ্বিতীয় সংস্করণ
২ মে ২০০১
তৃতীয় সংস্করণ
১ জুলাই ২০০১
চতুর্থ সংস্করণ
১৫ জুলাই ২০০৩
প্রচ্ছদ
হামিদুল হক মানিক
কম্পিউটার কম্পোজ
স্কাই গ্রাফিক্স, ১৪৪, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-31-1438-8
মূল্য
বোর্ড বাইন্ডিং ঃ ৩০০.০০ টাকা মাত্র।
পেপার ব্যাক বাইন্ডিং ঃ ২০০.০০ টাকা মাত্র।

পরিবেশক ঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রাপ্তিস্থান ঃ তাসনিয়া বই বিতান, ৪৫১/১, বড় মগবাজার (ওয়্যারলেস রেল গেট), ঢাকা; **বুক ভিউ**, নিউ মার্কেট, ঢাকা; **বাংলাদেশ বুক কো-অপারেটিভ সোসাইটি**, নিউ মার্কেট, ঢাকা; **সন্দেশ**, আজিজ কো-অপারেটিভ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা; **বুক সিন্ডিকেট**, ১২, আন্দরকিল্লা (২য় তলা), চট্টগ্রাম; **বুক ভিলা**, সদর রোড, বরিশাল

উৎসর্গ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যিনি জীবন দিয়েছেন
সেই অকুতোভয় সৈনিক
বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল-এর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রম গোপন ব্যাপার বলে পরিগণিত হলেও আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বের প্রায় সবদেশেই এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা, সমালোচনা হয়ে থাকে। যে দেশের গুপ্তচর সংস্থাকে কেন্দ্র করে এ পুস্তক লেখা হয়েছে সে দেশ অর্থাৎ আমাদের প্রতিবেশী ভারতেও এ সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় অজস্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, বর্তমান বিশ্বে আমাদের বাংলাদেশই সম্ভবতঃ একমাত্র দেশ যেখানে বিদেশী কোন গুপ্তচর সংস্থা কর্তৃক এদেশের বুকে পরিকল্পিত উপায়ে পরিচালিত তৎপরতা সম্পর্কে কোন কিছু বলা বা লেখা হলে তাৎক্ষণিকভাবে এ দেশেরই অভ্যন্তর থেকে ঐ বিদেশী সংস্থার পক্ষে সাফাই গেয়ে কথা বলার লোকের মোটেই অভাব হয় না। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর প্রসঙ্গে এ কথা নির্মম সত্য বই আর কিছু নয়। সম্ভবতঃ এ কারণেই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতাকে ঘিরে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেক গবেষক, সাংবাদিক মুখ খুলতে নারাজ। তবে স্বনামখ্যাত নির্ভীক লেখক ও গবেষক আবু রূশ্‌দ এর ব্যতিক্রম। তিনি অতি স্বচ্ছন্দে এ সীমারেখা অতিক্রম করেছেন এবং তথাকথিত অজানা আশঙ্কাকে জয় করেছেন। আর তাই এ কথা আজ নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কীয় গবেষণায় তিনি এদেশের বুকে এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটিয়েছেন।

যেহেতু আমি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংগঠন 'ডিজিএফআই' অর্থাৎ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি সেহেতু এদেশের বুকে 'র'-এর অপতৎপরতা সম্পর্কে আমার অল্প বিস্তর ধারণা রয়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন এ দেশে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে বৈরী গুপ্তচর সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে এদেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিককে অবশ্যই অবহিত ও সচেতন থাকতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা মহান মুক্তিযুদ্ধে 'র' আমাদের সহায়তা করেছে বলে তাদের পরবর্তী সকল কার্যক্রমকে বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। বরং একটি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি হিসেবে আমাদের নিরাপত্তার জন্য আমাদেরকেই ভাবতে হবে, আর তাই স্থায়ীভাবে কাউকে আমাদের শত্রু বা মিত্র বলে জ্ঞান করার কোন অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। আজ যে আমাদের পরম মিত্র, পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে কাল সে ঘোরতর শত্রু বলে পরিগণিত হতে পারে– আধুনিক বিশ্বে এ ধরনের নজীর খুব বিরল নয়। তাই আমরা দেখতে পাই, একসময় যে গণচীন যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তির বিরুদ্ধে মরনপণ সংগ্রামে লিপ্ত ভিয়েতকং গেরিলাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণ ও কূটনৈতিক ছত্রছায়াসহ সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করেছিল, পরবর্তীকালে সময়ের তাগিদে সে ভিয়েতনামকেই তার বৃহৎ প্রতিবেশী

গণচীনের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল।

'গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা ঃ বাংলাদেশে 'র' - আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপ সন্ধান' বইটির প্রতিটি পাতায় রয়েছে তথ্য উপাত্তের সাড়ম্বর উপস্থাপনা। স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতা সম্পর্কে লেখকের বিশদ বিবরণ তার অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি ও কঠোর পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করে। আশা করি বাংলাদেশের গোপন রাজনীতির ইতিহাসে এ বইটি অনেক না-বলা কথার প্রকাশ ঘটাবে।

ধন্যবাদান্তে

চট্টগ্রাম
২০ জানুয়ারী ২০০১

মেজর জেনারেল (অব.) এম, এ, মতিন,
বীর প্রতীক, পিএসসি

লেখকের কথা

'র'-অর্থাৎ Research and Analysis Wing ভারতের বৈদেশিক গুপ্তচর সংস্থার নাম। ১৯৬৮ সালে তদানীন্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এই সংস্থাটি গঠন করেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী RAW প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জন্মের মাত্র তিন বছরের মাথায় সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে 'র' যে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এর মাত্র চার বছর পর 'র'-এর সার্বিক সহাযোগিতায় ভারত সিকিম দখলেও সক্ষম হয়। তাই 'র' সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'The Illustrated Weekly of India' মন্তব্য করেছে, "RAW's major triumps in external intelligence were in Bangladesh and Sikkim".

এরপর কিন্তু 'র' থেমে থাকেনি। বরং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা তার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভারতের 'বন্ধু সরকারও' 'র'-এর আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তি থেকে রেহাই পায়নি।

গুপ্তচরবৃত্তি পৃথিবীতে নতুন কোন বিষয় নয়। বরং এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম পেশা এবং প্রতিটি দেশেই গুপ্তচর সংস্থা আছে- এটা স্বীকৃত সত্য। আবার শুধু যে নিবর্তনবাদী বা স্বৈরতান্ত্রিক পথে চলা দেশেই ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী অতিমাত্রায় তৎপর থাকে তা নয়, বরং গণতান্ত্রিক দেশেও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গুপ্তচর সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অবধারিত। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশের অবারিত দ্বার উন্মুক্ত থাকে সেখানে বৈরী শক্তির তৎপরতাও চলে গণতান্ত্রিক উদারতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে। তাই রাষ্ট্রকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী গুপ্তচর সংগঠনের। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ, ইংল্যান্ডের এম-১৬, ইসরায়েলের মোসাদ ও ভারতের 'র'-এর নাম উল্লেখ করা যায়। লক্ষ্য করে দেখা যায়, পৃথিবীর যে দেশেগুলোয় গণতান্ত্রিক অবকাঠামো যতো শক্তিশালী সেসব দেশের গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতা, অবকাঠামোও ততোটা ব্যাপ্ত, সমন্বিত ও আধুনিক।

এদিকে সাধারণভাবে বলা যায় যে, গুপ্তচরবৃত্তি সাধারণত তিন প্রকারের-Strategical অর্থাৎ কৌশলগত, Tactical অর্থাৎ মাঠ পর্যায়ের ও Counter Intelligence অর্থাৎ প্রতি গোয়েন্দা তৎপরতা। এখানে স্ট্র্যাটেজিক্যাল গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে বলা যায়, এটি অনেক ব্যাপক পরিসরে পরিচালিত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ইত্যাদি সকল বিষয়েই বিস্তৃত পরিসরে কৌশলগত গুপ্তচরবৃত্তি চালানো হয়। টার্গেট দেশের সামরিক শক্তি কিরূপ, ভবিষ্যতে কেমন হতে পারে, এক্ষেত্রে হুমকির খাতসমূহ কি কি বা সাংস্কৃতিক পর্যায়ে শত্রু দেশের সংস্কৃতিকে কিভাবে ধ্বংস করা যায় ইত্যাদি হতে পারে Strategical Intelligence এর উদাহরণ। অন্যদিকে Tactical Intelligence হচ্ছে মাঠ পর্যায়ের গুপ্তচরবৃত্তি। যেমন-কাউকে অনুসরণ করা, কারো উপরে নজর রাখা ইত্যাদি। আর Counter Intelligence হচ্ছে শত্রুর ইন্টেলিজেন্স

তৎপরতা থেকে নিজ তথ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এছাড়া নিজ দেশের সরকারী প্রতিষ্ঠান, সশস্ত্রবাহিনী ও গুপ্তচর সংস্থা সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় বৈরী গুপ্তচর সংস্থার অপারেটিভ বা এজেন্টদের অনুপ্রবেশ প্রতিহত করাও কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তৎপরতার অন্যতম লক্ষ্য।

এদিকে বাংলাদেশে 'র' স্ট্র্যাটেজিক্যাল ও ট্যাকটিক্যাল পর্যায়ে যে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করে আসছে সেখানে ভারত যতো না তার জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একাজে ব্যস্ত তারচেয়ে যাবতীয় উপায়ে বাংলাদেশকে হীনবল করে তোলাতেই তারা বেশী তৎপর। এখানে তাদের লক্ষ্য-বাংলাদেশকে সকল পর্যায়ে দুর্বল করে দেয়া যাতে সে বাধ্য হয়ে ভারতীয় আধিপত্যকে স্বীকার করে নেয়। আগ্রাসী এই গুপ্তচরবৃত্তি এতোটাই নীতি-নৈতিকতা বর্জিত যে, 'র' এদেশের বিরুদ্ধে যেমন শান্তিবাহিনী, বঙ্গভূমি আন্দোলনের মতো প্রত্যক্ষ সার্বভৌমত্ব বিরোধী কর্মকান্ডকে উস্কে দিয়েছে তেমনি একজন প্রেসিডেন্ট হত্যাকান্ডেও পালন করেছে ক্যাটালিস্টের ভূমিকা। বলতে গেলে এদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি থেকে শুরু করে সামরিক ও ধর্মীয় পর্যায়েও 'র'-এর কালোথাবার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে বাংলাদেশে 'র'-এর সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে-এদেশের বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী, রাজনীতিবিদ ও জনগণের এক বিরাট অংশকে ভারতীয় মতাদর্শের অনুকূলে প্রভাবিত করা। তাই আজ দেখা যায় বাংলাদেশে আইএসআই ঘাঁটি গেড়েছে বা কলকাতায় হরকাতুল মোজাহিদীন সদস্য বোমাসহ ধরা পড়েছে এমন ভারতীয় অভিযোগের স্বপক্ষে এদেশের একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা প্রচারণা যুদ্ধে নেমে পড়ছে তাৎক্ষণিকভাবে। এদের উদ্দেশ্য যেন ঐ একটিই-ভারত সরকার যা বলতে চায় তা বলে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করা। দুঃখজনক ব্যাপার হলো-এপক্ষের প্রচারণায় এখন এদেশের সাধারণ জনতার একাংশ ভারতীয় অভিযোগ সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। অথচ, এসবই যে জনমতকে বিভ্রান্ত বা প্রভাবিতকরণে 'র'-গৃহীত অপকৌশল তা কিন্তু স্বয়ং ভারতীয় বিশ্লেষকগণই স্বীকার করছেন।

যাহোক, বাংলাদেশ বিরোধী 'র' তৎপরতার যৎসামান্য বিবরণ দেয়ার জন্যই আলোচ্য বইটির প্রকাশ। এক্ষেত্রে 'র'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গুপ্তচরবৃত্তির প্রকৃতি বর্ণনার পাশাপাশি তথ্য, প্রমাণ দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত তৎপরতার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন পর্যন্ত সময়কালের 'র' তৎপরতার কথা বলা হলেও ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলীও পরবর্তিতে সময় সুযোগ মতো প্রকাশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

এদিকে, যেভাবে পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে পাঠক হয়তো মনে করতে পারেন-আরো তো অনেক কিছু ছিল, তাতো এখানে নেই। হ্যাঁ, কথাটি ঠিক। অনেক ঘটনাই জানা যায়, পর্দার আড়ালের অনেক চক্রান্তকারীর পরিচয়ও হয়তো অজানা থাকে না, কিন্তু সবকিছুই তো সবসময় লেখা যায় না। তাই মওলানা আবুল কালাম আজাদ 'ইন্ডিয়া উইন্‌স ফ্রীডম' বই প্রথম প্রকাশের সময় গোপন অনেক কিছুই সংযোজন করেননি। বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-এ

আশংকায় তিনি তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর গোপন নথিপত্র প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমার কাছে কোন গোপন নথিপত্র নেই সত্য-তবে, এ বইটি লিপিবদ্ধ করার এক পর্যায়ে যখন ডিজিএফআই ও এনএসআই-এর সাবেক ক'জন মহাপরিচালকের সাক্ষাৎকার নেই 'র' তৎপরতা নিয়ে তখন তাদের কাছ থেকে জানতে পারি পর্দার অন্তরালের অনেক ঘটনাবলী। এছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাংবাদিক হিসেবে অনেক প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্মকর্তার (সামরিক, বেসামরিক উভয়ই) মতামত জানার সুযোগ হয়েছে বহুবার। অবশ্য এসব সেনসিটিভ বিষয় প্রকাশে তাঁরা তাদের নাম উল্লেখ করতে নিষেধ করেছেন। তাই এখানে বাংলাদেশে দায়িত্বপালনরত ক'জন 'র' কর্মকর্তার সাথে কোন কোন রাজনৈতিক দলের কোন কোন নেতার 'সখ্যতা' ছিল তা সরাসরি না বলে আভাসে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী আপাতঃ 'ভারত বিরোধী' নেতাদের প্রসঙ্গও উদ্ধৃত হয়েছে 'র'-এর সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসেবে। আসলে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি কোথায় নেই 'র'-এর এজেন্ট? প্রতিটি স্তরেই আছে 'র'-এর পদচারণা। এগুলো লেখা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ এখনো অতোটা গণতান্ত্রিক হয়ে যায়নি যে, নির্বিঘ্নে মত প্রকাশ করা যাবে। অথচ, ভারতের হাজারো সমালোচনা করলেও সেখানে অন্ততঃ 'র' বা প্রভাবশালী কারো বিরুদ্ধে কিছু লিখলে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই। বরং 'র' সহ যে কাউকে হাজারো অভিযুক্ত করলেও কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। নিঃসন্দেহে এ পরিবেশ বাংলাদেশে কল্পনাতীত। তাই যেসব ঘটনাবলী পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, যার তথ্যসূত্র পাওয়া যাবে সেরূপ ঘটনাবলীই মূলতঃ এ বইয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। আশা করি পাঠক এ থেকেই বুঝে নিতে পারবেন-কারা 'র'-এর সহযোগী, কারা ভারতের এদেশীয় স্বার্থরক্ষাকারী?

এদিকে নিছক ভারত বিরোধিতার লক্ষ্যে এ বই লেখা হয়নি। বরং ভারত ও তার গুপ্তচর সংস্থা এদেশের বিরুদ্ধে কিভাবে, কোন পর্যায়ে তৎপরতা চালিয়ে আসছে সেসবের তথ্য সমৃদ্ধ বিবরণ দেয়াই এ বইয়ের উদ্দেশ্য। তবে এ বইয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে ডিজিএফআই (Directorate General of Forces Intelligence) ও এনএসআই (National Security Intellignce)-এর ক'জন সাবেক মহাপরিচালকের সাক্ষাৎকার। এগুলো, 'গোয়েন্দা বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ বিরোধী 'র' তৎপরতা' শিরোনামে দৈনিক ইনকিলাবে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হয় অক্টোবর ২০০০-এ। এই প্রতিবেদনগুলোতে সাবেক গোয়েন্দা প্রধানগণ তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এদেশে পরিচালিত 'র' তৎপরতা ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এর ব্যাপকতা নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোকপাত করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এযাবত কখনো, কোথাও গোয়েন্দা সংস্থা প্রধানদের এধরনের কোন সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়নি। আশা করি এথেকে পাঠক এদেশের ইতিহাসের অনেক অজানা অধ্যায় জানতে পারবেন। সেই সাথে ভারতীয় গুপ্তচরবৃত্তির ভয়াবহতাও অনুধাবন করতে পারবেন সচেতনতার সাথে। অবশ্য, জীবন চলার অভিজ্ঞতায় এও জানি-এদেশ এমনি একটি

দেশ যেখানে জনগণের এক বিরাট অংশ ভারতীয় প্রচারণায় এমনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, হাজারো প্রমাণ উপস্থাপন করলেও এরা 'র'-এর গুপ্তচরবৃত্তির সত্যতা মেনে নিতে চাইবেন না। আবার এমন লোকও দেখেছি যারা ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে কিছু বললেই তাকে মুক্তিযুদ্ধ বা প্রগতিশীলতা বিরোধিতা বলে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। আসলে এরা বুঝতে চান না, ভারতীয় চক্রান্তের বিরোধিতা করার অর্থ পাকিস্তানের পক্ষ নেয়া নয়। আর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার প্রশ্নই উঠে না। কারণ, বাংলাদেশ স্বাধীন থাকুক, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠুক এ স্বপ্ন সকল বাংলাদেশীর মতো আমিও দেখি।

এদিকে একথা বলে নেয়া দরকার বলে ভাবছি যে, অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন গুপ্তচর সংস্থ সংক্রান্ত বই লেখায় বিশেষ কোন সংস্থা বা ব্যক্তির সহায়তা নেয়া হয়েছে। হ্যাঁ, বই লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রাক্তন ক'জন গোয়েন্দা কর্মকর্তার অল্প বিস্তর গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে তা অস্বীকার করছি না। তবে তা বিস্তৃত পরিসরে নয়। এবং এব্যাপারে কোন সংস্থা বা কোন চাকুরীরত কর্মকর্তার সাহায্য ন্যূনতম পর্যায়েও নেয়া হয়নি। অবশ্য বইটির প্রকাশনা ক্ষেত্রে জিনাফ নামের একটি সংগঠন সার্বিক সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। এছাড়া এ বইটি গ্রন্থনা ও সাবেক গোয়েন্দা প্রধানদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে আমাকে নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন দৈনিক ইনকিলাবের ফিচার বিভাগে কর্মরত মেহেদী হাসান পলাশ ও সুহৃদ নূরে আলম চৌধুরী। তবে দৈনিক ইনকিলাবের মাননীয় সম্পাদক জনাব এ,এম,এম, বাহাউদ্দিন, সহকারী সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই শিকদার ও বিশেষ সংবাদদাতা জনাব এলাহী নেওয়াজ খানের সার্বিক দিক নির্দেশনা এবং সহায়তা ছাড়া এ বই প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। এছাড়া আমার স্ত্রী সুরভী রেফারেন্স সংক্রান্ত জটিল বিষয়ে যে সহায়তা করেছে তার উল্লেখ না করলেই নয়।

এ বইয়ে উদ্ধৃত তথ্যাবলী বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণে ন্যূনতম কাজে আসলেও আমার শ্রম স্বার্থক হবে বলে মনে করব।

ধন্যবাদান্তে–

ঢাকা। আবু রূশদ

১ ফেব্রুয়ারি ২০০১

জিনাফ নেতৃবৃন্দের কথা

গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক মহাপরিচালকদের ভাষ্য-বাংলাদেশে 'র' তৎপরতা বইটিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তথ্য প্রমাণসহ বিশদ বর্ণনা রয়েছে। কেন 'র' বাংলাদেশী বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তার কারণ সমূহও এ বইয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। যে কারণে স্বাধীনতাপ্রিয় প্রতিটি নাগরিকের এ বইটি পড়া প্রয়োজন বলে মনে করি। জিনাফের পক্ষ থেকে লেখককে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁর দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ এ বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা যারপরনাই আনন্দিত।

ধন্যবাদান্তে-

মিয়া মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
সভাপতি-জিনাফ

জাহাঙ্গীর আলম খান
সাধারণ সম্পাদক-জিনাফ

সূচীপত্র

অধ্যায়-১
এসপিওনাজ কী, কেন, কীভাবে

বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখক কাজী আনোয়ার হোসেন তাঁর বিখ্যাত 'মাসুদ রানা' সিরিজ-এর ৪৭তম সংখ্যা 'এসপিওনাজে' গুপ্তচরবৃত্তির উপর চমৎকার একটি বিবরণ দিয়েছেন। এসপিওনাজ জগতের অন্ধকার চোরাগলিতে অনেকেই কিভাবে জেনে বা না জেনে হারিয়ে যান তা ঐ বইতে ফুটে উঠেছে এভাবে- "মোহাম্মদ ফারুক আলমগীর ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার। রুচিশীল সংস্কৃতিবানের লেবাস। নিজেকে সংস্কৃতিবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বেশ কয়েক বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে আলমগীরকে। প্রথমেই প্রমাণ করতে হয়েছে সে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভক্ত। পাকিস্তানী আমলে এটা ছিল একটা বিদ্রোহের মত। ওঁর কাছে কালচারের প্রধান মানদন্ড ছিল কে কতটা বুঁদ হতে পারে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে। সেই সাথে যদি গায়ে হালকা সেন্টের মত মস্কোপন্থীর গন্ধ থাকে তাহলে তো কথাই নেই; রীতিমত প্রোগ্রেসিভ ...... একইভাবে বাড়তে বাড়তে কপালে সিঁদুরে টিপ আর মেঝেতে চন্দনের আলপনা দেখলেই চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে আসা অভ্যাস করেছে সে। .... ক্রমে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে তার এ সবই হচ্ছে সত্যিকার সংস্কৃতি ও বাঙ্গালীত্বের লক্ষণ। পয়লা বৈশাখে সাতসকালে উঠে একদল ছেলে-মেয়ে একসাথে জুটে জুতসই কোন বটমূলে সদলবলে 'এসো হে-এ-এ-বৈশাখ' বলে হাঁক ছাড়া যেন খুবই দরকার। ..... ঘঁষে- মেজে নিজেকে সে এতই সংস্কৃতিবান করে ফেলেছিল যে- শেষে ঈদ, বকরিদ, শবেবরাত বা মিলাদ শরীফ তার কাছে রীতিমত রুচিহীন, মুসলমানী, কমিউনাল ব্যাপার-স্যাপার বলে মনে হয়েছে। কেন যে নিজের নামটা তার কাছে সহ্য হয়েছে, ঘেন্নার ব্যাপার বলে মনে হয়নি, বলা মুশকিল।

.... একাত্তরের গোলমালে ভেগেছিল কলকাতায়। কোন আদর্শের জন্য নয়, প্রাণভয়ে। সত্যিকার বাঙ্গালী পেয়ে খুশি হয়ে 'দাদারা' অনেক সুবিধে দিয়েছেন ওকে। খাওয়া-থাকার কোনই অসুবিধে ছিল না। একটু-আধটু পানাভ্যাস ছিল (দোষ হিসেবে নয়, ইসলাম ধর্মে বারণ আছে বলে বিদ্রোহ হিসেবে) সেদিক থেকেও অনুকূল হাওয়া দিয়েছেন তাঁরা, জুটিয়ে দিয়েছেন কবিতা রায়ের মত সুন্দরী বান্ধবী। অর্থাৎ শুধু টোপই নয়, বড়শি, সুতো, ফাৎনা, মায় ছিপ পর্যন্ত গিলে বসে আছে সে। আটকা পড়েছে কবিতার মায়া জালে।

তেষট্টির রায়টে দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিল কবিতারা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফিরে এসেছে বেদখল হয়ে যাওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা যায় কি-না দেখতে। বড় ভাই অমলেশ, আর সে। ...... ইদানীং কি যেন অল্প টের পাচ্ছে আলমগীর। কিন্তু এখনো এতো ঘোরের মধ্যে রয়েছে যে, বললে বিশ্বাসই করবে না, এরা দু'জনেই আসলে ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগের বিশেষ ট্রেনিং পাওয়া স্পেশাল এজেন্ট।

স্বাধীনতার পর পরই কলকাতা থেকে ঝাড়কে ঝাড় আসতে শুরু করলো রথী মহারথীরা এ দেশের শিল্প-সাহিত্যের মানোন্নয়ন ও দিকনির্দেশের গার্জেনসুলভ

মনোভাব নিয়ে ......। বিশেষ কার্ড দিয়ে ভারতীয় ছবি দেখবার অনুরোধ, কবিতার মাধ্যমে কূটনীতিকের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয়-মদ্যপান চলতে থাকলো- এ সব। সে সাথে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো কবিতা। নিজের অজান্তেই একটা দু'টো করে তথ্য দিতে শুরু করলো আলমগীর। পত্রিকার পলিসি, কোন মিনিস্টারের কি মনোভাব, কোন ফ্যাকশন কি ভাবছে, নতুন কোন পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে কি-না- সবই অগ্রীম জেনে নিচ্ছে তারা। প্রথমদিকে এসব জানানোকে ঋণ পরিশোধ হিসেবে গ্রহণ করেছিল সে...... ধীরে ধীরে ওকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে দেশদ্রোহিতার দিকে। ....ওকে যে পুরোদস্তুর এজেন্টে পরিণত করবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে বানের জলে, ঠেলে দেয়া হচ্ছে এমন এক জায়গায়-যেখান থেকে ফিরবার পথ নেই, ঘুণাক্ষরেও টের পেল না বেচারী।"

যদিও উপরের বর্ণনা একটি 'Spy Fiction'-এর ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়, কিন্তু 'এসপিওনাজ' জগতের এক উজ্জ্বল বিবরণ লেখক তাঁর বইটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এবার 'এসপিওনাজ' সম্পর্কিত 'একাডেমিক' বা তথ্যগত বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১। এসপিওনাজ কী ও কেন

বর্তমান বিশ্বে একটি দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বা তার 'Potential enemy' (সম্ভাব্য শত্রু) নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা খোলামেলাভাবে (Overt) কূটনৈতিক সূত্র, প্রেস, রেডিও, টিভি বা জার্নাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও এর বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়, সে ক্ষেত্রে গোপনে বা পরোক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। তবে যে তথ্য জাতীয় নিরাপত্তার জন্য দরকার তা 'Hostile' বা শত্রুভাবাপন্ন দেশ অবশ্যই নিরাপদে সংরক্ষণ করে আর সে জন্য তা সংগ্রহ করতে হয় গোপনে ও ধরা না পড়ে সম্পূর্ণ 'জানি না' ভান করে। এসপিওনাজকে প্রকৃতার্থে উল্লেখ করা যায় এভাবে, 'যে গোপন/পরোক্ষ (Covert) উপায়ে কোন দেশ, সংস্থা বা ব্যক্তি তার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় কোন তথ্য সংগ্রহ করে বা করার চেষ্টা করে' তাকে এসপিওনাজ বলা যেতে পারে।

২। এসপিওনাজের প্রকৃতি

সাধারণত একটি এসপিওনাজ অপারেশন যখন 'চুপচাপ' ধরা না পড়ে সফল হয়, তখন তাকে সম্পূর্ণ সাফল্যজনক বলা যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ারও প্রয়োজন পড়ে। সাধারণত এসপিওনাজ অপারেশন দু'ভাবে সম্পন্ন করা হয়।

ক। Clandestinely

এক্ষেত্রে গোপনে কার্যসিদ্ধি করা হয় কিন্তু এর কোন 'ছদ্মাবরণ' থাকে না। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতীয় 'র'-এর হস্তক্ষেপ সর্বজনবিদিত কিন্তু এতে সরাসরি 'র'-এর সংযুক্ততার প্রমাণ রাষ্ট্রীয়ভাবে করা সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র'-এজেন্টরা মুক্তিবাহিনীকে ট্রেনিং দিয়েছে ও সাহায্য করেছে কিন্তু তা উপলব্ধি করার পরও পাকিস্তান সরকারের করার কিছু ছিলো না।

খ) Covertly

এক্ষেত্রে গুপ্তচরবৃত্তির কার্যকলাপ ছদ্মাবরণে ঢেকে এমনভাবে উদ্দেশ্য হাসিল করা হয় যে, এর প্রকৃত গতিবিধি বা প্রকৃতি ধরার কোন উপায় থাকে না। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনার খবরাখবর জানার জন্য চুপিচুপি বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা 'র'-এর একটি সফল অপারেশন। তেমনি ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ সংস্থায় নিয়োগকৃত এজেন্টের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ 'ভূ-জরিপ' সংক্রান্ত দলিলাদি পাচার Covert অপারেশনের আওতায় পড়ে।

৩। এসপিওনাজ নেটওয়ার্ক

যদিও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এসপিওনাজ নেটওয়ার্ক পরিচালিত হয়ে থাকে তবে সবক্ষেত্রে Basic (মৌলিক) কিছু কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বৃটিশ ও জার্মান উভয় পক্ষেই এমন একটি 'নেটওয়ার্ক' গড়ে তোলা হত যেখানে শুধুমাত্র আলাদা গোয়েন্দা/গুপ্তচরবৃত্তির প্রশিক্ষণ পাওয়া বিশেষ কিছু গুপ্তচর শত্রু এলাকায় একটি ব্যাপক 'নেটওয়ার্ক' গড়ে তুলত। সেখানে একজন অন্যজন্যের ওপর এমনভাবে নির্ভরশীল ছিল যে, একজন কোন ক্রমে ধড়া পড়লে ঐ এলাকার সকল এজেন্টের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল এবং বাধ্য হয়ে বাকী সকল গুপ্তচরকে হয় তাদের Cover সরিয়ে অন্য Cover-এ যেতে হতো বা পুরো set-up টাই পরিবর্তন করতে হতো। এক্ষেত্রে প্রথম পরিবর্তন আনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র CIA'র গঠনের মাধ্যমে। কিন্তু বৃটিশ শাসিত দেশগুলো স্বধীনতা লাভের পরও অনেক দিন পর্যন্ত বৃটিশ নীতির অনুসরণ করে যায়। পাকিস্তান ও ভারতের দিকে তাকালে তখন দেখা যায় যে, পাকিস্তান যদিও USA-র প্রভাবে তার Intelligence এজেন্সিতে কিছুটা আধুনিকীকরণ করেছিল ও সফলতাও পেয়েছিল, কিন্তু ভারত ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত (তৎকালীন) বৃটিশ পদ্ধতির অনুসরণে Intelligence Bureau (IB)-এর সাথে মিলিত প্রচেষ্টায় স্বল্প পরিসরে Foreign intelligncec-এর ব্যাপারে মাথা ঘামাত। "ফলশ্রুতিতে '৬৫ সালের যুদ্ধে ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো'র বৈদেশিক ডেস্ক কার্যোদ্ধরে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। তখন পাকিস্তানের যুদ্ধ প্রস্তুতি, সৈন্য ও সমরাস্ত্র চলাচল ও আনুষঙ্গিক কূটনৈতিক হালচাল সম্পর্কিত বিভিন্ন রিপোর্ট IB-Foreign Desk যদিও কিছুটা জোগাড় করেছিল কিন্তু 'Analysis' অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ ও সময়ানুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। এর পর পরই ইন্দিরা গান্ধীর আমলে প্রথমে বিদেশ সংক্রান্ত গুপ্তচরবৃত্তির জন্য একটি আলাদা এজেন্সী খোলা হয় যা পরবর্তীকালে Research & Analysis Wing (RAW) নামে পরিচিতি লাভ করে।"[১] বর্তমান বিশ্বে গুপ্তচরবৃত্তিতে বা Intelligence কার্যক্রমে শুধুমাত্র সামরিক দিকটি প্রাধান্য পায় না এবং সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে কোন জাতীয় Intelligence এজেন্সী পরিচালিত হয় না। কারণ, Intelligence জগতে বা একটি দেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থে শত্রু দেশের শুধুমাত্র সামরিক তথ্যাদিই যথেষ্ট নয়। বরং ব্যাপকভাবে

১। Asoka Raina, *Inside RAW: the Story of India's Secret Service*, Chapter-2

শত্রু দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, শিক্ষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, এমনকি চলচ্চিত্রের মত নির্দোষ বিনোদন মাধ্যম সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং এগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করাও Intelligence কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত।

একটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীতে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়ে থাকে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আপাতঃ গোবেচারা ইতিহাসবিদকেও শত্রু দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে তার Counter measure গ্রহণের জন্যে দরকার হতে পারে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের রথী-মহারথী, চলচ্চিত্রের সুপারস্টাররাও এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন। সাধারণত একটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী তার শত্রু দেশগুলো বা তার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী দেশের ওপর নজর রাখার জন্য আলাদা বিভাগ বা 'ডেস্ক' পরিচালনা করে থাকে। এরপর বিভিন্ন শাখার বিশ্লেষণের পর যদি কোন বিশেষ (Special) অপারেশনের দরকার হয় তখন 'Special Service Branch' সে দায়িত্ব ঘাড়ে নেয়।

এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আফ্রিকাতে নজর রাখাও ভারতের প্রয়োজন। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক ভারতীয়ের বসবাস। তাছাড়া মুসলিম দেশগুলোর বেশক'টি সে মহাদেশে অবস্থিত।

সকলের একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, সামরিক যুদ্ধই একমাত্র যুদ্ধ নয়। এটা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কূটনৈতিক সকলক্ষেত্রে যুদ্ধের শেষ বা চরম পর্যায় মাত্র।

এবারে সাধারণত যে সংগঠনের মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা হয় সে আলোচনায় আসা যাক। মূলতঃ এসপিওনাজ অপারেশন কেন্দ্রীয়ভাবে নিজ দেশের নিয়ন্ত্রণে বা তৃতীয় কোন দেশের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যেভাবেই সংগঠন নিয়ন্ত্রিত হোক না কেন মৌলিক অবকাঠামো নিয়ন্ত্রিত হয় নিজ দেশে যেখানে এসপিও নাজ পরিচালিত হয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে।

ক। রেসিডেন্ট (Resident)

শত্রুদেশে নিয়োজিত প্রধানতম নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা যিনি একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বিভিন্ন অপারেশন নিয়ন্ত্রণের কাজে নিয়োজিত থাকেন। উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে সাধারণত কূটনৈতিক মিশনে বা শত্রুদেশে পরিচালিত কোন NGO বা কল্যাণমূলক সংস্থায় এমন কি কোন ধর্মীয় সংস্থার ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব রূপে আইনসম্মতভাবে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে নিয়োজিত থাকেন। তাঁর পদমর্যাদা বা STATUS শত্রুদেশে আইনের বাইরে থেকে কাজ করার সুযোগ করে দেয়। মূলত তিনি এজেন্ট নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, তাদের বিভিন্ন অপারেশনে নিয়োজিত করা, সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে নির্দেশ দেয়া ও সর্ববিষয়ে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। শত্রুদেশ তার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারলেও তাঁর Diplomatic Cover নিশ্ছিদ্র প্রমাণ সংগ্রহে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের RESIDENT এজেন্ট

সাধারণত LEGAL RESIDENT নামে পরিচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে বেআইনীভাবে চুপিসারে কোন COVER গ্রহণ করেও এ ধরনের কাজ চালানো হয়। আবার তৃতীয় বা পার্শ্ববর্তী দেশে অবস্থান করে তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয় সাধনের কাজ চালানো যায়।

খ। প্রধান এজেন্ট (Principal Agent)

যে শত্রু দেশে Intelligence কার্যক্রম চালানো হয়ে থাকে সে দেশের প্রভাবশালী কোন ব্যক্তিত্বকে (বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি) যিনি সর্বসাধারণের চোখে মোটামুটি শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম এমন একজনকে পয়েন্ট বা প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনি আবার এজেন্ট নিয়োগ ও তাদের পরিচালনা ও সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকেন।

গ। এজেন্ট (Agent)

যে দেশে এসপিওনাজ কার্যক্রম চালানো হয় সে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন গ্রেডের এজেন্ট নিয়োগ করা হয়। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এজেন্ট নিয়োগ করা হয় যারা পয়সার মাধ্যমে, ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হয়ে বা মাসুদ রানার মোহাম্মদ আলমগীরের মত অজান্তে দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রধান এজেন্টের কাছে সরবরাহ করে থাকে। এরা মূলত রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন মাধ্যমে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তথ্য সংগ্রহ করে বা বিভিন্ন National Policy 'র উপর নজর রাখে।

ঘ। অপারেটিভ (Operative)

যে দেশ Intelligence network পরিচালনা করে তার এজেন্সীর বিশেষ প্রশিক্ষণ পাওয়া ব্যক্তিই একজন অপারেটিভ। তিনি সাধারণত একেকটি বিশেষ ব্যাপারে অভিজ্ঞ হন ও প্রশিক্ষণ লাভ করে এবং প্রয়োজন অনুসারে শত্রুদেশে এজেন্টদের সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিশেষ কোন কাজে (Special operations : যেমন-শান্তিবাহিনীকে ট্রেনিং দেয়া, কোন Subversive কাজে বা সাবোটাজে সাহায্য করা, অস্ত্র সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ দেয়া ইত্যাদি) নিয়োজিত হন।

ঙ। ট্যালেন্ট স্পটার (Talent Spotters)

এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিশেষ লোক বাছাইয়ের জন্য রেসিডেন্ট বা প্রধান এজেন্ট নিজস্ব পরিচিত কিছু লোককে নিয়োজিত রাখেন যারা কোন কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী বা সংস্কৃতিসেবীর কোন বিশেষ গোপন ব্যাপার জানেন ও অন্যান্য উপায়ে একজনকে এজেন্ট হিসেবে রিক্রুট করতে সাহায্য করেন। এভাবে Talent Spotters রা যেভাবে এজেন্ট নিয়োগে সাহায্য করেন তাকে বলা হয় 'Hooking up an agent'.

৪। এজেন্ট নিয়োগ পদ্ধতি

প্রধান এজেন্ট সাধারণত টাকার বিনিময়ে বা নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য (ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক) রেসিডেন্ট কর্তৃক সহজেই নিয়োজিত হন। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এজেন্ট নিয়োগের জন্য প্রধান এজেন্ট Talent Spotter-দের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মীর মানবীয় বিভিন্ন দোষ-ত্রুটির উপর দীর্ঘদিন নজর রাখেন। হয়তো কেউ মদ্যপানে অতিরিক্ত আসক্ত, কেউ অবৈধ বিকৃত যৌন সম্ভোগে অভ্যস্ত বা কারো টাকার প্রতি লোভ মাত্রাতিরিক্ত। আবার কোন Needy ব্যক্তি যার কোন কারণে (হয়ত জুয়া খেলে সর্বস্ব খুইয়ে ঋণে জর্জরিত) টাকার

অত্যন্ত দরকার, এমন ব্যক্তিদেরই তাদের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা হয়। কোন অসংলগ্ন অবস্থার প্রমাণ (নারী সম্ভোগে লিপ্ত থাকার ছবি)সহ তাদের ব্ল্যাকমেইল করে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে বাধ্য করা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে কার্যসিদ্ধি করা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে হয়ত সরকারকে পছন্দ নয় ও এর পতন ঘটানো বা সুনাম ক্ষুণ্ন করা নিজ রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজন এমন ঘটনাও ঘটে থাকে। বাংলাদেশে এর প্রমাণ অজস্র। এমনকি ১৯৭১ সালের যুদ্ধে "A Senior Pakistani officer who had stayed in Dhaka till the emergence of Bangladesh, provided invaluable information to RAW operative and was pulled out one day before Dhaka feell".[২]

৫। তথ্য প্রদানের প্রকৃতি

সাধারণত তিন উপায়ে একজন ব্যক্তির নিকট থেকে কোন তথ্য আদায় করা যায়।

ক। **Conciously** (সজ্ঞানে)

রাষ্ট্রের প্রতি বা সরকারের প্রতি বিদ্বেষবশত টাকার বিনিময়ে এ ধরনের তথ্য আদায় করা যায়।

খ। **Sub Conciously** (অর্ধচেতন অবস্থায়)

অনেকেই বিশেষ করে সরকারী কর্মকর্তারা বিভিন্ন আড্ডায় বা হঠাৎ করে অবচেতন অবস্থায় বেফাস কোন তথ্য প্রদান করে থাকেন। ১৯৭০ সালে লন্ডনে একজন পাকিস্তানী কূটনীতিক কোন এক স্থানে হঠাৎ বলে ফেলেন- "Teaching those stupid Bengalis a lesson they will never forget"[৩] যা পরবর্তীকালে RAW অপারেটরের মাধ্যমে ভারতে পাকিস্তানের মনোভাব আগাম আঁচ করতে সহায়তা করে।

গ। **Unconciously** (না জেনে, না বুঝে)

অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই (বিশেষ করে বাংলাদেশের মত Intelligence কর্মকান্ড সম্পর্কে অসচেতন দেশে) কোন পার্টিতে বা তথ্যের গুরুত্ব অনুধাবন না করেই (কোন কোন সময় নিজের গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য) কোন তথ্য জনসমক্ষে বা শত্রুদেশের এজেন্সীর কাছে প্রকাশ করে ফেলেন।

৬। সশস্ত্র বাহিনীর সম্পর্ক

আধুনিক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী কখনোই সশস্ত্রবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে না বা থাকা উচিত নয় (যদিও সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা বাহিনী থাকে)। CIA,, Mosad[৪], RAW এগুলোর কোনটিই সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নয়; বরং বেসামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণেই একটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সমরনীতি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার একটি অংশমাত্র, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে, সর্ববিষয়ে রাজনৈতিক দর্শনের উপর ভিত্তি করেই Grand strategy বা মহারণনীতি পরিচালিত হয়। তবে অবশ্যই সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষজ্ঞরা এজেন্সীতে নিয়োজিত থাকেন আলাদা দপ্তরে। সেখানে তারা

২। প্রাগুক্ত, অধ্যায় - ৬
৩। প্রাগুক্ত, অধ্যায়-৬
৪। ইসরাইলী গুপ্তচর সংস্থা

সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে সরকারকে সমরনীতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনায় সাহায্য করেন। কারণ Cultural aggression চালাতে হলে নিশ্চয়ই কেউ একজন সামরিক জেনারেলের সাহায্য চাইবেন না; বরং সংস্কৃতির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ একজনের পরিকল্পনাই সেখানে গৃহীত হবে।

৭। ডবল এজেন্ট (Double Agent)

আপাতদৃষ্টিতে শত্রুদেশের কোন ব্যক্তি বা এজেন্টকে যখন নিজদেশের প্রয়োজনে অর্থের লোভে বা অন্য কোনভাবে কাজে লাগানো হয় তখন তাকে ডবল এজেন্ট বলা যায়। হয়তো শত্রুদেশ কখনো এ ব্যাপারটি আঁচ করতে পারে না। তবে যখনই কাউকে ডবল এজেন্ট নিয়োগ করা হয় তখন তাকে নিজ দেশের কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়া হয় না- যা সে Double Cross করে শত্রুদেশের এজেন্সীতে পাচার করতে পারবে। অবশ্য বিশ্বাসঘাতকতা ও Double cross করা Double Agent নিয়োগের একটি মস্তবড় ঝুঁকি।

৮। এসপিওনাজ টার্গেট/লক্ষ্যসমূহ

এসপিওনাজ অত্যন্ত ব্যাপক বা বিস্তৃত পরিসরে পরিচালিত করা হয়। স্বাধীনতার পর আমাদের পাটশিল্পকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য Subversive operations কারো ভুলে যাবার কথা নয়। সেসময় বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটানোর জন্য ভারতীয় টাকশালে আমাদের নির্দেশিত সংখ্যার কয়েকগুণ বেশী নোট ছেপে আমাদের দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজানো হয়েছিল। ফারাক্কা ইস্যুর মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ, শান্তিবাহিনী সৃষ্টি, বিশেষ মতাদর্শের (আমাদের ঐতিহ্য বিরোধী) প্রচার পুস্তিকার সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ, বঙ্গভূমি- এ রকম হাজারো ক্ষেত্রে এসপিওনাজ নেটওয়ার্ক বিস্তৃত থাকে।

৯। বেশ্যালয়, কলগার্ল ও এসপিওনাজ

এটা সকলেই জানেন, গুপ্তচরবৃত্তিতে 'নারী' একটি মস্তবড় ফ্যাক্টর। সাংবাদিক শফিকুল কবিরের 'টিকাটুলী টু পিকাডেলী' যারা পড়েছেন তারা হয়ত স্মরণ করতে পারবেন যে, কিভাবে শফিকুল কবিরের বৃটিশ বান্ধবী আরব শেখদের সাথে বিকিনি পরিহিতা ইসরাইলী তরুণীদের দেখে মন্তব্য করেছিলেন, মেয়েদের 'ব্রার' মাঝখানটি শত শত ট্যাংক-কামানের চেয়েও শক্তিশালী। ইতিহাসখ্যাত মাতাহারির নাম তো গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, পৃথিবীর প্রধানতম প্রায় সব গুপ্তচর সংস্থাই বেশ্যালয় পোষে বা পর্ণোগ্রাফী বাজারজাত করে থাকে। "The CIA, the KGB and the SIS (British Intelligence) are reported to have funded and run brothels!"[৫] ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW-ও "Have been alleged to have run brothels at one time".[৬] এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য শহর বোম্বেতে ইসরাইলী কনস্যুলেট অবস্থিত। RAW ও Mosad উভয়েই আরব শেখদের 'Three 'W'র[৭] অন্তত দুই 'W' অর্থাৎ Women ও Wine দ্বারা সারা মধ্যপ্রাচ্যেই বৃহৎ

৫। প্রাগুক্ত, ক্রমিক ১, অধ্যায় - ২

৬। প্রাগুক্ত

৭। Women, wine, wealth

বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করে নিয়েছে ও বিভিন্ন সামরিক তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। বোম্বে নায়িকাদেরও এ ক্ষেত্রে 'Bait' হিসাবে ব্যবহার করার উদাহরণ আছে।

১০। শেষ কথা

এসপিওনাজ সম্পর্কে এত ছোট পরিসরে লেখা সম্ভব নয়, এসপিওনাজের Communication System সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো না। তবে আমাদের মত ছোট দেশ যেখানে রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে আমরা অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সকল পর্যায়ে আগ্রাসনের শিকার, সেখানে এসপিওনাজ সম্পর্কে সচেতন হওয়া আমাদের অবশ্যই দরকার। আমাদেরও প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। অনেকেই 'আর্মির যেরূপ দরকার নেই' বলে মত দেন সেখানে সে দেশে The Basic question arises- Why spy? The simple answer would be 'to survive.'

[এ নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে মাসিক নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট পত্রিকায়। পরবর্তীতে দৈনিক ইনকিলাবেও নিবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।]

অধ্যায়-২
চানক্যের বদান্যতার তত্ত্ব

[গুপ্তচরবৃত্তিতে চানক্য যিনি কৌটিল্য নামে পরিচিত তিনি 'অর্থশাস্ত্র' নামে একটি বই লিখেছিলেন। ভারত আজো তাদের কূটনীতি ও গুপ্তচরবৃত্তির ক্ষেত্রে চানক্যকে অনুসরণ করে থাকে। এখানে এই চানক্য ও তাঁর তত্ত্ব সম্পর্কে ১৯৯৫ সালে একটি দৈনিকে প্রকাশিত লেখকের একটি নিবন্ধ পত্রস্থ করা হলো]

ইতিহাসখ্যাত প্রতারক কূটনীতিক কৌটিল্য তার বিখ্যাত বই 'অর্থশাস্ত্রে' ছয়টি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। ৩১২ খৃস্টপূর্ব সাল হতে ৩০০ খৃস্টপূর্ব সালের মধ্যে রচিত 'অর্থশাস্ত্র' আজ নিছক 'পুরনো সেই দিনের কথা' বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তারপরও সেই তত্ত্বগুলো এমনি মারাত্মক যে, তা কি 'ভোলা যায়'? না ভোলা উচিত?

রাজনীতি, কূটনীতি সম্পর্কে চানক্যের তত্ত্বগুলো হলোঃ

(১) অন্য রাষ্ট্রের সাথে চুক্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

(২) অনবরত আঘাত করে শত্রুকে আহত করে রাখার নামই যুদ্ধ।

(৩) উদাসীন থাকার নামই নিরপেক্ষতা।

(৪) সামরিক তৎপরতা চালনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৫) অন্যকে নিজের কাছে আশ্রয় ও নিরাপত্তা চাইতে বাধ্য করাই হচ্ছে মিত্রতা।

(৬) একজনের সাথে শান্তি ও অন্যজনের সাথে যুদ্ধের নামই হচ্ছে দ্বৈতনীতি।

এখন, পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, চানক্যের সময় হতে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক ভারতীয় শাসক অত্যন্ত সার্থকভাবে উপরোক্ত সূত্রগুলো অনুসরণ করে আসছেন, বিশেষ করে ভারতীয় কংগ্রেসের নেতানেত্রীদের এ ব্যাপারে 'এ্যান এক্সপার্ট হেড মাস্টার' হিসেবে বিবেচনা করা চলে। এঁদের মাঝে জওহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী ও নরসীমা রাওয়ের নাম উল্লেখ করা যায়।

জওহরলাল নেহেরু নিঃসন্দেহে একজন দেশপ্রেমিক, প্রাজ্ঞ রাজনীতিক- যার মেধা, মনন দেশ পরিচালনার যোগ্যতা সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু এই জওহরলাল নেহেরু তাঁর দেশকে শক্তিশালী, উন্নত করার জন্য যেসব পথ অনুসরণ করেছিলেন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা করেছিলেন তার অনেক কিছুই ছিল স্পস্টরূপে অন্যদেশের স্বার্থপরিপন্থী, ক্ষেত্রবিশেষে অন্যের অধিকার কেড়ে নিয়ে আপন উন্নয়নের গতিময়তা অব্যাহত রাখার চেষ্টা।

নেহেরুর এরূপ মনোবৃত্তি নিয়ে আজ পর্যন্ত বহু আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে, মওলানা আবুল কালাম আজাদের 'ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম' বইয়ে প্রকাশ পেয়েছে অনেক

ভয়ঙ্কর 'সত্য' কথা। তাই এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজকের 'নিউক্লিয়ার ইন্ডিয়া'র স্বপ্নদ্রষ্টা নেহেরু সম্পর্কে কিছু না বললেই নয়।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন সবেমাত্র পারমাণবিক প্রযুক্তি হস্তগত করেছে। সে সময় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, চীন তো দূরে থাক, মহাপরাক্রমশালী সোভিয়েত রাশিয়া পর্যন্ত এ্যাটম বোমা বানাতে সক্ষম হয়নি। এমতাবস্থায় কোন পাগলও ভারতের মত দরিদ্র ও পরাধীন দেশে পারমাণবিক বোমা বানানোর কল্পনাও করতে পারে না। কারণ তখনো কেউ নিশ্চিত ছিল না যে, ভারত আদৌ স্বাধীনতা অর্জন করবে কিনা এবং করলেও কখন করবে? কিন্তু একথা আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, সে সময় ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরু কিভাবে ভারতে পারমাণবিক অস্ত্র মওজুদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন? এ ব্যাপারে ১৯৪৬ সালের ২৬শে জুন এক জনসভায় নেহেরু বলেন,

> "যতদিন পৃথিবী এখনকার মত পরিচালিত হবে, ততদিন পর্যন্ত প্রতিটি দেশের একটি যথার্থ উপকরণ থাকবে এবং সে তার নিরাপত্তার খাতিরে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। আমার এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারত তার নিজস্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নয়ন সাধন করবে এবং আমি আশা করি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা পারমাণবিক শক্তিকে গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করবেন। কিন্তু ভারত যদি আক্রান্ত হয় তবে সে অতি অবশ্যই তার ভান্ডারে যা কিছু মওজুদ আছে তা নিয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। আমি আশা রাখি যে, সাধারণত ভারত অন্যান্য দেশের সাথে মিলিতভাবে পারমাণবিক বোমার ব্যবহারে বিরোধিতা করবে।"

নেহেরুর এই বক্তব্যেই খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তিনি কথার মারপ্যাঁচে ভারতের পারমাণবিক বোমা অর্জনের কথা সকলকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছেন। এর পরবর্তী ইতিহাস সকলের জানা। এখন পৃথিবীর সকলেই জানেন ভারত এ্যাটম বোমা তৈরির পরবর্তী স্তরে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করতে যাচ্ছে।

এবার দেখা যাক, ভারত কিভাবে চানক্যের ছয়টি সূত্র অনুপুংখভাবে অনুসরণ করে আসছে। প্রথমে সূত্রে বলা হয়েছে অন্য রাষ্ট্রের সাথে চুক্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং আধুনিক 'অহিংস ভারত' তার পার্শ্ববর্তী প্রতিটি রাষ্ট্রের সাথেই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সঙ্গত কারণেই (!) কূটনৈতিক ছলনার জন্য এসব কথিত চুক্তিকে আখ্যা দেয়া হয়েছে 'মৈত্রী' ও সহযোগিতা চুক্তি নামে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পাদিত চুক্তি হতে উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে-

(১) সিকিমের সাথে একটি কথিত চুক্তি নিয়ে ২০ মার্চ ১৯৫০ সালে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়, "এখন থেকে সিকিমে একজন ভারতীয় কর্মকর্তা দেওয়ান হিসেবে রাজ্যের কার্যাদি পরিচালনা করবেন।"

(২) রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র হয়েও নেপাল ভারতের সাথে তথাকথিত

মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয় ১৯৫০ সালে। এ চুক্তি বলে তৃতীয় কোন দেশ থেকে নেপাল সমরাস্ত্র কিনতে পারবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এরপর ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে নেপাল চীন থেকে অল্প কিছু বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র সংগ্রহের উদ্যোগ নিলে ভারত স্থলবেষ্টিত নেপালের ১৫টি ট্রানজিট রুটের সবক'টি বন্ধ করে দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে নেপাল মাথা নোয়ায় ভারতের প্রতি। একে কি চানক্যের পাঁচ নম্বর সূত্র 'অন্যকে নিজের কাছে আশ্রয় ও নিরাপত্তা চাইতে বাধ্য করাই হচ্ছে মিত্রতা' বলা যায় না?

(৩) ১৯৮৭ সালের ১ জুন তারিখে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী শ্রীলংকার তামিলদের সাহায্যার্থে ভারতীয় বিমান দিয়ে রসদপত্র ফেলার নির্দেশ দেন। 'অপারেশন পোমালি' নামের ঐ আগ্রাসী তৎপরতার পর রাজীব গান্ধী মন্তব্য করেন, 'আমি কি মেসেজ দিতে চেয়েছি প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে হয়তো তা বুঝতে পেরেছেন।'

এরপর ২৯ জুলাই '৮৭তে শ্রীলংকা ভারতের সাথে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করতে বাধ্য হয় এবং IPKF বা Indian Peace Keeping Force শ্রীলংকার মাটিতে পা রাখে। এভাবেই ভারত আঞ্চলিক পুলিশী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

এখানে আমরা চানক্যের প্রথম, পঞ্চম ও চতুর্থ সূত্রের প্রয়োগ দেখতে পাই, যেখানে চতুর্থ সূত্রে বলা হচ্ছে "সামরিক তৎপরতা চালনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।"

(৪) '৭১ সালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে গোপন সাত দফা চুক্তিতে বাধ্য করা হয়। কথিত আছে, ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর দেয়ার পর তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অজ্ঞান হয়ে যান।

এরপর ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে স্বাক্ষরিত হয় তথাকথিত পঁচিশ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি, যাকে এদেশের জনগণ ঘৃণাভরে 'গোলামী চুক্তি' বলে আখ্যা দিয়েছে।

এদিকে ১৯৭৪ সালের ১৬ মে স্বাক্ষরিত সীমান্ত চুক্তি লংঘন করে ভারত এখনো বাংলাদেশের আঙ্গরপোতা, বেরুবাড়ি দখল করে রেখেছে।

অন্যদিকে ১৯৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর সৃষ্টি করা হয় শান্তিবাহিনী, যার দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে 'র' তৈরি করে বঙ্গভূমি আন্দোলন।

এছাড়া মালদ্বীপে সৈন্য প্রেরণের ঘটনাকেও আমরা চার ও পাঁচ নম্বর সূত্রের মিলিত প্রয়োগ বলে উল্লেখ করতে পারি।

ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী এভাবে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চানক্য কৌশল প্রয়োগ করে আসছে দীর্ঘদিন হতে। তবে পাকিস্তান ও চীন হয়তো

একটু ব্যতিক্রম হতে পারে। কারণ, এ দু'টো দেশ সামরিক ও অর্থনৈতিক খাতে বিশেষভাবে শক্তিশালী। অবশ্য তারপরও পাকিস্তানকে ১৯৭১ সালে পরাজিত করা ও পরবর্তীতে সিমলা চুক্তিতে আবদ্ধ করা ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সাফল্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

এ নিবন্ধে চানক্যের সূত্র সম্পর্কে ধারণা দেয়ার পর আশাকরি বাংলাদেশের সাথে ভারতের আচরণ নিয়ে আর কোন বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

অধ্যায়-৩

'র' কেন বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত

'র'-এর গুপ্তচরবৃত্তির প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ও তৎপরবর্তী পরিচালিত কয়েক ধরনের স্ট্র্যাটেজি ও বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতার বিবরণ দেয়া প্রয়োজন। ১৯৬৮ সালে 'র' গঠিত হয়েছিল মূলত বৈদেশিক গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনার জন্য। এর পূর্বে আইবি (Investigation Bureau) এতদসংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করত। তখন স্বভাবতই প্রশাসনিক ক্যাডার ও পুলিশ বাহিনীর লোকজন দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তাদের গুপ্তচরবৃত্তির প্রকৃতি ছিল অনেকটা 'আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার জটিলতায়' আক্রান্ত ধীর, শ্লথ ও কোন কোন ক্ষেত্রে 'হতাশাপূর্ণ'। কিন্তু 'র' গঠন করার পর ইন্দিরা গান্ধীর মত একজন তুখোড় স্টেটসম্যান আধুনিক ধ্যান ধারণার পরিপূর্ণ সুযোগকে কাজে লাগান; তবে সার্বিকভাবে ভারতীয় রাজনীতিবিদগণ 'চানক্যের' গুপ্তচরবৃত্তির দর্শনকেই মৌলিক চেতনা হিসেবে বেছে নেন। যার ফলশ্রুতিতে ভারত তৃতীয় বিশ্বের একটি হত দরিদ্র, শত অভ্যন্তরীণ সমস্যাসঙ্কুল দেশ হওয়া স্বত্ত্বেও 'র' গঠনের মাত্র তিন বছরের মধ্যে 'বাংলাদেশ অপারেশনের' মাধ্যমে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরিতে সুচারুরূপে সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে প্রাচীন ধ্যান ধারণা পোষণকারী কেবলমাত্র সামরিক প্রাধ্যান্যে পরিচালিত পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থা–আই এস আই পরিস্থিতিকে 'হযবরল' অবস্থায় নিয়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হতে সম্প্রতিক কাল পর্যন্ত পরিচালিত 'র' কার্যক্রমে মৌলিক কিছু পরিবর্তন হলেও বাংলাদেশের জনগণের বিপরীতে পরিচালিত কর্মধারায় এখনো কোন পরিবর্তন হয়নি বলে ধরে নেয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সে সময় আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত আমাদের সহায়তা করেছে ও অতি দ্রুত স্বাধীনতা লাভে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রথম হতেই আমাদের তৎকালীন জাতীয়তাবাদী নেতাদের সাথে আইবি ও পরবর্তীতে 'র' কর্মকর্তারা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় 'র'-এর সক্রিয় প্রশিক্ষণ পরিচালনা, ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে হানাদার পাকবাহিনীর রণকৌশল সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক উপদেশ প্রদান, গেরিলা যুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক লক্ষ্য হাসিলে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সর্বশেষে সম্মুখ যুদ্ধে ব্যাপক ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তখন বাংলাদেশ সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠিত ইন্টেলিজেন্স সংস্থা না থাকায় 'র' আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ না করলেও বেশিরভাগ প্রয়োজন মেটাতো। স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মনে হবে-'অহিংস' ভারত মানবতার অপমানে লজ্জিত (!) হয়ে কি মানবিক আচরণই না প্রদর্শন করলো! তবে ভারতের মনোভাব বা সহায়তার পিছনের ইতিহাস সম্পূর্ণ না টেনেও শুধু 'গোপন সাত দফা চুক্তি'র কথাটি যদি কোন স্বাধীনচেতা বাংলাদেশী ভেবে দেখেন (যা প্রস্তুত করেছিল 'র' কর্মকর্তাগণ), তবে পৃথিবীতে ভারতের পরিচয় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠবে, যা উপলব্ধি করতে পেরে তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাত দফা চুক্তিতে বাধ্য হয়ে স্বাক্ষর করার পর মূর্ছা

গিয়েছিলেন। আসলে 'শতাব্দীর সুযোগ'কে তারা এমনি এমনিই কাজে লাগায়নি। বরং এর পিছনে যে আজন্ম লালিত আর্য-চানক্য নীতির প্রভাব ছিল তা বলাই বাহুল্য। যদি তাই না হবে তবে ভারত কেন পরবর্তীতে ফারাক্কা চালু করে চরম অমানবিক কাজ করলো? কেন আজ ভারত সর্বকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ের পানি দয়া (!) করে বাংলাদেশকে দিয়ে চার কোটি মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে চরম অমানবিক কায়দায় শুকিয়ে মারছে? কেন সৃষ্টি করেছে শান্তিবাহিনী, বঙ্গসেনা, মোহাজির সংঘের মতো সংগঠনের?

অনেকেই হয়তো এ কথাটি জানেন না যে, ১৬ ডিসেম্বরের পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলটিও প্রস্তুত করেছিল 'র'-এর কর্মকর্তারা। 'নিয়াজী আত্মসমর্পণে রাজী হওয়ার পর 'র'-এর অফিস হতেই আত্মসমর্পণের চুক্তিমালা প্রণয়ন করা হয়'[১]। এবং 'র'ই অবশেষে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিব সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে'[২]। 'র'-এর কর্মকর্তারা এতবড় কাজ শুধুমাত্র আমাদের স্বাধীনতায় খুশী হয়ে সম্পাদন করেনি। বরং নিজ স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যেই তারা এ ভূমিকা পালন করেছিল ও এখনো করছে। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশে 'বন্ধুপ্রতিম দল' ক্ষমতাসীন না হলে ভারত 'বন্ধুত্ব'কে ছুড়ে ফেলে দেয় দূরে, বহুদূরে।

এদিকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার সময় এ উপমহাদেশের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে ভারতের কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল বলে ধরে নেয়া যায়।

প্রথমতঃ চির বৈরী পাকিস্তানকে দুর্বল করে দিয়ে সামরিক, অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা এবং ১৯৬২ ও '৬৫ সালের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী যে পেশাগত দুর্নামের ভাগীদার হয় তা দূর করার মাধ্যমে হীনমন্যতার বীজ নষ্ট করে দেয়া।

দ্বিতীয়তঃ দ্বি-জাতি তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত করার অজুহাত সৃষ্টির আড়ালে বাঙালীদের মনে অখণ্ড ভারত চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানো। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে ১৯৪৭ সাল ও পূর্ববর্তী ঘটনাবলী অস্বীকার করার ভিত্তি তৈরি করা।

তৃতীয়তঃ চীনের বিপরীতে ও রাশিয়ার পক্ষে অত্র অঞ্চলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা বজায় রাখা। এ ব্যাপারে মূলত রাশিয়ার কাছ থেকে চুক্তি মোতাবেক নিজ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও সমরাস্ত্র পাওয়ার প্রশ্নটিই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

চতুর্থতঃ বাংলাদেশে একটি বন্ধুভাবাপন্ন দলকে রাজনৈতিক পর্যায়ে সর্বতো উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে টিকিয়ে রাখা। যাতে এ অঞ্চলে ভারতের অনুকূলে ক্ষমতার ভারসাম্য বাজায় থাকে ও পার্শ্ববর্তী ৭টি বিচ্ছিন্নতাবাদ আক্রান্ত রাজ্যের বিদ্রোহ দমানোর জন্য বাংলাদেশকে প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায়। এর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য 'র'-এর মাধ্যমে সকল পর্যায়ে ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া জোরদারকরণ ও বাংলাদেশের নব্য প্রতিষ্ঠিত সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

পঞ্চমতঃ ভারতীয় চেতনার অনুকূলে বাংলাদেশে যদি কার্যকরভাবে কিছু সময়ের জন্য

১। Asoka Raina, *Inside RAW-the Story of India's Secret Service*, Chapter-10

২। প্রাগুক্ত, অধ্যায় - ৯

স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তার অজুহাতে খবরদারী করা যায় তবে বাংলাদেশের মতো তিনদিকে ভারত বেষ্টিত একটি দেশের বন্ধুত্ব ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তায় বড় রকমের প্লাস পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে- এই পরিকল্পনানুযায়ী এগিয়ে যাওয়া।

ষষ্ঠতঃ 'ভেতো বাঙালীকে' পশ্চিমবঙ্গীয়দের মতো শুধুমাত্র সংস্কৃতি চর্চার আঁতেলেকচুয়াল কায় কারবারে মত্ত রেখে একটি নির্জীব জাতিতে পরিণত করা। তাই বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায় হতে সশস্ত্র বাহিনী বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে আধিপত্য কায়েম করা। যদি বাংলাদেশীরা এ প্রক্রিয়াতেও 'পথে না আসে' তবে যেন-তেন প্রকারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙে দিয়ে আজন্ম ভারতের উপর নির্ভরশীল করে রাখা।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার পর যখন বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের উৎপত্তি হলো যার স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' নীতির আলোকে অর্থনৈতিকভাবে একটি শক্তিশালী দেশ গঠন তখন ভারতের প্রবীণ রাজনীতিবিদ শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণ (এখন পরলোকগত) বলেছিলেন, 'ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়ে আরেকটি পাকিস্তান সৃষ্টি করলো।' এছাড়া তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অত্যন্ত ভালভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, বাংলাদেশ শেখ মুজিবের ভাষ্যমতে 'দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র'। এছাড়া আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ভারতের সেনা প্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেকশ'-বলেছিলেন,

> 'বাংলাদেশে যদি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয় তাহলে ভারতের তাতে অবাক হবার কিছু নেই। আমাদের সৈনিকগণ যেদিন বাংলাদেশ মুক্ত করে সেদিনই আমি এই সত্য উপলব্ধি করি। বাংলাদেশের কখনোই ভারতের প্রতি তেমন ভালবাসা ছিল না। জানতাম ভারতের প্রতি তাদের ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী। অনুপ্রেরণার জন্য তারা ভারতের দিকে না তাকিয়ে বরং মক্কা ও পাকিস্তানের দিকেই তাকাবে। আমাদের সত্যাশ্রয়ী হওয়া উচিত'[৩]।

এখন পর্যন্ত যদিও বাংলাদেশ 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' হিসেবে পরিচিতি পায়নি, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর মনে সে ভয় প্রথম থেকেই ছিল। তাই তিনি শেখ মুজিবের মতো বড় মাপের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতাকেও সযতনে ইসলামী ভাবধারা হতে সরিয়ে রাখার জন্য আওয়ামী লীগে অনুপ্রবিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে চাপ দিয়ে এসেছেন। মূলত বাংলাদেশে লুটপাটের প্রথম ক্ষণে যখন মেজর জলিল ও লাখো জনতা অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতীয় আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তখনই ভারত সরকার বুঝেছিল যে, এ জাতিকে সরাসরি শোষণ করা যাবে না। এরপর ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে যখন একের পর এক প্রচেষ্টায় যতটুকু সম্ভব ভারতীয় চাপের বলয় হতে বের হয়ে আসার চেষ্টা করেছেন তখন ইন্দিরা গান্ধীকে স্বতন্ত্র চেতনাসমৃদ্ধ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে তার পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় পেয়ে বসে। এবং অবন্ধুসুলভ বাংলাদেশ তাঁকে 'দ্বিতীয় চিন্তা' গ্রহণে বাধ্য

৩। দৈনিক স্টেটসম্যান, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ৮৮

করে।

তিনি (ইন্দিরা গান্ধী) অত্যন্ত ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, যদি বাংলাদেশ একটি স্বনির্ভর ও স্বতন্ত্র চেতনাসমৃদ্ধ শক্তিশালী দেশে পরিণত হয় তবে তাতে অবশ্যই ভারতের বিভিন্ন স্বাধীনচেতা জাতিসমূহ তাদের স্বাধীনতা আন্দোলন বেগবান করার একটি উৎকৃষ্ট নৈতিক সমর্থন লাভ করবে। কারণ তারা তখন ভাববে যে বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র একটি দেশ যদি তিনদিকে ভারত পরিবেষ্টিত হয়েও সুখে শান্তিতে থাকতে পারে তবে তারাও স্বাধীনতা লাভের পর বৃহৎ ভারতকে পাশে রেখে টিকে থাকতে পারবে। এছাড়াও ইন্দিরা গান্ধী চাননি যে, ভারতের পূর্ব পাশে পাকিস্তানের মতো একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটুক[৪]। তাই তাঁর Brain Child 'র' কে[৫] যেনতেন প্রকারে একটি দুর্বল বাংলাদেশ ও সেখানে একটি তাঁবেদার শাসক শ্রেণী প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে গোপন সাতদফা চুক্তির ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহারের জন্য 'পঁচিশ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তিতে' আবদ্ধ হতে বাধ্য করান। এমনকি যে শেখ মুজিবকে পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালীরা তখন দেবতা জ্ঞান করতো সেই মুজিবকে তখন বাংলাদেশের আবির্ভাবে ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চাঙ্গা হয় কিনা এ ভয়ে পশ্চিমবঙ্গ সফরকালে কলকাতা এয়ারপোর্ট হতে হেলিকপ্টারযোগে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অথচ দিল্লী ভ্রমণের সময় শেখ মুজিব গাড়িতে করেই এয়ারপোর্ট থেকে গন্তব্যে পৌছান। মূলত ভারতীয় স্ট্র্যাটেজিক বিশেষজ্ঞদের মতে

> 'বাংলাদেশের আবির্ভাব ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী ৭টি রাজ্য (Seven Sister) তখন হতে আজ পর্যন্ত কাশ্মীরের পরপরই সবচেয়ে বেশী গোলযোগপূর্ণ অঞ্চল। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকারের আধিপত্য একটি ঐতিহাসিক সত্য। বাংলাদেশ হতে পাকিস্তানীদের জোড়পূর্বক বহিষ্কার ভারতীয় সরকারের মনে যথেষ্ট ভীতি সঞ্চার করে'[৬]।

তাই আবির্ভূত বাংলাদেশ যাতে নিজের হাতে গড়া 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে' পরিণত না হয় সেজন্য ইন্দিরা গান্ধী যে 'র'-এর মাধ্যমে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? তাই দেখা যায় গত ২৯/৫/৯৩ তারিখে ভারত সফর শেষে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া যখন কলকাতা দমদম বিমানবন্দরে যাত্রা বিরতি করেছিলেন তখন তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে ইচ্ছুক কোনো পশ্চিমবঙ্গীয় সাংবাদিককে তাঁর সাথে দেখা করতে দেয়া হয়নি। রিপোর্ট মতে 'র' কর্মকর্তারা চাননি বেগম জিয়ার ইমেজ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদের প্রভাবিত করুক। তাই সাক্ষাৎকার গ্রহণেচ্ছু সাংবাদিকদের জানিয়ে দেয়া হয় যে, বেগম জিয়া সাক্ষাৎকার দিতে রাজী নন; যা ছিল মিথ্যা। এ ঘটনা কি প্রমাণ করে না যে, ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশকে ভয়

৪। এধরনের আশংকার কথা ফিল্ড মার্শাল মানেকশ' ইন্দিরা গান্ধীকে ১৯৭১ সালে উল্লেখ করেছিলেন

৫। যে সংস্থাকে Indira Gandhi's Strong Troopers বলা হতো

৬। ব্রিগেডিয়ার আনোয়ারুল আজিম খান, *'Indo-Bangladesh Friendship treaty; Expression of Indian Mistrust and our sincerity'* Dhaka Courier, 15 April '94

পায়। তাদের ভয় হয়-না জানি কখন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরাও 'দিল্লী হটাও' আন্দোলন শুরু করে। আজ যারা ইন্দিরা গান্ধীকে স্মরণ না করার জন্য বাংলাদেশীদের 'বেঈমান' বলেন বা ভারত সরকারকে পরম মিত্র ভাবেন, তাদের এ কথাটি জানা থাকা ভাল যে, ভারত তাদের কখনোই বন্ধুর মর্যাদা দেয় না বরং 'বলির পাঠা' বা 'টয়লেট পেপার' হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।

এখন এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ভারত বাংলাদেশকে সব দিক দিয়েই একটি দুর্বল রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায়। গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে একটি দেশ সরাসরি দখল না করেও 'Under tight control'-এ রাখা সম্ভব। অবশ্য গণতন্ত্রের মহান (!) আদর্শের কথা বলে 'সিকিম' দেশটিকে যে ভারত কব্জা করেনি তা নয়। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে তাদের পলিসি 'সরাসরি সংঘাতমূলক' পর্যায়ের না হয়ে 'অন্তঃমুখী পরোক্ষ সংঘাতসূচক' পর্যায়ের বলে দাবি করা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আমরা রাজনীতি বহির্ভূত নিছক জ্ঞানচর্চা বা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই জেনে আসছি। অন্তত আমাদের দেশের বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীগণ পশ্চিমবঙ্গীয় কোনো বই, পত্র-পত্রিকা আমদানি নিষিদ্ধ করলে 'জ্ঞানের অঙ্গনে প্রতিবন্ধকতা কাম্য নয়' বলে তৎক্ষণাৎ বিবৃতি প্রদান করেন। কিন্তু এটাও সবাই জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বড় বড় সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের কোনো বই-এমনকি কোনো সাহিত্য পত্রিকাও উল্লেখযোগ্য হারে ওখানে যায় না বা ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার নেয়ার অনুমতি দেয় না। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওখানকার কেউ উদ্যোগ নিলেও সে উদ্যোগ প্রতিহত করা হয়। কিন্তু কেন? আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এর বাণিজ্যিক, নিদেন পক্ষে প্রতিযোগিতার দিকটি উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত রহস্য হচ্ছে যে, ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার ভালভাবেই জানে, বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রসর সাহিত্য-সংস্কৃতি চেতনা যদি কোনো ভাবে একবার পশ্চিমবঙ্গে আসন গেড়ে বসে তখন অখণ্ড বাঙালীত্বের সুপ্ত অহংকারটি ধীরে ধীরে পশ্চিমবাংলার জনগণের মাঝে ছড়িয়ে যেতে পারে। ক্রম ক্ষয়শীল কলকাতার 'সাহিত্য' ঢাকার উজ্জ্বল চিন্তাশৈলীর দ্বারা পরাজিত হলে স্বতন্ত্র বাংলাদেশ সৃষ্টির স্বতন্ত্র দেদীপ্যমান শিখাটি যে পশ্চিমবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি স্থাপন করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? এখানেই ভারতের আসল ভয় এবং সে জন্যই 'র'-এর সাংস্কৃতিক বিশেষজ্ঞরা 'রাষ্ট্রিক পরাধীনতা দৃষ্টিগ্রাহ্য কিন্তু কৃষ্টিক পরাধীনতা ধরাছোঁয়ার ও দৃষ্টির উর্ধ্বে '[৭] ধারণাটিকে নিজ দেশে প্রতিহত করে বাংলাদেশে রফতানী করেছে। এদিকে রণকৌশলগত দিক থেকে হাজারো সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও ভারত সরাসরি কখনোই বাংলাদেশ দখল বা আক্রমণ করার পরিকল্পনা প্রণয়নে ইচ্ছুক নয়। এখানে তাদের মূল আগ্রহ ও বৈরীতার গতিবিধি অনেকটা ধোঁয়াটে যা আমাদের প্রায়শই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দেয়। যেমন '৯১-এর নির্বাচনের পর ২রা মার্চ ১৯৯১ তারিখে কলকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়[৮] উল্লেখ করা হয়, 'নিষ্ঠুর বাস্তবকে মানিতে হইলে বাংলাদেশের জনসাধারণের বরং

৭। মহবুব আনাম, 'বেশি দামে কেনা অল্প দামে বেচা'- আবুল মনসুর আহমদ রচিত বইয়ের মুখবন্ধে উদ্ধৃত
৮। মূলত এ পত্রিকাটি 'র'-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

উচিত হইবে ভারতের সহিত মিলিত হইবার দাবি উত্থাপন করা।' তবে বাংলাদেশ যে একটি 'বোমা' বিশেষ তাও উঠে এসেছে একই কলামে, বলা হয়েছে 'সহস্র সমস্যার জটিলতাসহ বাংলাদেশের ভারতভুক্তি দিল্লীও স্বীকার করিতে ভয় পাইবে। .... যেসব সমস্যা বাংলাদেশকে নিয়ত পীড়ন করিয়া চলিয়াছে, বাড়িতে বাড়িতে তাহার উচ্চতা নতুন এক হিমালয় তুল্য হইয়া উঠিয়াছে। .... দুর্বল অর্থনীতির এত সাধ্য নাই যে, সেই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। ... ভারতের আন্তরিক সহায়তা ছাড়া বাংলাদেশ চলিতে পারিত না, ভবিষ্যতেও চলিতে পারিবে না।' এখানে অনেকেই 'আনন্দবাজারের' উক্ত মন্তব্যকে নিছক বেসরকারি পর্যায়ের একটি মন্তব্য বলে উল্লেখ করতে পারেন। কিন্তু তাদের এধরনের মনোভাব সবসময়ই একইরকম ছিল, এখনো আছে। তাই '৯১-এর নির্বাচনের সময় আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অপর একটি সাপ্তাহিক 'সানন্দা'র সম্পাদিকা অপর্ণা সেন নির্বাচন তদারক করতে বাংলাদেশে এসে বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ না করে[৯] তড়িঘড়ি করে ছুটে গেছেন 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাতের জন্য। এক্ষেত্রে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, তিনিই কি নির্বাচনের মাত্র দু'দিন পর অমন একটি রচনা পাঠককূলকে উপহার দিয়েছিলেন?

এদিকে বাংলাদেশকে যে চিরকালই 'অর্থনীতির সমস্যা সঙ্কুল নদী' পাড়ি দিতে হবে একথাটি খালেদা জিয়া সরকারের আমলে প্রযোজ্য ছিল না। তখন বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্ভাবনার উজ্জ্বল প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলেই এধারণার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যাবে।

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডঃ এমাজউদ্দিন আহমদ-উল্লেখ করেছিলেন,, 'দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা গর্ব করার মতন। এখন প্রয়োজন বিদেশী বিনিয়োগের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সুষ্ঠু পরিবেশ; ৫-৭ বছর দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলে ২০০০ সাল নাগাদ আমরা দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশকে ছাড়িয়ে যেতে পারবো'[১০]।

(খ) সে সময় বিশ্ব ব্যাংক বেগম জিয়ার অর্থনৈতিক কর্মসূচির প্রশংসা করে। এব্যাপারে ঢাকাস্থ বিশ্ব ব্যাংক প্রধান মিঃ ক্রিস্টোফার উইলোবি ৫/৪/৯৩ তারিখে ঢাকায় বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ম্যাক্রো ও মাইক্রো উভয় পর্যায়েই অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ... বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিও ভালভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ তুলনামূলক বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় (শতকরা ১৮ ভাগ) গ্রামাঞ্চলেও উন্নতির লক্ষণ সূচিত হচ্ছে।

৯। বেগম জিয়ার নামই হয়তো বেচারী অপর্ণা শোনেননি, যেমন ডঃ বি.এল. সাদানা, এমএ, এলএল, বি রচিত 'New Lights'. Encyclopedia of General Knowledge' বইটির ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত ৪৩তম সংস্করণের -১০ নম্বর পাতায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর তালিকায় 'কম্যুনিস্ট পার্টির' নাম থাকলেও বিএনপি'র নাম নেই এবং এক নম্বরে আছে 'আওয়ামী লীগের' নাম।

১০। ১৭/৬/৯৪ তারিখে 'সংসদীয় গণতন্ত্রঃ বাংলাদেশের রাজনীতি' শীর্ষক আলোচনায় প্রদত্ত বক্তব্য।

(গ) ২১/১/৯৪ তারিখে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্সের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড'-এর গভর্ণর এডি জর্জ তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমানকে বলেন, 'আপনারা যেভাবে ৪.৭ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতিকে ১.৩ শতাংশে নামিয়ে এনেছেন তা আমরা বৃটেনে পারিনি'[১১]।

(ঘ) ২৫/৫/৯৪ তারিখের 'ওয়াশিংটন টাইমস' উল্লেখ করে যে, 'বেগম খালেদা জিয়ার সংস্কারপন্থী সরকারের অধীনে বাংলাদেশ একটি দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যুগে প্রবেশ করেছে এবং নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি থেকে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগমুখী বাজার অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে'[১২]।

(ঙ) 'বার্ষিক উন্নয়ন খাতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে ৩৫.৮% ভাগ মঞ্জুর করা এবং বিভিন্ন খাতে ব্যাপক কর হ্রাস প্রস্তাবের কারণে নতুন বাজেট সকল মহলের প্রশংসা অর্জন করেছে। এতদিন যাবত দেখে এসেছি যে 'বাজেট' মানেই আতঙ্ক। জিনিসপত্রের দাম বাড়া। কিন্তু গত বছরে বিএনপি সরকারের কোনো শত্রুও নিশ্চয় বলতে পারবে না যে, জিনিসপত্রের (নিত্যপ্রয়োজনীয়) দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে'[১৩]।

(চ) স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এক বিদেশী সাংবাদিক মন্তব্য করেছিলেন, প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদবিহীন ও নিত্য প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ তার বিশৃংখল প্রশাসনযন্ত্র নিয়ে এক অন্তঃহীন অন্ধকার গহ্বরের দিকে ধাবিত হবে। কিন্তু বড় পুকুরিয়ার কয়লা, মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা ও 'এশীয় দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্থিতিশীল প্রশাসন'[১৪] নিয়ে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ডঃ হুমায়ুন আহমদের কণ্ঠে সেসময় 'এ দেশের ভবিষ্যত' সম্পর্কে শোনা যায় 'আমি এ দেশের অত্যন্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যত টের পাচ্ছি। ... একটি জাতির অগ্রগতির জন্যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে জাতীয় অহংকারবোধ কাজ করতে হবে। এটি আছে আমাদের মধ্যে। বিজয় দিবসে এখন লাখ লাখ লোকের ঢল নামে। বাঙালী মানেই নিস্কর্মা। এদের দিয়ে কিছু হবে না- এ জাতীয় কমন উক্তি এখন অনেক কমে এসেছে। এক সময় ধান-চালের দাম কমানোর জন্য আন্দোলন হত এখন ধানচালের দাম মাত্রাতিরিক্ত হারে কমে আসায় দাম বাড়ানোর জন্যে তাদের প্রতিবাদ করতে হয়। শীতকালে রাস্তায় বেরুলে আগে প্রচুর নেংটা ছেলেমেয়ে চোখে পড়ত। লক্ষণীয় হারে এখন আর তা চোখে পড়ে না। এখন বাংলাদেশের তৈরী গার্মেন্টস সামগ্রী বিদেশে যায়। এখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের বিদেশে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং তারা দেশকে কিভাবে সার্ভ করছে তা বাংলাদেশের ফরেন কারেন্সির রিজার্ভ দেখেই টের পাওয়া যায়। যে কোনো তৃতীয় বিশ্বের মাথা খারাপ হয়ে যাবে এই

১১। দৈনিক দিনকাল ২৩/১/৯৪

১২। প্রগুক্ত ২৮-৫-৯৪ সংখ্যা

১৩। ডঃ ফসিহউদ্দীন মাহ্‌তাব-এর সাক্ষাৎকার, প্রগুক্ত ১৮/৬/৯৪ সংখ্যা

১৪। বিবিসি ১৬-১১-৯৩

রিজার্ভ দেখে। আমার বিশ্বাস, জাপান আজকে যে অবস্থানে আছে একদিন বাংলাদেশও সেই অবস্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। জাপানের চাষের জমি আমাদের চেয়ে কম। তাদের খনিজ সম্পদ নেই, আমাদের আছে। তারা ভাত-মাছ খায়, আমরাও ভাত-মাছ খাই। তারাও খাটো, আমরাও খাটো। তারা পরিশ্রমী, আমরাও পরিশ্রমী। তারা বুদ্ধিমান, বাঙালিও বুদ্ধিমান। সুতরাং আমরা তাদের অবস্থানে কেন যাব না? অবশ্যই যাব'[১৫] ।

কিন্তু বাংলাদেশ যে জাপানের অবস্থানে 'অবশ্যই' যাবে এ পরিস্থিতি কি 'র' অনুসৃত পলিসি-র সাথে খাপ খায়? তাও ছিঁটে-ফোটা উন্নতি সহ্য করা যায় যদি ভারতকে স্ট্রাটেজিক সুবিধা প্রদানকারী একটি অনুগত দল ক্ষমতায় থাকে। একটি জাতীয়তাবাদী সরকারের হাত দিয়ে উন্নতি হবে, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা হবে আর উন্নত বাংলাদেশের বিপরীতে ভারতীয় 'সাত কন্যা' (সাতটি রাষ্ট্র) ও অন্যান্য প্রদেশে যে আত্ম অহংবোধ জেগে উঠবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? এছাড়া 'ভারতের পরাশক্তি হওয়ার ইচ্ছে আছে' বলে যখন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে তখন পশ্চিমে শক্তিশালী পাকিস্তান ও পূর্বে আরেকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র (যেখানে উভয়েই চীনের পরম মিত্র) নিয়ে এ অঞ্চলের সামরিক ভারসাম্য ভারতের অনুকূলে থাকে কি করে?

ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেল বলেছিলেন, 'আজ হোক কাল হোক আমরা আবার একাত্ম হবো এবং বৃহৎ ভারতের প্রতি আনুগত্য দেখাবো।' শ্রী প্যাটেলের উক্তি অনুযায়ী সরাসরি হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা আছে বলে মনে হতে পারে বা আমাদের দুর্বল হতে হতে সিকিমের মতো আরেক 'লেন্দুপ দোর্জি'কে ক্ষমতায় এনে ভারতের সাথে পার্লামেন্টে আইন পাস করে মিশে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকতে পারে। কিন্তু শ্রী প্যাটেলের মত একজন চরম উগ্র ব্যক্তি যখন উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন তখন বিশ্ব পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু বর্তমানে ভারত ভালভাবেই জানে যে, সরাসরি কোনো দেশ দখল করা সম্ভব নয় এবং বাংলাদেশও সিকিমের মতো 'ঠুঁটো জগন্নাথ' নয়। তাই তাদের একমাত্র বিকল্প হচ্ছে আধুনিক গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনার মাধ্যমে নেপাল বা সোভিয়েত রাশিয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা[১৬]।

এদিকে ভারত আজ পর্যন্ত যে মনোভাব দেখিয়ে আসছে, তা কি বন্ধুসুলভ? বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ ও বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের আর্য অহংকারে অহংকারীর পরিচয়ে পরিচিত করে তোলে। হিটলার আর্যত্বের বড়াই করতেন সকলকে বলে-কয়ে, কিন্তু ভারতীয় নেতারা সেই কাজটিই করেন বৃহৎ

১৫। মাহফুজ আহমেদ, *ঘরে বাইরেঃ হুমায়ুন আহমেদ, হাজার প্রশ্ন*, পৃঃ ৬৬-৬৭

১৬। সোভিয়েত রাশিয়া যে কারণেই ভাঙুক না কেন-ওর পিছনে যে সিআইএ'র বেশ বড় ভূমিকা ছিল তা অনস্বীকার্য।

গণতান্ত্রিক দেশের সুচতুর কূটনীতির ছদ্মাবরণে। এমনকি তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর করছিলেন তখন 'বোস্টন হোটেলে কোনো কৃষ্ণাঙ্গ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নরসীমার সেবায় রাখা হয়নি'[১৭]। বাংলাদেশে সার্ক সম্মেলনে যখন নরসীমা আসেন তখনও নিজ বাবুর্চি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। যদিও এটি তার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু আর্য-ব্রাহ্মণ প্রধানমন্ত্রী যে জাতপাতের ছুতোনাতা ছাড়তে পারেননি, এসব ঘটনায় তাই স্পষ্ট হয়ে যায়। এও এক ধরনের অহংবোধ, সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি।

এবার দেখা যাক, ভারতীয় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে ভারতের আচরণ নিয়ে কিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। 'আনন্দ বাজার' পত্রিকার ১১/১১/৮৮ সংখ্যায় সমর বিশারদ রবি রিখি[১৮] কোনো রাখ-ঢাক না করেই মন্তব্য করেন,

> 'শেখ মুজিবর রহমান যখন নিহত হন, তখন ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে ঠিক করেছিলেন হস্তক্ষেপ করবেন। এজন্য সেনাবাহিনীর তিনটি ডিভিশনকে সতর্কও করে দেয়া হল, কিন্তু শেষে সরকার গড়িমসি করলেন এবং সুযোগ পেরিয়ে গেল। ফলে, হল কি? কিছুই না, বাংলাদেশকে আমাদের শিবিরে রাখার সুযোগ আমরা হাতছাড়া করলাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে যুক্তিতে পোল্যান্ড ও আফগানিস্তানে এবং আমেরিকা নিকারাগুয়া ও গ্রানাডায় সেনা নামিয়েছিল, সেই যুক্তিতে ভারতও বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করলে তা অসঙ্গত হত না।'

এখন এই যদি ভারতীয়দের মনোভাব হয় তখন সবদিকে যে আক্রমণ (পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ) চলবে তাতে আর দ্বিধা কি? এবং এসব বৈরিতার মধ্যে গুপ্তচর সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা হবে অতি অবশ্যই প্রধানতম উপায়।

যারা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে নিছক বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছু খুঁজে পান না ও এ সূত্র ধরে ভারত কেন বাংলাদেশে গুপ্তচরবৃত্তি বা খবরদারি করবে বলেন, তাদের জন্য গুপ্তচরবৃত্তির কিছু সাধারণ সূত্র উল্লেখ করা যায়। গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্র নেই। বন্ধুভাবাপন্ন দেশেও গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা হয়। মূলত এর উদ্দেশ্য হলো সবদিকে চোখ-কান খোলা রেখে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসা। আজ একটি দেশে বন্ধুভাবাপন্ন সরকার ক্ষমতায় আছে, কিন্তু কাল যে কোনো কারণে তা নাও থাকতে পারে- যা গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনাকারী দেশের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। তাই ভারত-রাশিয়া মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পরও রাশিয়া ও ভারত উভয়ে উভয় দেশে গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির যেমন কোন প্রকৃত সীমা পরিসীমা নেই তেমনি নেই কোনো বিশেষ 'নৈতিকতার' মানদন্ড। সকলের মনেই একটি মৌলিক প্রশ্ন জাগতে পারে, 'গুপ্তচর কেন?' এক্ষেত্রে সহজ স্বাভাবিক উত্তর হচ্ছে–'টিকে থাকার জন্য।'

১৭। দৈনিক বাংলা ২৫/৫/৯৪

১৮। রবি রিখি ১৯৭১ সালে 'র'-এর উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে ভারতের পারমাণবিক প্রকল্পের উপদেষ্টা ও কৌশলগত বিষয়ে প্রখ্যাত কলামিষ্ট।

অধ্যায় - ৪

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত গুরুত্ব

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য দেশ। বর্তমানে এ উপমহাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মার্কিন সাংবাদিক উইলিয়াম ইরুরোজ 'দি ক্রিটিক্যাল মাস' বইয়ে মন্তব্য করেছেন, 'এ উপমহাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তপ্ত অঞ্চল।' এ পর্যালোচনায় নিশ্চয়ই কেউ বাংলাদেশকে উপমহাদেশের বাইরে কোনো 'ভিনদেশী' দেশ হিসেবে চিহ্নিত করবেন না। বাংলাদেশ যদিও একটি দরিদ্র দেশ ও সম্পদ সামর্থ্যের তুলনায় ভারত থেকে অনেক পিছনে আমাদের অবস্থান তবুও নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে বাংলাদেশ ভারতের নিজ স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে-

(ক) আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত আমাদের সরাসরি প্রতিপক্ষ না হতে পারে, কিন্তু সে যে চীন ও পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয় তা সকলের নিকটই স্পষ্ট। (যদিও ১৯৯৪ সালের চীন-ভারত সীমান্ত চুক্তিকে অনেকে পাক-চীন-বাংলাদেশ অক্ষের জন্য মারাত্মক আঘাত বলে অভিহিত করছেন, তবুও একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, ওই চুক্তির ফলে ভারতকে অরুনাচল প্রদেশের বিস্তৃত এলাকা চীনকে দিয়ে দিতে হয়। এছাড়া চীনা নেতা লী পেং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, 'ভারতের সাথে চুক্তির বিনিময়ে চীন তার পুরনো বন্ধুদের বিসর্জন দেবে না।' চীন-ভারত চুক্তি একটি সাধারণ সীমান্ত চুক্তি এবং কখনোই 'আদর্শ বিকিয়ে দেয়া একাত্মবোধক' চুক্তি নয়। যেমন আমাদের সাথে ভারতের ফারাক্কা সংক্রান্ত কোনো চুক্তি জাতীয়তাবাদী সরকারের আমলে সম্পাদিত হলেও তা চীনের সাথে সম্পর্কের বিনিময়ে ভারতের কোলে ঠাঁই নেয়া বোঝাবে না।) ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৫ ও '৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক গুরুত্ব চীন, ভারত ও পাকিস্তানের নিকট কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বুঝতে হলে আমাদের এ অঞ্চলের ভারতীয় অবস্থান ও তার মাঝে বাংলাদেশের অবস্থান ভালভাবে লক্ষ্য করতে হবে। বাংলাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে ভারতের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল, তার মাঝে একমাত্র যোগাযোগকারী পথ হচ্ছে তেঁতুলিয়া সীমান্তের উত্তর পার্শ্বের সরু করিডোর- যা 'শিলিগুড়ি' করিডোর নামে পরিচিত। কাজেই যে কোনোরূপ চীন-ভারত সম্ভাব্য সংঘর্ষে চীনের প্রথম লক্ষ্য হবে, 'শিলিগুড়ি করিডোর' বরাবর আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া সীমান্ত পর্যন্ত একটি পথ দখল করে দৃঢ়ভাবে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করা, যাতে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল হতে কোনো প্রকার গোলাবারুদ ও রসদপত্র পূর্বাঞ্চলে যেতে না পারে। এখন যেহেতু ভারতের পূর্বাঞ্চলে কোন সমুদ্র বন্দর নেই, তাই এ অবস্থায় পূর্ব ভারত হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চল। এ পরিস্থিতির আলোকে ভারত বাংলাদেশকে একমাত্র 'ট্রানজিট রুট' হিসেবে বিবেচনা করে আসছে এবং চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে রসদপত্র পরিবহনের প্রস্তাবও রাখতে বাধ্য হচ্ছে। এখন যদি বাংলাদেশে একটি জাতীয়তাবাদী সরকার ও শক্তিশালী অর্থনীতির পাশাপাশি

শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী থাকে এবং মুসলিম দেশগুলোর সমান্তরালে চীনের মত একটি পরাশক্তির ছত্রছায়া অব্যাহত থাকে তবে তা হবে Crisis Period-এ ভারতের জন্য পূর্ব ভারতে হুমকির সামিল।

(খ) বর্তমানে ভারতের একটি বড় মাথাব্যথা হচ্ছে, বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও এর ক্রমবিকাশ। এই সাতটি প্রদেশ যা North East Frontier Agency বা NEFA নামে পরিচিত, সেখানকার মিজোরাম, অরুনাচল, নাগাল্যাণ্ড, আসাম, ত্রিপুরা, মনিপুর ও মেঘালয় রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামে অস্থির ভারতের জন্য বাংলাদেশ হচ্ছে বিভক্তকারী অঞ্চল। বাংলাদেশ এই NEFA কে সমগ্র ভারত থেকে আলাদা করে রেখেছে এবং একজন বিশেষজ্ঞের মতে 'Bangladesh has the potential either to ignite or cool down the turmoil in this part of the Indian union'[১]। অর্থ্যাৎ বাংলাদেশের অবস্থান এমনি যে, তার পক্ষে যেমন ভারতীয় ইউনিয়নের এঅঞ্চলকে উত্তপ্ত করার সুযোগ রয়েছে তেমনি গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিকে স্তিমিত করাও তার পক্ষে সম্ভব। এদিকে পশ্চিমাঞ্চলে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে ব্যাপক সেনা সমাবেশের পর ভারতকে আরো প্রচুর সেনা সদস্য পূর্বাঞ্চলের NEFA-তে মোতায়েন করতে হয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে প্রায় সময়ই বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়োজিত রাখায় ভারত এখন মূলত একটি Cantonment Country-তে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ সারা দেশজুড়েই সেনাবাহিনী ছড়িয়ে- ছিটিয়ে মোতায়েনকৃত অবস্থায় আছে। এখন যদি পাকিস্তানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী বাংলাদেশকে ব্যবহার করে পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করা না যায়, তবে পাক-ভারত সংঘর্ষে ভারত কখনোই প্রয়োজনানুযায়ী সেনা মোতায়েন করতে পারবে না। ফলে এ উপমহাদেশে ভারতের 'Hegemony' বা একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন হবে ব্যাহত এবং "ভারত সেজন্যই চায় একটি 'বন্ধুভাবাপন্ন' বাংলাদেশ যা সাতকন্যার গেরিলাদের জন্য ভারতকে বিভক্ত করার একটি এলাকা হিসেবে পরিগণিত হবে না"[২]।

এদিকে বাংলাদেশের শর্তহীন সমর্থন ভারতের জন্য কতটুকু প্রয়োজন সে ব্যাপারটি উঠে এসেছে বিশিষ্ট ভারতীয় সমরবিদ কে. সুব্রানিয়াম স্বামীর মন্তব্যে। তাঁর 'Bangladesh and India's Security' বইয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন,

> 'It's (Bangladesh) existence constitutes a weak point in Indian Security in the strategic northeast region. Should events in Assam and the other 'tribal' states in that region, or in neighbouring Burma, cause deterioration in India's control of the area, Bangladesh proximity would be a critical factor'.

(গ) প্রতিটি অঞ্চলেই আঞ্চলিক বলয়ে একটি মূল প্রভাব বিস্তারকারী (dominant) দেশ থাকে, যাকে ঘিরে উক্ত অঞ্চলের নীতি-আদর্শ, রণনীতি আবর্তিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশিষ্ট গবেষক আবুল কালাম তার

১। M. Nuruzzaman, *National Security of Bangladesh* : BIISS journal Vol 12, No. 3.1991 P. 377

২। প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩৭৭

'সমকালীন' আন্তর্জাতিক রাজনীতি বইয়ে উল্লেখ করেছেন,

'পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতির পথে দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে-দ্বান্দ্বিক রণনৈতিক কাঠামো। দক্ষিণ এশিয়া এমন একটি অঞ্চল যাতে অভিন্ন হুমকিপ্রসূত কৌশলগত সমঝোতা নেই বললেই চলে। বরং এ অঞ্চলের দেশগুলোর প্রতি হুমকির ক্ষেত্রে কোনো না কোনো আঞ্চলিক ইন্ধন রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। বিশেষ করে এ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থ রাষ্ট্র ভারত এবং প্রান্তস্থ প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ভয়-ভীতিজনিত ব্যবধান অব্যাহত রয়েছে। .... নীতিগত পর্যায়ে এ অঞ্চলের প্রধান দেশ হিসেবে ভারত একটি বিশ্ব ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে সক্রিয় এবং এক্ষেত্রে ভারত যথেষ্ট চাতুর্য ও সুক্ষতার পরিচয় রাখে। পাকিস্তান ছাড়া এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে ভারত 'আন্তঃ নির্ভরশীলতা' রণনীতির ভিত্তিতে গড়ে তোলে শান্তিপূর্ণ, বন্ধুপ্রতিম ও সহযোগিতার সম্পর্ক। যদিও অনেকে ভারতের এ ধরণের রণনীতিকে একক ভারতীয় আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বলে মনে করছে।'

এবং এ জন্যই 'অন্য কারো কর্তৃত্ব' বা 'ভারতীয় সরকারের সমার্থক রাজনৈতিক দর্শন ও আঞ্চলিক অবস্থান' ভিন্ন কোনো দেশের স্বাধীন চিন্তাধারা ভারতীয় রণ-রাজনৈতিক দার্শনিকদের চোখে গ্রহণীয় নয়।

(ঘ) সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত দিক-নিদের্শনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

'পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই স্মরণ রাখতে হবে আমাদের দেশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, স্ট্র্যাটেজিক অবস্থানের কথা। .... বাংলাদেশের আশেপাশে কয়টি দেশ রয়েছে? ভারত, বার্মা, ভূটান, নেপাল, সিকিম এবং চীন এই ছয়টি দেশ। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে প্রতিটি দেশ এত সন্নিকটবর্তী যাকে বলে স্টোন থ্রোয়িং ডিসটেন্স। বাংলাদেশ থেকে নেপালের দূরত্ব ১৮ মাইল, ভূটান ৪৫ মাইল এবং চীনের বর্ডার প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ মাইল বা তার চেয়ে সামান্য বেশি হতে পারে। বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ। আমাদের রাষ্ট্রীয় সীমানার শুরু সমুদ্রের জলরাশি দিয়ে। আর এ মহাসমুদ্রই বাংলাদেশকে দিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান। এ কারণে আমরা হলাম সকলের টার্গেট। এটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে'৩। অন্য এক রচনায় তিনি আরো উল্লেখ করেছেন 'বাংলাদেশ এ উপমহাদেশ এবং এ অঞ্চলের সামরিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। এখানে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসতে পারে যে, ইংরেজ জাতি এ উপমহাদেশে তাঁদের উপনিবেশ কায়েমের প্রাথমিক ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছিল কেন? উপমহাদেশের অন্য যেকোনো স্থান তারা প্রথমে দখল করতে চাইলে নিশ্চয়ই পারতো। কিন্তু বাংলাদেশকে তারা এজন্য বেছে নিয়েছিলো যে, এখান থেকে অন্যান্য স্থানে চলাচলে সুবিধা হবে। বাংলাদেশের যে ভৌগোলিক অবস্থান ও আকার তাতে এখান থেকে পশ্চিম ও পূর্বদিকে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করাও সুবিধাজনক বলে ইংরেজরা এ স্থানকে প্রথমে বেছে নিয়েছিলো ..... বাংলাদেশের ছিলো এক বিরাট স্ট্র্যাটেজিক অবস্থান এবং

৩। জিয়াউর রহমান রচিত 'আমাদের পররাষ্ট্রনীতি'- নিবন্ধে উদ্ধৃত

বলাবাহুল্য যে, সেই অবস্থান আজও গুরুত্বপূর্ণই রয়ে গেছে। আমাদের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আধিপত্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ'[৪]।

এখানে তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতীয় আধিপত্যবাদ, উপনিবেশবাদ, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের হাত হতে আমরা কি নিরাপদ? না। ভারতীয় আধিপত্যবাদী মনোভাব বুঝতে হলে রাজীব গান্ধীর সময়কার শ্রীলংকা অপারেশন ও নেপালের রাজধানীতে পুলিশী অভিযানের কথা উল্লেখ করতে হয়। ভারত-শ্রীলংকা চুক্তি (জুলাই '৮৭) সম্পাদনের পূর্বে ভারত বিমান বাহিনীর পরিবহন বিমান দ্বারা শ্রীলংকার জলসীমা ও স্থলসীমায় তামিল গেরিলাদের জন্য রসদপত্র ফেলেছিল। এটি করা হয় শ্রীলংকার বিনানুমতিতে। তখন প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রীলংকা যখন একটু মাথা উঁচু করতে চেয়েছিল তখন তদানীন্তন রাজীব সরকার শ্রীলংকার বিরুদ্ধে কিরূপ নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত মন্তব্য থেকে। বলা হয়,

> 'This exchange of letters (Veteran President Jayawardane and Rajib Gandhi) ensures that forces prejudicial to India's interest will not be present on Sri Lanka's soil. It also ensures that Sri Lankan ports, including Trincomale will not be given for military use, this is prejudicial to India's interest'[৫]

শ্রীলংকা অপারেশন সম্পর্কে আরো কিছু চমৎকার তথ্য ছাপিয়েছে ভারতীয় পত্রিকা 'Sunday'। উক্ত পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়

> 'Mrs Gandhi told kao (RAW chief) to repeat his Bangladesh success in Sril Lanka. RAW set up camps in Tamil Nadu and old RAW trainers (Bangladesh operation) were brought, to train the militants to destabilise the Government. The former Indian high commissioner in Sri Lanka JN Dixit, even accused RAW of having given Rs. 5 crores to LTTE?'[৬]

'র'-এর উপনিবেশবাদী অপারেশনের সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো সিকিমের ভারত ভুক্তিকরণ। নিজ ইচ্ছা ও মতবাদ অন্যের ওপর চাপিয়ে সে দেশে আপাতদৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আড়ালে প্রভাব বলয় বিস্তার করার উদাহরণ হতে পারে নেপালের গণআন্দোলন ও ভারতপন্থী কংগ্রেসী সরকারকে ক্ষমতায় বসানো এবং উক্ত এলাকায় ক্রমবর্ধমান চীনা প্রভাব খর্ব করা ও সাথে সাথে তিব্বত অঞ্চলে 'র'-এর অপারেশন নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাওয়া।

বর্তমানে এ উপমহাদেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে 'কেন্দ্রস্থ' ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ছাড়া প্রতিটি দেশকে তার প্রভাববলয় ও আদর্শিক সমার্থকতার মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু পাকিস্তানের সাথে গুপ্তচর তৎপরতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেরে ওঠা বিভিন্ন কারণে অতটা সহজ নয় তাই ভারত পাকিস্তানের বিপক্ষে সরাসরি সামরিক তৎপরতা ও সামরিক পর্যায়ে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশের সাথে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অন্যরকম। যেহেতু একমাত্র 'Friendly Bangladesh'-এর উপস্থিতিই তার নিরাপত্তা বলয়কে ভারসাম্যপূর্ণ

৪। জিয়াউর রহমান রচিত 'আমাদের পথ' নিবন্ধে উদ্ধৃত

৫। Indo-Sri Lanka Agreement. *Indian External Affairs Ministry*. New Delhi 1987

৬। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Ashok A Biswas, *RAW's role in furthering India's foreign policy*, The New Nation, 31 Aug. 94

অবস্থায় রাখতে পারে তাই বাংলাদেশে 'বন্ধু' সন্ধান ও সে 'বন্ধু'র মাধ্যমে গোপন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা লাভ হচ্ছে ভারতীয় সরকারের মূল উদ্দেশ্য।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় ভারতীয় নীতি নির্ধারকগণ এটা নিশ্চিত করেছেন যেখানে এখন 'By any measure economic, political or military power, India dominates the strategically important Asian subcontinent and the Indian Ocean'. [৭] অর্থাৎ ভারত সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রতিটি পর্যায়েই যে কোন উপায়ে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ উপমহাদেশ ও ভারত মহাসাগরে প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। এই প্রাধান্য বিস্তারের জন্যই সম্ভবত ভারত ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে সামরিক বাজেট বাড়িয়েছে ২৮% ভাগ। এরপূর্বে ১৯৯৩ সালে ভারতের ২৮,৭৭০ কোটি টাকার সামরিক বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪,৫০০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় অর্থাৎ এক বছরের বৃদ্ধি পায় ৫৭৩০ কোটি টাকা। ভারত এক বছরে তার সামরিক খাতে ব্যয় যতখানি বাড়িয়েছে সেই বর্ধিত অংশটি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাতে সাড়ে তিন বছরের বাজেটের সমান।[৮] এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে, চীন-ভারত চুক্তি যদি ভারতের অনুকূলেই হবে তবে দারিদ্রপীড়িত ভারতে এক বছরে ('৯৩ সালে) ২০%ভাগ সামরিক বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছিল কেন? এরপর যদি ভারতের মতো একটি দেশ আমাদের পাশে থাকে তখন ভারত ও তার আশেপাশের ছোট দেশগুলোর অবস্থান সম্পর্কিত একটি সুন্দর কিন্তু সুনির্দিষ্ট মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। নেপালের অধ্যাপক G.B. Khanal বলেছিলেন, 'For a small country the best neighbour is a rich country with a small army. The most dangerous enemy is a poor country with a big army' [৯]।

৭। Asia pacific Defense Forum, Fall 1992
৮। নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট জুন' ৯৪ সংখ্যা
৯। News Week : Sep 25, 1989

অধ্যায় - ৫
'র'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যধারা

'র' সম্পর্কে স্বভাবতই প্রকাশ্যে কিছু জানা সম্ভব নয়। এমনকি ভারতীয় জনগনও এ সম্পর্কে খুব একটা কিছু জানতে পারেন না। 'র'-কত গোপনে কাজ করে সে সম্পর্কে ১৯৯০ সালে ভারতীয় সংসদের বি.জে.পি দলীয় এমপি শ্রী যশবন্ত সিং-এর মত হচ্ছে, 'র'-এর সবকিছু এতই গোপনীয় যে, আমার মনে দৃঢ় সন্দেহ, এ এজেন্সী সম্পর্কে সরকারও ভালভাবে কিছু অবগত আছেন কিনা?[১] 'র'-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর বাৎসরিক বাজেট অত্যন্ত গোপনীয় এবং অপ্রকাশ্য; এমনকি সংসদে পর্যন্ত আলোচিত হতে পারে না[২] । উক্ত পত্রিকায় একজন RAW কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলা হয় যে, 'RAW has within its ranks every form of specialist from a cobbler to a nuclear scientist'.

তবে ভারতীয় সাংবাদিক অশোকা রায়না লিখিত 'র' সম্পর্কে প্রকাশিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ 'Inside RAW : The Story of India's Secret Sevice-এ 'র' সম্পর্কে বেশ কিছু ধারণা পাওয়া যায়। একই সাথে অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট ও বিশ্লেষণ থেকে আমরা 'র'-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারণা পেতে পারি।

ক। 'র'-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ

(১) পার্শ্ববর্তী সকল দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলী ও অবস্থান, যা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সরাসরি জড়িত এবং ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিতে যার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

(২) পাকিস্তানে বিপুল সমরোপকরণ সরবরাহ 'র'-এর সর্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়।

(৩) চীনের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলী ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা।

(৪) পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ভারতীয় একাধিপত্য (Hegemony) কায়েম করা, যাতে অত্র অঞ্চলে অন্য কোনো শক্তির প্রকাশ্য বা পরোক্ষ কোনরূপ ভারত বিরোধী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা সৃষ্টি না হয়। প্রয়োজনে শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও নেপালে যে ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছিল সে ধরনের পুলিশী ভূমিকা গ্রহণ করা।

(৫) ভারত মহাসাগরসহ সমগ্র উপমহাদেশে ভারতীয় সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করা।

(৬) পণ্ডিত নেহেরুর 'অখণ্ড ভারত মাতা'র কল্পনাবিলাসকে বাস্তবে রূপ দিয়ে বিশ্ব শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়া।

(৭) সর্বশেষ কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য হলো যে, বিভিন্ন গোত্রের বিপুল সংখ্যক ভারতীয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করে আসছেন, যারা ওই দেশের জোরালো অবস্থানে অবস্থান করছেন এবং এসমস্ত ভারতীয়ের প্রভাব ও চাপে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ভারতের অনুকূলে দৃঢ় সমর্থন জোগাতে পারে। এসব ভারতীয়দের বিভিন্নভাবে কাজে

১। The Illustrated Weekly of India, October 14, 1990

২। প্রাগুক্ত

লাগানো 'র'-এর অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া ব্যবসায়ী, সংস্কৃতিকর্মী, সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগানো।

খ। সাধারণ কর্ম-পদ্ধতি

(১) বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসের ছদ্মাবরণে, কূটনৈতিক সুবিধাকে (Diplomatic Immunity) পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে নির্বিঘ্নে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা। এ ব্যাপারে Miles Copland তাঁর 'The real world of Spies' বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো সরকারী কর্মকর্তা, তিনি যে কোন পর্যায়েই কর্মরত থাকুন না কেন, যখন তিনি সরাসরি গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন তখন তাকে 'ইন্টেলিজেন্স' কর্মকর্তা বলা যায়। এ সমস্ত কর্মকর্তা হতে পারেন রাষ্ট্রদূত, এ্যাটাশে (সামরিক, নৌ, বিমান), সিভিল এভিয়েশন, বাণিজ্যিক, পেট্রোলিয়াম অথবা কৃষি সংক্রান্ত অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মকর্তা। এমনকি "প্রশাসনিক ও উপদেষ্টার কাজে নিয়োজিত ছাড়া সকল দূতাবাস কর্মকর্তা-কর্মচারীই 'ইন্টেলিজেন্সের' সাথে জড়িত থাকতে পারেন এবং বিভিন্ন দূতাবাসের ছাদে অবস্থিত নানা আকৃতির এন্টেনা তাদের নিজস্ব 'কীর্তি কাহিনী' বলার জন্য যথেষ্ট"[৩]। 'র'-ও এভাবে দূতাবাস কেন্দ্রিক তৎপরতায় জড়িত।

(২) একজন ছাত্র, পর্যটক, সাংবাদিক, বিমানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসায়ী অথবা এমনকি একজন শিল্পীকেও বিশেষ প্রশিক্ষণ দানের পর পার্শ্ববর্তী দেশে বিশেষ সময়ে বা স্থায়ীভাবে 'র' প্রেরণ করে থাকে।

(৩) বিভিন্ন আকর্ষণীয় মহিলাকে 'র' ইন্টেলিজেন্সে নিয়োগ করে দেশে বা বিদেশের 'টার্গেট'কে তাদের মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইল করে থাকে।

(৪) বিএসএফ-এর সাথে মিলিতভাবে সীমান্ত এলাকায় গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করাও 'র'-এর অন্যতম কাজ।

(৫) বিভিন্ন দেশের সাথে ভারতের পক্ষে অসম চুক্তি সাধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় 'র' বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(৬) 'টার্গেট দেশের' প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীদের মাঝে সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদানের আড়ালে ভারতীয় চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানোয় এই সংস্থা বরাবরই তৎপর।

(৭) ভিডিও ফিল্ম, সাময়িকী, পর্ণো পত্র-পত্রিকা, দূরদর্শন (সাম্প্রতিক কালে জিটিভি সহ অন্যান্য স্যাটেলাইট চ্যানেল), অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র মাধ্যমে সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করা ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৮) ভারতপন্থী রাজনৈতিক দলকে টার্গেট দেশে সর্বতোভাবে সাহায্য করা ও প্রতিষ্ঠিত করা 'র'-এর দীর্ঘদিনের 'ঐতিহ্য'।।

(৯) ভারতের চারপাশে সীমানাব্যাপী 'বিশেষ কার্যক্রম বিভাগের' অপারেটিভদের মাধ্যমে 'র' সীমানা সংলগ্ন, সীমান্তবাসীদের ছোট খাট যুদ্ধাস্ত্র ও যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, যাতে যদি কোনো দেশ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

৩। Asoka Raina, *Inside RAW : The Story of India's Secret Service*, Chapter-5

ঘোষণা করে তবে যেন তারা নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং এর পাশাপাশি (Special Service Bureau) অপারেটরদের সাথে সীমান্ত অতিক্রম করে শত্রুর পশ্চাতে সক্রিয় থাকতে পারে।

(১০) বিচ্ছিন্নতাবাদী ও নাশকতামূলক কাজে টার্গেট দেশের এজেন্টদের প্রশিক্ষণ দেয়া ও প্রয়োজনে নিজ অপারেটিভদের কাজে লাগানো 'র'-এর অন্যতম কাজ।

(১১) অল ইন্ডিয়া রেডিও, দূরদর্শন ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার-প্রপ্যাগান্ডা পরিচালিত করা। যেমন-'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র সিমলায় অবস্থিত 'মনিটরিং সার্ভিস'-এ সকল উন্মুক্ত বেতার প্রচারণা মনিটর করা হয় এবং চাহিদানুযায়ী তা 'র'কে সরবরাহ করা হয়[৪]।

(১২) 'র'-এর কৌশলের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকা, গুজব, পঞ্চম বাহিনীভুক্ত রাজনৈতিক দলের সভা সমিতি, আন্দোলনের মাধ্যমে 'ভুল তথ্য উপস্থাপন'-যার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'টার্গেট' দেশের জনগণকে 'ভুল পথে পরিচালিত করা', 'জনমতকে হতবুদ্ধি, বিশৃংখল বা প্রজ্বলিত করা'। "সোজা কথায় এর অর্থ হচ্ছে প্রবঞ্চনা বা চাতুরীর আশ্রয়ে কার্যসিদ্ধি করা। এক্ষেত্রে শত্রুদেশে ভুল তথ্যের অনুপ্রবেশ করানো হয় যার ফলশ্রুতিতে সে দেশের স্বার্থহানি ঘটে থাকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রু দেশের জনগণকে নিজ দেশের ইচ্ছানুযায়ী কোনো বিশেষ কিছুতে বিশ্বাস করানো। এ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ভুল গোয়েন্দা রিপোর্ট সংবাদ মাধ্যম, কূটনৈতিক চ্যানেল, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও অন্যান্য পেশাজীবীদের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করানো হয়। যাদের মতামত ভুল তথ্য পরিবেশনের সূত্র ধরে নিজ দেশের ইচ্ছানুযায়ী পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করার মত প্রভাব বিস্তারকারী"[৫]।

(১৩) বিভিন্ন নাশকতামূলক বা অন্তর্ঘাতমূলক কাজ সময়ানুযায়ী টার্গেট দেশে নিজ অপারেটিভ ও এজেন্টদের (টার্গেট দেশের নাগরিক) মাধ্যমে করা হয়। "এক্ষেত্রে 'বিশেষ অপারেশন বিভাগ' (SOD) বিশেষ অপারেশনে 'প্রচুর নোংরা কাজে' জড়িত হয়ে পড়ে যেসব কার্যাবলীকে বলা যায় গোপন বিশেষ অপারেশন যা অন্যকিছু হতে কম শয়তানিপূর্ণ। তবে অবশ্যই যুদ্ধ হতে ভাল প্রকৃতির"[৬]! এবং এ সমস্ত কাজ, 'Which is a dirty trick for one person may be a legitimate ploy for another. As long as it is legitimate task, the Government of India has the right to impose the task and the organisation's duty is to carry it out' অর্থাৎ "যা একজনের কাছে নোংরা কৌশল তা অন্যজনের কাছে হতে পারে একটি আইনসিদ্ধ, বৈধ কাজ। যতক্ষণ পর্যন্ত এধরনের কার্যক্রম বৈধ বলে বিবেচিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভারত সরকারের অধিকার আছে এ কাজ সংশ্লিষ্ট সংস্থার উপর চাপিয়ে দেয়ার। এবং এক্ষেত্রে সে সংস্থারও দায়িত্ব হচ্ছে সেই কাজ সম্পন্ন করা"[৭]।

(১৪) চোরাকারবারি ও বিশেষ মহিলাদের মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনায়ও 'র' পারদর্শী।

৪। প্রগুক্ত, অধ্যায়- ৫

৫। প্রগুক্ত, অধ্যায়- ৪

৬। প্রগুক্ত, অধ্যায়- ৪

৭। R. Swaminathan, ex special Secretary, RAW; *interview with Illustrated weekly of India.* October 14, 1990

(১৫) বন্ধুপ্রতিম দেশের গুপ্তচর সংস্থার সাহায্যে যেখানে নিজেদের উপস্থিতি সম্ভব নয় বা অভিজ্ঞতা কম, সেখানে 'দ্বিতীয় পক্ষের' মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি চালানোতে 'র'-এর অভিজ্ঞতা রয়েছে।

(১৬) 'র'-এর ARC-Aviation Research Centre - এর আওতাধীন গাল্ফস্ট্রীম-৩ বিমানগুলো ৫২,০০০ ফুট উচ্চতায় উড়ে পাকিস্তান, চীনের পাশাপাশি বাংলাদেশের উপরও পর্যবেক্ষণ কাজ চালিয়ে থাকে [৮]।

৮। Ashok. A. Biswas, *RAW's role in furthering India's foreign policy,* the New Nation, 31 Aug '94

অধ্যায় - ৬

বাংলাদেশে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা সহজ কেন

বাংলাদেশে 'র' কার্যক্রম তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান আমল হতে ক্রিয়াশীল হলেও তখন তা ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে। কিন্তু '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পর যখন ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যক্ষ নির্দেশে 'র' বাংলাদেশে তার কর্মকাণ্ড শুরু করে তখন তা ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু 'আদেশ প্রদানের' পরপরই এক তুড়ি মেরে আজন্ম সংগ্রামী একটি জাতিকে হীনবল করা যায় না বা গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে বর্তমান সভ্য বিশ্বে হিটলারের 'গেস্টাপো' কায়দায় কোনো দেশকে সরাসরি দখলে রেখে লণ্ডভণ্ড করা সম্ভব নয়। গুপ্তচরবৃত্তির বিস্তৃতি বা ধরণ-ধারণ সম্পর্কে আমরা সাধারণত ভাবি যে, 'জেমস্ বন্ড' বা 'মাসুদ রানা'র মতো কিছু স্পাই বা অপারেটিভ কোন দুর্ধর্ষ কাজে নিয়োজিত রয়েছে যারা শত্রু দেশের তথ্য, খবরা-খবর পাচার করছে কিংবা সামরিক ব্যাপারে নজরদারি করছে। কোনো কোনো সময় অবশ্য কিছু ধ্বংসাত্মক কাজ-কর্মে বিদেশী গুপ্তচরদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে আমরা পত্র-পত্রিকায় খবর পাই। কিন্তু আধুনিক গুপ্তচরবৃত্তি অত্যন্ত ব্যাপক পরিসরে পরিচালিত হয়। এর প্রকৃত ধরণ ও ঘটনা সংঘটনের সময় বোঝা বা জানা না গেলেও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তা সীমিত পরিসরে হলেও আলোর মুখ দেখে। আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে সিকিম নিয়ে 'র'-এর গৃহীত গণতান্ত্রিক (!) পদক্ষেপ তখন নেহাতই সিকিমের গণতান্ত্রিক আন্দোলন মনে হলেও এবং ভারত সরকার তার সম্পৃক্ততার কথা তখন অস্বীকার করলেও এখন নিজেরাই তা প্রকাশ করছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ শত্রু দেশের মানব-মানবীর একান্ত ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয়টিকেও গুপ্তচরবৃত্তির আওতায় নিয়ন্ত্রণের দাবি করে থাকেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, পারিবারিক এমনকি মানবাধিকারের সীমানা পর্যন্ত গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালিত হয়ে থাকে। শুধুমাত্র স্পাই বা অপারেটিভের [১] মাধ্যমে কোনো দেশে কোনো গুপ্তচর সংস্থার পক্ষে এককভাবে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন হয় টার্গেট দেশে একদল এজেন্ট,[২] তাঁবেদার বুদ্ধিজীবী, আমলা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, এমনকি কলগার্ল। গণতান্ত্রিক দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অর্থাৎ এক কথায় মুক্ত পরিবেশে গুপ্তচরবৃত্তি ও তার থাবা বিস্তার করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু পরিকল্পিত উপায়ে সেখানে অনেক কিছু অনুধাবন করা গেলেও সরাসরি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আসলে গুপ্তচরবৃত্তিতে 'আজ যা মিথ্যা, কাল তা সত্য' কিন্তু ততদিনে 'Operation is over'। এখন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে।

(ক) বাংলাদেশে গুপ্তচরবৃত্তি চালানো সহজ কেন?

এ উপমহাদেশে মূলত পাকিস্তান ভারতের প্রধানতম বৈরী দেশ। তাই স্বভাবতঃই

১। যে সংস্থা গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালিত করে তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ পাওয়া গুপ্তচর

২। টার্গেট দেশের নাগরিক

পাকিস্তানে ব্যাপকমাত্রায় গুপ্তচরবৃত্তি চালানোই ভারতের জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ অন্তত ভারতের 'সদিচ্ছা' সম্পর্কে একমত। তাদের দেশ সামরিক, বেসামরিক যে ধরনের সরকার দ্বারাই পরিচালিত হোক না কেন, পাকিস্তান জানে তার মূল শত্রু কে এবং কেন, কিভাবে 'র' তাদের দেশে কোন কোন পর্যায়ে আঘাত হানতে পারে? পাকিস্তানের গুপ্তচর প্রতিষ্ঠান, বেসামরিক আমলা, সামরিক বাহিনী, প্রচার যন্ত্র-সকল ক্ষেত্রে একটি সুসমন্বিত, দীর্ঘদিনের চর্চায় অভিজ্ঞতাসঞ্জাত পেশাদারী মনোভাব গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানও কৌশলগত গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনায় সক্ষম। তৃতীয়তঃ তাদের জাতীয় নিরাপত্তার ভিত্তি ও তার দুর্বলতা চিহ্নিত। ফলে ভারতীয় বা যেকোন ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা সাফল্যের সাথে মোকাবিলার ক্ষমতা তাদের আছে। কিন্তু বিপরীতে বাংলাদেশে জাতীয় নিরাপত্তার যে মৌলিক ভিত্তি জাতীয় ঐকমত্য তা রাজনৈতিক আদর্শের দ্বান্দ্বিকতায় ধোঁয়াটে, সর্বোপরি অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য আমাদের দেশে HIS [৩] এর তৎপরতা নির্বিঘ্নে প্রবহমান থাকা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ আমাদের কোনো সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা নীতি নেই এবং কার পক্ষে কোন্ পর্যায়ে, কিভাবে, কখন আঘাত আসতে পারে সে ব্যাপারে আমরা এখন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাপক নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারিনি। তৃতীয়তঃ পাকিস্তানের গুপ্তচর প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সুসংগঠিত ও আক্রমণাত্মক। এছাড়া 'র'-এর লক্ষ্য পাকিস্তানে যেখানে মূলত সামরিক বিষয়াদিতে সীমাবদ্ধ, সেখানে আমাদের দেশে সামরিক ক্ষেত্রটি গৌণ। বরং অনায়াসে যখন সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক পর্যায়ে কিছু প্রভাব বিস্তার করলে বা হুজুগে বাংলাদেশীদের চাবি দিয়ে দম দেয়া পুতুলের মত ছেড়ে দিলেই কার্যসিদ্ধি হয়, সেখানে ভারত সঙ্গতকারণেই সামরিক বিষয়াদির চেয়ে অন্যান্য খাতেই নজর দিয়েছে বেশী। কারণ সামরিক পর্যায়ের আগ্রাসী ভীতি প্রদর্শন বা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যাওয়া ভারতের সমর শক্তির জন্য 'Split of the military power' হিসেবে পরিগণিত হবে। চতুর্থতঃ আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙালি, যাদের ভাষাগত, নৃতত্ত্বগত, সংস্কৃতিগত পরিমণ্ডলে ভারতের পশ্চিম বাংলার সাথে প্রচুর সাযুজ্য রয়েছে। আমরা এখনো বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের ওপর নির্ভর করে থাকি। প্রচার মাধ্যমে আমাদের কারিগরী পশ্চাৎপদতা যা মূলত অর্থনৈতিক কারণে দুরতিক্রম্য, সেখানে বিশাল ভারতীয় প্রচার সাম্রাজ্য আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আধুনিকতার মাদকতা আমাদের তরুণ-যুবকদের কাছে কাম্য হলেও আমরা সুস্থ সাংস্কৃতিক অবয়ব দান করতে পারিনি। ফলে ওই সুযোগটি গ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গীয় আদলের সংস্কৃতি চর্চা ও বোম্বের উলঙ্গ দেহ সর্বস্ব স্যাটেলাইট কালচার। পঞ্চমতঃ পাকিস্তানের মতো দেশে জনগণের মাঝে প্রচার যন্ত্রের কল্যাণে বেসিক কিছু 'নিরাপত্তা' ও 'কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স' চেতনা ক্রিয়াশীল যা আমাদের এখানে নেই। ষষ্ঠতঃ গুপ্তচরবৃত্তির সকল শাখা-প্রশাখাকে সর্বদা পল্লবিত

৩। Hostile Intelligence Service - বৈরী অর্থাৎ শত্রু দেশের গুপ্তচর সংস্থা

রাখার জন্যে যে অনুগত শ্রেণীর প্রয়োজন হয় তা বাংলাদেশে একটু বেশি পরিমাণেই সহজলভ্য। কারণ উপমহাদেশ বিভক্তির প্রায় সাথে সাথেই তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানীরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে মনে মনে আলাদা জাতিসত্তার ভিত্তি রচনা শুরু করে। এর মাঝে স্বয়ং 'কায়েদে আজমের' একটি উক্তিকে কেন্দ্র করে যে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়, তখন হতে জনগণ পাকিস্তান বিরোধী হয়ে ওঠে। এভাবে ধীর ধীরে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' ও সর্বশেষে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিস্তৃত পরিসরে সকল পর্যায়ের নেতা, মুক্তিযোদ্ধা, সামরিক বাহিনীর সদস্য, আমলাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠেছিল ভারতের পক্ষে। সবচেয়ে যে ব্যাপারটি গ্রাউন্ড ওয়ার্ক-এর জন্য সুবিধাজনক ছিল, তা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় সাহায্য-সহায়তার মাধ্যমে ভারতের ব্যাপক ভূমিকা পালন। যার সূত্র ধরে পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর পর ভারতীয় আদর্শের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং পর্যায়ক্রমে এর লালন-পালন ও বয়োঃসন্ধিকালে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে গড়া সংগঠন আ'লীগ স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল কৃতিত্বের দাবিদার, দলীয় নীতি-আদর্শ ও রাজনীতি চর্চায় মধ্যপন্থী এবং সংগ্রামী হিসেবে সামগ্রিকভাবে অবশ্যই ভারতীয় তাঁবেদারির বোঝা বহন করে না। শেখ মুজিবের মতো একজন বড় মাপের নেতা ব্যক্তিগতভাবে কখনোই সরাসরি বা পরোক্ষে ভারতের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করেছেন এমন কথা বলা সত্যের অপলাপ মাত্র। তাঁর শাসনামলে পর্যন্ত যখন সকল পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ও তাঁর পরিবারের অনেক সদস্যকে দুর্নীতি, তাঁবেদারির দোষে দুষ্ট হতে দেখা গেছে তখনও শেখ মুজিব ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতির বাইরে ছিলেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, তাঁর শাসনামলেই বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে, সবচেয়ে বেশিমাত্রায় চক্রান্তের শিকার হয়েছে এবং তার দলের এক ব্যাপক 'অতি বিপ্লবী' অংশ ভারতের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে। এখানে সার্বিকভাবে সংগঠন হিসেবে বা আওয়ামী লীগ সমর্থনকারী সাধারণ জনগণ হয়তো সহজ, সরলভাবেই গণতান্ত্রিক রাজনীতির ক্রমধারায় আওয়ামী লীগের সকল কর্মকাণ্ডকে নিষ্কলুষ মনে করে। কিন্তু বিশেষ কিছু কারণে ও ঘটনা পরম্পরায় ভারতের নিয়ন্ত্রণে 'পুতুলের নাচের ইতিকথা'র কথা মনে পড়ে যায়।

একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বাধীনতা আন্দোলন ও যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে আওয়ামী লীগের একটি অংশের সাথেই 'র'-এর ব্যক্তিগত পর্যায়ের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এ সংক্রান্ত কিছু দালিলিক প্রমাণাদি ভারতীয় সাংবাদিক 'আশোকা রায়না' রচিত ইনসাইড 'র' বইটিতে পাওয়া যায়। উক্ত বইয়ের 'অপারেশন বাংলাদেশ' অধ্যায়ের 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' শিরোনামের অংশে বলা হয়েছে-

> "বাংলাদেশ অপারেশনে যুক্ত হবার জন্য ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর একটি পরিষ্কার সারসংক্ষেপ প্রকাশ করতে হলে একজনকে অবশ্যই ১৯৬৮ সালে 'র'- এর জন্ম সালের পরপর ঘটে যাওয়া

গোয়েন্দা কার্যাদির পর্যালোচনা করতে হবে। কিন্তু ততদিনে ভারতীয় এজেন্টরা পূর্ব পাকিস্তানে 'মুজিবপন্থী' একটি অংশের সাথে যোগাযোগ সাধন করেছে। আগরতলায় ১৯৬২-'৬৩ সালে ভারতীয় এজেন্ট ও 'মুজিব পন্থীদের' মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পরবর্তী গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।"

এরপর 'র'- এর কার্যক্রম বৃদ্ধি উপাধ্যায়ে উল্লেখ করা হয় যে,

"পূর্ব পাকিস্তানে একটি গোপন সংস্থা গড়ে তোলার কাজ তরান্বিত করার মাধ্যমে 'শত গুপ্তচরের' বছর শুরু হয়। ... কর্নেল মেননের [৪] অবিরাম ভ্রমণ ও যোগাযোগের জন্য সীমান্তব্যাপী 'র'-এর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র খোলা হয় এবং কর্নেল মেননের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরের প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের নিবিড় যোগাযোগ ঐ সমস্ত তরুণ, অবিশ্রান্ত ও উৎসর্গীকৃত যোদ্ধাদের মনোবল দারুণভাবে বৃদ্ধি করে। এ সমস্ত ভ্রমণ 'স্থানীয় কেন্দ্র প্রধান' নির্বাচনে বিশেষ কাজে লাগে। এ সমস্ত 'কেন্দ্র প্রধানদের' মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কর্নেল এম এ জি ওসমানীর নেতৃত্বাধীন মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর শফিউল্লাহ ও আব্দুল কাদের সিদ্দিকী, যিনি 'বাঘা সিদ্দিকী' ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি পরবর্তীতে 'মুক্তিবাহিনী' ও 'র' এজেন্টদের মধ্যে যোগাযোগকারী রূপে আবির্ভূত হন।"

'মুজিব বন্দী-তাজউদ্দীন কলিকাতায় আশ্রয় প্রার্থী' অংশে বলা হচ্ছে-

"তাজউদ্দীন ও আরো কয়েকজন নেতৃস্থানীয় নেতা 'র' এজেন্টের সাথে সারারাত ভ্রমণ করে মুজিবনগরে এসে পৌছেন .... তাজউদ্দীনের সাথে অন্য যারা ছিলেন তারা হলেন জনাব নজরুল ইসলাম, মোশতাক আহমদ, সামাদ আজাদ এবং চারজন ছাত্রনেতা ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খান।"

পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে 'উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় সাধনের' জন্য 'র', আইবি ও তিন বাহিনীর মিলিত ডিরেক্টরেট অব ইন্টেলিজেন্স-এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে 'সংযুক্ত গোয়েন্দা কমিটি' গঠিত হয়। বেসামরিক পর্যায়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি ও তার প্রয়োগে নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি সেক্রেটারিয়েট কমিটি গঠিত হয়। প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, অর্থ ও পররাষ্ট্র সচিব সমন্বয়ে এ সচিব পর্যায়ের কমিটি কাজ আরম্ভ করে এবং 'র' প্রধান কাও সদস্য সচিব হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন। এছাড়া 'রাজনৈতিক প্রতিনিধি জনাব ডিপি ধর যিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি ছিলেন, তাঁকে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পরিষদে অন্তর্ভূক্ত করা হয়'[৫]।

ডিপি ধর ও আরএন কাও পরবর্তী পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রভাবান্বিত করে তাদের পূর্ব পরিচিত আওয়ামী লীগ যুব শাখার সংগঠন ও নেতৃত্ব সম্পর্কে খুঁটিনাটি খোঁজ খবর নিয়ে 'মুজিব বাহিনী' গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। মুজিব বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ছিল কাও ও আরো ব্যাপক অর্থে 'র'-এর আয়ত্তে একটি সম্পূর্ণ পৃথক Regimented বাহিনী গড়ে তোলা, যারা যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে 'র'-এর পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতে পারবে। মেজর জেনারেল উবানকে মুজিব বাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণের

৪। শঙ্কর নায়ারের ছদ্ম নাম-যিনি ছিলেন 'র'-এর একজন পরিচালক

৫। Asoka Raina, *Inside RAW, The Story of India's Secret Service, Operation Bangladesh*, Chapter-6

দায়িত্ব দেয়া হয়। জেনারেল উবানের ভাষ্যমতে,

> "The RAW created 'Mujib Bahini'-a special force during liberation war. Mujib Bahini was trained at the Headquarters of ARC (Aviation Research Centre : RAW's special outfit) at Chakrata near Dehradun, (UP). The force was headed by Sirajul Alam Khan, Tofail Ahmed, Abdur Razzak and Late Fazlul Haque Moni. After liberation, most members of this force joined JRB and JSD[৬].

এ বাহিনী পরিচালনায় 'কাও' ছিলেন উবানের বিশেষ উপদেষ্টা। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর 'মুজিব বাহিনী'র সদস্যদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগের মাধ্যমে 'রক্ষী বাহিনী' গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে জেনারেল উবানের সম্পৃক্ততা তার ভাষ্য মতে ফুটে উঠেছে এভাবে,

> "একদিন প্রধানমন্ত্রীর (ইন্দিরা গান্ধীর) মুখ্য সচিব পিএন হাকসার আমার নামে একটি বার্তা পাঠালেন। বার্তায় বলা হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী আমাকে শেখ-এর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিসেবে ঢাকায় পাঠাতে সম্মত হয়েছেন। শেখ একটি নতুন বাহিনী গঠনের চিন্তা-ভাবনা করছিলেন, যাতে তার মুক্তিবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ এবং মুজিব বাহিনীর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়"[৭]।

এই নতুন বাহিনীটি ছিল বাংলাদেশের সকল আওয়ামী লীগ বিরোধীদের স্তব্ধ করায় ত্রাস সৃষ্টিকারী রক্ষীবাহিনী। আজ আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না যে, রক্ষীবাহিনী ছিল 'RAW'-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও প্রশিক্ষণে পরিচালিত হিটলারের 'Brown Shirts'-[৮] এর True Copy এবং এ বাহিনীতে 'র'-এর ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ছাড়া ভিন্ন কাউকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অন্যদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের ভারতপন্থী অংশের সম্মতিক্রমে ও 'র'-এর ড্রাফট অনুযায়ী গোপন সাত দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিটির সাতটি শর্ত একটি স্বাধীন দেশের জন্য এতটাই অবমাননাকর যে ভাবতেও অবাক লাগে, কিভাবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ চুক্তি সম্পাদনে সায় দিয়েছিলেন? অবশ্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর মূর্ছা যান। গোপন সাত দফার আওতায়ই আমাদের সেনাবাহিনীর দফা রফা করে, 'আভ্যন্তরীণ আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তি বাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে' বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় [৯] এবং 'ওই লিখিত সমঝোতাই হচ্ছে বাংলাদেশ রক্ষী বাহিনীর উৎস'[১০]।

এখানে স্বাধীনতা যুদ্ধের বেশ ক' বছর পূর্বের কিছু কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ'র ভূমিকা" নামক বইটিতে

৬। Maj Gen S.S Uban, *Phantoms of Chittagong-The Fifth Army in Bangladesh* -এ উদ্ধৃত

৭। প্রাগুক্ত

৮। ব্রাউন শার্টস্ ছিল হিটলারের পেটোয়া বাহিনী। বিরোধী দলের সভা সমাবেশ, মিছিল ভেঙ্গে দেয়া ছিলো এদের কাজ। রক্ষিবাহিনীর কাজও ছিলো বিরোধী দল মত দমন করা।

৯। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, মাসুদুল হক লিখিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য

১০। প্রাগুক্ত

লেখক জনাব মাসুদুল হক উল্লেখ করেছেন

> "১৯৬২ সালে পাকিস্তানের গোয়েন্দা দপ্তর (IB) জানতে পারে যে, কলকাতার ভবানীপুরের একটি বাড়িতে যা ছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অপারেশনাল দপ্তর সেখানে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন সক্রিয় রয়েছে। এটির উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা। চিত্তরঞ্জন সুতার ও কালিদাস বৈদ্য এই গোপন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে ঐ দুই ব্যক্তিই তথাকথিত 'বঙ্গভূমির' প্রবক্তা। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত দু' ব্যক্তিই ছিলেন আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এমপি। মূলত ঃ তারা 'র'-এর এজেন্ট হিসেবেই আওয়ামী লীগে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন এবং আওয়ামী লীগকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের এক পর্যায়ে ঐ দু'জনসহ মোট তিনজন সংখ্যালঘু আওয়ামী লীগ নেতা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করে রাখার প্রস্তাব রাখেন"[১১]।

এখানে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো পরে জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারকে বিষয়টি অবহিত করলেও তাদের বিরূদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি এবং জনাব চৌধুরীর মতে, 'তারা-কিছু সংখ্যালঘু নেতা চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে সিকিম বানাতে'[১২]। বাংলাদেশকে ভারতের সাথে যোগদানের মত গুরুতর অভিযোগের পর চিত্তরঞ্জন গংদের বিরূদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় এটিই কি প্রমাণিত হয় না যে, আ'লীগের ইনার সার্কেলে এমন কিছু গোপনীয় ব্যাপার আছে যা ভারত ও 'র'-এর বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিতে তাদের রাশ টেনে ধরে বা তারা সরাসরি 'র'-এর এজেন্টদের জেনে শুনে আস্কারা দেন হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অথবা তারা বুঝেও না বোঝার ভান করেন।

আসলে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন আওয়ামী লীগ নেতাদের ভারতে বিতর্কিত অবস্থান, বিলাস-ব্যসনে মত্ততা ও আরো অনেক স্থলন (অবশ্যই সকলে নয়) 'র'-কে ঐসব নেতাদের ভবিষ্যৎ ও তাৎক্ষণিক ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহারের চমৎকার সুযোগ করে দেয়। ইন্টেলিজেন্সে যাকে বলে 'Hook up' সে পদ্ধতিতে বিভিন্ন নেতা-কর্মীদের অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী ব্ল্যাকমেইল করার পরিপূর্ণ প্রমাণ হস্তগত করা হয় এবং ঐ ট্রাম্প কার্ডগুলো দেখিয়ে তাদের ইতোপূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

এভাবে ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় একটি অংশের 'র' কন্টাক্টদের সাথে দহরম-মহরমের ফলেই স্বয়ং ভারতীয়রাই স্বীকার করেছে যে,'RAW Operations Continue in Bangladesh where the agency maintains a substantial presence'[১৩] অর্থাৎ, বাংলাদেশে 'র' অপারেশন অব্যাহত রয়েছে এবং এদেশে 'র' লক্ষ্যণীয়ভাবে উপস্থিতি বজায় রেখেছে!

এদিকে আওয়ামী বলয়েই কেবল বিদেশী এজেন্টের কর্মতৎপরতা জেঁকে বসেছে আর বাকী দলগুলোয় কোন এজেন্ট নেই এরূপ একটি সন্দেহ বা প্রশ্ন সকলের মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। উত্তরে বলা যায় যে, আওয়ামী বলয় ছাড়া অন্যান্য দলে বা সংগঠনে এজেন্ট যে একেবারে নেই তা নয়, তবে আওয়ামী বলয়ে যেভাবে এজেন্টরা প্রভাব

১১। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত গ্রন্থ

১২। প্রাগুক্ত

১৩। Sunday 18-24 September 1988

বিস্তারকারী পর্যায়ে চলাফেরা করে তা অন্য কোন সংগঠনে ততটা আগ্রাসী নয়। এর অন্তর্নিহিত কারণ হলো ভারত সরকার ও আওয়ামী বলয়ের আদর্শিক একাত্মতা বা সাযুজ্যতা। যেমন ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। ইন্দিরা গান্ধী ৬ ডিসেম্বর '৭১ তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্টের যৌথ হাউসের সভায় বলেন,

> "মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, বাংলাদেশের নেতৃবর্গ ইতিমধ্যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং এই প্রেক্ষিতেই তাদের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তারা যে আদর্শগুলি রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পত্র লিখেছেন তার কপি আপনাদের টেবিলে দেয়া হল।"

"তাই ভারতীয় সংবিধানের চার মূলনীতিতে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারতপন্থী বা প্রো-ইন্ডিয়ান দলগুলোর মধ্যে 'র'-এর নিকট সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য"[১৪]।

১৪। দৈনিক ইনকিলাব, ৫ মে '৯০ সংখ্যা

অধ্যায়-৭

বাংলাদেশে 'র' তৎপরতা (১৯৭৬-'৯০)

১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার একটি দৈনিকের সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের একটি ভূমিকা রয়েছে"। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের এই কথায় স্বভাবতই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের এই 'একটি' ভূমিকা আসলে কি এবং রাজনীতি যেহেতু রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়ে থাকে, তাই ভারতীয় ভূমিকায় সহায়তাকারী সেই রাজনৈতিক দল কোন্‌টি?

উপরোক্ত প্রসঙ্গে ২৩ জুলাই '৯৩ সংখ্যা 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধের উল্লেখ করা যায়। 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক' শিরোনামের উক্ত নিবন্ধে প্রয়াত সাংবাদিক জনাব শামছুর রহমান উল্লেখ করেছিলেন,

> "পঁচাত্তর-পরবর্তীতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা তারা (ভারত) গ্রহণ করেছিল তাতে তাদের মৌলনীতি ছিল দু'টি-(১) বাংলাদেশে ভারত অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং ভারতের স্বার্থের বাহক দল ও ব্যক্তিদেরকে আনুকূল্য প্রদান করা এবং (২) প্রথম কৌশল ব্যর্থ হলে বিভিন্নভাবে চাপ ও প্রভাব বিস্তার করে ক্ষমতাসীন সরকারকে নতজানু করানো, যাতে আর্থিক, রাজনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতির বাস্তবায়নে বাংলাদেশ (ভারতের) বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়।"

এ দু'টো নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভারত কোন সময়ই পিছপা হয়নি। বিশেষ করে ১৯৬২ সালে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা যেভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জড়িয়ে গিয়েছিল '৭৫-এর পট পরিবর্তনে তা বেশ খানিকটা হোচট খাওয়ায় তাদের ভিন্ন পথে কিন্তু কৌশলে অগ্রসর হতে হয়। তবে তাই বলে যে ভারত বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ আগ্রাসন চালানোর চিন্তা করেনি তা কিন্তু নয়। বরং এব্যাপারে তদানীন্তন ইন্দিরা সরকারের মনোভাব বোঝা যায় স্বয়ং ভারতীয় লেখকদের কথা থেকে।

এদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করায় 'র' খুব সহজেই এদেশের সকল পর্যায়ে এজেন্ট তৈরীতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তারা এসকল এজেন্টদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়নি। বরং শেখ মুজিব সরকার-যাদের সাথে আপাতদৃষ্টিতে ভারতের সুসম্পর্ক ছিল বলে ধারণা করা হয় সেই মুজিব আমলেও 'র'-তৎপরতা সমান তালে অব্যাহত ছিল। এমনকি "সে সময় 'র' এজেন্টরা নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে নজর রাখা অব্যাহত রাখে"[১]। তবে "স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকারের আচরণ ছিলো আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন। ফলে বাংলাদেশের জনগণ ভারতকে সন্দেহ ও ঘৃণার বস্তু হিসেবে দেখতে শুরু করে। এই ঘৃণা ও সন্দেহের কারণে ভারতের সাথে

১। Asoka Raina, *Inside RAW : The Story of India's Secret Service*, Chapter-6

বাংলাদেশের মৈত্রীর ব্যাপার ছিলো বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন। '৭১-এর পর সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কে অবনতি ঘটে। সে সময় গোটা বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরস্পর মুখোমুখি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্রশক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অপরদিকে ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় পরাজয়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব এ অঞ্চলে হ্রাস পেতে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ে ভারতের আত্ম-অহংকার হঠাৎ করে বেড়ে যায়। একই সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন পরাজয়ে ভারতের আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। এই দুই ইচ্ছাশক্তির জোরে ভারত নিজেকে এ অঞ্চলের মুরুব্বী হিসেবে গড়ে তুলতে শুরু করে। শুরু হয় তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যপীড়িত একটি দেশের বিশাল সমরসজ্জা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে নিজের বলয়ভুক্ত করার সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়া।

১৯৭১ সালের পর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও সেনা কর্মকর্তারা দক্ষিণ এশিয়াসহ অস্ট্রেলিয়ার জলসীমা পর্যন্ত ভারতের একাধিপত্য কায়েমের মাস্টার প্লান তৈরী করে। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশ এই মাস্টার প্লান বাস্তবায়নে ভারতকে সকল প্রকার সহযোগিতা দিতে শুরু করে। বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় করে ভারত অত্যাধুনিক অস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করতে থাকে। এ মাস্টার প্লানের চূড়ান্ত বাস্তবায়নের জন্যে তার প্রয়োজন হয় রাজনৈতিক সমর্থনের। এ লক্ষ্যে প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর স্নায়ুবিক চাপ প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করে ভারত। প্রতিবেশী বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করে। মাঠে নামিয়ে দেয় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'কে। উপরোক্ত দেশগুলোর মধ্যে মালদ্বীপ ও ভূটানের কোনো স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি নেই। এরা ভারতীয় বাজারের ক্রেতা। বাকি দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেব আত্মপ্রকাশ করে।

স্বাধীনতার পর মুজিব সরকারের ওপর ছিলো ভারতের একচ্ছত্র প্রভাব। এ প্রভাব বিস্তার করতে ভারত সরকার আশ্রয় নেয় বিভিন্ন কৌশলের। শেখ মুজিব তার স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বের জন্য ভারতের এ ধরনের নাক গলানো নীতিতে প্রায়শঃ বিরক্ত হতেন। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এ কারণে শেখ মুজিবকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতো না। 'র' শেখ মুজিবকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে উঠে পড়ে লাগে। মুজিব মন্ত্রিসভায় কয়েকজন এ সময় 'র'-এর পক্ষে কাজ করতো। অতঃপর '৭৫-এর ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়" [২]। এ অবস্থায় 'র'-খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়লেও '৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর আবার তারা বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এর নেতৃত্বে "...যে পরিস্থিতিতে ও যেভাবে ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় (মুজিব হত্যাকান্ডের মাত্র ৮০ দিনের

২। সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ১৩/১০/৯২ সংখ্যা

মাথায়), তাতে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ গোপন ভারতীয় সমর্থন ছিল" [৩]।

এ প্রেক্ষিতে ৭ নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আবির্ভূত হন জিয়াউর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে 'র'-এর অপতৎপরতার বিরুদ্ধে অন্য কোন শাসক তাঁর মতো রুখে দাঁড়াননি। এবং একারণেই জে. জিয়াকেও মোকাবিলা করতে হয়েছে ভয়াবহ সব গোপন কার্যক্রম। এমনকি সে সময় বাংলাদেশে 'র' কতোটা তৎপর ছিল তা বোঝা যায় স্বয়ং তাঁর (জিয়ার) স্বীকারোক্তি থেকে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভারত সফরের সময় ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা চলাকালীন 'র'-এর তৎকালীন প্রধান আর. এন. কাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। "ইন্দিরা গান্ধীর এক প্রশ্নের জবাবে জিয়া কাওকে উল্লেখ করে মন্তব্য করেন-যতটুকু না আমি জানি, তার থেকে এই ভদ্রলোক বেশী জানেন আমার দেশ কিভাবে চলছে" [৪]। জে. জিয়ার শাসনামলে 'র' এমন কোন কার্যক্রম চালাতে বাকী রাখেনি যার মাধ্যমে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী আদর্শের পতন ঘটানো যায়। এক্ষেত্রে জে. জিয়ার যেসব পদক্ষেপ ভারতের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো হলো –

১। জে. জিয়া পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় বলয়ের বাইরে এসে চীন, পাকিস্তান ও মুসলিম দেশগুলোর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলেন। বস্তুতঃ বিদেশনীতির এই কৌশলের কারণেই ভারত প্রস্তুতি নেয়ার পরও বাংলাদেশে সামরিক আগ্রাসন পরিচালনার দ্বারপ্রান্তে এসেও পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

২। মুক্তিযুদ্ধকালীন তদানীন্তন প্রবাসী সরকার ভারতের সাথে গোপন সাতদফা চুক্তি প্রণয়ন করেন। এর একটি ধারা ছিল যে, বাংলাদেশের স্বতন্ত্র কোন সশস্ত্রবাহিনী থাকবে না। পরবর্তিতে মুজিব আমলে ভারতের সাথে ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তিতেও অধীনতামূলক বহু ধারা সংযোজিত ছিল। এসব কারণে ইচ্ছে থাকা স্বত্ত্বেও শেখ মুজিব সশস্ত্রবাহিনীকে সুসজ্জিত করে গড়ে তুলতে পারেননি। কিন্তু জে. জিয়া ভারতীয় চাপকে উপেক্ষা করে একটি শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং খুব কম সময়ের মধ্যে তিনি মুজিব আমলের এক ডিভিশনকে পাঁচ ডিভিশনে উন্নীত করেন। এছাড়া তিনি একটি ছায়া প্রতিরক্ষানীতিও প্রণয়ন করেন যার আলোকে সম্ভাব্য ভারতীয় আগ্রাসন মোকবিলায় কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায় সেজন্য প্রস্তুতিও চলতে থাকে [৫]।

৩। জে. জিয়ার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দর্শন ভারতকে সবচেয়ে বেশী বিচলিত

৩। Srikant Mohapatra, *National Security and Armed forces in Bangladesh* Strategic Analysis, Delhi, August 1991. page - 589

৪। পূর্বে উল্লেখিত Inside RAW, অধ্যায়-৬

৫। লেখকের সাথে লে. জে. মীর শওকত আলী, মে. জে. আব্দুস সামাদ, এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ হোসেন চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, ২০০০

করে তোলে।

৪। কথিত ভারতীয় সেক্যুলার দর্শন ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারের মাত্রা জে. জিয়ার শাসনামলে সংকুচিত হয়ে আসে।

৫। অর্থনৈতিক খাতে ভারত নির্ভরশীলতা হ্রাস পাওয়ায় ভারতীয় নীতি নির্ধারকগণ যারপরনাই চিন্তিত হয়ে পড়েন।

৬। ভারত যে দলটিকে 'বন্ধু' মনে করতো তার রাজনৈতিক অপমৃত্যু ঘটার আশঙ্কা দেখা দেয়ায় 'র' কর্মকর্তাগণ জে. জিয়ার শাসনামলকে ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী বলে চিহ্নিত করেন।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নীতি নির্ধারকগণ দু'টো উপায় অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন। এর একটি হলো-যেকোনভাবে জে. জিয়াকে উৎখাত করা বা সম্ভব হলে হত্যা করা ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে যদি বা যতদিন তা করা সম্ভব না হয় ততদিন জিয়া প্রশাসনকে বিভিন্নমুখী চাপে ব্যতিব্যস্ত করে রাখা যাতে তারা দেশগড়ায় নজর দিতে না পারেন এবং পক্ষান্তরে বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যায়।

উপরোক্ত সূত্রের আলোকে 'র' প্রথম লক্ষ্যকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ধরে নিয়ে জিয়া প্রশাসনকে বিশৃংখল করে তোলায় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে এধরনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তৎপরতার বিবরণ তুলে ধরা হলো।

কাদেরিয়া বাহিনী সৃষ্টি

শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার পর তদানীন্তন আ'লীগ নেতা কাদের সিদ্দিকী যিনি বাঘা সিদ্দিকী নামে পরিচিত তিনি জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন। উল্লেখ্য যে, কাদের সিদ্দিকীর সাথে 'র'-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'র'-এর সহযোগিতায় তিনি কিভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তথা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হন তার বিবরণ পাওয়া যায় 'র'-সম্পর্কে লিখিত ভারতীয় লেখক অশোকা রায়নার বইয়ে। 'ইনসাইড 'র'-ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায়' শিরোনামের ঐ বইটিতে কাদেরিয়া বাহিনী সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়– "টাইগার সিদ্দিকী যিনি দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখার সংকল্প ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁর সাথে তখনকার 'ক্ষয়প্রাপ্ত' মুক্তিবাহিনীর ১৬,০০০-২০,০০০ সদস্য নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নেন।

টাইগার সিদ্দিকী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে সমস্ত 'র' সদস্যের সাথে পরিচিত ছিলেন, তিনি পুনরায় সাহায্য ও নিরাপত্তার আশায় তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশে তিনি ও তাঁর লোকজন তখন গ্রেপ্তারের তালিকায় ছিলেন। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, তাড়াহুড়ো করে জড়ো হওয়া মুক্তি ফৌজের উদ্দেশ্য ছিল 'মুজিববাদ'কে পুনর্জীবিত করা। সিদ্দিকী তাঁর তিনজন সঙ্গীসহ দিল্লীতে যেয়ে ধরণা দিতে থাকেন। তাদের চাহিদা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সরল প্রকৃতির, যেমন পূর্বের মত বেসরকারি গোপন সমর্থন প্রদান ও তাদের পুনঃসংগঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থদান।

ভারতীয় সরকার তাদের দাবিপূরণে সম্মত হন। কিন্তু এর সাথে একটি শর্ত জুড়ে দেয়া হয় যে, মুক্তিফৌজ বাংলাদেশের সীমানা থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং এ পদক্ষেপ শুধুমাত্র মুজিবের স্বপ্নসাধ পুনর্জীবিত করার জন্য সীমিত সময়ে পরিচালিত হবে। তারা শুধুমাত্র চরম অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতেই ভারতীয় আশ্রয়স্থান ব্যবহার করতে পারবেন। এ শর্তে মুক্তিফৌজ রাজি হয়ে যায় কারণ বাংলাদেশ রাইফেলস্ তাদেরকে কৃচিৎ কখনো আক্রমণ করতো এবং প্রায় সময় তারা (বিডিআর) নিষ্ক্রিয় থাকত বললেই চলে। শেখ মুজিবের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা থাকার পাশাপাশি আরেকটি বিশেষ কারণে তারা মুক্তিফৌজকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন, আর তা হচ্ছে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে জানতে পারে যে, বাংলদেশ মিজো গেরিলাদের আশ্রয় দিয়ে চীনাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ দিয়েছে এবং কাদের বাহিনীর মুক্তিসেনারা তাদের ধারণায় এ ধরনের তৎপরতাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং 'র'-এর মাধ্যমে সিদ্দিকীকে ভারতীয় সরকারের সাহায্য প্রদান অব্যাহত থাকে।"

শান্তিবাহিনী গঠন

শান্তিবাহিনী যে 'র'-এর তত্ত্বাবধানে সৃষ্ট এ নিয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। এক্ষেত্রেও প্রমাণ হিসেবে ইনসাইড 'র'-বইয়ে উদ্ধৃত তথ্যের উল্লেখ করা যায়। এ ব্যাপারে উক্ত বইয়ে বলা হয়েছে –

"বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তের একদম শেষ পর্যায়ে যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অবস্থিত সেখানকার চাকমা গেরিলাদেরও মুক্তিবাহিনীর মত 'র' সাহায্য করে যাদেরকে এক সময় 'র'-অপারেটিভ ও ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সাহায্য করেছিল। চাকমারা ইয়াহিয়া খানের সময় বিদ্রোহী হয়ে উঠতে শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই নদীর উপর একটি বাঁধ তৈরি করে। ফলে ঐ এলাকার চাকমাদের অন্যস্থানে পুনর্বাসন করা হবে বলে সরিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে ঐ পুনর্বাসন কখনো করা হয়নি। বরং এর পরিবর্তে সত্তর দশকে বাঙালি মুসলিম জনগণ দরিদ্র চাকমাদের নিকট হতে সহায় সম্পত্তি ক্রয় আরম্ভ করে এবং এর পরপর ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়াও একই সাথে চলতে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর চাকমাদের কিছু সময়ের জন্য সাহায্য করা হয়। কিন্তু মুজিব হত্যাকান্ডের পর আবার সেই ধর্মান্তকরণ পুরোদমে আরম্ভ হয়ে যায়। তাই তারা বাধ্য হয়ে সাহায্যের আশায় ভারতে আসা শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর মতই তারা তাদের পুরনো 'র' কন্টাক্টদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং অবশেষে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়।

আগরতলা অতিক্রম করে এসে তারা দরকষাকষি শুরু করে। তাদের পরিবার-পরিজন ও শিশুদের নিরাপত্তা বিধানের দাবি ভারত সরকার মেনে নেন। তারা তাদের নিজস্ব যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তারা একটি সংকীর্ণ করিডোরের নিরাপত্তা নিশ্চিত ক[illegible] জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করে যার মাধ্যমে তাদের পরিবার-পরিজন ভারতে অনুপ্রবেশ করতে পারে। এদিকে মিজো সমস্যার আশংকা রয়ে যায়

কারণ তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'আশ্রয়স্থান' হিসাবে ব্যবহার করছিল ও চীনারা তাদের প্রশিক্ষণে নিয়োজিত ছিল। চাকমা উপজাতিদের আকার, আকৃতি ও চেহারা মিজোদের মত একই রকম থাকায় ও মিজোরা উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চালাবার জন্য অস্ত্রসজ্জিত হওয়ায় প্রাথমিকভাবে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সুতরাং লালডেঙ্গা, যিনি ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চালানো হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের 'র'-এজেন্টদের সাথে তার আলোচনা সীমিত সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছে, যেখানে তিনি 'র'-এজেন্টদের সাথে ইউরোপে যেতে সম্মত হন। পরবর্তীতে 'র'-অপারেটিভদের মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে তাঁকে দিল্লীতে আনা সম্ভব হয়, যদিও তখন পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হয়নি। এ পর্যায়ে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশি মাত্রায় সক্রিয় হওয়ার পরিবর্তে মিজো বিদ্রোহীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ভারতীয় সরকারকে তথ্য সরবরাহের প্রস্তাব দেয় যার পরিবর্তে তারা তাদের পরিবারের জন্য ভারতীয় আশ্রয়ের নিশ্চয়তা চায়। ভারত সরকার এ দাবী মেনে নেন" [৬] । ভারতীয় লেখকের দাবী মতে চাকমাদের ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ যদিও তথ্যভিত্তিক নয় তবুও অন্তত এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'র'- শান্তিবাহিনী তৈরী করেছে।

এছাড়া ভারতের নতুন দিল্লীস্থ ইন্সটিটিউশন অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের রিসার্চ ফেলো মি. অশোক. এ. বিশ্বাস তাঁর এক নিবন্ধে শান্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় সংশ্লিষ্টতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। গত ৩১-৮-৯৪ তারিখে The New Nation পত্রিকায় প্রকাশিত 'RAW's Role in Furthering India's Foreign Policy' শিরোনামের এক নিবন্ধে জনাব বিশ্বাস বলেন, "RAW is now involved in training rebels of Chakma tribes and Shanti Bahini who carry out subversive activities in Bangladesh" অর্থাৎ 'র' এখন চাকমা সম্প্রদায় ও শান্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়ায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রকম নাশকতামূলক কাজের সাথে জড়িত।

ঠিক একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির এককালীন সভাপতি উপেন্দ্রলাল চাকমা ১৯৯১ সালে অন্যান্য শান্তিবাহিনী নেতাদের সাথে মতভেদ দেখা দেয়ার পর বলে ফেলেন যে, "শান্তিবাহিনীর নেতৃত্ব মূলতঃ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার হাতে ন্যস্ত" [৭] ।

ভারত শুধু যে শান্তিবাহিনী সৃষ্টি করেছে তাই নয় বরং প্রথম থেকেই যাবতীয় উপায়ে শান্তিসেনাদের প্রশিক্ষণ ও সমরাস্ত্র প্রদান করেছে। এব্যাপারে আত্মসমর্পণকারী বেশ ক'জন শান্তিসেনার কাছ থেকে জানা যায় যে, "বেশ কিছু শান্তিবাহিনী সদস্য ১৯৭৬ সালে ভারতের দেরাদুনে গোরিলা যুদ্ধ ও জুনিয়র লিডার কোর্সের প্রশিক্ষণ লাভ করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব শান্তিবাহিনী সদস্য প্রাথমিকভাবে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনী ও রাজাকারদের পরিত্যক্ত অস্ত্র দিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের কাজ শুরু করে। ১৯৭৫ সালের শেষার্ধে তারা ভারত হতে প্রথম অস্ত্রের চালান পায়। বিভিন্ন সূত্র হতে জানা যায়

৬। পূর্বে উল্লেখিত Inside RAW, অধ্যায়-৯
৭। মাসুদ নিজামী, *পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে কূট রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচিত,* দৈনিক ইনকিলাব, ১১-৬-৯৩

সন্ত্রাসীরা ভারতীয় 'র'-এর মাধ্যমে নভেম্বর '৭৫, মার্চ '৭৭, আগস্ট '৭৯ এবং জুলাই '৮৯-এ পাঁচবার বড়ধরনের অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরকের চালান পেয়েছে" [৮] ।

সশস্ত্রবাহিনীতে অভ্যুত্থান সংঘটন

৭ নভেম্বর '৭৫-এর সিপাহী জনতার বিপ্লবের পর জে. জিয়া যখন বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় আবির্ভূত হন তখন সশস্ত্রবাহিনীতে একটির পর একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। অথচ আ'লীগ শাসনামলে যেখানে সশস্ত্রবাহিনীকে সুসংগঠিতভাবে গড়ে তোলা হয়নি, দেয়া হয়নি পর্যাপ্ত বাজেট সেখানে জে. জিয়া সশস্ত্রবাহিনীকে গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করেছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সেনাবাহিনীর আকার বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। এবং "১৯৭৪-'৭৫ অর্থবছরে যেখানে প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল মাত্র ৭৫০ মিলিয়ন টাকা সেখানে ১৯৭৫-'৭৬ অর্থবছরে বরাদ্দ দেয়া হয় ২০৬২ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৭৬-'৭৭ এ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২১৯৪ মিলিয়নে" [৯]। এছাড়া জে. জিয়া '৭৫-এর ৭ নভেম্বর বিপ্লবের মাত্র ছয় মাসের মাথায় ঢাকার সন্নিকটে নবম ডিভিশন নামে একটি নতুন সেনা ডিভিশন গঠন করেন। পাশাপাশি রক্ষিবাহিনীর সদস্যদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে সেনাসদস্যদের সাথে দেশের জেলাশহরগুলোতে অবস্থিত বিভিন্ন সেনানিবাসে পাঠিয়ে দেয়া হয়। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট যে ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট 'বেঙ্গল ল্যানস্যার' অভ্যুত্থানে মূল ভূমিকা পালন করেছিল সেটিকে পাঠিয়ে দেয়া হয় বগুড়ায়। এভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি (জে.জিয়া) সেনাবাহিনী থেকে বিশৃংখলা দূর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তারপরও তাঁর শাসনামলে অনূন্য ২১টি ছোট বড় সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় বলে জানা যায়। অবশ্য কোন কোন সূত্রে এধরনের অভ্যুত্থানের সংখ্যা ১৮টি বলে উল্লেখ করা হয়। সংখ্যা যাই হোক জে. জিয়ার ক্ষমতারোহনের পরমুহূর্ত থেকেই যে সুপরিকল্পিতভাবে সশস্ত্রবাহিনীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে জে. জিয়াকে অপসারণের চেষ্টা করা হয় তা বলাই বাহুল্য। এবং বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায় এধরনের বেশীর ভাগ অভ্যুত্থানই সংঘঠিত হয়েছিল ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার ইন্ধনে। যদিও এসম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা সহজ নয় কিন্তু ঘটনা বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, ভারত শেখ মুজিবের মৃত্যু ও বাংলাদেশে ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল সরকারের পতনে উদ্বিগ্ন হয়ে জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এক্ষেত্রে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায়, জে. জিয়া ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় একইসাথে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশে 'প্রো-জিয়া' ও 'প্রো-মুজিব' বাহিনীর মধ্যে কাল্পনিক সংঘাতের খবর ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। একথাও ভারতের প্রভাবশালী

৮। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন লেখকের রচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম: শান্তিবাহিনী ও মানবাধিকার, অধ্যায় ২, পৃঃ ২৬

৯। Moudud Ahmed, *Democracy and Challenge of Developement*. p. 36

পত্রিকায় বলা হয় যে, "সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ও বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই মুজিব অনুসারীরা জিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে"[১০]। এমনকি ৭ নভেম্বর বিপ্লবে খালেদ মোশাররফ নিহত হবার পরও "ভারতীয় প্রচার মাধ্যম দীর্ঘদিন অব্যাহতভাবে প্রচার চালায় যে, বাংলাদেশের সেনানিবাসগুলোয় জিয়াপন্থী সৈনিকদের সাথে মুজিবপন্থীদের সংঘর্ষ চলছে"[১১]।

এভাবে জে. জিয়ার শাসনামলের প্রাথমিক ধাপেই ভারত সুপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বিশৃংখলা সৃষ্টিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। পরবর্তিতে জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীতে সেসব ক্যু বা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় তার পিছনেও 'র'-এর সংশ্লিষ্টতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় এতদসংক্রান্ত বিভ্রান্তিকর প্রচারণাই এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। এছাড়া জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংঘটিত এসব অভ্যুত্থান প্রক্রিয়ায় যে 'র' যুক্ত ছিল তার একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতীয় 'সানডে' পত্রিকার ১৮তম সংখ্যায় প্রকাশিত 'দি সেকেন্ড ওল্ডেস্ট প্রফেশন' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন থেকে। 'সানডে'র ঐ প্রতিবেদনটি '৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'দৈনিক মিল্লাত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সানডে'তে উল্লেখ করা হয় যে, "'৭৫ সালের পর ইন্দিরা গান্ধীর অনুমোদন নিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করার চক্রান্ত বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়। '৭৭ সালে ভারতে জনতা পার্টি নির্বাচনে জয়ী হলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে 'র'-এর প্রথম দফা হত্যার চেষ্টা ভন্ডুল হয়। যদিও '৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হন। .... ঐ প্রতিবেদনে ভারতের কংগ্রেস সরকার বিরোধীদের বিরূদ্ধে গোয়েন্দাগিরি, ভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব-বিরোধী ও রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রাণনাশের ব্যাপারে 'র'-এর নাশকতামূলক তৎপরতার বিবরণ দেয়া হয়। বলা হয় '৭১ সালে 'র' বাংলাদেশে বৃহত্তর বিজয় সূচিত করলেও শেখ মুজিবের মৃত্যু ঠেকাতে সংস্থার ব্যর্থতা গাধামার্কা ভুলের বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ....

মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জনতা দলীয় এম.পি সুব্রামনিয়াম স্বামীকে উদ্ধৃত করে নিবন্ধে বলা হয়, 'র'-এর তৎকালীন প্রধান কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ আর এন কাও ও সহকারী প্রধান শঙ্কর নায়ার মুজিবের মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়েন এবং জিয়া হত্যার চক্রান্ত করেন। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের পতনের পর মোরারজী দেশাইকে বিষয়টি অবহিত করা হয়। প্রতিবেশী একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যায় 'র'-এর আকাংখা শুনে প্রধানমন্ত্রী দেশাই বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তিনি জিয়া হত্যা চক্রান্ত বন্ধের নির্দেশ দেন।

১০। স্টেটসম্যান, হিন্দুস্তান টাইমস, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫

১১। দেখুন, হিন্দুস্তান টাইমস্, ৯ নভেম্বর ১৯৭৫; প্যাট্রিয়ট, ১৬ নভেম্বর ১৯৭৫; ইকনমিক টাইমস্, নিউ দিল্লী ১৯ নভেম্বর ১৯৭৫; স্ট্রেইট টাইমস্, ২০ নভেম্বর ১৯৭৫; স্টেটসম্যান, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৫

শঙ্কর নায়ার তখন বলেন, এ অবস্থায় ফিরে আসার পথ রুদ্ধ হয়ে পরিত্যক্ত হলে 'র'-এর সম্পদরা (এজেন্ট অর্থে) বিপদাপন্ন হয়ে পড়বে। দেশাইয়ের অনমনীয়তার মুখে 'র'-জিয়াকে হত্যার চক্রান্ত অবশেষে পরিত্যাগ করে"[১২]। এখানে জিয়া হত্যা পরিকল্পনা সাময়িকভাবে স্থগিত করায় যেসব এজেন্ট ধরা পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল মূলত তাই ঘটে বাস্তবে। লক্ষ্যণীয় '৭৭ সালে মোরারজী দেশাই যখন 'র'-কে 'পরিকল্পনা' স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই 'র'-এর আশঙ্কা অনুযায়ী বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীতে অনুপ্রবিষ্ট 'র'- এজেন্টরা দিশেহারা হয়ে একটির পর একটি অঘটন ঘটাতে থাকে। যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে 'র'-এদের উপর থেকে ছত্রছায়া প্রত্যাহার করে নেয় তাই তারা (এজেন্টরা) বিক্ষিপ্তভাবে অভ্যুত্থান ঘটাতে থাকে এবং এর প্রতিটিই ব্যর্থ হয়, যদিও '৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতাসীন হওয়ার পর 'র'-এজেন্টরা জিয়াকে হত্যা করে। এখানে জে. জিয়ার শাসনামলে সংঘটিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভ্যুত্থান যেগুলোয় ভারতীয় চরদের সংশ্লিষ্টতা আচ করা যায় সেগুলোর বিবরণ দেয়া হলো ঃ

১। ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর বিপ্লবের পর '৭৬-এর শুরুতে যখন কর্নেল তাহের অনুসারীরা অনেকটা নিশ্চুপ হয়ে যায় তখন বিভিন্ন সেনানিবাসে চারমাসের ব্যবধানে বেশকিছু অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটে যার একপর্যায়ে জিয়াউর রহমানকে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করতে হয়। এরকম একটি ক্যু হয় '৭৬-এর মার্চে যেখানে একটি সেনা ইউনিটে বিদ্রোহ দেখা দেয় ও তাতে তিন জন সৈনিক নিহত হয়। এ ঘটনায় জে. জিয়া নিজে উপস্থিত হয়ে সৈনিকদের শান্ত করেন।

২। '৭৬ সালের জুলাই মাসে বগুড়া সেনানিবাসে একটি অভ্যুত্থান ঘটে। দিনব্যাপী এই অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা বহুকষ্টে দমন করা সম্ভব হয় এবং এ ঘটনার জন্য দায়ী হিসেবে প্রায় ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৩। '৭৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে বগুড়ায় ও অক্টোবর মাসের শুরুতে দু'টো বড় ধরনের অভ্যুত্থান ঘটে। ২৯,৩০ সেপ্টেম্বর রাতে বগুড়ায় একদল সৈনিক হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও অস্ত্র নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তারা শহরেও প্রবেশ করে। কিন্তু ৫০০ জনের মতো অভ্যুত্থানকারী জনগণের সহানুভূতি লাভে ব্যর্থ হওয়ায় অবশেষে এ ক্যু'দেতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ ঘটনায় একজন অফিসার নিহত ও তিনজন সৈনিক আহত হন।

এঘটনা যখন ঘটছিল তখন এক রহস্যময় কারণে জাপান এয়ার লাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমানকে ছিনতাই করে জাপানীজ রেড আর্মির সদস্যরা ঢাকায় অবতরণে বাধ্য করে। তদানীন্তন বিমানবাহিনী প্রধানসহ বিমান বাহিনীর সিনিয়র কর্মকর্তারা এঘটনায় বিমানবন্দরে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একইসাথে সরকারকেও বাধ্য হয়ে ছিনতাই ঘটনায় বেশীরভাগ মনোযোগ প্রদান করতে হয়। তাই স্বভাবতই অন্য কোনদিকে

১২। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, এলাহী নেওয়াজ খান, *এরশাদের উত্থান-পতন*, ওয়েসিস বুকস্

পর্যাপ্ত নজর দেয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঠিক এমনি এক পরিস্থিতিতে বগুড়া অভ্যুত্থানের দু'দিনের মাথায় ২রা অক্টোবর বিমানবাহিনীর নন কমিশন্ড অফিসারদের নেতৃত্বে একটি ব্যাপক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। বিদ্রোহী সৈনিকেরা গুলী করতে করতে সেনা ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসে ও সরকারী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ দখল করার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে তারা রেডিও স্টেশন ক্ষণিকের জন্য দখলও করে নেয়। এদের সাথে সংঘর্ষে প্রায় ২০০ জন লোক নিহত হয় যাদের মাঝে ছিল ১১ জন বিমান বাহিনীর অফিসার। অভ্যুত্থান প্রক্রিয়ার একপর্যায়ে বিদ্রোহীরা জে. জিয়ার ক্যান্টনমেন্টস্থ বাসভবন আক্রমণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু সরকার অনুগত সৈনিকদের দৃঢ় প্রতিরোধের মুখে এই ক্যু'দেতা ব্যর্থ হয়ে যায়। তবে এ অভ্যুত্থানের সবচেয়ে কঠিন দিক হলো যে, এতে বিমানবাহিনীর সিনিয়র পাইলটরা নিহত হওয়ায় পুরো বিমানবাহিনীই মূলত অকার্যকর হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, এ অভ্যুত্থান ঢাকায় সংঘটিত হলেও ভারতীয় প্রচার মাধ্যমে এমনভাবে প্রচার পায় যাতে মনে হয়েছিল দেশের অন্যান্য সেনানিবাসেও অভ্যুত্থান ঘটেছে এবং সরকার পতনের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

এধরনের আরো অনেক ক্যু বা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে জে. জিয়ার শাসনামলে। এর অনেকগুলো জাতীয়ভাবে সেনাবাহিনী বা দেশকে প্রভাবিত করতে না পারলেও এগুলোর ইন্ধনদাতা ছিল মুষ্টিমেয় কিছু সৈনিক/অফিসার। এরা বেতনভাতা, সুযোগ সুবিধা, শ্রেণীহীন সমাজ গঠন ইত্যাদি কথা বলেই মূলত সেনাসদস্যদের উত্তেজিত করে তুলতো। এরকম একটি অভ্যুত্থান ঘটেছিল রংপুরস্থ ৩ সিগন্যাল ব্যাটালিয়নে। তদানীন্তন রংপুর রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলে ছিল ৩ সিনগ্যাল ব্যাটালিয়নের অবস্থান। '৭৭ সালে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এক বিকেলে হঠাৎ কিছু সৈনিক অস্ত্রাগার ভেঙ্গে অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে বিদ্রোহ করে বসে। ঘটনা অনুসন্ধানে জানা যায় জনৈক অফিসার একজন সৈনিকের সাথে 'খারাপ' ব্যবহার করেছে এ অজুহাতেই ঐ বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে[১৩]।

প্রকৃতপক্ষে জে. জিয়ার শাসনামলে সেনাবাহিনীতে অনুপ্রবিষ্ট 'র'-এজেন্টদের বিচ্ছিন্ন তৎপরতাই এসব অভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ। এসব এজেন্টকে স্বাধীনতার পর যেমন 'র' নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিল তেমনি রক্ষিবাহিনীর সদস্যদের বাছ বিচার না করে 'গণহারে' সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করাতেও 'র'-এর অনেক এজেন্ট সশস্ত্রবাহিনীতে তৎপর হওয়ার সুযোগ পায়। একথা হয়তো কারো অজানা থাকার কথা নয় যে, রক্ষিবাহিনী সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয় দিকনির্দেশনা মতে। মুজিববাহিনীর স্রষ্টা ভারতীয় মেজর জেনারেল এস.এস. উবান যেভাবে 'র'-এর সক্রিয় উদ্যোগে মুজিববাহিনী তৈরী করেছিলেন তেমনি এই উবানই রক্ষিবাহিনী সৃষ্টির নেপথ্য কারিগর ছিলেন। ফলে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ভারতপন্থী এমনকি সরাসরি 'র'-এর (পরোক্ষ) নিয়োগকৃত অনেকেই ছিলেন রক্ষিবাহিনীতে। এবং এরাই পরে মোরারজী দেশাই

১৩। লেখকের ব্যিক্তিগত অভিজ্ঞতা

'জিয়া হত্যা পরিকল্পনা' স্থগিত করায় 'ধরা পড়ার' হাত থেকে বাঁচার জন্য বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থান সংঘটন করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হত্যাকান্ড

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল। কেন?

কেন প্রবাদপ্রতীম জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েও তিনি অকালে প্রাণ হারান তাঁরই হাতে গড়া সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে? কারা ছিল সেই ঘাতক চক্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদদানকারী, চক্রান্তের মূল পরিকল্পক?

এসব প্রশ্নের উত্তর আঁচ করতে পারলেও এর পক্ষে তথ্য প্রমাণ খুঁজে পাওয়া বেশ দুষ্কর বৈকি। বিশেষ করে যেখানে জিয়া হত্যায় বাংলাদেশের একটি বিশেষ মহল জড়িত যারা রাজনৈতিকভাবে বেশ শক্তিশালীও বটে, সেখানে অনেক কিছুই আজ হারিয়ে যাচ্ছে 'অপপ্রচারণার ইতিহাসে'।

তবে কারা জিয়া হত্যায় জড়িত ছিল ও কাদের জন্য তাঁকে হত্যা করেছিল একটি দেশের গুপ্তচর সংস্থা তা সহজেই বোঝা যায় সেই প্রতিবেশী দেশের স্বনামখ্যাত বিশ্লেষকগণের লেখা থেকে। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষক পার্থ সারথি ঘোষের [১৪] কথা। প্রেসিডেন্ট জিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করে ভারত আসলে কাদের বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আনতে চাইছিল সে রহস্য পার্থ ঘোষ কোনো রাখঢাক না করেই ফাঁস করে দেন তার এক লেখায়। প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যাকান্ডের পর বাংলাদেশে যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছিল সে সময় ২৯ আগস্ট '৮১ সংখ্যা ভারতীয় Mainstream পত্রিকায় 'Limits of Diplomacy : Bangladesh' শিরোনামে তার এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন, "আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল থেকে ভারত কি পাবে তা বিচার্য বিষয় নয়। কিন্তু মুজিব ও তাঁর উত্তরসূরিদের সাথে অভিজ্ঞতার আলোকে এটা বলা যায় যে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের মধ্যেই ভারতের একটি শক্ত ভিত রয়ে গেছে।" এবং যেহেতু আ'লীগের মধ্যেই কেবল ভারতের 'ভিত' রয়ে গেছে তাই এই আ'লীগকে যে কোনো উপায়ে ক্ষমতায় আনাই ছিল ভারতের লক্ষ্য। এব্যাপারে ভারতের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মিঃ পার্থ সারথি ঘোষ মন্তব্য করেন, "কিন্তু ঘটনা প্রবাহ ভারতের অনকূলে নিয়ে আসায় কিভাবে প্রভাব খাটানো যায়? এটি নিশ্চিত যে, শুধু কূটনীতি দিয়ে তা করা সম্ভব নয়, বরং রাজনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য আওয়ামী লীগকে গোপনীয়ভাবে যাবতীয় সাহায্য প্রদান করতে হবে। এবং এরকম গোপন সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই যে কোনো প্রকার নৈতিক সংস্কার বা নীতিকে বর্জন করতে হবে।" অর্থাৎ এ

১৪। পার্থ সারথি ঘোষ বর্তমানে দিল্লীস্থ ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের সাথে জড়িত। ইনি একসময় 'র'-এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়। বাংলাদেশ-ভারত ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি প্রণয়নে পার্থ সারথির বিশেষ ভূমিকা ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার বাংলাদেশ সরকার তার 'র'-এর সাথে সম্পৃক্ততা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ বা BIISS-এর একজন লেখক হিসেবে তিনি দিব্যি BIISS পত্রিকার সাথে একসময় জড়িত ছিলেন। এবং যথারীতি উক্ত পত্রিকায় তার নামও ছাপা হয়েছে।

বিশ্লেষণ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আ'লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে ভারত তাদের স্বার্থরক্ষাকারী বলে মনে করে না। এবং এই আ'লীগকে ক্ষমতায় আনার জন্যই তারা 'গোপনীয়' অনেক কাজ করেছে যে 'কাজের' অন্যতম হলো প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা।

মূলতঃ '৭৫-এর ১৫ আগস্ট পট পরিবর্তনের পর ভারত বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে হটিয়ে একটি 'বন্ধুভাবাপন্ন' রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় আনার জন্য উঠেপড়ে লেগে পড়ে। এক্ষেত্রে আ'লীগই হচ্ছে সেই রাজনৈতিক দল এবং আ'লীগকে ক্ষমতায় আনার জন্যই ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' জিয়া হত্যার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এব্যাপারে ১৫ মার্চ '৮৯ সংখ্যা দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় ঋতু সারিন প্রদত্ত তথ্যের উল্লেখ করা যায়। জনতা দলীয় এমপি মিঃ সুব্রামনিয়াম স্বামীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি উল্লেখ করেন 'র'ই মূলত জিয়াকে হত্যা করেছে। এদিকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত অপর একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক 'সানডে' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে ঢাকার The New Nation পত্রিকার এক রিপোর্টে বলা হয়-"ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অনুমোদনক্রমে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে"[১৫]। উক্ত রিপোর্টে বলা হয় যে, "মুজিব হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে ভারতে জিয়া হত্যার ষড়যন্ত্র দানা বাঁধে। কিন্তু ষড়যন্ত্র যখন পেকে ওঠে, সেই সময় ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটে। মোরারজি দেশাই ক্ষমতায় আসেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে হত্যা ষড়যন্ত্রের কথা শুনে তিনি 'সন্ত্রস্ত' হয়ে ওঠেন এবং হত্যা বন্ধ করেন। এরপর ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় এলে প্রেসিডেন্ট জিয়া নৃশংসভাবে নিহত হন।"

প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যার পেছনে ভারত জড়িত ছিলো এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এব্যাপারে হাজারো তথ্য প্রমাণ হয়তো অদূর ভবিষ্যতে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। তবে এখানে উল্লেখ করা মোটেও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, "জিয়া হত্যার সংবাদ সর্বপ্রথম প্রচার করেছিল আকাশবাণী-আগরতলার একজন সাংবাদিকের বরাত দিয়ে। প্রশ্ন হচ্ছে সারা দুনিয়া জানার আগে আগরতলার সাংবাদিক কি করে খবর পেলেন চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে? জিয়া হত্যার দায়ে জড়িত দুই পলাতক সেনা অফিসার দীর্ঘকাল কোথায় কাদের আশ্রয়ে ছিল? এখনও একজন কলকাতা নগরীতে ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন" [১৬]।

অন্যদিকে জিয়া হত্যার মাত্র ১২ দিন পূর্বে শেখ হাসিনা ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। "ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের মাত্র তিন দিন পরই ভারত সৈন্য নামিয়ে তালপট্টি দ্বীপটি দখল করে নেয়। সারাদেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়লেও তিনি

১৫। The New Nation : 29 September, 1988, RAW planned to kill Ziaur Rahman.

১৬। শামছুর রাহমান, *বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক*, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২২ বর্ষ ৯ সংখ্যা ২৩ জুলাই '৯৩/৮ শ্রাবণ ১৪০০, পৃঃ ৩৭

ছিলেন নিশ্চুপ। তাঁর প্রত্যাবর্তনের ১৩ দিনের মাথায় দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারীদের হাতে নিহত হলেন প্রাণপ্রিয় নেতা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। হত্যাকান্ডের খবর পেয়ে সিলেট থেকে ঢাকা ফেরার সময় শেখ হাসিনা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমান্ত দিয়ে পাড়ি জমানোর প্রয়াস পান। সীমান্তরক্ষীরা বাঁধ সাধেন" [১৭]।

উপরোক্ত তথ্যাবলী ছাড়াও জিয়া হত্যায় ভারতের সংশ্লিষ্টতার পক্ষে যেসব প্রমাণাদি পাওয়া যায় সেগুলো হলো-

১. প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের একদিন পূর্বে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করে।

২. জিয়া হত্যার দু'দিন পর-২ জুন '৮১ তারিখে আকাশবাণী পরিবেশিত সকাল ৭ঃ৫৫-র খবরে বলা হয় যে, বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে।

৩. আকাশবাণীর অন্য আরেক খবরে ভারতীয় সরকারের বরাত দিয়ে জানানো হয়, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে সহায়তার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

৪. প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়ার সাথেসাথেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নয়াদিল্লীস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে জানতে চান যে, শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা?

আসলে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তনসহ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ও বিশেষ করে স্বকীয় কৌশলগত নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন বলেই তাঁকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডে নিঃসন্দেহে জড়িত ছিল ভারত। তাদের আধিপত্যবাদী নীল নকশা বাস্তবায়নে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক দলটিতে 'ভারতের ভিত্তি' রয়ে গেছে সেই দলটিকে ক্ষমতাসীন করার জন্যই 'র'-এর হাতে নিহত হন জিয়াউর রহমান।

(লেখকের এ নিবন্ধটি দৈনিক দিনকাল, ৩০ মে '৯৭ উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত)

'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলন

জে. জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর 'র' বাংলাদেশের জনগণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে তখনি প্রকাশ্যে মাঠে নামার সাহস পায়নি। কিন্তু ২৪শে মার্চ '৮২ তারিখে যেদিন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তারকে সরিয়ে জে. এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন ঠিক তার পরদিন অর্থাৎ ২৫শে মার্চ '৮২ তারিখে ঘোষিত হয় তথাকথিত 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' নামের একটি পৃথক রাষ্ট্র। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা—খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও পটুয়াখালি নিয়ে এই স্বঘোষিত হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের যাবতীয় চক্রান্ত চালানো হয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে। ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর প্রত্যক্ষ

১৭। শওকত মাহমুদ, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনার ১২ বছর,* দৈনিক দিনকাল ২০/৫/৯৩ সংখ্যা।

মদদে সৃষ্ট এই বঙ্গভূমি আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক দাবীই নয় বরং একটি সশস্ত্র গ্রুপও তৈরী করা হয় বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের জন্য। 'বঙ্গসেনা' নামের এই সশস্ত্রবাহিনীটির নেতৃত্ব দেন একসময়কার আ'লীগ নেতা ডাঃ কালীদাস বৈদ্য। চারটি দলীয় সংগঠন বিএলও, বিএলটি, এলটিবি ও আরএসএসও পৃথক পৃথকভাবে স্বাধীন বঙ্গভূমি চক্রান্তে মদদ জোগায়।

১৯৮২ সালে যখন বঙ্গভূমি আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তখন ভারতে রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ভারতে অব্যাহত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে চোখ সরানো বা অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ধুয়া তুলেই মূলত ইন্দিরা গান্ধী সেসময় অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় বাংলাদেশবিরোধী এই ফ্রন্ট খোলায় কোনরূপ রাষ্ট্রীয় শিষ্টাচারের পরিচয় দিতে পারেননি। একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী সৃষ্টি, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার দাবী ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে গারোল্যান্ড আন্দোলন উস্কে দিয়ে ভারত বাংলাদেশে মূলত ঃ ত্রিমুখী পরোক্ষ আগ্রাসন চালানোর পায়তারা করে।

স্বাধীন বঙ্গভূমি চক্রান্ত সম্পর্কে '৮২ সাল থেকে নিয়ে এপর্যন্ত পত্র পত্রিকায় প্রচুর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। জে. এরশাদের শাসনামলের প্রায় পুরো সময়টুকুতে এ আন্দোলন অব্যাহত থাকলেও '৮৪ জুলাই থেকে এর মাত্রা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায় যা বেগম জিয়ার শাসনামলেও স্তিমিত হয়নি। স্বাধীন বঙ্গভূমি চক্রান্ত সম্পর্কে এখানে ২৫ জুলাই '৮৯ সংখ্যা সাপ্তাহিক সুগন্ধায় প্রকাশিত কলকাতা থেকে পাঠানো অমিত বিক্রম রানার একটি প্রতিবেদন পত্রস্থ করা হলো।

তথাকথিত 'স্বাধীন বঙ্গভূমি'র ব্লু প্রিন্ট ঃ একটি হিন্দু রাষ্ট্র তৈরির চক্রান্ত

কলকাতা থেকে অমিত বিক্রম রানা। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। একটি স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র তৈরির প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন পর বর্তমানে ভারত সরকারের মদদ লাভ করে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। অহরহ 'স্বাধীন বঙ্গভূমি'র দাবি তোলা হচ্ছে।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় বঙ্গ সেনারা নিজেদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এদের কন্ট্রোল রুম হচ্ছে কলকাতাস্থ হেডকোয়ার্টার।

গত মে মাসে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা আসম রব 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই আন্দোলন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করার জন্য ভারতের সম্প্রসারণবাদী কৌশল।'

সংসদ অধিবেশনে নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের স্বাধীন বঙ্গভূমি ষড়যন্ত্রের ওপর একটি মূলতবী প্রস্তাব বিরোধী দলের পক্ষ থেকেই উঠেছিল। সেদিন ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ জাসদ-এর শাজাহান সিরাজসহ অন্যান্যরা যে বক্তব্য রাখেন এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ...প্ত জেনারেল মাহমুদ হাসান জানান, "বাংলাদেশের ভেতর তথাকথিত 'স্বাধীন

বঙ্গভূমি' আন্দোলনের কোন অস্তিত্ব নেই। যারা এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলা নিয়ে স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের' একদল উগ্রপন্থী স্বাধীন বঙ্গভূমি রাষ্ট্রের প্রচার চালাচ্ছে। এর ফলে যদি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত আসে বাংলাদেশ সরকার শক্ত হাতে তার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত।"

একই সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ জানান, 'ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চালানো হচ্ছে সুসম্পর্কের খাতিরে ভারত যেন এখনই তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেয়।'

স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রের প্রথম ব্লু প্রিন্ট

তথাকথিত 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' তৈরির চক্রান্ত গত কয়েক বছর ধরে তোড়জোড় চললেও স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র চক্রান্তের প্রথম ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয় পঞ্চাশ দশকে।

ডাঃ কালিদাস বৈদ্য তার 'বঙ্গভূমি ও বঙ্গসেনা' বইতে স্বীকার করেছেন, ১৯৫২ সালে কালিদাস বৈদ্য, চিত্তরঞ্জন ছুতোর ও নীরদ মজুমদার এই তিনজন উগ্রপন্থী যুবক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য ব্যাপক কর্মতৎপরতা চালান। সেই সাথে গোপনে হিন্দুদের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র বাসভূমির কথাও প্রচার করেন। সাম্প্রতিক স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনকে চাঙ্গা করতে ডাঃ কালিদাস বৈদ্য ও চিত্তরঞ্জন ছুতোরই সবচেয়ে বেশি কাজ করছেন। এরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বহুদিন ভারতের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন ছুতোর রাজনৈতিকভাবে বেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। এর মূলে ছিলো ভারত সরকারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মুজিব সরকারের ওপর প্রভাব খাটানোর জন্যই ইন্দিরা সরকার তাকে সবসময়ই যথাসাধ্যভাবে ব্যবহার করেছেন। এখনও তার সাথে বাংলাদেশী একটি দলের যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। অনেকের মতে তার সাথে 'রুশ কানেকশনও' জড়িত। বনগাঁ সীমান্তে স্বাধীন বঙ্গভূমি সমর্থকদের ব্যাপক প্রচারের প্রাণকেন্দ্র হলো ভবানীপুরের রাজেন্দ্র রোডের চিত্তরঞ্জন ছুতোরের বিলাসবহুল বাড়ি। এখন এটাই হচ্ছে বঙ্গসেনার ঘাঁটি।

রাজীব গান্ধী মদদ দিচ্ছেন

স্বাধীন বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার চক্রান্তকে ভারত সরকার যে মদদ দিচ্ছেন তার প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর একাধিক বিবৃতি। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ জন্যই ভারতে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। দূরদর্শন ও রেডিও রাজীব গান্ধীর বিবৃতি ফলাও করে প্রচার করছে। গত ১৭ জানুয়ারী ১৯৮৯ 'বঙ্গভূমি' পন্থীদের বাংলাদেশ মিশন অভিযানের কথা আকাশবাণী থেকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়।

বর্তমানে স্বাধীন বঙ্গভূমির সৈন্যবাহিনী ভারত সরকারের নেপথ্য মদদে আন্দোলনকে

শক্তিশালী করে তুলতে ব্যস্ত। সীমান্তবর্তী এলাকায় তীব্র হিন্দুত্ব রক্ষার প্রচার চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশের বুকে স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি এবং এর সরকার ঘোষণা, সৈন্য বাহিনী তৈরি ইত্যাদি প্রচেষ্টায় ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। অথচ ভারতীয় প্রশাসন ও পুলিশ এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করে যাচ্ছেন। উগ্রপন্থী নেতাদের গ্রেফতার করারও কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না।

ভারত সরকারকে মদদ দিতেই হবে

ডাঃ কালিদাস বৈদ্য বলেন, ভারত সরকার বঙ্গসেনাদের মদদ দিচ্ছেন, বলতে পারেন প্রশ্রয় দিচ্ছে। তবে মদদ আমাদের দিতেই হবে। সেই ক্ষেত্র আমরা তৈরি করছি। আমরা ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। আমাদের বক্তব্য আমরা তাঁদের ক্রমাগত বোঝাবার চেষ্টা করছি। যদি সত্যি সেই সম্ভাব্য জনসমর্থন পাই, ভারত সরকারকে একদিন সৈন্য বাহিনী দিয়ে আমাদের সাহায্য করতেই হবে। আমাদেরও সরকার আছে, সেনাবাহিনী আছে, তবে ভারতীয় সেনাবাহিনী 'বঙ্গসেনা' নামেই এ্যাকশনে নামবে।

বঙ্গসেনার কার্যক্রম চালু রয়েছে

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে ব্যাপকভাবে বঙ্গভূমির প্রচার চালানো হচ্ছে। বনগাঁ, বগুলা ও গোবরডাঙ্গা কলেজের যুব ছাত্রদের মধ্যে এর প্রভাব বাড়ছে। চলছে অস্ত্রশিক্ষা। সেনাধ্যক্ষ কালিদাস বৈদ্য অবশ্য ব্যাপারটিকে সত্য বলে মানছেন না।

একটি সূত্র মতে, আনন্দমার্গের আদর্শে বিশ্বাসী 'আমরা বাঙালী', চাকমাদের শান্তিবাহিনী এবং একটি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা বঙ্গ সেনাদের পুরোপুরি সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কালিদাস বৈদ্য বলেন, এ মুহূর্তে আমরা অস্ত্র প্রশিক্ষণে পা বাড়াচ্ছি না। আগে যথেষ্ট লোকজন হোক, দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রচার হোক, তারপর। তবে, অস্ত্র প্রশিক্ষণের প্রয়োজনই বা কি? যথাসময়ে ভারত সরকারই অস্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব নেবে।

বাংলাদেশে 'হিন্দু লীগ' গড়া হয়েছে বলে জানান বি এল ও নেতা সুব্রত চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গভূমি সংগঠকদের হাত শক্ত করতে বিজেপিও এগিয়ে এসেছে। তবে বঙ্গভূমি আন্দোলনের চারটি গ্রুপকে একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধ শক্তির মাধ্যমে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এই সমন্বয় কমিটি গঠনের মূল হোতা অবশ্যই ডাঃ কালিদাস বৈদ্য যার একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে আরেকবার বিভক্ত করা।

এভাবে স্বাধীন বঙ্গভূমি আনেদালনের নামে 'র' যে বাংলাদেশ বিরোধী চক্রান্তেই অবতীর্ণ হয় তা নয় বরং বাংলাদেশকে গ্রাস করারও পরিকল্পনা করে। এব্যাপারে ঢাকার ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ঢাকা কুরিয়ার'-এর সহকারী সম্পাদক ইরতিজা নাসিম আলীর সাথে ডাঃ কালীদাস বৈদ্যের একটি সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দেয়া যায়। ১৯৮৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত ঐ সাক্ষাৎকারে ইরতিজা নাসিম আলী কালীদাস বৈদ্যের

কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, "আচ্ছা বলুন তো বঙ্গভূমি আন্দোলনের বিকল্প কি হতে পারে?" তাৎক্ষণিকভাবে কালিদাস বৈদ্য উত্তর দিয়েছিলেন, "বিকল্প একটাই, বাংলাদেশ যদি ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়ে নীরবে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এই বশ্যতা স্বীকারেই কেবল বঙ্গভূমি আন্দোলন বন্ধ হতে পারে" [১৮]।

ভারতের তালপট্টি দখল, শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও বিশৃংখল পরিবেশের মধ্য দিয়ে জে. এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ

জে. জিয়াউর রহমানের শাসনামলে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ভারতের দিল্লীতে বসবাস করতেন। বাংলাদেশে তার ফেরত আসাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ব্যাপার হলেও "জিয়া হত্যার মাত্র ১২ দিন পূর্বে শেখ হাসিনা ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের মাত্র তিনদিন পরই ভারত সৈন্য নামিয়ে তালপট্টি দ্বীপ দখল করে নেয়। সারাদেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়লেও তিনি ছিলেন নিশ্চুপ"[১৯]। উল্লেখ্য যে, তালপট্টি দ্বীপে নৌবহর পাঠানোর আগে ৮মে ১৯৮১ ভারতের লোকসভায় তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসীমা রাও যিনি নিজে ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশের সাথে এতদসংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন করেছিলেন, তিনিই বলেন, দক্ষিণ তালপট্টির নাম 'নিউমুর' দ্বীপ বা পূর্বাশা।

একথা এখন আর লুকানো কোন বিষয় নয় যে, জে. জিয়াকে হত্যার পরপর 'র' বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় তাদের বিশ্বস্ত 'একজনকে' ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছিল। কিন্তু জে. জিয়ার জানাযায় লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতি ও সাধারণ জনগণের আবেগ, অনুভূতি লক্ষ্য করে 'র' বুঝতে পারে যে ঐ মুহূর্তে বাংলাদেশে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ছাড়া ভিন্ন কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই 'র' বিশ্লেষকগণ সরাসরি ভারতপন্থী বলে চিহ্নিত দলটিকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমতায় না এনে উদ্যোগ নেয় বিকল্প জাতীয়তাবাদী শক্তি দাঁড় করিয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী মহলে বিভেদ সৃষ্টি করার। এক্ষেত্রে বুঝে হোক, না বুঝে হোক বা অবচেতনভাবে হোক জে. এরশাদ- এর ক্ষমতা গ্রহণ 'র'-এর এই উদ্দেশ্য সাধনে কিছুটা হলেও ভূমিকা পালন করে। লক্ষ্যণীয়, জে. এরশাদ ক্ষমতাগ্রহণ করার সময় ভারতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো যেমন কোন উচ্চবাচ্য করেনি তেমনি আ'লীগের দলীয় পত্রিকা 'বাংলার বাণী'তে প্রথম পৃষ্ঠায় সামরিক শাসনকে স্বাগত জানিয়ে বিশেষ সম্পাদকীয় পর্যন্ত লেখা হয়েছিল। 'অমানিশার ঘোর কেটে যাক' শিরোনামের ঐ সম্পাদকীয় এখন ইতিহাসের বিষয় হলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তনে গোপন কার্যক্রমের একটি প্রকাশ্য দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এসময় যখন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ফিল্ড ওয়ার্ক চলছিল তখন ঢাকাস্থ ভারতীয় কূটনীতিকদের গতিবিধিও সন্দেহজনক হারে বৃদ্ধি পায়। স্বভাবতই বাংলাদেশী কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলো ভারতীয় কূটনীতিকদের উপর কড়া নজর রাখা শুরু করে। এরই এক পর্যায়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মুচকুন্দ দুবে

১৮। শেখ নুরুল ইসলাম, *তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলন ঃ বর্তমান তৎপরতা ও তার নেপথ্য কাহিনী*, দৈনিক দিনকাল, ৪-১২-৯৩ সংখ্যা
১৯। ক্রমিক ১৭ দ্রষ্টব্য

দায়িত্বপালনরত একজন এন এস আই কর্মকর্তাকে চড় মেরে বসেন।

এদিকে জে. এরশাদকে 'র' ও আ'লীগ স্বচ্ছন্দে ক্ষমতাগ্রহণ করতে দিয়েছিল মূলতঃ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ধারায় বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে। এক্ষেত্রে জে. এরশাদ জাতীয় পার্টি সৃষ্টির মাধ্যমে একটি বিকল্প জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এদেশের সহজ, সরল সাধারণ জনগণের অনেকেই ভাবতে থাকেন জে. এরশাদ একজন দক্ষ ও আন্তরিক প্রশাসক। তাই জনগণের একটি অংশ তাঁর সমর্থকে পরিণত হয়। ফলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী জনগণের মাঝে দু'টি ভাগ স্পষ্ট হয়ে উঠে যার প্রভাব গিয়ে পড়ে নির্বাচনে। অথচ, পক্ষান্তরে আ'লীগের ভোটারদের মাঝে কোন বিভেদ সৃষ্টি হয়নি। এখানে জাতীয় পার্টির সৃষ্টি হওয়ায় তা কিভাবে নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রে আ'লীগের বিজয় নিশ্চিত করে তার একটি উদাহরণ উপস্থাপন করা যেতে পারে। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র জনাব তরিকুল ইসলাম যশোর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ঐ নির্বাচনে তিনি মাত্র ২১২ ভোটের ব্যবধানে আ'লীগ প্রার্থীর নিকট পরাজিত হন। সেখানে জাতীয় পার্টির তদানীন্তন প্রার্থী জনাব খালেদুর রহমান টিটো পান প্রায় ত্রিশ হাজার ভোট। অথচ, এই ত্রিশ হাজার ভোটারের কেউই কিন্তু আ'লীগের ভোটার নন। এবং পূর্বে যখন জাতীয় পার্টি ছিল না তখনও এ ভোটগুলো আ'লীগের বাক্সে পড়েনি। ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাই বিএনপি প্রার্থী বিচারপতি সাত্তার পেয়েছিলেন ৬৫.৮০% ভাগ ভোট। পক্ষান্তরে আ'লীগ প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেন পেয়েছিলেন ২৬.৩৫% ভাগ ভোট। এর পূর্বে জে. জিয়ার শাসনামলে যেসব নির্বাচন হয় সেগুলোতেও নির্বাচনী ফলাফল ছিল অনেকটা একইরূপ।

এসব বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, 'র' জে. এরশাদকে ততদিন পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকতে দিয়েছে যতদিনে তাঁর মাধ্যমে (এরশাদ) একটি বিকল্প জাতীয়তাবাদী শক্তি দাঁড় করানো সম্ভব হয়। এবং যে পর্যায়ে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি-এ দুটো দলই ভোট ভাগাভাগি হওয়ায় ক্ষমতায় যেতে ব্যর্থ হবে ঠিক তখনি 'র'-জে. এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করবে এমন একটি সিদ্ধান্ত তাদের ('র') ছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জে. এরশাদের দীর্ঘ নয় বছরের শাসনামলে আ'লীগ প্রায় প্রতিবারই আন্দোলনের মাঠ থেকে অকস্মাৎ পিঠটান দিয়েছে। কেবলমাত্র '৯০ সালে সিগন্যাল পাওয়ার পরই আ'লীগ এরশাদ পতন আন্দোলনে শরীক হয়। এক্ষেত্রে 'র'-ভেবেছিল '৯১-এর নির্বাচনে হয়তো আ'লীগ জয়লাভ করার মতো পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কারণ, ততদিনে প্রশাসন, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, প্রচার মাধ্যম থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'র'-এর শুভানুধ্যায়ীরা 'হারানো ভূমি পুনর্দখলে' অনেক দূর এগিয়ে যেতে পেরেছেন।

এদিকে জে. এরশাদ 'র'-এর ইঙ্গিতে ক্ষমতায় এসেছেন এধরনের অভিযোগ থাকার পরও রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে অনেকক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী ধারা বজায় রাখেন। বিশেষ করে তিনি চীন, পাকিস্তানসহ সকল মুসলিম দেশের সাথে জে. জিয়া অনুসৃত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখায় ভারত যারপরনাই তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। জে. এরশাদের বিরুদ্ধে 'র' সংশ্লিষ্টতার হাজারো অভিযোগ থাকলেও তাঁর শাসনামলে

বাংলাদেশ মোটামুটিভাবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম, বঙ্গভূমি ইত্যাদি বিষয়েও তিনি নীতি বিচ্যুত হননি। এছাড়া সশস্ত্রবাহিনীর আকার বৃদ্ধি ও সমরাস্ত্র সংগ্রহেও তাঁর ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। মূলত ঃ এসব কারণেই 'র' তাঁকে পুরো মুঠোয় নিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর শাসনামলেও অব্যাহতভাবে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যায়।

বাংলাদেশে 'র'-কর্মকর্তাদের গোপন সফর ও একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের নীতি নির্ধারণে সহায়তা দান

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যায় নিমজ্জিত হয়। সেসময় ফারাক্কাসহ অপরাপর নদীর উজানে দেয়া বাঁধ ভারত খুলে দেয়ায় বন্যার মাত্রা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। এতে বাংলাদেশের জনগণ ভারতের এরূপ অমানবিক ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এরই মাঝে বাকশালের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশে 'আফগান স্টাইলে বিপ্লব' ঘটানোর আহ্বান জানান। এদিকে বন্যার পর দেশে যখন পুর্নোদ্যমে পূনর্বাসন প্রক্রিয়া চলছিল তখন গোপনে 'র'-এর ক'জন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ছদ্মবেশে বাংলাদেশ সফরে আসেন। এব্যাপারে একটি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, "একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে, এবারের শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে পর্যটকের ছদ্মবেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর অতিরিক্ত পরিচালক দেবাশীষ (দীপংকর)-এর নেতৃত্বে ডজন খানেক 'র' সদস্য বর্তমানে বাংলাদেশে এসেছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, পর্যটকের ছদ্মবেশে আগত এসব এজেন্টরা ইতিমধ্যেই ভারতের স্বার্থরক্ষাকারী কিছু রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও ব্যবসায়ীর সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এবারের বন্যার সময় বাংলাদেশে ভারত বিরোধী রাজনীতি বেড়ে যাওয়ার দরুণ আওয়ামী লীগসহ ভারতের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়ার জন্যেই চুপিসারে এই সফর।

অভিজ্ঞ মহলের একটি অংশের মতে, ভারতীয় 'র' এজেন্টরা অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি গঠনের প্রথম থেকে এ পর্যন্ত নানাভাবে 'র' এজেন্টরা এই পার্টির ভেতরে আছর বজায় রাখে। উপদলীয় কোন্দল, লবিং, গ্রুপিং এবং পদ নিয়ে কাড়াকাড়ির পেছনে ভারতীয় এই গোয়েন্দা সংস্থা ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ড চালিয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই 'র' তাদের চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে থাকে। এছাড়াও সানডে পত্রিকা পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও মরিশাসে 'র'-এর তৎপরতা সম্পর্কে বিশদ সংবাদ পরিবেশন করেছে। 'র' শুধু দেশের বাইরেই তাদের গোয়েন্দা তৎপরতা সীমিত রাখেনি, ভারতের অভ্যন্তরে বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধেও তাদের তৎপরতা আব্যাহত রয়েছে।

সম্প্রতি পর্যটকের বেশে 'র'-এর অতিরিক্ত পরিচালক দীপংকরসহ ডজন খানেক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার ঢাকা আগমন তাই নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, বাকশালের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাকের সাম্প্রতিক বক্তব্য ও 'র' কর্মকর্তাদের ঢাকা আগমনের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে।"[২০]

'৮৮-এর বন্যায় ভারতীয় হেলিকপ্টার থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ছবি সংগ্রহের প্রচেষ্টা

১৯৮৮ সালের বন্যার সময় পৃথিবীর আরো অনেক দেশের ন্যায় ভারত সরকারও 'বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ' সামরিক হেলিকপ্টার প্রেরণ করে ত্রাণ কাজে সহায়তাদানের জন্য। কিন্তু অন্যকোন দেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ না উঠলেও ভারতীয় হেলিকপ্টারগুলোর গতিবিধি নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ করা হয় ভারতীয় হেলিকপ্টারগুলো একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার পথে সোজা না গিয়ে ঘোরাপথে বিভিন্ন কে পি আই (Key Point Installation) বা অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ছবি সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। এনিয়ে ভারতীয় পাইলটদের সাথে ঢাকাস্থ এয়ারফোর্স মেসে বাংলাদেশী অফিসারদের বাক বিতন্ডাও হয়। একপর্যায়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠলে ভারতীয় হাইকমিশনার বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত না করেই তেজগাঁ বিমান বন্দরে এসে ভারতীয় হেলিকপ্টারগুলো ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

এরশাদ সরকারের মন্ত্রীসহ অনেকেরই 'র'-এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ

১৯৯৩ সালে জে. এরশাদ মন্ত্রিসভার একজন প্রাক্তন সদস্যসহ দশজনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গ্রেপ্তার করে। এদের বিরুদ্ধে 'র'-এর পক্ষে একটি 'স্পাই রিং' পরিচালনা করার অভিযোগ আনা হয়। এব্যাপারে ১৫ আগস্ট '৯৩ সংখ্যা 'দি নিউ নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদক তপন খানের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এরশাদ সরকারের একজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব নুরুজ্জামানকে 'র' ১৯৮৩ সালে এজেন্ট হিসেবে রিক্রুট করে। "10 including former Minister, held as RAW men" শিরোনামের ঐ রিপোর্ট মতে, অভিযুক্ত নুরুজ্জামানের নেতৃত্বে '৮৩ সাল থেকে 'র'-একটি স্পাই চক্র গড়ে তোলে যারা বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ছদ্মাবরণে তাদের গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করে আসছিল। এই গ্রুপটির সাথে 'র' ও প্রতিবেশী ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথেও এ চক্রটি সখ্যতা গড়ে তোলে। সরকারী এসব কর্মকর্তার সহায়তায় এই চক্রটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন তথ্য সংগ্রহ ও পাচারে সক্ষম হয়। একপর্যায়ে 'র' কর্মকর্তার কাছে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদফতরের অতি গোপনীয় জরীপ সংক্রান্ত তথ্যাবলী পাচারের

২০। সাপ্তাহিক নগরী, ১-৭ নভেম্বর '৮৮ সংখ্যা

অভিযোগে নুরুজ্জামানের সহযোগী জাকির হোসেন খানকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

এব্যাপারে আরো একটি দৈনিকে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। দৈনিক ইনকিলাব-এর ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সংখ্যায় "ভারতে গোপন দলিল পাচারের চাঞ্চল্যকর নেপথ্য কাহিনী" শিরোনামে সাকির আহমদ উল্লেখ করেন, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কারা ভারত বিদ্বেষী, তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী এবং দেশের মাটির নীচে খনিজ সম্পদ, গ্যাসের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য ভারত কি কারণে সংগ্রহ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে এই প্রশ্ন জনমনে দেখা দিয়েছে। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বড় ধরনের টোপ গিলিয়ে বাংলাদেশী দু'জন নাগরিকের মাধ্যমে এসব কর্মকাণ্ড শুরু করে। সাবেক সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব 'র-এর এদেশীয় এজেন্ট হিসেবে দেশের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে–এমন সব গোপন দলিল ভারতে পাচার করে দিয়েছে। 'র'-এর ছড়ানো টাকার কাছে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ফাঁস করে দেয়ার সাথে সাবেক মন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব জড়িত রয়েছে। টাকা ও পিএইচডি ডিগ্রীর টোপ ছেড়ে 'র' তার জালে টেনে নেয় ভূ-তত্ত্ব জরিপ পরিদফতরের উপ-পরিচালককে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, এরশাদ সরকারের প্রভাবশালী জনৈক মন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব মোঃ নুরুজ্জামান মুন্না ভারতীয় ব্যবসা লাভের জন্য ১৯৮৬ সাল থেকেই 'র'-এর এদেশীয় এজেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করে। এই কাজে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূ-তত্ত্ব জরিপ পরিদফতরের উপ-পরিচালক সিকদার মোঃ হাবিবুর রহমানকে নগদ অর্থ ও পিএইচডি ডিগ্রী পাইয়ে দেয়ার লোভ দেখিয়ে 'র'-এর জালে টেনে নেয়। গোয়েন্দা সংস্থা 'র' দীর্ঘ ৭ বছর পর মুন্না ও হাবিবের কাছ থেকে এ সম্পর্কিত একটি দলিল হাতিয়ে নিয়ে যায়।

রমনা থানাধীন ২/১১, ময়মনসিংহ রোড, পরীবাগস্থ ট্রেড ইম্পেক্স মার্কেন্টাইল লিমিটেড-এর মালিক মোঃ নূরুজ্জামান মুন্না সম্পর্কে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার একটি সূত্র জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে সে তাদের কাছে সবকিছু স্বীকার করেছে। এরশাদ সরকারের সময় ১৯৮৩ সালে নতুন বাংলা যুব সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে নূরুজ্জামান যোগদান করে। পরে ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতির পদটি লাভ করে। এই পথ ধরেই জাতীয় পার্টির বিভিন্ন নেতার সান্নিধ্যে এসে রাজধানীতে নিজের আসন করে নেয়। সূত্রটি সাবেক প্রভাবশালী মন্ত্রীর নাম উল্লেখ না করে জানায়, মন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হিসেবে কাজ করার সময় নূরুজ্জামান ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর এদেশীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করে। ১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে একদিন সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনের রাস্তায় নুরুজ্জামানের সাথে 'র'-এর ভারতীয় প্রতিনিধির পরিচয় ঘটে। পরিচয় ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলে 'র'-এর অপর একজন সদস্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে প্রথম সদস্য ভারতে ফিরে যায়।

নুরুজ্জামান জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে যে, 'র'-এর দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে পরিচয় হওয়ার পর তাকে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ভবিষ্যৎ কি হতে পারে এবং কারা ভারত বিদ্বেষী ও বিদ্বেষী নয় সে সম্পর্কে তথ্য দিতে হত। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে ভারতে চলে গেলেও তার সাথে নুরুজ্জামান চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ রেখেছিল। সূত্র জানায়, ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে 'র'-এর তৃতীয় প্রতিনিধি ঢাকায় এসে নুরুজ্জামানকে ডেকে দ্রুত কাজ করার নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখে দেয়া ছাড়াও সেগুলো প্রায়ই নুরুজ্জামান তার নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ফ্যাক্সের মাধ্যমে ভারতে পাঠিয়ে দিত। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ আগাম পাচার করার সময় বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ গ্যাস সম্পর্কিত গোপন দলিল নিয়ে 'র'-এর প্রতিনিধির সাথে তার কথাবার্তা হয়।

ভারতীয় বড় বড় ব্যবসা পাইয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিলে নুরুজ্জামান দলিল পাচার করতে রাজি হয়ে পড়ে। সে এই কাজের জন্য তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এস এম হাবিবুর রহমানের সাথে 'র'-এর প্রতিনিধির পরিচয় করিয়ে দিয়ে বন্ধুকে বিনিময়ে কি দেয়া হবে জানতে চায়। সূত্র জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে নুরুজ্জামান বলেছে, তার কথা শুনে হাবিবুরকে নগদ টাকা ও ভারত থেকে পিএইচডি ডিগ্রী দেয়ার প্রস্তাব দিলে তারা দলিল পাচারে রাজি হয়।

গত বছর হাবিবুর রহমান পরিবার নিয়ে ভারতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নুরুজ্জামান সব ব্যবস্থা করে দেয়। সেপ্টেম্বর মাসে ভিসা নিয়ে ভারতে গিয়ে দু'মাস পর ফিরে এসেই হাবিবুর 'র'-এর প্রতিনিধির সাথে বৈঠক করে। বৈঠকটি সন্ধ্যার পর নুরুজ্জামানের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হয়েছিল। বৈঠকে গ্যাস সম্পর্কিত দলিল পাচারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৩ জনই নিয়েছিল। সূত্র জানায়, ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে হাবিবুর রহমান বাংলাদেশে মোট কতটি গ্যাস ফিল্ড রয়েছে, ক'টি থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে এবং গ্যাসের মওজুদসহ কতদিন চলবে তার একটি পরিসংখ্যান (১৯৯২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত) নুরুজ্জামানের কাছে পৌঁছে দেয় বলে নুরুজ্জামান স্বীকার করেছে।

নুরুজ্জামান জিজ্ঞাসাবাদে আরো বলেছে, তার বন্ধুর দেয়া দেশের গোপন দলিলের ফটোকপি গত মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যবর্তী সময়ে 'র'-এর প্রতিনিধির কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। গোপন দলিল পাচারের নিশ্চয়তা দেয়ার পরই নুরুজ্জামান প্রথম উপহার হিসেবে হিন্দুস্থান ফটো ফিল্মের বাংলাদেশীয় প্রতিনিধিত্ব লাভ করে। গ্যাস সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের ফটোকপি হস্তান্তরের দু'দিন পর 'র'-এর প্রতিনিধি ঐ কাগজ নিয়ে ভারতে চলে যায়। যাবার সময় নুরুজ্জামান ও হাবিবুরকে বলে যায়, গ্যাস সম্পর্কিত সমুদয় দলিল ছাড়াও কয়লা ও তেলের ব্যাপারে দলিলপত্র দিতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতার ফলে ভারত থেকে নুরুজ্জামানের বিভিন্ন

ব্যবসা পাওয়ার স্বপ্ন এবং তার বন্ধু হাবিবুরকে পিএইচডি ডিগ্রীসহ নগদ অর্থের টোপ ভেস্তে গেছে।

সূত্র জানায়, নুরুজ্জামান জিজ্ঞাসাবাদে আরো স্বীকার করেছে যে, বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তির কাছ থেকে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার আগাম খবর সংগ্রহ করে নুরুজ্জামান তার নিজের ফ্যাক্সের মাধ্যমে ভারতে পাচার করেছে। হাবিবুর রহমানকে আদালতে হাজির করার পর আদালত প্রাঙ্গণেই একজন আলোচিত্র সাংবাদিককে আঘাত করে ক্যামেরা ড্রেনে ফেলে দেয়ার মত দুঃসাহস দেখিয়েছে। সূত্র মতে, এই দু'জনের পেছনে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নেপথ্য ইন্ধন রয়েছে। আর এই ইন্ধনের ফলেই তারা দেশের চরম ক্ষতি করেও সাংবাদিককে পেশাগত দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখার জন্য হাত উঠানোর মত দুঃসাহস দেছিয়েছে।

পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ সিটি শাখার অপারেশন স্কোয়াড ও অন্য দু'টি গোয়েন্দা সংস্থা নুরুজ্জামানের জবানবন্দী পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা করছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সাথে আতাত করে দলিল পাচারে নুরুজ্জামান ও হাবিবুরের পেছনে ইন্ধনদানকারীরা গা ঢাকা দিয়েছে। এদেরকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশসহ গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে সূত্র জানায়।"

এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করায় 'র'-এর গ্রীন সিগন্যাল

১৯৯০ সালে 'র' স্থির নিশ্চিত হয়ে যায় যে, জে. এরশাদের গৃহিত পদক্ষেপসমূহ ও তাঁর অনুসৃত নীতিমালা ভারতের স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষা করছে না। বিশেষ করে '৯০ সালে ইরাক যখন কুয়েত দখল করে নেয় তখন জে. এরশাদ ভারতের সাথে '২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি'র বন্ধন অস্বীকার করে জাতিসংঘ বাহিনীতে সৈন্য প্রেরণ করেন। জে. এরশাদের বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ আনা হলেও এই একটিমাত্র কারণেই এদেশবাসী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কারণ, জে. এরশাদ জাতিসংঘ বাহিনীতে সৈন্য পাঠিয়ে বিশ্বকে পরোক্ষভাবে একথাই জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ এবং এদেশ ভারতের চাপকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা রাখে। দ্বিতীয়তঃ ছোট্ট দেশ কুয়েত দখলের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ বাংলাদেশ ইরাক বিরোধী জোটে অংশগ্রহণ করার অর্থ হলো-আমাদের দেশটিও ছোট, যদি কখনো ভারত একে গ্রাস করতে চায় তাহলে এদেশের জনগণ বিশ্বকে বলতে পারবে-আমরা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সহায়তা করেছি। এখন আমাদের পাশে এসে দাঁড়াও। এছাড়া এ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যে মর্যাদা লাভ করে তা কোনভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। মূলতঃ এ ঘটনায় ভারত তার আধিপত্যবাদী মনোভাব থেকে জে. এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার গ্রীন সিগন্যাল প্রদান করে।

পাকিস্তানের সাথে সামরিক সম্পর্ক ও পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা জে. এরশাদের বিরূদ্ধে 'র'-কে ক্ষিপ্ত করে তোলে

যদিও এব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কোন তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব নয় কিন্তু

দু'য়েকটি পত্র পত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, জে. এরশাদ তাঁর শাসনামলের শেষদিকে পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে পারমাণবিক বোমা বানাতে না পারলেও তিনি পাকিস্তানের কাছ থেকে পারমাণবিক ছত্রছায়া পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। এব্যাপারে ভারতীয় 'সানডে' পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, "…. মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানের পরমাণু বোমার দিকে আকৃষ্ট হবে। ….. বলা হচ্ছে চারটি দেশ আছে। সউদী আরব, সংযুক্ত আরব আমীরাত, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ। এদের সাথে এককভাবে পাকিস্তানের সরাসরি সামরিক সম্পর্ক রয়েছে। সময় ও সুযোগ মতো পাকিস্তান এদের অথবা অন্য কোন দেশকে পারমাণবিক ছাত্রছায়া দিতে পারবে।"[২১] এছাড়া নব্বই দশকের শুরুতেও প্রকাশ্যে এমন কিছু আভাস পাওয়া গিয়েছিল যে, জে. এরশাদ হয়তো পাকিস্তানের সহায়তায় পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহের গোপন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। নব্বই দশকের শুরুতে 'উন্নয়ন প্রক্রিয়াঃ রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা গতিধারা' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের তদানীন্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "বাংলাদেশ ছোট দেশগুলোর আস্থা অর্জন করেছে। সতর্ক ও পরিকল্পিত পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাহায্য সহায়তায় ১৯৯৫-এর মধ্যে পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এর মধ্যে ভারতের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে।"[২২]

একথা স্বভাবতই ধরে নেয়া যায় ভারত কখনোই তার পশ্চিমে পাকিস্তানের পাশাপাশি পূর্বে বাংলাদেশের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র মজুদ থাকার ব্যাপারটি মেনে নিতে পারে না। এবং একারণেই ভারত যেকোনভাবেই হোক সে ধরনের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিতে চাইবে। জে. এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে একটি পছন্দনীয় দলকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে '৯০-'৯১ সালে ভারত সে লক্ষ্যেই এগিয়ে গিয়েছিল। যদিও '৯১-এর সংসদ নির্বাচনের ফলাফল তার সে প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।

এদিকে জে. এরশাদ পাকিস্তানের সহায়তায় শুধুমাত্র 'পারমাণবিক ছত্রছায়া' অর্জনের চেষ্টাই করেননি বরং তিনি ১৯৯০ সালের শেষদিকে পাকিস্তান থেকে ৪০টি এফ-৬ জঙ্গী বিমান সংগ্রহেও সফল হয়েছিলেন। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো যখন বাংলাদেশ ভারতীয় প্রভাবকে নিউট্রালাইজ করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের সাথে সামরিক সম্পর্ক জোরদার করছিল ঠিক তখনি ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় অভিযোগ করা হতে থাকে যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা রোহিঙ্গাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো তখন ঠিক একইসাথে একইরূপ অভিযোগ করেছিলেন আ'লীগের কতিপয় নেতা নেত্রী। এছাড়া এসময় থেকেই ভারত প্রথমবারের মতো উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কথিত সহায়তা প্রদানে ডি জি এফ আই ও

২১। দৈনিক ইনকিলাব, ০১/০৫/৯৩ সংখ্যা

২২। মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, *বাংলাদেশঃ প্রতিরোধের রূপরেখা ও রণনীতির সন্ধানে*, পৃ. ২৫

আই এস আই-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে।

যাহোক, ১৯৯০ সালে 'র' বাংলাদেশে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। বাংলাদেশে একটি ভারতপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠাই ছিল এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। এব্যাপারে সেসময় পত্র-পত্রিকাতে বেশ ক'টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এখানে এরকম দু'টি রিপোর্ট পত্রস্থ করা হলো ঃ

(ক) রাজীব পরবর্তী 'র'-এর কাণ্ড

উপরোক্ত শিরোনামে দৈনিক মিল্লাতের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "ভারত বাংলাদেশ পঁচিশ বছর চুক্তির অনুবর্তী সরকার গঠনের লক্ষ্যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও সংকটকে কাজে লাগিয়ে একটি পুতুল সরকার কায়েম করতে চায় বলে জানা গেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা মনে করে বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধীদের দমন করার জন্য প্রয়োজন 'মদদপুষ্ট' একটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা গ্রহণ। কারণ এ ধরনের একটি বশংবদ দলের মাধ্যমেই তারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয় বরং সার্কভুক্ত ভারত বিরোধী প্রতিটি দেশেই এ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। নেপালে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সরকারের আন্দোলন কার্যতঃ তাদেরই বিজয়। কারণ সার্কভূক্ত একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও নেপাল ভারত বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছিল। এমনকি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কোন তোয়াক্কা না করেই নেপাল সরকার চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে প্রয়াসী হয়েছিল। নেপালে তাদের এ বিজয়ের পর সংস্থার আশু টার্গেট হচ্ছে বাংলাদেশ। তারা চায় বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে বিবদমান বিষয়সমূহ নিয়ে সময় ক্ষেপণ করতে এবং একটি সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষা করতে। এমনকি ভারতের বর্তমান সরকারের একজন মন্ত্রী সম্প্রতি বাংলাদেশের সাথে ভারতের সুসম্পর্কের কথা বলায় ভারতীয় গোয়েন্দা ও আমলারা তা সুনজরে দেখেননি। ফলতঃ ভারতের সাথে বাংলাদেশের বিবদমান তিনবিঘা করিডোর, গঙ্গার পানি বন্টন সমস্যা ও শান্তিবাহিনীর সমস্যার কোন সমাধানই হয়নি এবং কোন উদ্যোগও ভারতীয় পক্ষ এই কারণে এখনো গ্রহণ করেনি। সমস্যা জিইয়ে রাখার জন্য ইতিমধ্যে ভারতীয় পক্ষ নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে। গঙ্গার পানি বন্টনের ক্ষেত্রে দিল্লী পশ্চিমবঙ্গকে এই ইস্যুর সাথে যুক্ত করেছে। এ থেকে দৃশ্যতঃ মনে হয়েছে যে, পশ্চিমবাংলা যেন একটি আলাদা রাষ্ট্র। এছাড়াও তিনবিঘা সমস্যার সমাধান না করে তা আরও দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে। অন্যদিকে শান্তিবাহিনী সমস্যার মুখরক্ষা সমাধানের তোড়জোড় দেখালেও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদদ প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ইতিমধ্যে 'র'-এর মদদপুষ্ট বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতের মুখচেনা প্রচার মাধ্যমগুলো এই মর্মে প্রচার চালাচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের তুষ্ট করার জন্যে বাংলাদেশের গৃহীত স্বায়ত্বশাসন কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি যে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে ক্রমান্বয়ে

এগুচ্ছে তা একাধিক আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহল ইতিমধ্যেই আভাস দিয়েছে।

বর্তমানে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনাকে অন্তর্ঘাতমূলক কৌশল দ্বারা মোকাবেলার জন্য সংস্থাটি পাকিস্তানের সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে নতুন করে পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ইতিমধ্যেই ভারতের জনৈক নেতা বলেছেন যে, ভারত সরকারের উচিত হবে সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের সমস্যা তুলে ধরা। অবশ্য পাকিস্তানের করাচীতে দীর্ঘদিন থেকেই সমস্যা চলছে।

শ্রীলংকায় সৃষ্ট চক্রান্তের জাল থেকে এখনো শ্রীলংকাও পূর্ণ মুক্তি পায়নি। অর্থাৎ ভারতের চারপাশের রাষ্ট্রসমূহে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অপতৎপরতা এখন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, রাজীব সরকারের পতনের পর 'র'-এর দর্প অনেকাংশে খর্ব হবে বলে মনে করা হলেও সর্বশেষে পরিস্থিতির মূল্যায়নে উক্ত ধারণা অমূলক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।"[২৩]

(খ) দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কালো থাবা

বাংলাদেশে প্রো-ইণ্ডিয়ান সরকার প্রতিষ্ঠায় 'র' গভীর চক্রান্তে লিপ্ত

১৯৯০ সালে 'র' কিভাবে মরিয়া হয়ে এদেশে একটি ভারতপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাবে বলা হয়, "আর দেরী নয় যত শীঘ্র সম্ভব বাংলাদেশে একটি প্রো-ইণ্ডিয়ান সরকার খাড়া হোক–এই প্রত্যাশায় ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে তারা এ লক্ষ্যে কিছুটা এগুতে সক্ষম হয়েছে বলেও আত্মতৃপ্তির আমেজ অনুভব করছে। তাদের ধারণা, বাংলাদেশে কৌশলে একটা তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই পরবর্তীতে ধাপে ধাপে সিকিমের ন্যায় বিনা যুদ্ধে কেল্লা ফতে করা সম্ভব হবে। রিসার্চ এণ্ড অ্যানালাইসিস উইং অর্থাৎ সংক্ষেপে 'র' নামে পরিচিত এই সংস্থাটির মাধ্যমে ভারতের গতায়ু কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠী উপমহাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এতকাল মস্তানীসুলভ মোড়লীপনা ফলানোর পাশাপাশি বহু অঘটন সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে। উদ্দেশ্য, ঐ অঞ্চলের দেশগুলো গায়ে-গতরে বড় দেশ হিসেবে ভারতকে মোড়ল মেনে হর-হামেশা ষষ্টাঙ্গে প্রণাম করুক। যারা মোড়ল মানতে চায়নি তাদেরকে 'বেয়াদবির উচিত শিক্ষা' দেয়ার জন্য ঘরের শত্রু বিভীষণদের দ্বারা শান্টিং দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। একই কায়দায় সিকিমে একটি প্রো-ইণ্ডিয়ান পুতুল সরকার দাঁড় করানোর পর ওরা নিজেরাই পার্লামেন্টে ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়েছে।

ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে পারদর্শী 'র' শ্রীলংকায় এ ধরনের জাল ফেলতে গিয়ে অবশ্য টাইগারদের কবলে পড়ে শেষমেষ কোন রকমে পালিয়ে বাঁচতে সক্ষম হয়েছে। পাকিস্তানের সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানেও মাঝে মাঝে জাল ফেলে, যদিও এখন পর্যন্ত দড়ি টেনে মাছ তো দূরের কথা, জালই ফেরত মেলেনি। ইতিমধ্যে 'মাছ' মিলেছে নেপালে। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, ভারতের আধিপত্যবাদী চরিত্রের কঠোর সমালোচক

২৩। দৈনিক মিল্লাত ২৪/০৪/৯০

নেপালের স্বাধীনচেতা রাজা বীরেন্দ্রর বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের কথিত বিজয় মূলত ঃ ভারতেরই সাফল্য। এটা সবার জানা কথা যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরক্ষণেই বাহাত্তরের ১৯ মার্চ ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয় ২৫ বছরী ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি, যাতে পারস্পরিক সহযোগিতার নামে বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা অনেকটা লোপ পায়। তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকার এটিকে 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি' নামে প্রচার করলেও রাজনীতিক মহল একে অধীনতামূলক মৈত্রী বা 'দাসখত চুক্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। যা-ই হোক '৭৫-এর আগস্টের পটপরিবর্তন ও মুজিব হত্যাকে 'র' এক বিরাট পরাজয় ও ব্যর্থতা বলে মনে করে। সেই থেকে 'র' কিছুদিনের জন্য কচ্ছপের মত মাথা গুটিয়ে নিলেও আস্তে আস্তে পুনরায় কাজ শুরু করে এবং সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, নেপালে রাজতন্ত্র খতমের 'জনপ্রিয়' শ্লোগানের ছদ্মাবরণে প্রো-ইণ্ডিয়ান গণতন্ত্র রোপনের কাজ সারা হলেই 'র'-এর পরবর্তী সম্ভাব্য টার্গেট হচ্ছে বাংলাদেশ।

ভারতীয় সংবিধানের চার মূলনীতিতে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ হচ্ছে বাংলাদেশের ভারতপন্থী বা প্রো-ইণ্ডিয়ান দলগুলোর মধ্যে 'র'-এর নিকট সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। 'র'-এর 'ওম' ও অর্থবহ পৃষ্ঠপোষকতায় দলটি '৭৫-এর ল্যাজেগোবরে দশা কাটিয়ে সময়ের ব্যবধানে ইতিমধ্যে বেশ মোটাতাজা হয়ে উঠেছে।

ভারতের ক্ষমতাসীন নয়া সরকার বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের কথা বললেও 'র' তাদেরকে বাংলাদেশে একটি পুতুল সরকার গঠনের 'প্রয়োজনীয়তা' উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

'র'-এর একথাও জানা আছে যে, ২৫ বছরী ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির মেয়াদ ১৯৯৭ সালে শেষ হয়ে যাবার আগেই পুতুল সরকার বসানোর কাজ সেরে ঐ চুক্তি জিন্দা করে নিতে হবে। এ কারণেই ভারতের নতুন সরকার তিন বিঘা হস্তান্তর, শান্তিবাহিনী সমস্যা সমাধান ও ফারাক্কায় পানি বন্টনের স্থায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নিয়েও আবার ফেলে রেখেছে। তারা চায়, ওগুলো পুতুল সরকারের মাধ্যমে করিয়ে তাদেরকে 'জনপ্রিয়' বানিয়ে সেই ফাঁকে কাজ বাগিয়ে ফেলবে।

সাম্প্রতিক উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অনেকগুলো সীট পেয়ে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করেছে। নির্বাচন সম্পর্কে বিএনপি'র সিদ্ধান্তহীনতা এবং জাতীয় পার্টির অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও এই দলে লুক্কায়িত আওয়ামী লীগারদের নানাবিধ সহযোগিতা আওয়ামী লীগের জন্য এই সাফল্য বয়ে এনেছে। ফলে, আওয়ামী লীগের এখন এই ধারণা জন্মেছে যে, আসন্ন সংসদ নির্বাচনে তারা অতি সহজেই দেড় শতাধিক আসন পেয়ে যাবে। তাছাড়া সংখ্যালঘু ভোট ও টাকা যে বাংলাদেশের নির্বাচনে বিরাট একটা ফ্যাক্টর তা তো ওপেন সিক্রেট ব্যাপার। সঙ্গত কারণেই আওয়ামী লীগের জন্য এদুটো আশীর্বাদ মওজুদ রয়েছে। উপজেলা নির্বাচনের পর দেশে মোটমুটি নির্বাচনী পরিবেশ তৈরী হয়ে গেছে। আন্দোলনে বিএনপি'র লাভ। তাই আওয়ামী লীগ চায়, আন্দোলনের পরিবর্তে নির্বাচনী পরিবেশ ধরে রাখতে। দলটির গত বর্ধিত সভায় নির্বাচনের পক্ষে

জোরালো বক্তব্য রাখা হয় এবং এ ব্যাপারে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শেখ হাসিনার উপর অর্পণ করা হয়। এছাড়া সম্প্রতি সিমিটার তেলচুক্তি প্রশ্নে বিপন্ন ডঃ কামাল হোসেন ও তার গ্রুপকে বর্ধিত সভায় সহযোগিতার পরিবর্তে একেবারে শুইয়ে দিয়ে 'নিষ্কন্টক' ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কারণ ডঃ কমাল, আব্দুল মান্নান প্রমুখ নেতা আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে 'র'-এর চক্রান্তবিরোধী মহল হিসেবে পরিচিত। আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতিস্বরূপ আওয়ামী লীগ দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সরকার ও অন্যান্য বিষয়ে কঠোর সমালোচনায় উঠেপড়ে লেগেছে। তাছাড়া ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসও সরকারের স্থিতিশলীতা এবং আইন-শৃংখলা প্রশ্নে জনমনে নানাভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কৌশল অবলম্বন করেছে বলে জানা গেছে। কয়েক মাস আগে ভারতীয় কূটনীতিকরা গোপনে মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ গিয়ে কিছু লোকের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক ও রাত্রিযাপন করেন। গত বৃহস্পতিবারও রাজশাহীতে ভারতীয় দূতাবাসের একজন কূটনীতিকের রহস্যজনক তৎপরতার কথা জানা যায়। এদিকে, ভারতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতে বাংলাদেশে কল্পিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের বানোয়াট খবর অনবরত প্রচার করা হচ্ছে। পার্বত্য জেলাগুলোতে পরিস্থিতির উন্নতি সত্ত্বেও ভারত শান্তিবাহিনীকে প্রশ্রয় দিয়ে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের ইন্ধন যোগাচ্ছে। এছাড়া কথিত বঙ্গভূমি ষড়যন্ত্র জিইয়ে রেখে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ও ব্যাপক অপপ্রচারের নেপথ্য ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ভারতীয় ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'অনুকূল ক্ষেত্র' সৃষ্টিই যে এসব প্রচার ও কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্য তা সচেতন দেশপ্রেমিক জনগণের বুঝতে মোটেই কষ্ট হবার কথা নয়। ফলে 'র' যতই ক্ষেত্র প্রস্তুত করুক তা এ দেশের সচেতন জনগণের দুর্জয় প্রতিরোধের মুখে ভেসে যেতে বাধ্য-অতীতের ইতিহাস অন্তত তা-ই প্রমাণ করে।"[২৪]

বাংলাদেশে 'র'-এর ৬০,০০০ এজেন্ট রয়েছে

জে. এরশাদ শাসনামলে জাতীয় সংসদের অন্যতম বিরোধী দলীয় সদস্য জাসদের জনাব আ.স.ম. আব্দুর রব সংসদের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে বলেন, বাংলাদেশে ভারতের ৬০,০০০ এজেন্ট রয়েছে।

কাল্পনিক সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ তোলেন শেখ হাসিনা

১৯৮৭ সালে ভারতে ঈদের ছুটি কাটাতে গিয়ে শেখ হাসিনা কলকাতা বিমান বন্দরে ভারতীয় সাংবাদিকদের একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। সেখানে তিনি বলেন, "বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নেই। সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে।"[২৫] এছাড়া চাকমাদের সম্পর্কেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য করে বলেন, "চলছে অত্যাচার। বাধ্য হয়ে চাকমারা আশ্রয় নিচ্ছে ভারতে।"[২৬] এছাড়া ঐ একই তারিখের

২৪। দৈনিক ইনকিলাব, ০৫/০৫/৯০

২৫। দৈনিক যুগান্তর, কলকাতা ০৪-০৬-৮৭ সংখ্যা

২৬। দৈনিক আদালত, কলকাতা ০৪-০৭-৮৭ সংখ্যা

ইংরেজী দৈনিক 'দি স্টেটসম্যানে'ও শেখ হাসিনার কথার সূত্র ধরে "Ershad accused of persecution' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। শেখ হাসিনার এসব কথিত অভিযোগের বহু পূর্বে থেকেই ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে আসছিল। কিন্তু বাংলাদেশের একজন প্রভাবশালী নেত্রীর কথায় ভারতের সে অভিযোগ যেন অনেকটা ভিত্তি পেয়ে যায়। আমরা তো নয়, তোমাদের লোকই বলছে তোমরা সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করছো–এভাবেই যুক্তি দাঁড় করাতে সক্ষম হয় ভারত। 'র' যে উদ্দেশ্য নিয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্লট তৈরী করে আ'লীগ নেত্রী সে প্লটেরই স্বপক্ষে এভাবে দাঁড়িয়ে যান।

গারোল্যান্ড আন্দোলন

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গভূমি আন্দোলন উস্কে দিয়েও 'র' বাংলাদেশ বিরোধী চক্রান্ত থেকে বিরত হয়নি। বরং বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আরেকটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সৃষ্টিতে 'র' ১৯৮৮-'৮৯ সালে প্রত্যক্ষভাবে ইন্ধন জোগায়। এক্ষেত্রে 'র'-এর লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে খন্ড বিখন্ড করে দেয়া অথবা তা করতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশকে অব্যাহত চাপের মুখে রাখা যাতে সে বাধ্য হয়ে ভারতের কাছে মাথা নোয়ায়। এলক্ষ্যে ১৯৮৮ সালের শেষদিক হতে বিভিন্ন ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় হঠাৎ করে ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারোদের 'অধিকার' নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকে। গারো উপজাতীয়দেরকে নিয়ে 'গারোল্যান্ড' নামে একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন কিংবা স্বায়ত্তশাসনের নামে কথিত এই আন্দোলনের উস্কানী দিয়ে সে সময় ভারতীয় পত্রিকায় শুধু রিপোর্ট প্রকাশই নয় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লিফলেটও ছড়ানো হয়।

এদিকে 'গারোল্যান্ড' নিয়ে ৭-২-৮৯ তারিখে ভারতের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় 'বাংলাদেশে গারোরা আলাদা আবাসভূমি চায়' শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এস. গুরুদেব নামের জনৈক সাংবাদিক উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, "উত্তর ময়মনসিংহের আদিবাসী গারো এবং হাজং, কুচ, বনাই, সাওতালসহ অন্যান্য উপজাতীয়রা তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে একটি আলাদা আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে যাচ্ছে।" এরশাদ সরকার কর্তৃক সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর পরই এ আন্দোলন জোরদার হয় বলে প্রতিবেদক উল্লেখ করেন। এস. গুরুদেব আরো অভিযোগ করেন যে, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও উপজাতীয় নারীদের জোর করে ধর্মান্তরিত করাসহ তাদেরকে অপহরণ পর্যন্ত করা হচ্ছে। এমনকি উপজাতীয়দের হাজার হাজার একর জমি বাংলাদেশ সরকার শত্রুসম্পত্তি আইনে অধিগ্রহণ করেছে বলেও স্টেটসম্যানে অভিযোগ করা হয়। তবে একই সাথে উক্ত প্রতিবেদন থেকে এটাও জানা যায় যে, সীমান্তের গারো পার্বত্য এলাকা থেকেই 'গারোল্যান্ড' আন্দোলনের প্রত্যক্ষ উস্কানী দেয়া হচ্ছে। ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী (কংগ্রেস-ইন্দিরা) পি. স্যাংমা (P. Sangma) প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে এক পত্রে বিষয়টি নিয়ে ইতিবাচক সহযোগিতা দানের আহ্বান

জানিয়েছেন বলে উক্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।

'গারোল্যান্ড' আন্দোলন যে 'র'-এর পরিকল্পনায় সূচিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। সে সময় যে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এনিয়ে মাতামাতি করা হয় সেই পত্রিকাটিও 'র'-এর ক্রীড়নক একটি পত্রিকা বৈ কিছুই নয়। এদিকে কথিত 'গারোল্যান্ড' আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৮৯ সালে ঢাকার একটি পত্রিকায় লেখা হয়, "অতীত ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, আজকের কথিত 'গারোল্যান্ড' আন্দোলনের জন্ম হয় ১৯৪৭ সালে। এ সময় কমিউনিষ্ট পার্টি বাংলাদেশ-এর সাবেক প্রধান মনি সিং-এর নেতৃত্বে 'আদিস্তান' নামক একটি আন্দোলন শুরু করা হয়। কিন্তু তৎকালীন সরকার কঠোর হস্তে এ আন্দোলন দমন করেন।

১৯৫০ সালে আবার দেখা দেয় হাজং বিদ্রোহ। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর অনেকে চলে যায় ভারতে। সেই সময় ভারতে চলে যাওয়া উপজাতীয়দের সাথে আজকের কথিত 'গারোল্যান্ড' আন্দোলনের একটা সংযোগ রয়েছে বলে জানা যায়। বর্তমানে আবার জনৈক সুরেন্দ্র সাধু 'আদিস্তান' আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে একটি সূত্র থেকে জানা যায়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন 'কাদেরিয়া বাহিনীর' সদস্যরাও নাকি এখন 'গারোল্যান্ড' আন্দোলনে প্রত্যক্ষ মদদ যোগাচ্ছে। ভারতীয় মহল থেকে প্রচার চালানো হচ্ছে যে, বর্তমানে প্রায় এক হাজার উপজাতীয় যুবক ভারতের মেঘালয়ে গিয়েছে ট্রেনিং এর জন্য। মেঘালয় রাজ্য সরকার তাদেরকে নাকি প্রশিক্ষণে সংযোগিতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সাহায্য করছে বলে একটি সূত্র থেকে জানা যায়।

এদিকে নেত্রকোনা, মোমেনশাহী, শেরপুর, জামালপুর ও কিশোরগঞ্জে কর্মরত খৃষ্টান মিশনারী সংস্থাগুলোও 'গারোল্যান্ড' আন্দোলনে মদদ যোগচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন এলাকার অধিবাসীদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, বাস্তবে কথিত 'গারোল্যান্ড' আন্দোলনের কোন অস্তিত্ব তাদের জানা নেই, তবে ভারতের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম থেকে এ ধরনের একটি আন্দোলনের কথা তারা জানতে পেরেছে। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায় ময়মনসিংহের আদিবাসী গারোদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সৃষ্টির জন্য ভারত বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। ভারতের মেঘালয় রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেও অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।"

'র'-বিবিসি কানেকশনঃ বাংলাদেশকে ভারতের সাথে মিশে যাবার উপদেশ

বিবিসি ভারতের কোন সংবাদ মাধ্যম নয়। কিন্তু তারপরও এই উপমাহাদেশের কোন ইস্যু নিয়ে যখন বিবিসি খবর প্রচার করে তখন কোন এক রহস্যময় কারণে সেখানে ভারতমুখীনতাই প্রকাশ পায়। বিশেষ করে বিবিসি'র কলকাতা অফিস থেকে সব

সময়ই সূক্ষ্মভাবে বাংলাদেশ বিরোধী খবর প্রচার করা হয়ে থাকে। ১৯৮৯ সালে এরকম একটি প্রতিবেদন প্রচার করা হয় বিবিসি টেলিভিশনে। উক্ত প্রাতিবেদনে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাপক চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জনগণের করুণ জীবনযাত্রার চালচিত্র ঐ অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে উপসংহারে বলা হয়, বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হলে ভারতের সাথে মিশে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এ 'আহ্বানের' পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা কি খুব অন্যায় হবে যে, 'র'-বিবিসি'কে এব্যাপারে প্রভাবিত করেছে? বা বিবিসি'র ভারতস্থ (ইন্ডিয়ান) সংবাদদাতাদের সাথে 'র'-এর যোগাযোগ নেই?



তসলিমা নাসরিনের লেখা 'লজ্জা'র পক্ষে ভারতীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি'র মিছিল - 'সানডে', নভেম্বর-২১-২৭ '৯৩ সংখ্যার সৌজন্যে

বিশৃংখল পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ

৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ তারিখে এরশাদের পতন ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে শুরু করে '৯১-এর সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত 'র' ও তার এদেশীয় এজেন্টরা বেশ ভাল পারফরমেন্স দেখাতে সক্ষম হয়। যদিও ওই সময় 'র'-এর আদর্শিক চালিকা শক্তি 'কংগ্রেস' দিল্লীর মসনদে আসীন ছিল না তবু সে সময়ে কাকতালীয়ভাবে ভারতে কংগ্রেস-বিরোধী কোনো সরকার সরাসরি সরকার পরিচালনায় ছিল না বলে অন্যান্য পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে 'র'কে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তখন ভারতের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর প্রকাশ্যে বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকায় জড়িত হননি ও সে অবস্থা বা ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। কারণ ভিপি সিং-এর সরকারের পতনে ও জনতা দলের দলছুটদের নিয়ে কংগ্রেসের সমর্থনে চন্দ্রশেখর সরকার গঠন করেছিলেন। ভিপি সিং-এর পতন প্রক্রিয়া হতেই ভারতীয় রাজনীতিবিদরা মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে দারুণভাবে ব্যস্ত ছিলেন। "ফলে সাউথ ব্লকের (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) বাংলাদেশ বিষয়ক কর্মকর্তারা তখন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। সেই স্বাধীন মনোভাব তারা প্রকাশ করলেন। সঙ্গে পেলেন 'র'-এর কর্মকর্তাদের। অবশ্য ওই স্বাধীন মনোভাব তাদের নীতির ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ পঁচাত্তর-পরবর্তীতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা তারা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মৌলনীতি ছিল দু'টি- (১) বাংলাদেশে ভারত অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং ভারতের স্বার্থের বাহক দল ও ব্যক্তিদেরকে আনুকূল্য প্রদান এবং (২) প্রথম কৌশল ব্যর্থ হলে বিভিন্ন চাপ ও প্রভাব বিস্তার করে ক্ষমতাসীন সরকারকে নতজানু করানো। যাতে আর্থিক, রাজনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বাঁধা (ভারতের) না হয়ে দাঁড়ায়।"[২৭]

৬ ডিসেম্বর '৯০-২৭ মার্চ '৯১

শেখ হাসিনা ১৯৮৯ সালে লন্ডনে বিশিষ্ট সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের এক পর্যায়ে বলেছিলেন 'ক্ষমতার ৪ আনা ভাগ পাইলেও তিনি ক্ষমতায় যাইতে রাজি আছেন।'[২৮] তখন কোনো অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু '৯০-এর গণ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তিনি ও তাঁর বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা এরশাদ পতনের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু তারা যখন নিশ্চিত হলেন যে, এরশাদের পতনের আর দেরি নেই, তখন মাত্র ৪ আনা ভাগের স্বপ্ন না দেখে আওয়ামী লীগ ১৬ আনা ক্ষমতার মোহে বিভোর হয়ে উঠে।

এরশাদ পতনের পর পর পছন্দনীয় দলটিকে ক্ষমতার মসনদে বসানোর রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য 'র' অপারেটিভ ও এদেশীয় এজেন্টরা বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হয়ে

২৭। শামছুর রহমান, *বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক*, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৩ জুলাই '৯৩

২৮। সাপ্তাহিক সুগন্ধা- সত্যবাকের কলাম ২৫/৭/৮৯

ওঠে, যার মধ্যে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত ঘটনাবলী উল্লেখের দাবি রাখেঃ

১। যেকোনোভাবে জাতীয়তাবাদী শক্তির মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি, অন্য কোনো জাতীয়তাবাদী সংগঠনের কোনো নেতা-কর্মী যাতে বিএনপিতে যোগদান করে বিএনপিকে শক্তিশালী করতে না পারে সে পদক্ষেপ গ্রহণ। এ পর্যায়ে তারা ('র') প্রথমেই দেশজুড়ে তথাকথিত প্রগতিবাদী ও আস্ফালনকারী স্বভাবের রাজনীতিকদের দ্বারা গণদুশমনদের একটির পর একটি তালিকা প্রকাশ করতে থাকে। যখনই যাকে নিজেদের আদর্শের বিরোধিতাকারী বলে মনে হয়েছে তখনই ফটোস্ট্যাট কাগজে গণদুশমনের তালিকায় তার নাম উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যাদের নাম তালিকায় প্রকাশ পায় তাদের অনেকে দোষী হলেও অন্যান্য অনেকের ক্ষেত্রে কোনো বাছ বিচার করা হয়নি। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, এরশাদ আমলে যারা এরশাদের কবিতাকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে পত্রিকায় ছেপেছেন বা টিভি শিল্পী হিসেবে যেসব অতি প্রগতিবাদী এরশাদের কৃপা প্রার্থনায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন তাদের একজনকেও গণদুশমনের তালিকায় স্থান দেয়া হয়নি। টিভির সংবাদ পাঠক হিসেবে পরিচিত এক নাট্যাভিনেতা এবং তার সঙ্গীসাথীরা আপোস মীমাংসার জন্য এরশাদের সঙ্গে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সাক্ষাৎ করেছিলেন, সেই ব্যক্তিকেই এরশাদ পতনের পর পর টিভি পর্দায় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে খবর পড়তে দেখা যায়। অনেকে বলেন যে, তিনি জোর করে সেদিন খবর পড়েছিলেন। মূলত হঠাৎ করে গণদুশমন বানানোর প্রক্রিয়ার লক্ষ্য ছিল, যাতে জাতীয় পার্টির বিপুল সমর্থক ও নেতা-কর্মী বিএনপিতে ফিরে যেতে না পারে। জাতীয় পার্টির সমর্থকরা বিশেষ করে মফস্বল এলাকায় সকলেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তখন এরশাদ পতনের পর জাতীয় পার্টির অবস্থা এমনই ছিল, যাতে অনেকে মনে করেছিলেন জাতীয় পার্টির কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তৎকালীন সময়ে তা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিকও ছিল। এখন এখানে যদি সাধারণ জনগণকে বা গ্রাম পর্যায়ের সহজ-সরল নেতা-কর্মীদের ভয় পাইয়ে 'নিরাপত্তাহীন' পরিবেশে ফেলে দেয়া যায় ও সচেতন সকলের কাছে ঘৃণার পাত্রে পরিণত করা যায়, তখন স্বভাবতই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী জাতীয় পার্টির সমর্থকরা বিএনপি'তে যেতে পারবে না। অর্থাৎ নয় বছরের আন্দোলনে দুর্বল বিএনপি তার পূর্বেকার এক বড় সমর্থক গোষ্ঠীকে হারায় ও তাদের পুনর্গঠিত জাতীয় পার্টিতে জড়ো করার চেষ্টাও ওই অদৃশ্য শক্তি তখন হতে চালিয়ে যায়।

২। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর কর্মীরা আন্দোলনের পরপর এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করলেন যে, সকল পর্যায়ে মনে হতে লাগলো-তারাই একমাত্র এরশাদকে টেনে নামিয়েছেন। তখন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তির সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে কোনো উল্লেখযোগ্য পদচারণা না থাকায়, তারা (বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা) টিভি, রেডিও, পথনাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে '৭৫-পূর্ব দিনগুলোর গুণকীর্তন শুরু করে দেন। '৭৫-পরবর্তী জিয়া সরকার, সাত্তার সরকারকেও এরশাদের মত একই গন্ডিতে ফেলা হতে থাকে।

তখন যে সমস্ত শিল্পী, নাট্যকর্মী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, তাদের

অনেককে এরশাদের পদলেহনকারী হিসেবে চিহ্নিত করে অস্পৃশ্য ঘোষণা করা হয়। নাশিদ কামালের সঙ্গে শাকিলা জাফরের নাম একই সাথে প্রকাশ করা হলেও পরবর্তীতে সময় বুঝে শাকিলা জাফরকে ঠিকই পুনর্বাসিত করা হয়েছে। কিন্তু নাশিদ কামাল আজো 'অগ্রহণীয়'ই থেকে গেছেন। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পরিবর্তন নিয়েও এমন কান্ড হয়েছিল। এরকম উদাহরণ আরো অনেক দেয়া যায়।

৩। সশস্ত্রবাহিনী বিরোধী প্রচারের মাধ্যমে ঘোলাটে পরিবেশে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের ক্ষেপিয়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এখানে 'র'-এর উদ্দেশ্য ছিল যদি পরিস্থিতি সুবিধের মনে না হয় তবে যেন আবার খন্ডকালীন বিশৃংখলায় ফিরে যাওয়া যায়। এছাড়া সশস্ত্রবাহিনীর ভিতরের যূথবদ্ধতা ভেঙে দিতে পারলে লাভ ছাড়া ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশ্য জেনারেল নূরউদ্দিন ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রাণান্ত পরিশ্রমের কারণে সেরূপ কোনো প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জন সম্ভব হয়নি। জে. নূরউদ্দিন তখন প্রতিরাতে প্রতিটি ব্যাটালিয়নে, ইউনিটে প্রতিদিনকার রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনাবলীর চুলচেরা বিশ্লেষণ উপস্থাপনের নির্দেশ দেন। সেখানে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের প্রোপাগান্ডাকে বিশ্বাস না করে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয় ও সর্বতোভাবে জনগণের মন-মানসিকতা সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয়। সে সময় সেনানিবাস শহরগুলোয় এরশাদের পক্ষে সশস্ত্রবাহিনীর সমর্থনদানের বিভিন্ন গুজব ছড়ানো হয়েছিল। তাছাড়া সৌদি আরবে অবস্থানরত সেনা সদস্যদের জীবনহানি নিয়েও গুজব প্রচারিত হয়। জাতীয় পার্টির একটি অংশের সাথে আওয়ামী লীগের আঁতাত প্রকৃতপক্ষে 'র'-এর পরামর্শক্রমে ও পরিকল্পনামাফিক হয়েছিল বলে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও বিভিন্ন ঘটনা ও আ'লীগ-জাতীয় পার্টি আঁতাতে কারা লাভবান হয়েছিল আর কাদের ক্ষতি হয়েছিল, সেসমস্ত কিছু পর্যালোচনা করলেই ভিতরের অনেক কিছু বোঝা সহজ হয়ে যায়। তবুও তখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এতদসংক্রান্ত যে সমস্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল তার বেশ কিছু আমাদের কৌতূহল মিটাতে পারে। এমনি একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক আগামী' পত্রিকায়। প্রতিবেদক সাজ্জাদ হায়দার সেখানে মন্তব্য করেন "১৯৯১-এর নির্বাচনে জাতীয় পার্টি (আংশিক) অংশগ্রহণ করবে কি না তা অস্পষ্ট ছিল। জাতীয় পার্টি প্রকৃতপক্ষে ছত্রভঙ্গ পার্টিতে পরিণত হয়েছিল। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মিজান চৌধুরী জাতীয় পার্টির হাল ধরেন এবং বিপুলভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালান। ঐ মাসেই 'মর্নিং সান' পত্রিকার এক রিপোর্টে শেখ হাসিনা ও মিজান চৌধুরীর বৈঠকের সংবাদ ছাপা হয়। এরই প্রতিক্রিয়ায় পরদিন 'মর্নিং সান' অফিসে একদল লোক হামলা চালায়। আওয়ামী লীগের এ খবরের সত্যতা অস্বীকার করার কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা যায় জাতীয় পার্টি পূর্ণ শক্তিতে নির্বাচনী মাঠে নেমেছে। রটনা হলো, আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহী করেছে। তবে রটনা যাই হোক, জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় বিএনপি'র ভোট নষ্ট হয়েছে, এটা নিশ্চিত। সুবিধা পেয়েছে আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনার সঙ্গে মিজান চৌধুরীর কথা আদৌ হয়েছে কি না জানা না গেলেও এটা বলা যায়, নির্বাচনোত্তর প্রতিক্রিয়া প্রায় অভিন্ন।"[২৯]

২৯। আগামী, ২২ মার্চ '৯১ সংখ্যা

৪। সকল রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অন্তর্ঘাতমূলক ও দেশবিরোধী কর্মকান্ড বেশ জোরেসোরে উস্‌কিয়ে দেয়া হয়। তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের প্রশাসন একের পর এক প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে থাকে। তার ১৬ জন উপদেষ্টা নিয়ে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ মতাদর্শী উপদেষ্টাবৃন্দ তাদের দলের 'আগাম বিজয় নিশ্চিত' এমন একটি ভাব দেখিয়ে একের পর এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। জনৈক সাবেক 'উপাচার্য' গোটা জাতিকে ধর্মনিরপেক্ষতা শেখানোতে বিশেষ তৎপরতা আরম্ভ করেন। শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আনা, জাতীয় নীতি নির্ধারণ, যা জনগণের নির্বাচিত সরকার করবেন, কিন্তু তিনি কোন যুক্তিতে, কার ইঙ্গিতে এমন অতি প্রগতিবাদী তৎপরতা শুরু করে দিয়েছিলেন তা জানা না গেলেও বোঝা গিয়েছিল। সে সময় পাঠ্যপুস্তকে 'আল্লাহ'র নামের পরিবর্তে 'সৃষ্টিকর্তা' বা ঈশ্বর বসানোর ঘোষণা দিলে সারা জাতি অবাক হয়ে আওয়ামী ধর্মনিরপেক্ষতার আসল রূপ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এ প্রেক্ষিতে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া স্পষ্টরূপে আল্লাহর নাম পরিবর্তনের যে কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

এছাড়া জনাব রেহমান সোবহান নামের একজন অর্থনীতিবিদ জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যাপৃত হন। ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে তখন এমনই মাতামাতি আরম্ভ হয়ে যায় যে, এক পর্যায়ে বেগম খালেদা জিয়াকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়, 'বিএনপি ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে নয়'। অবশ্য তিনি এ কথার দ্বারা ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদের কথা বোঝাতে চাননি। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ নেতারাও তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করতে গেলে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সংবিধান হতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বিসর্জন দেয়া হবে না বলে জানিয়ে দেন ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন।

এছাড়া আওয়ামী লবীর উপদেষ্টারা তাদের ওপর অর্পিত খন্ডকালীন দায়িত্ব পালন না করে 'অযথা' দায়িত্ব পালনে ব্যাপৃত হয়ে পড়ায় তখন সারাদেশ জুড়ে কারা বিদ্রোহ দেখা দেয়। একটির পর একটি কারা বিদ্রোহ সারাদেশে আতংকের সৃষ্টি করে ও জনগণ একে গণ আন্দোলনের ফল বলে মনে করতে থাকে। অনেক জায়গায় এরকম অরাজক পরিস্থিতিতে সামরিক আইন জারির গুজব শোনা যায়। অবশ্য বেশ ক'টি নির্ভরশীল সূত্র হতে ধারণা পাওয়া যায় যে, তখন এরকম অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করে সশস্ত্রবাহিনীর জনৈক জেনারেলকে সামরিক আইন জারির সুযোগ করে দেয়ার একটা প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। আন্দোলনের সময় কাকতালীয়ভাবে ওই জেনারেল তাঁর ডিভিশন নিয়ে শেরে বাংলা নগরে বিজয় দিবস কুচকাওয়াজ পরিচালনার জন্য অবস্থান করছিলেন। জে. নূরউদ্দিন তাঁকে কিভাবে সামাল দিয়েছিলেন তা জানা সম্ভব নয়। এখানে অনেকে বলতে পারেন যে, ওই জেনারেল যদি ক্যু করতেন, তবে 'র'-এর উদ্দেশ্য সফল হতো কিভাবে? উত্তরে বলা যায়, তখন যদি কোনো জেনারেল ঢাকায়

ক্যু করতো তবে প্রথমেই ঢাকা সেনানিবাসের ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাঁধতো। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতো। এরপর তারা সফলতা পেলেও তখন অন্য কোনো সেনানিবাস হতে সমর্থন আদায় করতে পারতো না। ফলে ব্যাপক সংঘর্ষের আশংকা দেখা দিত। অন্যদিকে এ পর্যায়ে বেসামরিক জনগণ সদ্য সমাপ্ত আন্দোলনের উত্তপ্ততায় আবার মাঠে নেমে আসতো। ফলে বিপুল প্রাণহানির সঙ্গে গৃহযুদ্ধেরও সম্ভাবনা ছিল। যদি এরকম বড় কিছু হওয়ার পূর্বেই বিদ্রোহী জেনারেলের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটতো, তবুও সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে জনগণের সঙ্গে সশস্ত্রবাহিনীর সম্পর্ক ভীষণ রকমের খারাপ করে দেয়া সম্ভব হতো। এটাই বা 'র'-এর জন্য কম কি!

৫। এ সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ বিরোধী 'র' কার্যক্রম চলার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ হতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বিরোধী প্রচারণা জঘন্য রূপ লাভ করে। কোনো প্রতিবেশী দেশের নির্বাচন নিয়ে পত্রিকায় মাতামাতি করা স্বাভাবিক। কিন্তু শালীনতা, ভব্যতার মাথা খেয়ে আনন্দবাজার গ্রুপ সরাসরি বিএনপি'র বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ করে।

এ সংক্রান্ত একটি প্রামাণ্য দলিল এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে। ২৯ ডিসেম্বর '৯০ তারিখে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় 'বাংলাদেশে এক শ্রেণীর মানুষের মনে চাপা ভারত বিদ্বেষের ইঙ্গিত পেয়েছি' শিরোনামে সুনীতি ঘোষ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তার রচনা থেকেই বোঝা যায় তারা (ভারতীয়রা) বাংলাদেশে কোন দলকে ক্ষমতায় দেখতে চায়? কারা তাদের এদেশীয় বন্ধু? ও কিভাবে তথাকথিত সৎ প্রতিবেশী হওয়া যায়? সুনীতি ঘোষের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। "ভারত নামে এক দেশ আছে এই উপমহাদেশে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে বসে তা বোঝার উপায় নেই। বাংলাদেশের সংবাদপত্র, টিভি-রেডিওতে পাকিস্তানের সংবাদ থাকে। সেখানে কোথাও বরফ পড়লে তা টিভি-তে দেখানো হয়। বিশ্বের তাবৎ মুসলিম রাষ্ট্রের খবরাখবর জানা যায় প্রচার মাধ্যম থেকে। কিন্তু প্রতেবেশী ভারতের যে টুকরো টুকরো ছবি মাঝে–মধ্যে প্রকাশিত হয় সে ভারতের মানুষের প্রধান কাজ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা। দাঙ্গার সংবাদ লেখার সময় ভারতে সাংবাদিকরা বৃহত্তর স্বার্থে দাঙ্গাকারীদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় গোপন করলেও বিদেশী সংবাদ সংস্থাগুলো এসব আচরণ বিধির ধার ধারে না বলে তাদের পরিবেশিত সংবাদ সাধারণ বাংলাদেশীকে ভারত বিরোধী করে তুলতে সাহায্য করে।

কেবল সংবাদপত্রই নয়, বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত ইতিহাস পড়লেও বোঝা যায় না ওদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতবাসীর কোনো অবদান ছিল। বাংলাদেশীদের হয়ে পাকিস্তানী খান সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ১৮ হাজার ভারতীয় জওয়ান প্রাণ দিয়েছেন। বাংলাদেশে যুদ্ধের এবং বাংলাদেশী শরণার্থীদের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে ভারতের মানুষ প্রায় ছ' বছর অতিরিক্ত করের বোঝা বহন করেছেন। সমস্ত আরব দেশ এবং চীন যখন মুখ ফিরিয়েছিল তখন স্বীকৃতি দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে ভারত। এসব কথা বাংলাদেশের কোনো বই পড়লে বোঝা

যায় না। গত ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে যখন ঘটা করে সারা বাংলাদেশে জাতীয় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে তখন মুহূর্তের জন্য কেউ একবার ভারতীয় জওয়ানদের কথা মনে করেননি। রাজনীতিকদের অভিধানে যে কৃতজ্ঞতা বলে কোনো শব্দ নেই তা বাংলাদেশের রাজনীতিকদের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়। একমাত্র শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের প্রবীণ কিছু নেতা ছাড়া আর কেউ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা ভুলেও উল্লেখ করেন না।

যতবার বাংলাদেশে গিয়েছি সাধারণ মানুষের সৌজন্যবোধ ও অতিথিপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ভারত সম্পর্কে বিদ্বেষের অন্তঃ সলিলা ধারা লক্ষ্য না করে পারিনি। সন্দেহ নেই, এই মনোভাব সৃষ্টির জন্য বিএনপি এবং মৌলবাদী কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি এবং কিছু কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ভারত বিরোধিতাকে যারা আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রধান উপজীব্য বলে গ্রহণ করেছেন তারাই দায়ী। আরও লক্ষ্য করেছি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার কৃত্রিমতা। একই বুরুশে সবাইকে মসীলিপ্ত করা অনুচিত হলেও একটি কথা স্পষ্টাস্পষ্টি বলা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবীদের ধর্মনিরপেক্ষতা একপ্রকার লোক দেখানো ব্যাপার।

একথা সত্য, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমকে শিরে ধারণ করে এবং ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' বলে ঘোষণা করে বাংলাদেশের যে সংবিধান 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকৃত সে সংবিধান নিয়ন্ত্রিত দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা আশা করা যায় না। প্রয়াত জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে এ কাজ করলেও, এর প্রতিবাদে বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীরা খুব একটা সরব ছিলেন বলে শোনা যায়নি। তাদের গণতান্ত্রিক আকৃতিতে কোনো খাদ না থাকলেও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস যে অনেকটা কৃত্রিম তাও দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবস্থা দেখলেই উপলব্ধি করা যায়। গত ক'বছর এই উপমহাদেশে মুসলমান প্রধান দেশগুলোর রাজনৈতিক চরিত্র দেখে আজ এ কথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থার সঙ্গে ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অবস্থা কোনো মতেই তুলনীয় নয়। ভারতের সংখ্যালঘুরা আজ সর্ব অর্থে ভারতবাসী। তাঁরা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং সে অধিকার অর্জনে তাঁরা সরব ও সক্রিয়। কোনো-কোনো মহলের এটা পছন্দ না হলেও সাধারণভাবে ভারতের মানুষ এই পরিস্থিতিকে স্বাগত জানান। হিন্দুদের সহনশীলতার কষ্টিপাথরে ভারতের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। জাতি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা আজ আর একতরফা ব্যাপার নয়। নিন্দনীয় হলেও এটাই ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তর্নিহিত শক্তির পরোক্ষ প্রমাণ। উত্তর ভারত সাম্প্রদায়িক অশান্তির প্রধান কেন্দ্র হলেও সেখানকার মুসলমানদের কিন্তু হিন্দুদের মতো ধুতি পরে চলতে হয় না। অথবা সর্বদাই উৎকণ্ঠার সঙ্গে বাস করতে হয় না। বাংলাদেশের অবস্থা কিন্তু তা নয়। পরিস্থিতির চাপে বাংলাদেশী হিন্দুরা ধুতি পরা ছেড়ে দিয়েছেন অনেক দিন আগেই ঢাকেশ্বরী কালীবাড়ির প্রাঙ্গণেও যখন হিন্দুরা লুঙ্গি পরে চলাফেরা করেন তখন

বুঝতে বেগ পেতে হয় না সংখ্যালঘুরা কি মানসিকতা নিয়ে বাংলাদেশে বাস করছেন। বাংলাদেশী হিন্দুরা পাকিস্তান আমলেই জলকে জল বলতে ভুলে গেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশেও তাঁরা 'পানি'র মধ্যেই জলের আস্বাদ পান। হিন্দু মেয়েরা খুব একটা বাইরে বের হন না। কোথাও কোনো গোলামাল হলেই হিন্দুদের ত্রয়োস্ত্রী তার শাঁখা খুলে রাখেন, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেন। স্কুল-কলেজে হিন্দু ছেলে-মেয়েদের নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। পথ দিয়ে গেলে মন্তব্য শুনতে হয় ওই মালাওনের বাচ্চা যাচ্ছে। যাঁদের সঙ্গতি আছে তাঁরা বাংলাদেশ ছাড়তে প্রস্তুত। যাঁদের সে অবস্থা নেই তারা নিছক বেঁচে থাকার জন্য ধর্মান্তরিত হতে রাজি। সাম্প্রতিক সফরকালে এবং এর আগেও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পেরেছি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও বেশ কিছু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বেশ কিছু হিন্দু নেতা ত্যাগ স্বীকার করলেও ওদেশের রাজনীতিতে আজ তারা এক প্রকার অপাঙক্তেয়। নিরাপত্তার স্বার্থে এবং পুলিশের হয়রানির ভয়ে বাংলাদেশের হিন্দুরা ভারতীয় সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলাই শ্রেয় বিবেচনা করেন। বস্তুত ভারতীয় সাংবাদিকদের সম্পর্কে বাংলাদেশী হিন্দুদের মনে একটা চাপা ক্ষোভ আছে। তাদের বিশ্বাস, সরকারি আতিথেয়তা এবং উপঢৌকনে মুগ্ধ ভারতীয় সাংবাদিকরা সোনার বাংলার স্বর্ণাভ দিকটা দেখেই খুশি হয়ে দেশে ফিরে যান। বাংলাদেশের সামাজিক চিত্রের যে আরেকটি অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক আছে তা জানতে তাঁরা আগ্রহী নন। যখন জানালাম আমি অন্য দিকটি জানতে চাই তখন ওঁরা ওঁদের দুঃখের কথা বললেন, এবং তা-ও অত্যন্ত নিচু স্বরে-পাছে কেউ শুনতে পায়।

ওঁদের কাছ থেকেই জানতে পারি, রাজ্যের সিভিল সার্ভিসে কয়েক বছর আগে হিন্দু ছেলেরা ভাল ফল করলে পরের বছরই তাঁদের পাসের হার কমিয়ে দেয়া হয়। হিন্দু ছেলে বাংলাদেশের বিমান বাহিনীতে যোগ দিতে চাইলে তাঁকে নিরুৎসাহ করা হয় নানাভাবে। সামান্যতম উস্কানিতেই ভেঙে ফেলা হয় হিন্দুদের মন্দির অথবা অপবিত্র করা হয় তাদের ধর্মস্থান। গত অক্টোবর মাসে পুলিশের উপস্থিতিতে ঢাকেশ্বরী (কালী) মন্দিরে আগুন লাগনো হয়েছে, ভাঙচুর হয়েছে। অপহৃতা কালী প্রতিমা। ভেঙে ফেলা হয়েছে গৌড়ীয় মঠ। আক্রান্ত হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ। একইসময়ে সুপরিকল্পিতভাবে দেশের বিভিন্ন জেলায় হিন্দুদের অনেক মন্দির ভেঙে ফেলা হয়েছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হয়তো এসব সমর্থন করেননি। হয়তো কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী এতে ব্যথিত। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির জন্য খুব একটা উদযোগী হয়েছেন বলে শোনা যায়নি। হিন্দুরা যে রাজনৈতিক দলকে নিজেদের বলে মনে করেন সেই আওয়ামী লীগের নেতারা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়া ছাড়া আর কিছু করেননি। ভারত বিরোধী বিএনপি নেতারা এ সবের জন্য এরশাদকে দায়ী করে নিজেদের দায়মুক্ত করেছেন। বরং মৌলবাদী জামায়াতের নেতাদের অবস্থান ছিল সংখ্যালঘুদের কাছে অনেক উৎসাহজনক। তাঁরা অযোধ্যার ঘটনার জন্য হিন্দুদের ওপর বদলার বিরোধিতা করে বলেছেন, 'ভারতে হিন্দুরা মুসলমানদের আক্রমণ করতে

পারে। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুরা তো মুসলমানদের আক্রমণ করেনি। তাহলে হিন্দুদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হবে কেন?' এ ধরনের ইতিবাচক কোনো কথা কিন্তু শেখ হাসিনা বা বেগম খালেদা জিয়া বলেননি। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রতি যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেল তাতে প্রত্যেকটি ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ লজ্জিত। কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলোর উচিত প্রত্যেকটি দাঙ্গার অন্তর্তদন্ত করা এবং দোষীদের সমুচিত শাস্তি দেয়া। এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উদ্বিগ্ন হলেও বাংলাদেশীদের লক্ষ্য করা উচিত উত্তর ভারতের এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পশ্চিম বাংলাকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেনি। পশ্চিম বাংলা বা ত্রিপুরাতে কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটলে বাংলাদেশে তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু উত্তর ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশে হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। অথচ এই ব্যাপারটিই এবারে ঘটেছে বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের রাজনীতিকদের মানসিকতার আর একটি লক্ষ্যণীয় দিক দুই বাংলার মধ্যে সমস্যাগুলোকে 'ভারত বনাম বাংলাদেশ' এই পটভূমিকায় দেখার চেষ্টা। বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। তাই সরকারি স্তরে কথাবার্তা নিশ্চয়ই দিল্লীর সঙ্গে বলতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশী নেতাদের বোঝা উচিত ওদের যাবতীয় সমস্যা তা তিন বিঘাই হোক আর গঙ্গার জল ভাগাভাগিই হোক-পশ্চিম বাংলার সঙ্গে জড়িত। বোঝা উচিত পশ্চিম বাংলার সঙ্গে কথা না বলে কেন্দ্রের পক্ষে বাংলাদেশ সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। দুই বাংলার নেতাদের মধ্যে বেসরকারি স্তরে কথাবার্তা, আদান-প্রদান হলেই অনেক বকেয়া সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত হতে পারে। অযথা ভারত বিরোধী রাজনীতি প্রকৃত উদ্দেশ্য না হলে বাংলাদেশের রাজনীতিকরা পশ্চিম বাংলার নেতাদের সঙ্গে বেসরকারি স্তরে যোগাযোগ করে অনেক সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারেন। তবে ঢাকায় কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ অপেক্ষা 'সার্বভৌমত্বের' প্রশ্নই তাঁদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

৬। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ '৯১-এর নির্বাচনে ভাল করবে কি খারাপ করবে তা নির্ভর করে তাঁর নেতৃত্ব, যোগ্যতা, আ'লীগের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সর্বোপরি বাংলাদেশের জনগণের ওপর। ১৯৭০ ও '৭৩ সালে বাংলাদেশীরাই পরম নিশ্চিন্তে আ'লীগকে ভোট দিয়েছিল। সেখানে তখন পর্যন্ত ভারতীয় আশীর্বাদ বা প্রত্যক্ষ সহায়তার প্রয়োজন পড়েনি। অথচ '৯১-এর নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক পত্রিকা গোষ্ঠী 'আনন্দবাজার গ্রুপ' আওয়ামী লীগের সরাসরি পক্ষাবলম্বনে সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এখানে সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের প্রয়াত সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিবের কন্যা হয়েও শেখ হাসিনা তার পিতার স্বাতন্ত্র্যবোধের ন্যূনতম প্রকাশও ঘটাতে পারেননি, বরং তিনি তাঁর সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে আনন্দবাজারের অপপ্রচারণায় ইন্ধন জুগিয়েছেন।

'৯১-এর নির্বাচনের সময় পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস নেতা প্রণব মুখার্জীর কাছ থেকে আশীর্বাদ চাওয়া নিয়ে শেখ হাসিনা বেশ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারো কাছ থেকে আশীর্বাদ নেয়া অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু যে সাম্প্রদায়িক, আধিপত্যবাদী

কংগ্রেসের সাথে আ'লীগের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভিযোগ তোলা হয়, শেখ হাসিনা তার আশীর্বাদ সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি করে সে অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ দিয়েছিলেন। তাছাড়া একটি স্বাধীন দেশের 'জননেত্রী' এভাবে অন্য দেশের আধিপত্যবাদী দলের নেতার কাছ থেকে আশীর্বাদ নেবেন–তা আমাদের দেশ ও জাতির জন্য লজ্জাজনক, দুর্ভাগ্যজনক।

সে সময় আ'লীগকে প্রত্যক্ষ সমর্থন ও বিএনপিকে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করে এবং প্রণব মুখার্জীর আশীর্বাদ সংক্রান্ত খবর নিয়ে কলকাতার আনন্দবাজার গোষ্ঠীর 'সানন্দা' পত্রিকায় ৭ ফেব্রুয়ারি '৯১ সংখ্যায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। 'রাজধানী থেকে' কলামে 'হাসিনা না খালেদা' শিরোনামের প্রতিবেদনটিতে জনাব সুমন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"......... ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে, হাসিনার বিরুদ্ধে বেগম খালেদা বোধ হয় তেমন সুবিধে করে উঠতে পারবেন না। তার সবচেয়ে বড় কারণ আওয়ামী লীগের যে সাংগঠনিক শক্তি আছে খালেদার বিএনপি'র তা নেই। মনে আছে গত বছর এপ্রিলে ঢাকায় তাঁর বাড়িতে বসে হাসিনা এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, 'আপনাদের দেশে কংগ্রেসের মতো এই বাংলাদেশে আমাদের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে সংগঠন আছে। ভোট হলে যে আমরা জিতবোই তাতে সন্দেহ নেই'। সংগঠনের জোর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি'র কথা উঠলেই তিনি বলেন, 'ওই দল আবার গণতন্ত্রের কথা বলে কেন? বিএনপি তো আসলে ক্যান্টনমেন্টেরই পার্টি?' হাসিনার কটাক্ষের লক্ষ্য অবশ্যই বেগম খালেদা। কারণ খালেদার প্রয়াত স্বামী জিয়াউর রহমান ছিলেন সেনাবাহিনীর লোক। লড়াইটা যেখানে গণতন্ত্র কায়েম করার সেখানে হাসিনা যে যোগ্যতার দাবিদার তা নিয়েও বোধহয় কোনোও প্রশ্ন ওঠে না। .... পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ দুই দেশেই রাজনৈতিক নেতাদের অস্তিত্বের অন্যতম শর্ত ভারত-বিরোধিতা। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের সাহায্যের কথা এখনও হাসিনা ব্যক্তিগত আলোচনায় কৃতজ্ঞচিত্তেই স্মরণ করেন। উচ্ছসিত প্রশংসা করেন নেহেরু পরিবারের এবং হয়তো সেজন্যই নির্বাচনী প্রচারে নামার আগে জীবিতাবস্থায় ইন্দিরার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কংগ্রেসী নেতা প্রণব মুখার্জীকে হাসিনা টেলিফোন করেছিলেন আশীর্বাদ চাইতে। আজকের বাংলাদেশে উপকারীর উপকারইবা কয়জন স্বীকার করেন?"

৭। এরশাদ পতনের পর ভারতে অবস্থানরত দাগী আসামীরা বাংলাদেশে চলে আসা শুরু করে। '৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর যারা সরাসরি বাংলাদেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত ছিল তারা নতুন পরিস্থিতির সুযোগে বাংলাদেশে আসার সুযোগ পায়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ ও শাস্তিদান সম্পূর্ণ আদালতের ব্যাপার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই দীর্ঘদিন 'র'-এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এদের সম্পর্কে '৯১ সংখ্যা 'দৈনিক মিল্লাত'-এ বলা হয়, "বিগত সাধারণ নির্বাচনী তৎপরতায় দীর্ঘকাল কলকাতায় অবস্থানরত 'র'-এর মদদপুষ্ট অনেক পলাতক বাংলাদেশীদের ব্যবহার করা হয়েছে। এদের অধিকাংশই নির্বাচনের পূর্বে ঢাকা প্রত্যাগমন করে। যেমন -আওরঙ্গ ও তার সঙ্গীগণ।"

৮। এরশাদ পতনের পর পর হঠাৎ করে দেশে কতগুলো মারাত্মক বিশৃংখলা দেখা দেয়। তখন দেশের অবস্থা ছিল বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের ভাষায় 'উত্তপ্ত' বারুদাগার-এর মত। তাঁর মত একজন দক্ষ প্রশাসকও সে সময় অনেক অরাজক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খেয়ে যান।

১৯৯০ সালের ২৯ ডিসেম্বর দেশের বিভিন্ন জেলখানায় কারা বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে। এ হাঙ্গামা ধীরে ধীরে অনেক জেলে ছড়িয়ে পড়ে। কারাগার নিয়ে এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। কারাগারের লক-আপ ভেঙ্গে কারাবন্দীদের আঙ্গিনায় বেরিয়ে আসা, কারারক্ষী ও কারাবন্দীদের মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, গুলিবর্ষণ, লাশ নিয়ে মিছিল, দাবিনামা পেশ, অনশন ইত্যাদি আলামতের পাশাপাশি সড়কি, বল্লম, ভোজালি, কিরিচ, চাপাতি, ককটেল তৈরির মাল-মশলা উদ্ধারেরও খবর পাওয়া যায়।

এখন এখানে যে কেউ একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, সাধারণ কয়েদীদের কাছে জেলখানায় কারা এত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করলো? পুলিশ প্রশাসনের ব্যাপক প্রহরার ফাঁক-ফোকর গালিয়ে কিভাবে, কারা এগুলো দেশের 'নিরাপদতম' স্থান বলে স্বীকৃত জেলখানায় পাঠাতে পারলো? যদি পুলিশ প্রশাসন বলতো যে, তারা এর কিছু জানে না, তবে তাদের প্রশিক্ষণ ও শৃংখলা নিয়ে বা সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে তখন যারাই এরকম কোনো অন্তর্ঘাতমূলক ও ধ্বংসাত্মক কাজ করুক না কেন, তার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল বিচারপতি সাহাবুদ্দিনকে প্রশাসনিক জটিলতায় ব্যস্ত রেখে রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নজর না দিতে বাধ্য করা। অর্থাৎ কোনো একটি বিশেষ পক্ষ যেন সকল পর্যায়ে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে পারে সে লক্ষ্যেই এসব ঘটনা ঘটানো হয়।

৯। বিভিন্ন জনসভায় আ'লীগের পক্ষ থেকে বিএনপি বিরোধী নানা রকম প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি স্বয়ং আ'লীগ সভানেত্রীও জঘন্য, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ভাষায় বিএনপিকে আক্রমণ করতে থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি রাজনৈতিক সমালোচনা বা বিরোধিতার সকল মাত্রা ভঙ্গ করে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেন তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

(ক) নির্বাচনী প্রচারাভিযানের এক পর্যায়ে রাজশাহীর জিরো পয়েন্টে ভাষণ দানকালে শেখ হাসিনা শহীদ জিয়াউর রহমানকে 'মদ্যপ' ও 'অসৎ' বলে অভিহিত করেন।

(খ) ১৬/২/৯১ তারিখে মাদারীপুর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা দানকালে শেখ হাসিনা বলেন, "....১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এ দেশের মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকারকে কেড়ে নিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়। জিয়া সেই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। ...... বিদেশী টাকা পয়সা লুটপাটের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে জিয়া ও এরশাদের মধ্যে গন্ডগোল দেখা দিলে জিয়াকে হটিয়ে এরশাদ ক্ষমতায় আসে। ..... জিয়াউর রহমান যা করেছেন এরশাদও তা করেছে।"

(গ) ০৯/০২/৯১ তারিখে আ'লীগের প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম এক বিবৃতিতে বলেন, "খালেদা জিয়া ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ছিলেন।"

এরকম অশ্লীল ও ব্যক্তিগত কুৎসা রটনার আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। এক কথায় আ'লীগ একথাই প্রমাণ করতে চায় যে, এরশাদ যা জিয়াও তা! অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী সবাই খারাপ!

১০। নির্বাচনী প্রাচরাভিযানের সময় বিভিন্ন সংস্থা ও পত্র-পত্রিকা বেশ কিছু জরিপ প্রকাশ করে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ৯৯% ভাগ জরিপেই আ'লীগকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দেখানো হয়। সিপিবি-র ঘনিষ্ঠ একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ৮ দলের মন্ত্রীসভা গঠনের ওপর প্রধান শিরোনাম প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, আ'লীগসহ ৮ দল মেজরিটি তো বটেই বরং দুই তৃতীয়াংশ আসন পাবে। পক্ষান্তরে বিএনপি দ্বিতীয় হবে না তৃতীয় হবে তা নিয়েও তাদের বিস্তর সংশয় ছিল। এমনকি সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান 'বিআইডিএস'-এর পরিচালিত জরিপেও আ'লীগের বিজয়বার্তা প্রচার করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, বিআইডিএস-এর অন্যতম রিসার্চ ফেলো রেহমান সোবহান[৩০] ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা।

মূলতঃ এসব প্রচারণার উদ্দেশ্য ছিল বিএনপি সমর্থকদের ওপর মনস্তাত্বিক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া।

অন্যদিকে বাংলাদেশ টেলিভিশনও সে সময় সম্পূর্ণ একপেশে ও ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে নির্বাচনের দিন তাদের আ'লীগ প্রীতি অত্যন্ত নগ্নভাবে সকলের চোখে ধরা পড়ে। এ ব্যাপারে ২২/৩/৯১ সংখ্যা 'সাপ্তাহিক আগামী'তে উল্লেখ করা হয়।' "বাংলাদেশ টেলিভিশনের অধিকাংশ কর্মকর্তা কলাকুশলী ও শিল্পীই নাকি 'নৌকা'র বিজয়ে বড় বেশি নিশ্চিত ছিলেন। আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ অনেকে নাকি আওয়ামী লীগের জন্যে জানপ্রাণ দিয়ে খেটেছেন। 'জিরো পয়েন্ট' নাটকটির ভরাডুবির পর জনাব মামুন আরেকটি নাটক নাকি প্রচার করতে যাচ্ছিলেন, এতে আওয়ামী লীগের জয়গান ছিল। নির্বাচনের দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানমালায় এমন সব গান ও নাটক প্রদর্শিত হয় যাতে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক 'নৌকা' ছিল। গানের কথায়-কথায় ছিল 'নৌকা, 'তরী', 'নাও' শব্দাবলী। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণাকারী 'নৌকা'র প্রার্থীদের ফল প্রচারে গলায় যেমন জোর পেয়েছেন 'ধানের শীষ'-এ বেলাতে তেমনটি পাননি। আনিসুল হক প্রমুখ সম্পর্কে দর্শকরা এসব অভিযোগ করেছেন। একটি নির্মাণ সংস্থার পরিচালক সিরাজুল মজিদ মামুন অনেক সাবধানী হলেও দর্শকদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারেননি। গার্মেন্টস কারখানার মালিক আনিসুল হক নির্বাচনের ফলাফল প্রচার করতে গিয়ে বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠান উপস্থাপনার মতো কাজকর্ম করছিলেন।

শুধু টিভির কর্মকর্তা নয়-খোদ তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের বক্তব্য সম্পর্কেই কথা উঠেছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারির মানিক মিয়া ও পান্থপথের জনসভার টিভি কভারেজ সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ ছিল না। বাস্তবে পান্থপথের সমাবেশ থেকে মানিক মিয়ার সমাবেশ ছিল দ্বিগুণ।

সরকারের বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্টেও তাই নাকি বলা হয়েছে। কিন্তু বিটিভিতে যে ফটো কভারেজ দেয়া হয়-তাতে পান্থপথের ছবিটি বড় করে দেখানো হয়, মানিক মিয়ার

৩০। ইনি আ'লীগ আমলে পরিকল্পনা কমিশনে ছিলেন

সমাবেশের চেয়ে।

সর্বশেষ নির্বাচনী প্রচারণা উপলক্ষ্যে বেগম জিয়ার মানিক মিয়ার সমাবেশ ও শেখ হাসিনার পান্থপথের সমাবেশের লোক সমাগমের বিষয়টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সারাদেশের ভোটারদের মধ্যে এই জনসভার ব্যাপারে খুবই আগ্রহ ছিল। কিন্তু বিটিভি'র বার্তা বিভাগের কারসাজিতে সঠিক তথ্য পরিবেশিত হয়নি। এ সম্পর্কে একটি দৈনিকের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে বার্তা কক্ষের নূরুল ইসলাম জানান, বিষয়টি পরীক্ষা করা হবে। পরে (নির্বাচনের আগে) তথ্য সচিব এ সম্পর্কে বলেন, আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি দু'টি জনসভায় জনসমাগম বাস্তবেও সমান-সমান।

উল্লেখ্য, ওই তথ্য সচিব কিছু দিন আগে মন্ত্রণালয়ে এসেছেন। ওই মন্ত্রণালয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো উপদেষ্টা ছিল না। তথ্য দফতরের সদ্য প্রকাশিত বই পুস্তকে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। রেডিও ও টিভিতেও 'বঙ্গবন্ধু' বলা হয় বারবার। নির্বাচনের পর 'জাতির পিতা' বলার পরিকল্পনা ছিল।"

টিভি কর্মকর্তা ও কলাকুশলীদের এ ধরনের কার্যক্রম দেখে কি এটাই মনে হয় না যে, রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে আ'লীগপন্থী সংস্কৃতিসেবীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আজও আমাদের টিভিকে সে রেশ টানতে হচ্ছে।

১১। সে সময় বিবৃতিজীবী ও প্রগতিবাদী হিসেবে পরিচিত বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সবাই সর্বোতভাবে বিএনপি বিরোধী ভূমিকা পালন করেছিলেন। নির্বাচনের পূর্বে 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' পত্রিকা বুদ্ধিজীবীদের বেশ কিছু সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। 'কাকে ভোট দিচ্ছেন' এই প্রশ্নের উত্তরে অধকাংশই 'নৌকা' প্রতীকে ভোট দিবেন বলে জানিয়ে দেন।

১২। সকল পর্যায়ে দেশী ও ভারতীয় প্রচারণা মাধ্যম যে কিভাবে উদ্দেশ্যমূলক ভুল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণ ও আরো বৃহৎ অর্থে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়, তার বড় প্রমাণ হতে পারে, '৯১-এর সংসদ নির্বাচনে 'আ'লীগের বিজয় নিশ্চিত' এ ধরনের প্রচারণা। এসব ক্ষেত্রে দেখা গেছে পূর্ব থেকেই এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, সকলেই যাতে আ'লীগ নিশ্চিতভাবে বিজয়ী হচ্ছে এটা ভাবতে পারে। এরকম প্রচারণার উদ্দেশ্য ছিল-যদি নির্বাচনে আ'লীগ পরাজিত হয় তাহলে যেন তাৎক্ষণিকভাবে কারচুপির রেডিমেড অভিযোগ উঠানো যায়। এখানে এরকম প্রচারণায় বিদেশী সংবাদিক ও পর্যবেক্ষকগণ কিভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন 'সাপ্তাহিক আগামী' হতে তার কিছু প্রমাণ তুলে ধরা হলো।

(ক) 'নৌকা'র দিকে তাক।

নির্বাচনের আগের দিন মঙ্গলবার সন্ধ্যা। স্থান ঢাকা শেরাটনের মিডিয়া সেন্টার। নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহে আগত বিদেশী সাংবাদিকদের একটা মিলন ক্ষেত্র ছিল এখানে। এদিন সন্ধ্যায় আনন্দবাজার গোষ্ঠীর 'দ্য টেলিগ্রাফে'র আলোকচিত্রী অলক মিত্রকে ব্যস্ত দেখা গেল রেডিও ফটো পাঠাতে। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের আলাপ আলোচনা হচ্ছিল। অলক মিত্রের ধারণা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করবে। এ কারণে নির্বাচনের দিনে তার প্রথম এসাইনমেন্ট হলো শেখ হাসিনা। তিনি জানালেন, আগামীকাল (নির্বাচনের দিন) সকাল সাতটায় তিনি ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে যাবেন।

অলক মিত্র তার পত্রিকার জন্য কি ছবি পাঠাচ্ছেন তা দেখার কৌতুহল হলো। তার ছবিটি হলো রাজধানীর একটি রাজপথ। সেনাবাহিনীর একজন সদস্য রাজপথে টহল দিচ্ছে। তার রাইফেলের নল একটি নৌকা প্রতীকের দিকে তাক করে আছে। [৩১]

(খ) বিএনপি ফ্যাক্টর নয়!

'৯১-এর সংসদ নির্বাচনে অতীতের যে কোনো নির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশী-দেশি, বিদেশী পর্যবেক্ষক এসেছিলেন। সবার একই বক্তব্যঃ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয়েছে। এ নির্বাচনেক যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মতো দেশের নির্বাচনের সাথেও তুলনা করা যায়। আর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্যে এ নির্বাচন ছিল এক দৃষ্টান্ত। বৃটিশ সংসদীয় পর্যবেক্ষক দল, কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দল ও জাপানী সংসদীয় পর্যবেক্ষক দল গত ২৭ ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশে আসে। কমনওয়েলথ ও সার্ক পর্যবেক্ষক দলে অন্তর্ভূক্ত দেশসমূহের রাজনীতিক, কূটনীতিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আমলা, সাংবাদিক, সাবেক মন্ত্রী, অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত টিম বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনকে অনন্য অ্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা নিজ-নিজ দেশে গিয়ে সূক্ষ, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মতো অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সরকারকে পরামর্শ দেবেন। পর্যবেক্ষক দলসমূহ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পর পৃথক-পৃথক সংবাদিক সম্মেলন করে তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তারা বাংলাদেশ সরকারের কাছে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় সুপারিশও করে গেছেন। নির্বাচনকে প্রশ্নাতীত উল্লেখ করলেও সব পর্যবেক্ষক দলই অভিন্ন মত পোষণ করেন যে, ভোটার তালিকায় কিছু ক্রুটির ব্যাপার তাদের গোচরে এসেছে। তবে এ অনিয়ম নির্বাচনী ফলাফলে কোনো প্রভাব ফেলেনি বলেও তাঁরা উল্লেখ করেন।

বৃটিশ পর্যবেক্ষক দলের একজন সদস্য ঘরোয়া পরিবেশে কয়েকজন সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বলেন, তাঁরা বরাবরই নিরপেক্ষ। কিন্তু বাংলাদেশে এসে তাঁরা এবার ভুল করে ফেলেছেন। তিনি বলেন, তাঁদেরকে প্রথমে ধারণা দেয়া হয়েছিল বিএনপি নির্বাচনে কোনো ফ্যাক্টর নয়। ফ্যাক্টর হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী। তিনি আরো বলেন, ২৫ ফেব্রুয়ারী তাঁরা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, শেখ হাসিনা, আব্বাস আলী খান, হাসানুল হক ইনু ও বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁরা বিচারপতি কে এম সোবহানের সাথেও নির্বাচন বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে বিশদ কথাবার্তা বলেছেন। তবে বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। অবশ্য নির্বাচনের পর ফলাফল দেখে পর্যবেক্ষক দল বিস্মিত হন। তাঁরা খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করাকে তখন জরুরী মনে করেন। ১ মার্চ সন্ধ্যায় পর্যবেক্ষক দলটি বিএনপি-র বনানী অফিসে যান বৃটিশ পার্লামেন্টারিয়ান মি. পিটার শোর নেতৃত্বে এবং বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৩১। সাপ্তাহিক আগামী ৮/৩/৯১ সংখ্যা

অধ্যায়-৮

বাংলাদেশে 'র' তৎপরতা (১৯৯১-'৯৬)

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে 'র'-এর হিসাব নিকাশ সম্পূর্ণ ওলট পালট হয়ে যায়। যে তথ্য, বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে 'র' ভারত সরকার ও বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক মহলকে 'গো এহেড' সিগন্যাল দিয়েছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯১-এর নির্বাচনী ফলাফলে তা ভুল বলে প্রমাণ করে। অবশ্য দীর্ঘ নয় বছর একটি বিকল্প জাতীয়তাবাদী শক্তি লালন পালন করে 'র' '৯১-এর নির্বাচনে এটি অন্তত নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় যে, বিএনপিসহ কোন ন্যাশনালিস্ট দলই নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। নির্বাচনে বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয় সত্য কিন্তু তার একার পক্ষে সরকার গঠন করার মতো আসনে বিজয়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ, বাংলাদেশে একটি দূর্বল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় যাকে স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন উপায়ে অস্থিতিশীল করে তোলা সহজ ছিল। তাই দেখা গেছে বিএনপি সরকার গঠন করার সাথে সাথে সংবিধান পরিবর্তন করে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েমে সর্বব্যাপী চাপ প্রয়োগ করা হয় এবং বিএনপি'ও তার দুর্বলতার কারণে সেই চাপের মুখে মাথানত করে।

এদিকে '৯১-এর সংসদ নির্বাচনে 'র' যে তার পছন্দনীয় দলটিকে সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে সেব্যাপারে ভারতীয় পত্র-পত্রিকাতেই অনেক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সরাসরি অর্থ সাহায্যের প্রসঙ্গেও কোন রাখঢাক করা হয়নি। এরকমই একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ২৮ এপ্রিল '৯১ সংখ্যা ভারতের 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকায়। দিল্লী ডেট লাইনে প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল- "গোপন অভিযানের অজুহাতে 'র'-কর্মকর্তারা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান চালু করেছে।" 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের' এই রিপোর্টটির উপর ভিত্তি করে পরবর্তিতে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় বেশ ক'টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। এরকম একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে দৈনিক ইনকিলাব তার ৩০ এপ্রিল '৯২ সংখ্যায়। ঐ রিপোর্টটি এখানে হুবহু তুলে দেয়া হলো-

একটি পরাজিত দলকে 'র' সাড়ে ৪ কোটি রুপী দিয়েছিল

ইনকিলাব প্রতিবেদন ঃ "ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার গবষেণা ও পর্যালোচনা শাখা 'র'-এর কার্যক্রম যেমন রহস্যজনক তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 'র'-এর আগ্রহ ও তৎপরতা যে একটু বেশী তা দীর্ঘদিন যাবত লক্ষ্য করা গেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এই সংস্থা বাংলাদেশের একটি মহল, গোষ্ঠী বা দলের স্বার্থে কাজ করে এসেছে। গত ২৮ এপ্রিল ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় রাজেশ যোশীর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। দিল্লী ডেট লাইনে প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল 'গোপন অভিযানের অজুহাতে 'র' কর্মকর্তারা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান চালু করেছে।' 'র' সূত্রের উদ্বৃতি দিয়ে প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, মিঃ ভার্মা যখন 'র'-এর সচিব ছিলেন তখন তথাকথিত এসব জরুরী অভিযানের জন্য গোয়েন্দা সংস্থা থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্ধ করা হয়। মিঃ ভার্মার পর মিঃ গৌরী শংকর বাজারী যখন 'র'-এর সচিব তখন

অনুরূপ অভিযান পরিচালিত হয়। এসব অভিযানের নীল-নকশা ও অর্থ যে বাংলাদেশের একটি বিশেষ মহলকে উৎসাহিত ও সক্রিয় করেছে তা সহজেই অনুমেয়। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে, প্রতিবেশী দেশের একটি রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনের ব্যয়ভার বহনের সহায়তার জন্য কলকাতায় অবস্থানরত 'র'-এর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মিঃ বি.বি. নন্দীর মাধ্যমে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লাখ রুপী পাঠানো হয়। যদিও ঘটনাক্রমে সেই দলটি নির্বাচনে পরাজিত হয়।"

ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা যে এভাবে রাজনৈতিক দলকেই অর্থ জোগান দেয় তা নয় বরং বাংলাদেশের সকল খাতেই প্রভাব বিস্তার করার জন্য 'বিশেষ ভাতার' ব্যবস্থা তাদের রয়েছে। ১৯৯১ সালে সূচিত উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগে 'র' এদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক এমনকি প্রচারণা মাধ্যমেও কোটি কোটি টাকা 'বিনিয়োগ' করে যেখানে তাদের লক্ষ্য হলো– মানসিকভাবে বাংলাদেশীদের ভারতীয়করণ করা। '৯১-এর পর বেগম খালেদা জিয়ার সরকার সবকিছুতে 'অবাধ' নীতি অনুসরণ করায় 'র'-এর পক্ষে এধরনের পরোক্ষ বা Covert তৎপরতা চালানো সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খালেদা জিয়ার শাসনামলে 'র' এসব খাতে কত টাকা ব্যয় করে তার সুনির্দিষ্ট কোন হিসাব পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। এরকম একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল 'The New Nation' পত্রিকার ১৯ ডিসেম্বর '৯৬ সংখ্যায়। 'Bangladesh-India Relation :Thruth must be told' শিরোনামের ঐ রিপোর্টে প্রতিবেদক সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী উল্লেখ করেন, "একটি হিসেব মতে ভারত বন্ধুভাবাপন্ন সাংবাদিক সংগ্রহ ও তাদের হাতে রাখার জন্য প্রতিবছর ৩০ থেকে ৪০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করে থাকে। এছাড়া আরো ৭০ থেকে ৮০ মিলিয়ন টাকা খরচ করা হয় সহায়ক সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহ টিকিয়ে রাখার জন্য। তবে ভারত সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ প্রায় ৩০০ থেকে ৩৫০ মিলিয়ন টাকা প্রতিবছর সাহায্য হিসেবে দেয় তার মূল রাজনৈতিক 'প্লাটফর্মকে'।"

'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ'ঃ বঙ্গভূমি'র সমান্তরালে নতুন ষড়যন্ত্র

১৯৯১ সালের শুরুতে যখন পুরো বাংলাদেশ একটি চরম বিশৃংখল অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছিল, সকলে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সংসদ নির্বাচনের ঠিক সে মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার মাটিতে 'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ' নামে একটি সংগঠন দাঁড় করায় 'র'। স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনে জড়িত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই ছিলেন এর মূল সংগঠক। বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানুষ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে একথা পৃথিবীকে জানিয়ে বাংলাদেশকে একটি নিবর্তনবাদী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করাই ছিল মোহাজির সংঘ তৈরীর অন্যতম কারণ। এছাড়া ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী এসব কথিত 'মোহাজেরদের' মাধ্যমে পরবর্তিতে ভারতে এক কোটি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের প্রচারণাকে যৌক্তিক ভিতের উপর দাঁড় করানো হয়। পুশব্যাক ষড়যন্ত্রের পটভূমিও ছিল এই মোহাজির সংঘ। মূলতঃ একসময় পশ্চিমবঙ্গে আশ্রিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতন চলছে, এরকম সুপরিকল্পিত অবাস্তব অভিযোগ উত্থাপন করে পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দুদের অনুপ্রবেশ নিয়ে হৈ চৈ

বাঁধিয়েছে। শুরু করেছে বঙ্গভূমি আন্দোলন। খুব একটা সুবিধে না হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরাও ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে-এরকম একটি কাহিনী ফেঁদে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমানদের বিতাড়নের পটভূমি সৃষ্টির জন্যই 'র' এই কথিত 'মোহাজির সংঘ' নামে নতুন ষড়যন্ত্রের রূপরেখা তৈরী করে। যদিও এই 'মোহাজির সংঘ' সৃষ্টি করা হয় ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কিন্তু এনিয়ে ব্যাপক প্রচারণা শুরু হয় '৯২ সালে। এব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত 'মাসিক কলম' পত্রিকার ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ সংখ্যায় একটি সরেজমিন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। 'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘঃ ষড়যন্ত্র কাদের' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি এখানে পত্রস্থ করা হলো ঃ

'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ'ঃ ষড়যন্ত্র কাদের?

এ.এইচ. ইমরানঃ 'অনুপ্রবেশ' নিয়ে প্রচারণার জোয়ার পশ্চিম বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে যে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি করছে- তা অনস্বীকার্য। বিগত নির্বাচনে পশ্চিম বাংলায় বিজেপি-র নির্বাচনী প্রচারণার প্রধান বিষয়ই ছিল এই 'অনুপ্রবেশ'। অবশ্য বিজেপি এবং অন্য সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও পত্র-পত্রিকাগুলোর বক্তব্য হচ্ছেঃ অনুপ্রবেশের অর্থ হল মুসলিম অনুপ্রবেশ। হিন্দুরা হচ্ছেন শরণার্থী মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৬০ লাখ মুসলমানকে ভিটেমাটি ছাড়া করতে হবে। অনুপ্রবেশ সমস্যার এটাই হচ্ছে একমাত্র সমাধান।

স্বভাবতই এ ধরনের প্রচারণা রাজ্যের হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সন্দেহ-অবিশ্বাস সৃষ্টি করে চলেছে। নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলেছেন, মুসলমান অনুপ্রবেশের যে পরিসংখ্যান ও যুক্তি খাড়া করা হয়েছে- তার বাস্তব কোন ভিত্তিই নেই। সাম্প্রদায়িক কিছু সংগঠনের যোগান দেওয়া 'তথ্য' ও 'পরিসংখ্যান' সূত্র যাচাই না করেই পত্র-পত্রিকায় অবলীলাক্রমে ছেপে দেওয়া হচ্ছে। মুসলিমদের সম্পর্কে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা ও মুসলিম বিতাড়নই হচ্ছে এদের লক্ষ্য। নইলে একদিকে বিদেশী হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের স্বাগত জানানো এবং অন্যদিকে মুসলিম বিতাড়নের ধূয়ো তোলা সম্ভব ছিল না।

এর মধ্যে আবার অনুপ্রবেশ বিতণ্ডায় এক নয়া মাত্রা যোগ করেছে 'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ' নামের রহস্যময় এক সংগঠন।

মঞ্চে হাজির মোহাজির

১৯৯১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে নাটকীয়ভাবে এই সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর প্রথম আবির্ভাবেই দেখা গেল পশ্চিম বাংলার সংবাদপত্র জগত এবং রেডিও-টেলিভিশনে তাদের নিয়ে দারুণ হৈ-চৈ। হঠাৎ আবির্ভূত এ ধরনের ভুঁইফোর কোন সংগঠনকে কলকাতা বেতার ও দূরদর্শন নিজেদের 'মহামূল্য সময়' থেকে যে রকম ঢালাও বরাদ্দ প্রদান করেছে- তার দ্বিতীয় নজীর খুব একটা নেই।

'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ' তার জন্ম ও অস্তিত্ব ঘোষণা করে কলকাতার প্রেসক্লাবে এক অভূতপূর্ব সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে। দিন-ক্ষণ-তারিখ-সন হচ্ছে যথাক্রমে

মঙ্গলবার, অপরাহ্ন ২ ঘটিকা, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১।

এ সম্পর্কে খবরের কাগজ এবং বেতার ও দূরদর্শনে ফলাও করে যে খবর ছাপা হয় তার মোদ্দা কথা ছিল, আমরা হলাম বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী। আমরা হাজারে হাজারে ভারতে ঢুকে পড়ে বেশ থিতু হয়ে বসেছি। ধান্দা ও রোজগারপত্রের ব্যবস্থা করে নিয়েছি। কিন্তু এখন আমরা এতে সন্তুষ্ট নই। আমাদের এখন 'বিশ্বমানবাধিকার' চাই।

মোহাজির সংঘের লোকেরা প্রেসক্লাবে দু'আড়াই শ' লোকের এক মিছিল নিয়ে আসে। এদের ভিড়ের চাপে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণ উপচে পড়ে। মিছিলে এবং সাংবাদিক বৈঠক চলাকালীন এদের গগণবিদারী জঙ্গী শ্লোগান চলতে থাকে- 'নারাএ তকবীর, আল্লা হো আকবর' এবং 'বাংলাদেশ মোহাজির-জিন্দাবাদ'। এই কায়দায় 'সাংবাদিক বৈঠক' বা প্রেস কনফারেন্স আগে কখনো হয়নি বলে উপস্থিত সাংবাদিকরা মন্তব্য করেন। সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, যদিও 'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ' স্বঘোষিত মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের সংগঠন, প্রেস কনফারেন্সে কিন্তু সাংবাদিকদের কাছে 'মোহাজিরদের' লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তৎপরতার মন্তব্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন জনৈক দেবেনবাবু।

'সাংবাদিক সম্মেলনের' কথা প্রচারিত হওয়া মাত্রই 'অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের' এই দুঃসাহসমূলক স্পর্ধা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। আকাশবাণী কলকাতা ও দূরদর্শন বেশ খানিকটা সময় ও গুরুত্ব দিয়ে সব ক'টি সংবাদ বুলেটিনেই খবরটি সম্প্রচার করে। দৈনিকগুলোতেও ফলাও করে সংবাদটি ছাপা হয়। পরে আনন্দবাজার, বর্তমান, যুগান্তর, স্টেটসম্যান প্রভৃতি পত্রিকায় 'মুসলমান অনুপ্রবেশের' এই অকাট্য প্রমাণ নিয়ে জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় ও বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এদের মধ্যে একটু শালীন ও সংযমী ভূমিকা ছিল আনন্দবাজার পত্রিকার। ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১-তে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় 'অনুপ্রবেশের স্ফীত ধারা' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে- "যেভাবে একদল বাংলাদেশী সাংবাদিক সম্মেলন ডাকিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তাহারা পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারী, এই রাজ্যে ওই বে-আইনীভাবে হাজির হওয়া বাংলাদেশীর সংখ্যা লক্ষাধিক এবং গোটা ভারত ধরিলে পাঁচ লক্ষেরও বেশি- তাহা অবশ্যই পোড় খাওয়া পত্রকারদেরও মুখের বাক্য হরণ করিয়া লইয়াছিল। নিজেদের বে-আইন কাজের কথা সর্বসমক্ষে ঘোষণার মধ্যে এক ধরনের সরলতা, অকপট আচরণের ইঙ্গিত অবশ্যই মিলবে। কিন্তু তাহা হইতে সাধারণ মানুষের পক্ষেও সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইবে। আর, সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব যাহাদের তাঁহারা নিজেদের অপদার্থতার কোন সাফাই গাহিতে বসিবেন? এতগুলো চেক পয়েন্ট এবং সেগুলোর পাহারাদার ডজন ডজন শুল্ক ও অভিবাসন অফিসারদের তবে তনখা দিয়া পুষিবার কেন প্রয়োজন? জানিবার ইচ্ছা হয় যে, ওই বিশাল অনুপ্রবেশের ব্যাপারটা রাজ্য সরকারের জানা ছিল কিনা। না থাকিলে তাহা অবশ্যই গৌরবের বিষয় নহে, আর জানা থাকিলে সরকারকে বলিতে হইবে প্রতিরোধাত্মক কী কী ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে।.... সাংবাদিক সম্মেলনে মোহাজির সংঘের নেতারা উপস্থিত হইয়াছিলেন

বিরাট এক মিছিল সঙ্গে লইয়া। বোধ করি বক্তব্যের গুরুত্ব যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে।"

বিলক্ষণ বোঝা যায়, প্রেসক্লাবে মোহাজির সংঘের তরফ থেকে দেবেনবাবুদের বক্তব্যকে আনন্দবাজার ও দোসর অন্য পত্রিকাগুলো ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছে। এর মধ্যে মহাভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত 'অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ' জাতীয় কোন ব্যাপার রয়েছে কিনা বা সমগ্র বিষয়টিকে একটু তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে কিনা- আনন্দবাজারের পোড় খাওয়া সাফ্ দিল্ সম্পাদকীয় নিবন্ধের কলমচি একবারও তার প্রয়োজন অনুভব করেননি। বিশ্বাসের জন্য উন্মুখ প্রকৃত বিশ্বাসীর লক্ষণই হচ্ছে 'শুনলাম ও বিশ্বাস করলাম' জাতীয় সদা-প্রস্তুত হৃদয়-তনু-মন। আনন্দবাজার ও সহযোগী দৈনিকগুলো তাই বোধ হয় মুসলমান অনুপ্রবেশকে প্রমাণ-সিদ্ধ বলে মেনে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি করেনি।

এরপর সম্পাদকীয়টিতে আনন্দবাজার ভুঁইফোঁড় এই মোহাজির সংঘের বক্তব্যের খেই-কে শুধু ধরে নয় বরং টেনেটুনে আরও প্রসারিত করে কেবল পশ্চিমবাংলায়ই নয়, সেই সঙ্গে অসমওে বাংলাদেশী মুসলমানদের অনুপ্রবেশকে সুযোগ বুঝে 'প্রমাণিত' করে দিয়েছেন। যদিও কট্টর অসমীয়রা জাতীয়তাবাদী আসু-অগপ-আলফা এবং ক্ষমতায় থাকাকালীন তাদের পরিচালিত পুলিশ-প্রশাসন জোর তৎপরতা চালিয়ে শ' পাঁচেক মুসলমানকেও অনুপ্রবেশকারী বলে ট্রাইবুনালে দাঁড়া করাতে পারেনি।

আনন্দবাজার লিখেছেঃ "অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, সীমান্তের ওপার হইতে নিয়মিতভাবে প্রতিদিনই কিছু বিদেশী নাগরিক বে-আইনীভাবে যে এদেশে প্রবেশ করেন তাহা কর্তা-ব্যক্তিদের বিলক্ষণ জানা। দেশের ভিতরও অন্যায়ভাবে মদদ দিবার মতো অভিভাবকদের অভাব নাই। প্রতিবেশী রাজ্য অসমে যে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন ছাত্র নেতারা করিয়াছিলেন তাহার একটি দাবি ছিল, ওই বিদেশী নাগরিকদের চিহ্নিত ও বহিস্কার করিতে হইবে। তখন বাংলাদেশ সরকার ক্রমাগত মাথা নাড়িয়া বলিয়াছে যে একজন বাংলাদেশীও অবৈধভাবে ভারতে আসে নাই। ক্ষমতায় আসিয়া অগপ সরকার অবশ্যই বিদেশীদের সনাক্ত করিতে পারে নাই, কতকটা অক্ষমতা এবং কিছুটা আইনঘটিত জাটিলতার কারণে। মাঝখান হইতে কিছু নিরপরাধ মানুষকে লইয়া টানা হ্যাঁচড়া হইয়াছে মাত্র। 'আপনাদের বিদেশীরা কোথায় গেল?' বলিয়া রঙ্গ-রসিকতাও শুনিতে হইয়াছে অগপ মন্ত্রীদের। 'বাংলাদেশ মোহাজির সংঙ্ঘর' নেতারা এখন প্রমাণ করিয়া দিলেন-যদি সত্যিই প্রমাণের প্রয়োজন কাহারো থাকিয়া থাকে- যে বিদেশী অনুপ্রবেশ বাস্তবে ঘটিয়াছিল। শুধু অসমে নয় পশ্চিমবঙ্গেও। ...... ইতিপূর্বে সংবাদ-পত্রে যখনই অবৈধ চলাচলের কথা প্রকাশিত হইয়াছে সরকারী প্রবক্তারা তাহা অসত্য বা অতিরঞ্জিত বলিয়া এড়াইয়া গিয়াছেন। অভিযোগ তোলা হইয়াছে যে, কোনও কোনও মাতব্বর নেতা জানিয়া শুনিয়া এইসব বিদেশীর ভূয়া পরিচয়পত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। রেশন কার্ড এবং পাসপোর্ট পর্যন্ত বক্রপথে করাইয়া দিয়া তাহাদের ভারতীয় নাগরিক সাজাইয়াছেন। সরকার সেই অভিযোগ উড়াইয়া দিয়াছে। সীমান্ত এলাকার জেলাগুলোতে অস্বাভাবিক জনবৃদ্ধির উদাহরণ দেখাইয়া কেহ কেহ উদ্বেগ প্রকাশ

করিয়াছেন, সরকার কিন্তু পরম অনুদ্বিগ্ন থাকিয়াছে। ..... কিন্তু অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গটা এখন যেভাবে জনসমক্ষে আসিয়া পড়িল তাহাতে নিশ্চেষ্ট থাকা আর কি সরকারের পক্ষে সমীচীন হইবে?"

অসমে অনুপ্রবশেকারী চিহ্নিত ও বিতাড়ন করার যে পর্বটি অগপ সরকারের আমলে সংঘটিত হয়েছে তা সবার জানা। দেখা গেছে ন্যায় ও আইনের পথে সেখানে মুসলিম অনুপ্রবেশকারী খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ স্বাধীনতার পর অসমে জোরপূর্বক মুসলিম বিতাড়ন ঘটেছে লাগাতার, কিন্তু আগমন ঘটেনি। কাজেই আইন ও তথ্য-প্রমাণের বৈধতার ভিত্তিতে অগ্রসর হলে মুসলিম অনুপ্রবেশকারী খুঁজে না পাওয়ারই কথা। কিন্তু '৭১-এর আগে এবং তার পরেও পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে বাঙ্গালী হিন্দুরা অবিরাম অসমে ঢুকেছে, ঢুকছে। তাই দেখা গেছে অগপ সরকার অভিবাসী বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালী হিন্দুকেও নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছিলেন। দুটো ব্যাপারই আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় স্তম্ভের কলমচি মহাশয়ের ঘোরতর দুঃখের কারণ হয়েছে। তিনি এখানে বোধ করি বলতে চেয়েছেন আইনের পথে গেলে অসম থেকে কি করে মুসলমান বিতাড়ন করা যাবে? ভাবখানা-বাপু হে! যদি সিত্যই মুসলামন তাড়াতে চাও-তবে আইন-কানুনের রাস্তা ছাড়। এ জন্য তোমাদের মূলমন্ত্র হতে হবে 'বলং বাহু বলং'। যদি তা না পারো সেটা তোমাদের 'অক্ষমতা'। অভিবাসী বাঙালী হিন্দুরা 'নিরপরাধ' -তাদের নিয়ে 'টানা-হ্যাঁচড়া' করা কেন? এ জন্যই হয়তো কলমচি মহাশয় 'আইনঘটিত জটিলতা' ও 'অগপ-র অক্ষমতায়' বিষাদগ্রস্ত হয়ে জব্বর হা-হুতাশ প্রকাশ করেছেন।

১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১-তে 'গণশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় যে, 'অনুপ্রবেশকারীদের সাংবাদিক বৈঠক নিয়ে তদন্ত হবে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব মনীষ গুপ্ত জানান, এই সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা এবং প্রেস ক্লাব চত্বরের মধ্যে বিক্ষোভকারীদের ঢুকে পড়া ও বিক্ষোভ দেখানোর পেছনে কারা আছে তা খোঁজ নিতে কলকাতা পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরে অবশ্য এই খোঁজ-খবরের ফলাফল নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। মাঝখানে শুধু পুলিশ দপ্তরের একটি বিবৃতিতে ব্যাপারটিকে আরও জোরালো ও রহস্যময় করে তোলার চেষ্টা দেখা গেছে। গোয়েন্দা কর্তা ব্যক্তিরা এই মোহাজির সংঘের পেছনে বাংলাদেশের সংযোগ ছাড়াও পাকিস্তানেরও জড়িত থাকার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন। সাংবাদিকদের তারা বলেন, 'খতিয়ে দেখা হচ্ছে এই 'বাংলাদেশী মোহাজির সংঘের' সঙ্গে পাকিস্তানের মোহাজির কওমী মুভমেন্ট (MQM) দলের কোন ধরনের যোগাযোগ রয়েছে কিনা।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হল, পাকিস্তানের 'মোহাজির কওমী মুভমেন্ট' পাক সংসদে একটি গুরুত্বপূর্ণ দল। মূলত ভারত থেকে চলে আসা হিজরতকারী[১]। মুসলমান ও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের বংশধর পাক নাগরিকেরা এই রাজনৈতিক দলটির সমর্থক। পাকিস্তানের এই দলটির সঙ্গে দু'হাজার মাইল ব্যবধানের পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত অনুপ্রবেশকারী মোহাজির সংঘের সংযোগ কেন গোয়েন্দারা কল্পনা করলেন- তা তারাই

১। আরবীতে হিজরতকারীদের বলা হয় 'মোহাজির'

জানেন। তবে একটা কথা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল-যারাই মোহাজির সংঘের নামকরণ করে থাকুক না কেন- তারা সাম্প্রদায়িক একটি মহল প্রচারিত তথাকথিত 'অনুপ্রবেশ ও আন্তর্জাতিক মুসলিম ষড়যন্ত্র' থিয়োরীতে আরও হাওয়া দিতে চেয়েছেন। তাদের দেখানো পথেই পা ফেলেছেন আমাদের গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ।

১৫ ফেব্রুয়ারী ঐ সংবাদে 'গণশক্তি' অবশ্য অন্য একটি ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। পত্রিকাটির মতে দূরদর্শনের ভূমিকা খুবই আশ্চর্যজনক। সাধারণত প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের সাংবাদিক সম্মেলন ছাড়া অন্য কোন সংগঠন, রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির সাংবাদিক সম্মেলনের ছবি দূরদর্শনে দেখানো হয় না। কিন্তু মোহাজির সংঘের সাংবাদিক সম্মেলন এবং বিক্ষোভের ছবি বেশ সময় নিয়ে কলকাতা দূরদর্শনে দেখানো হয়। গণশক্তির ভাষায় দূরদর্শনের এই 'অতি আগ্রহ' প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে।

'মোহাজির সংঘের' এই সাংবাদিক সম্মেলন জাতীয় স্তরেও গুরুত্ব পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশের প্রমাণ হিসাবে এই সাংবাদিক সম্মেলন বিভিন্ন জায়গায় নানাভাবে উল্লেখিত হচ্ছে। এরও শুরু আনন্দবাজারে। পত্রিকাটি ২৭ মার্চ '৯১-তে অনুপ্রবেশ নিয়ে এক বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। আনন্দবাজারের প্রতিবেদক তাপস সিংহ এতে 'বেপরোয়া মোহাজির' শিরোনামে এক প্রতিবেদন লেখেন। এতে মোহাজির সংঘের উপর এক 'অনুসন্ধানী' রিপোর্টে প্রমাণ করা হয় মোহাজির সংঘের অস্তিত্ব ও বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। সংঘের প্রেসিডেন্ট রইসউদ্দিন বিশ্বাসের সঙ্গেও প্রতিবেদক মহাশয় মোলাকাত করেন। সিংহমশাই নিজের অনুসন্ধানী তৎপরতার ফলাফল বিবৃত করেছেন এইভাবে ঃ 'দশ বছর হয়ে গেল রইসউদ্দিন এদেশে এসেছেন। এসেছেন তার মত আরও অনেকে। এই সব বাংলাদেশী-মুসলমান ছড়িয়ে পড়েছেন কাশীপুর, দমদম, বারাসাত, বিড়া, খিদিরপুর ৬ নং ডক, মতিঝিল, হাওড়ার বাঁকড়া, ব্যান্ডেল, মছলন্দপুর ও দ্বিতীয় হুগলী সেতু সহ বিভিন্ন জায়গায়। অথচ এদের কোথাও আটকানো হয়নি।'

নিবন্ধটি শেষ করেছেন তিনি সরকারকে উসকানির কষাঘাত করে। তাঁর ভাষায়ঃ 'ঢাকার একটি বিখ্যাত রসিকতা ছিল, 'অমন কথা কইবেন না কত্তা, শুনলে ঘোড়াতেও হাসব'। ('অনুপ্রবেশ হয় না', 'অনুমতি ছাড়া অ্যাকশন নিতে পারি না') রাজ্যের স্বরাষ্ট্রদপ্তরের এসব কথাবার্তা শুনে সাধারণ মানুষও কি একই কথা বলবেন না?'

ইংরেজী 'সানডে' পত্রিকায় ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ সংখ্যা অনুপ্রবেশ সম্বন্ধীয় এক নিবন্ধে (Making themselves at Home) 'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘে'র এই সাংবাদিক সম্মেলনকে 'প্রমাণ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুপ্রবেশ নিয়ে অন্য একটি নিবন্ধ খাড়া করে (শিরোনামঃ ৬০ লক্ষ বাংলাদেশী উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীয়ানা বদলে দেবে?) মাসিক 'আলোকপাত' তার আগস্ট ১৯৯১ সংখ্যায় লিখেছে, বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলার মানচিত্রে যে চোরা স্রোত বয়ে আসছে, সম্প্রতি তাঁরই ভয়ঙ্কর প্রকাশ '৬০ লক্ষ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী', এই বাংলার সীমান্ত এলাকা ধরে যারা ক্রমেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। ছড়িয়ে পড়তে পড়তে

দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কোথাও কোথাও। মিছিল করছে। বুক ফুলিয়ে বলছে, 'আমরা বে-আইনীভাবে এই বাংলায় প্রবেশ করেছি।' প্রকাশ্য রাস্তায়, এমনকি কলকাতায় তারা শ্লোগান দিতে দ্বিধা করছে না-'আল্লা হো আকবর, বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ জিন্দাবাদ।' দাবি তুলছে 'আমাদের দায়-দায়িত্ব নিতে হবে ভারত সরকারকে।'

দেখা যাচ্ছে মোহাজির সংঘ দ্বারা এই প্রেস কনফারেন্সকে গণমাধ্যম ও হিন্দু ফ্যাসীবাদী সংগঠনসমূহ মুসলিম অনুপ্রবেশের এক রকম 'সত্যায়িত দলিল' হিসাবে প্রচার করে চলেছে।

প্রেস কনফারেন্সটির জের যে এখনও সমানে টানা হচ্ছে তার আরও দু-একটা নমুনাঃ 'এদিকে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করা একদল মোহাজির কলকাতা শহরের বুকে মিছিল করে, সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দিতে হবে বলে দাবি তুলেছে। এখনও তারা নখদন্ত বিস্তার করতে পারেনি।'[২]

'কলকাতার রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার হাজার বাংলাদেশী মুসলমান নিজেদের 'অনুপ্রবেশকারী' বলে চিহ্নিত করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেও ঢাকার কর্তৃপক্ষ নির্লজ্জভাবে এদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।'[৩]

দূরদর্শনে গত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময়ে সি পি এম-এর বিমান বসু কংগ্রেসের সৌগত রায় এবং বিজেপি-র শ্রী বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী মহাশয় ভোট-সমীক্ষা করছিলেন। শ্রী বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীজী নিজের বক্তব্যের সপক্ষে মোহাজির সংঘের 'বুক ফুলিয়ে' মিছিল ও সাংবাদিক সম্মেলনের মোক্ষম প্রমাণ পেশ করে অপর দু'জন রাজনীতিবিদকে একেবারে লা-জওয়াব করে দেন।

এরপরেও বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যম বিশেষ করে রেডিও ও দূরদর্শনে 'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘের' নানা বক্তব্য, ছবি ও 'বিক্ষোভ' বিশেষ গুরুত্বসহ প্রচারিত হয়েছে এবং এ ধারা এখনও জারী রয়েছে।

যুক্তি-তর্কের সীমানা ছাড়িয়ে কিছু প্রশ্ন

এই মোহাজির সংঘের কার্যাবলীর যৌক্তিকতা ও বিশেষ একটি মহলের আচরণ বিচার করলে স্বাভাবিকভাবেই এমন কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় বাস্তব বুদ্ধিতে যার হিসাব মেলে না।

প্রথমতঃ অনুপ্রবেশকারীর সহজাত প্রবণতাই হলো চিহ্নিত হওয়াকে ভয় করা। সে যুক্তিসঙ্গত কারণেই চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রাণপনে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, সংগোপনে জনারণ্যে মিশে থাকতে চায়। অন্যথায় যে তার ক্ষতির সম্ভাবনা- তা সে ভালো করেই জানে। হিন্দু ও মুসলিম উভয় অনুপ্রবেশকারী সম্বন্ধেই একথা সত্য। কিন্তু বিশেষভাবে সত্য একজন মুসলিম অনুপ্রবেশকারী সম্বন্ধে। কারণ সে বেশ জানে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত পুলিশ, প্রশাসন এবং বিধি-ব্যবস্থায় যে

২। সাপ্তাহিক স্বস্তিকা, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১

৩। সুনীত ঘোষ, *উদ্ধৃতিঃ রাজধানী রাজনীতি*, দৈনিক আনন্দবাজার, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯১

স্বাভাবিক সহানুভূতি একজন হিন্দু অনুপ্রবেশকারী পেতে পারে, একজন মুসলিম অনুপ্রবেশকারীকে উল্টো বরং বিরূপ ও বিদিষ্ট মনোভাবের মোকাবিলা করতে হয়। অথচ বাংলাদেশ মোহাজির সংঘের 'মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা' কোনরকম প্রয়োজন ব্যতিরেকেই নিজেরাই নিজেদের অনুপ্রবেশকারী বলে ঘোষণা দিচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলন করে পুলিশ প্রশাসনকে প্রকাশ্যে প্ররোচনা দিচ্ছে যাতে তাদের দণ্ড দিয়ে কারাগারে প্রেরণ ও পরে বহিষ্কার করা হয়। নিজেদের স্বার্থ বিরোধী এমন কাজ পাগলেও করবে না, অথচ মোহাজির সংঘের মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা লাগাতার তাই করে চলেছে। ব্যাপারটি অবশ্যই রহস্যময়।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের এভাবে সাংবাদিক সম্মেলন, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মিছিল করার পেছনে উদ্দেশ্য কি? মোহাজির সংঘের দাবী কি? অনুপ্রবেশকারীদের হঠাৎ এসব করার কোন্ প্রয়োজন পড়ল? এ সবের মাধ্যমে কোন কিছু হাসিল করার সম্ভাবনা কতদূর? অনুপ্রবেশকারী হলে তারা থাকবে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং তারা হবে খুবই গরীব। কারণ সংগতিসম্পন্ন কোন মানুষ নিজের ঘর: দোর সম্পত্তি ফেলে এভাবে ভিন দেশে অনিশ্চিত ও কষ্টকর জীবনে প্রবেশ করে না। কারা তাদের সংগঠিত করছে? এজন্য টাকা পয়সা ও নেতৃত্ব কোথা থেকে আসছে?- মনে এ প্রশ্নগুলো উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

সাংবাদিক সম্মেলনে মোহাজির সংঘের বক্তব্য ও তাদের বিতরিত লিফলেট থেকে এ প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। খোদ মোহাজির সংঘেরই লিখিত বক্তব্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সহজ রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা থাকায় তারা এখানে এসেছেন এবং নানা ধরনের কাজকর্ম করে পরিবার-পরিজনসহ জীবন ধারণ করছেন। কাজেই এ অনুপ্রবেশকারীরা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় চুপচাপ ভোটারলিস্টে নাম তুলে নিজেদের ধীরে ধীরে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে নেবেন- এটাই হতো তাদের দিক থেকে যুক্তিসংগত আচরণ। কিন্তু তা না করে তারা উল্টো বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। তা দাবীগুলো কি? আশ্চর্যের হলেও সত্যি হচ্ছে নিজেদের অনুপ্রবেশকারী বলে সদম্ভ ঘোষণা দেওয়া ছাড়া তাদের বক্তব্য বা লিফলেটে বিশেষ কোন দাবীই নেই। নানা ধানাই পানাই করার পর লিফলেটে নিজেদের কথা ছেড়ে বাংলাদেশী হিন্দুদের কথাও বলা হয়েছে-'বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ হিন্দু সাম্প্রদায়িক নির্যাতনে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নির্যাতনজনিত অর্থনৈতিক সংকটে পিতৃপুরুষের ভিটাবাড়ি ছাড়িয়া ভারতে আশ্রয় নিয়াছে।'

শেষে বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের দফা ২৫ ও দফা ২৬- এর বরাত দেওয়া হয়েছেঃ 'প্রতিটি মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবা এবং বেকারত্ব ও অসুস্থতার সময় নিরাপত্তার অধিকার সহ তাহার পরিবারের উপযুক্ত স্বাস্থ্য এবং সাচ্ছন্দযুক্ত জীবন মানের অধিকার আছে। প্রতিটি মানুষেরই শিক্ষার অধিকার আছে।

উপরোক্ত ঘোষণায় পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র স্বাক্ষর করিয়াছে। আমরা যদি বিশ্বের মানবের

মধ্যে পড়ি তাহা হইলে আমরা কাজকর্ম করিয়া বিশ্বের কোথাও উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, চিকিৎসা এবং শিশু-কিশোরেরা শিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? মানব শরীর লাভ করিয়াও জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব মানবাধিকার হইতে বঞ্চিত হইব কেন? ভারত, বাংলাদেশ, জাতিসংঘ এবং বিশ্বের সকল মানুষের কাছে আমাদের দাবী যে, মানব শরীর লাভ সত্ত্বেও আপনারা যদি আমাদের বিশ্ব মানবের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে না করেন তাহা হইলে একযোগে আমাদের সকলকে মারিয়া ফেলুন অথবা সৎভাবে কাজকর্ম করিয়া পরিবারবর্গসহ মানুষের মতন বাঁচার ব্যবস্থা করুন।'

দেখা যাচ্ছে, মোহাজির সংঘের মূল দাবী হচ্ছে 'বিশ্ব মানবাধিকার' অর্জন। তারা ভারতীয় নাগরিকত্ব চাননি এবং 'বিশ্বের কোথাও' যে কোন জায়গায় সৎভাবে জীবন যাপনে প্রস্তুত। আর খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি দাবীগুলো পেশ করার জন্য নিজেদের 'অনুপ্রবেশকারী' বলে ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। প্রতিটি ভারতবাসীরও দাবী ঐ একই। তাদের সংগে মিশে এই দাবীগুলো উত্থাপন করাই ছিল সবেচেয়ে যুক্তিসংগত পথ। তা না করে এত ঝুঁকি নিয়ে 'বিশ্ব মানবাধিকার' চাওয়া সত্যি রহস্যপূর্ণ। প্রাসঙ্গিক অন্য প্রশ্নগুলোরও কোন সদুত্তর মোহাজির সংঘের আচরণ ও কাজকর্ম থেকে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশী মোহাজির সংঘের সাংবাদিক সভায় হিন্দু নেতাদের বক্তব্য পেশ ও মাতব্বরীরও হিসাব মেলানো কস্টকর। তাই স্টেটসম্যান পত্রিকাও তাদের পরিবেশিত সংবাদে [৪] বলতে বাধ্য হয়েছে 'বাংলাদেশী মোহাজির সংঘের নির্দিষ্ট কোন দাবী ছিল না'।

পথ যে আমার গেল বেঁকে

এসব প্রশ্নকে সামনে রেখে কলম-এর তরফ থেকে বিগত আগস্ট মাসে এক অনুসন্ধানী অন্তর্তদন্ত শুরু করা হয়। মোহাজির সংঘের লিফলেটে কার্যালয়ের ঠিকানা দেওয়া ছিল, ৫/১, খগেন চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০২। সহকর্মী আবদুল্লাহ আবুল কালামের সাথে কাশীপুর গানসেল ফ্যাক্টরীর উল্টোদিকে ঐ ঠিকানায় বিস্তর খোঁজাখুজি করেও মোহাজির সংঘের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। সেখানে রয়েছে প্রাচীর ঘেরা একটি পুরানো বিরাট দালান বাড়ি। কস্মিনকালেও সেখানে ঐ নামের কোন কিছু ছিল না বলে ঐ ঠিকানার লোকেরা জানালেন। বহু লোককে পুছতাছ করে শেষতক জানা গেল অনেকটা এগিয়ে গঙ্গার ঘাটের ধারে ঝোপড়িতে কিছু বাংলাদেশী থাকে। দেখা গেল সেখানে ত্রিশটির মতো হত-দরিদ্র বাংলাদেশী হিন্দু-মুসলমান পরিবার অস্থায়ী ঝোপড়ি তৈরী করে কোনক্রমে মাথা গুঁজে আছে। মোহাজির সংঘের প্রেসিডেন্টের হদিস পাওয়া গেল এখানেই। প্রেসিডেন্ট রইসউদ্দিন বিশ্বাস জনৈক নিমাই ঘোষের রিকসা ভাড়ায় নিয়ে চালায়। ঝোপড়িতে জানা গেল, এই মুহূর্তে রইসউদ্দিন বিশ্বাসকে পাওয়া যেতে পারে বরাহনগরে নিতাই ঘোষের সাইকেলের দোকানের সামনে জয়শ্রী সিনেমার কাছে রিকসা স্ট্যান্ডে। সেখানে গিয়ে ঘন্টা দেড়েক অপেক্ষা করার পর রিক্সা সমেত রইসউদ্দিন বিশ্বাসের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। এক রেস্টুরেন্টে বসে দীর্ঘক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা হল। তাঁর কথায়, সে বছর দশেক হল বাংলাদেশের যশোর থেকে এখানে

৪। ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ সংখ্যা

এসেছে, পরে পরিবার-পরিজনও নিয়ে এসেছে। ঝোপড়ির মুসলমান পরিবারগুলোর বেশিরভাগই তার আত্মীয় কিংবা চেনা পরিচয়ের মানুষ। তার প্রেরণা ও তদারকিতেই তারা এখানে এসেছে। সে নিজে লেখা পড়া জানে না। মোহাজির সংঘের ঠিকানা প্রসঙ্গে তার বক্তব্য হচ্ছে 'সংগঠনের জন্য ঠিকানা একটা চাই। তাই ওই ঠিকানাটা ব্যবহার করা হচ্ছে। কাশীপুরের এত ভিতরে তো মোহাজির সংঘের খোঁজে বড় কেউ আসে না।' আর পিয়ন চেনা থাকায় চিঠিপত্র এলে তা সে পেয়ে যায়। অবশ্য পাশের একটি স্কুলে তারা সংঘের বোর্ড লাগাতে পারবে বলে বাবুদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। রইসউদ্দিন মাঝে মধ্যে এখনও বাংলাদেশে যান বলে জানালেন। তাঁর কথায় রয়েছে আঞ্চলিক টান। রইসউদ্দিন বিশ্বাসের সঙ্গে কথোপকথনের কিছু অংশঃ-

- আপনারা বিক্ষোভ করলেন, প্রেস কনফারেন্স করলেন। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, বেশ তো ছিলেন, আছেন। মানে আপনাদের কি কেউ হয়রান করছিল, না অন্য কোন অসুবিধা হচ্ছিল?

- না, এখানে কেউ আমাদের হয়রান-পেরেশান করে না। আর অসুবিধা কেন করবে? আমরা কাজ করি, খাই। এখানকার লোক, খাস হিন্দুবাবুরা দরকারে আমাদের সাহায্যও করে।

- তাহলে বিক্ষোভ কেন? আপনাদের দাবী কি?

-(রইসউদ্দিন আমতা আমতা করতে লাগলেন, শেষে বললেন) আসলে একদিন ঐ হিন্দু কল্যাণ পরিষদ না কি যেন তার অফিসে যাওয়া হল। কথাবার্তা হলো। তারপর আমরা মিছিল করলাম। ছবি উঠলো।

- তা আপনাদের দাবীগুলো কি কি?

- সে তো বাবু, আমাদের কাগজে লেখা আছে।

- কেন আপনার জানা নেই?

- আছে, কিন্তু সব কথা কি মনে রাখা যায়?

- তা বাংলাদেশী মোহাজির সংঘের সদস্য কত?

- (একটু ভেবে) কয়েক হাজার হবে।

- আপনার হিসাবে কত বাংলাদেশী মুসলমান ভারতে ঢুকেছে?

- আমার মতে তো কম করে বিশ ত্রিশ হাজার হবে। তবে বাবুরা বলেন অনেক বেশী। ৬০ লাখ। আমার কিন্তুক মনে হয় হিন্দু-মোসলমান মিলালে অত হবে। একলা মোসলমান অত হবে না।

-তা রইস ভাই, আপনি যে বললেন হিন্দু কল্যাণ পরিষদ, না কোন্ পরিষদের বাড়িতে গিয়েছিলেন-তার ঠিকানাটা কি?

- (বিব্রত হয়ে) সেটা তো বলা যাবে না।

- ঠিক আছে, এই যে মোহাজির সংঘের লিফলেটে হিউম্যান রাইটসের কথা আছে, ইংরেজিতে নানান উদ্ধৃতি আছে-এগুলো কে লিখলো? আপনি?

- আমি মুখ্যু মানুষ। তবে আমাদের লোক আছে। বড় বড় বাবুরা আছেন, তারা লিখে

দিয়েছেন।

- বাবুদের নাম কি?

- সেটা তো বলা যাবে না। নেতারা মানা করে দিয়েছেন। এসব জানাজানি হলে তেনাদের অসুবিধা হবে।

- প্রেস ক্লাব ঠিক করে দেওয়া, খবর কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ করা, প্রেসে লিফলেট ছাপা, রেডিও-টিভি-কে ডাকা- এগুলো কে করলো? আপনার পক্ষে তো এসব সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। অন্য কথা বাদ দিলেও রোজকারের রিক্সা চালানো শেষ করে কলকাতা গিয়ে এসব কি করে করবেন?

- বাবুরাই সব করে দিয়েছেন। আমি তো এসব কিছু চিনি না।

- রইস ভাই, আপনাদের ঝোপড়িতে গিয়ে নিজেই দেখলাম আপনারা খুবই গরীব। প্রেসক্লাবের ভাড়া, লিফলেট ছাপা- এসবের জন্য টাকা কোথায় পেলেন?

- অল্প কিছু আমরা দেছি বাকিটা বাবুরাই বন্দোবস্ত করেছেন।

- তা এই যে আপনাদের লিফলেটে মোহাজির সংঘের সদস্য, কর্মকর্তা বলে আরও বেশ কয়েকজন মুসলমানের নাম রয়েছে, ঠিকানা না থাকলেও বিভিন্ন জায়গার নামে আছে-যেমন মোঃ ওমর আলী সর্দার (মছলন্দপুর) ইত্যাদি-তা এদের আপনি চেনেন? কখনও এসব জায়গায় গিয়েছেন? বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে যোগাযোগ হয় কি করে?

- আমি সবাইকে চিনি না। কিন্তুক বাবুরা জানেন, চেনেন। যোগাযোগ মানে মিটিং-মিছিলে দেখা হয়। বাবুরা ঠিক খবর পাঠায়ে দেন।

- আচ্ছা, আপনাদের সাংবাদিক সম্মেলনে দেবেনবাবু বক্তৃতা করেন। আপনাদের সঙ্গে ওর পরিচয় কিভাবে হল?

- ওকে আগে চিনতাম না। প্রেসক্লাবে যাওয়ার দু'তিন দিন আগে প্রথম দেখি। বাবুরাই ওকে ঠিক করে দিয়েছিলেন।

- বাবুদের নাম ধাম বললে অসুবিধা কোথায়? আমরা তাদের সঙ্গেও কথা বলবো। ওরা তো ভাল কাজই করছেন।

- না সাহেব। তেনারা রাগ করবেন। তেনাদের অসুবিধা আছে।

বোঝা গেল, রইসউদ্দিন বিশ্বাস বাবুদের ব্রিফিং-এর বাইরে যেতে রাজী নয়। গরীব রিক্সাচালক সে। খুব বেশি রাজনীতি বোঝে না। তেমন খবরাখবরও রাখে না। বাবুরা বলে দেওয়ায় রিক্সার মালিক কম ভাড়া দিয়ে বা কখনও ভাড়া না দিলেও তাকে কিছু বলে না। আর তাই রইসউদ্দিন মাঝে মধ্যে রিক্সা না চালিয়ে মিটিং-মিছিলে যেতে পারে। 'নইলে গরীবের সুযোগ কোথায়?'

তেনাদের সন্ধানে

এরপর আগস্ট '৯১-এর শেষ দিকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মুস্তাফিজুর রহমান ভারত সফরে আসেন। রেডিও, দূরদর্শন থেকে জানতে পারা যায় যে 'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ' ও 'বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ' এ উপলক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন,

স্মারকলিপি প্রদান ও ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির নিকট আলাদা আলাদাভাবে গণ অবস্থান ও সাংবাদিক সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কার্য উপলক্ষ্যে কলকাতার বাইরে থাকায় গণ অবস্থানের শেষ দিন রাত্রি আটটায় এক সহকর্মীর সংগে সংগঠন দুটির অবস্থান-প্যান্ডেলে হাজির হই। উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের লোকজন তখন 'অবস্থান' শেষ করে ট্যাক্সিতে উঠে রওনা হচ্ছেন। প্রশ্নের উত্তরে তারা তাদের কার্যালয়ের ঠিকানা দিয়ে আশ্বাস দিলেন যে সেখানে গিয়ে তাদের নেতা সুশান্ত সাহার সঙ্গে দেখা করলেই সংগঠনটি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যাবে। পাশেই মোহাজির সংঘর প্যান্ডেলে তখন কেউই নেই। ডেকোরেটার্সরা প্যান্ডেল ভাংছিলেন। তাদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল- তারা কলকাতার জানবাজারের 'নিউ শঙ্কর ডেকোরেটার্স'-এর লোক। উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ এবং মোহাজির সংঘ-দুটো প্যান্ডেলই তারা তৈরী করেছেন। সুশান্তবাবু নামে এক ভদ্রলোক তাদের এই প্যান্ডেল দু'টি তৈরী করার জন্য অর্ডার এবং টাকা-পয়সা দিয়েছেন। কাছাকাছি এই দুই সংগঠনের বাইকালার বেশ কিছু পোস্টারও দেখতে পাওয়া গেল। পোস্টার দুটির বয়ান হচ্ছেঃ (১ ও ২ নং বক্স দেখুন)

বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান উপলক্ষ্যে সিধু কানু ডহরে গণ অবস্থান ও অনশনে **দলে দলে যোগ দিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্মানজনক অস্তিত্ব রক্ষা করুন।** **সমাবেশ মঞ্চে বেলা ৪ ঘটিকায় সাংবাদিক সম্মেলন** **বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ** **৫/১, খগেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী রোড,** **কলিকাতা-২**

বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু বিতাড়ন, ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল, ধর্মান্তরিতকরণ, মন্দির ধ্বংস, সেটেলমেন্ট ও অর্পিত সম্পত্তির নামে বিষয়-সম্পত্তি খাসকরণ প্রভৃতি মানবাধিকার বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদে এবং বাংলাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতাসহ মূল চারনীতি প্রতিষ্ঠা, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার, সংখ্যালঘুদের বৈষম্যমুক্ত স্বাধীন সম্মানজনক জীবন যাপনের অবস্থা সৃষ্টি করা, বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ফেলে আসা বিষয়-সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ, উদ্বাস্তু হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুনর্বাসন লাভের দাবীতে আগামী ২৬শে আগস্ট, সোমবার বেলা ৯ ঘটিকায় দিল্লীগামী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান উপলক্ষ্যে সিধু কানু ডহরে গণ অবস্থান ও অনশন বেলা ৩ ঘটিকায় অনশনস্থল সভা মঞ্চে সাংবাদিক সম্মেলন বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ ৩৭, হুটাল গাছা রোড, কলিকাতা-৭৯

অক্ষর ও ছাপার সাদৃশ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, নামে ভিন্ন সংগঠনের হলেও পোস্টার দু'টি ছাপা হয়েছে একই প্রেসে। বয়ানেও দু'টি ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে উভয় সংস্থার 'সাবধান পত্র ও স্মারকলিপি' ছাপা হয়েছে একই কাগজে, হুবহু একই টাইপ ব্যবহার করে। এসব থেকে পরিস্কার মালুম পাওয়া যাচ্ছিল যে, মুখোশের আড়ালে উভয় সংগঠনই এক অদৃশ্য যোগসূত্রে এক সাথে বাঁধা রয়েছে। দুই সংগঠনেরই অন্তরালে কলকাঠি নাড়ছেন যারা তারা একই লোক।

রাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের লিফলেটে কার্যালয় হিসাবে উল্লেখিত ঠিকানায় (৩৭, ইটাল গাছা রোড, কলিকাতা-৭৯, দমদম এয়ারপোর্টের নিকটে) সহযোগী সাংবাদিক শিপ্রা আদিত্যকে নিয়ে উপস্থিত হলে দেখা গেল, এক বাড়ির বাইরের দিকে তালা দেওয়া একটি ঘরে পরিষদের সাইন বোর্ড লাগানো রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ঐ ঘরের সামনের দিকে দরজায় ঝোলানো তালা কখনো খোলে না। উদ্বাস্তু পরিষদের কেউ সেখানে থাকে না এবং পরিষদের কোন কাজকর্মও সেখান থেকে পরিচালিত হতে কেউ কখনো দেখেনি। ঘরটির পেছন দিকে গিয়ে দেখা গেল একটি ওষুধের গোডাউন বহাল তবিয়তে চলছে। চত্বরের মধ্যে বাড়ির মালিকের বসতবাটি। প্রথমে তো তাঁরা কিছুই বলবেন না। পরে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে খানিকটা বিশ্বাস জন্মানোর পর জানালেন, এই ঠিকানায় বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণের কেউ থাকে না। কেবল চিঠিপত্রের যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। আসল লোকেরা থাকে ভবানীপুরে। কাজকর্মও ওখান থেকে হয়। চিঠিপত্র এলে এরা ফোন করে জানান। ভবানীপুর থেকে লোক এসে চিঠিপত্র নিয়ে যায়। বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের আসল আস্তানা হিসাবে ওরা আমাদের ভবানীপুরের যে ঠিকানা দিলেন তা হল- 'সানি ভিলা', ২১, ডঃ রাজেন্দ্র রোড, নর্দান পার্ক, কলকাতা-৭০০০২০, ফোন নাম্বার ৭৫১০৩২ এবং ৭৫৬৯৩৫। বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের নেতা এবং আহ্বায়ক সুশান্ত সাহা ঐ ঠিকানাতেই থাকেন বলে তারা জানালেন।

নাটের গুরু

নর্দান পার্কের এই সানি ভিলা সম্বন্ধে সামান্য খোঁজ খবর করতে গিয়ে বেরিয়ে এল অনেক চমকপ্রদ তথ্য। এই ঠিকানায় থাকেন শ্রী চিত্তরঞ্জন ছুতার। তিনি হলেন বাংলাদেশ সংসদে আওয়ামী লীগের এক প্রাক্তন সাংসদ। তার আসল বাড়ি হচ্ছে বরিশালের স্বরূপকাঠিতে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর করতেন পাকিস্তান কংগ্রেস। ১৯৫৪ সালে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে পিরোজপুর নির্বাচনী এলাকায় তপসিলীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হন। তিনি বিয়ে করেন বরিশালের কংগ্রেস নেতা পিকে সেনের কন্যা মঞ্জুশ্রী দেবীকে। পূর্ব পাকিস্তানে গণআন্দোলন শুরু হবার সময় ১৯৬৯ সালে তিনি ভারতে চলে আসেন। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ তাঁর মাধ্যমেই শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ ও অন্য পাকিস্তান বিরোধী মহলের সঙ্গে পূর্ব বাংলায় যোগাযোগ রাখতো। বলা হয়ে থাকে, ১৯৭০ সালে ২১ রাজেন্দ্র রোডের সানি ভিলা নামক বহুতল বিশিস্ট বিরাট বাড়িটি

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা তার হাতে তুলে দেয়। এখান থেকে তৎকালীন পূর্ববাংলায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ, পরিকল্পনা তৈরী ও নির্দেশ প্রেরণ প্রভৃতি ব্যাপারে সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করা হতো। আওয়ামী লীগ-বাকশাল নেতা আবদুর রাজ্জাক প্রমুখের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পর 'পূর্ব ব্যবস্থামত' আওয়ামী লীগের নির্বাচিত কিছু নেতা সানি ভিলাতে এসে শ্রী চিত্ত ছুতারের সঙ্গে যোগযোগ করেন। ২৫শে মার্চ সংগ্রাম শুরু হবার আগেও আওয়ামী লীগের তরফ থেকে আবদুর রাজ্জাকরা শ্রী ছুতারের কাছে অস্ত্রশস্ত্র চেয়ে লোক (ডাঃ আবু হেনাকে) পাঠান। শ্রী ছুতার আশ্বাস দেন, 'সব রেডি হচ্ছে, ঠিক সময়ে পেয়ে যাবেন।' এ ব্যাপারে ভারতের তরফ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত জেনারেল উবান ও তাঁর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আওয়ামী নেতৃত্বের যোগাযোগ ও সমন্বয়কারী ছিলেন শ্রী চিত্ত ছুতার। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে শ্রী চিত্ত ছুতার প্রবল প্রভাব নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যান। ১৯৭৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগের টিকিটে সাংসদ হন। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্টে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হবার পর পরই তিনি আবার ভারতে চলে আসেন। ঐ সানি ভিলাই হয় তার স্থায়ী আস্তানা।

শ্রী চিত্ত ছুতারের অতীত কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জানা যায় যে, ভারত বিভাগের সময় চিত্ত ছুতার ও তার কিছু সহযোগী ভারতে অবস্থান করছিলেন। ১৯৫২ সালে শ্রী চিত্ত ছুতার, কালিদাস বৈদ্য ও নীরদ মজুমদার পূর্ব বাংলায় ফিরে যান। তারা সেখানে সংখ্যালঘুদের মুক্তির জন্য ব্যাপক কর্মতৎপরতা চালান। হিন্দুদের জন্য পূর্ববাংলায় এক 'স্বতন্ত্র বাসভূমি' প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা 'গোপন স্বাধীনতা আন্দোলন' চালাতে থাকেন। বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ, বাংলাদেশের জমিতে হিন্দুদের জন্য 'বঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার মূল হোতা হচ্ছেন শ্রী চিত্ত ছুতার ও ডাঃ কালিদাস বৈদ্য। চিত্ত ছুতার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে বহুকাল ভারতের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনেও ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

অবশ্য চিত্ত ছুতারের আসল লক্ষ্য হল পাকিস্তানকে ভেঙ্গে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ভেঙ্গে হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা। প্রথম পর্যায়ে সাফল্য লাভ করার পর শ্রী চিত্ত ছুতার এখন তাঁর আসল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য গোপনে কাজ করে চলেছেন।

চিত্তবাবু পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন মূলতঃ ভারত সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের জন্য। স্বাধীন বাংলাদেশেও মুজিব সরকারের উপর প্রভাব খাটানোর জন্য ভারত সরকার চিত্ত বাবুকেই ব্যবহার করেছেন। এখনও ভারত সরকারের তরফ থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন চিত্তবাবু। চিত্ত ছুতারের মাধ্যমে আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং অন্যরা বাংলাদেশে হিন্দু বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে টাকা পাঠাচ্ছে। আর এস এস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা ডাঃ সুজিত ধর এ ব্যাপারে চিত্ত ছুতারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। বর্তমানে কৌশলগত কারণে ডাঃ কালিদাস বৈদ্য দেখাশুনা করছেন 'বঙ্গভূমি' ও সশস্ত্র সংগ্রাম আন্দোলন। আর চিত্ত ছুতার নিজ দায়িত্বে

রেখেছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগযোগ, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিয়ে এক আন্তর্জাতিক ইস্যু খাড়া করা, প্রচারণা দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ মুসলিম অনুপ্রবেশের কল্পকাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে বাংলাদেশকে বেকায়দার ফেলা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলিম বিতাড়নের কর্মসূচীর জন্য জনমত গঠন ও একে বাস্তব ভিত্তি প্রদানের কর্মসূচী।

ছুতারের ঘরে ঘোঘের বাসায়

আগেই শুনেছিলাম ভবানীপুরের নর্দান পার্কের লাগোয়া রাজেন্দ্র রোডে শ্রী চিত্তরঞ্জন ছুতারের আস্তানা সানি ভিলার বিশাল বাড়িটি নিরাপত্তার কারণে দুর্ভেদ্য এক দুর্গপ্রায়। নীচের তলায় থাকে সামরিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেশ কিছু বাংলাদেশী হিন্দু যুবক এবং শ্রী ছুতারের জন্য ১৫ দেহরক্ষী। এদের মধ্যে বিশালদেহী কিছু অবাঙ্গালী অঙ্গরক্ষকও আছেন। অনেকের ধারণা, আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাই এই পাহারাদারদের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। চিত্তবাবু বাইরের লোকদের সঙ্গে দেখা করেন না, সাংবাদিকদের সঙ্গে তো নয়ই। তিনি নেপথ্যে থেকে গোপনে কাজ করতে ভালোবাসেন। আমি ও সহকর্মী সাংবাদিক শিপ্রা আদিত্য ফোন করে জানিয়েছিলাম, 'বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের' নেতা সুশান্ত সাহার সঙ্গে দেখা করতে চাই, ঠিকানা পেয়েছি দমদমের ইটালগাছা রোডের অফিস থেকে।

কথা মতো সকাল ১১টা নাগাদ সানি ভিলায় হাজির হলাম। বিশাল গেট। দু'তিন জনের পাঁচ-সাত মিনিটের জিজ্ঞাসাবাদের পর নীচের তলাতেই একটি ঘরে আমাদের বসানো হল। সামনেই দেখা যাচ্ছিল একটি ঘরে খাবারের পাত পড়েছে জনা কুড়ি লোকের। তারা খাচ্ছেন। এরা যে এখানে মেস করে খান তা বোঝা যাচ্ছিল। ঘরের একপাশে রয়েছে ৩৫০ সি সি'র একটি বিরাট বুলেট মোটর সাইকেল। তার নাম্বার প্লেট বাংলায় লেখা। যদিও ভারতে বাংলাভাষায় গাড়ির নাম্বার প্লেট লেখা নিষিদ্ধ। গাড়ি বারান্দায় রয়েছে একটি নতুন মারুতি জিপসি। একটু পরে ক্রাচ নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার এক যুবক প্রবেশ করলেন। খুটিয়ে নানা জেরা জিজ্ঞাসাবাদ। শেষে জানালেন আজ সুশান্ত সাহার সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি সংগঠনের কাজে বর্ডার অঞ্চলে গেছেন। আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের 'সহ আহ্বায়ক' বিজন কুমার রায়। এবার কথা বলার জন্য আমাদের লাগোয়া ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। দেবদেবীর ক্যালেন্ডার ছবি, শেখ মুজিবেরও একটি ছবি দেওয়ালে ঝুলছে। ঢুকলেন বিজন কুমার রায়। মুখচোরা শ্যামবর্ণ, বছর ত্রিশেক বয়স। সঙ্গে আর এক যুবক, ভালো স্বাস্থ্য, এরও বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যেই, হাতে দামী বিদেশী সিগারেট। নাম জানালেন বাপি, আগে পরে কিছু নেই। দীর্ঘক্ষণ আলাপচারিতার পর জানা গেল, বাপি চিত্ত ছুতারের ছেলে। বাবার এক নম্বর সহকারী, সমস্ত তৎপরতার দু'নম্বর পরিচালক। নেপথ্যে থাকা চিত্ত ছুতারের প্রধান মুখপাত্র। এলাকাতে 'নাম' রয়েছে। বিজন রায়ের প্রতিটি কথাকে গাইড করছিলেন বাপি, খেই ধরিয়ে দিচ্ছিলেন, অপছন্দ হলে থামিয়ে নিজেই বলছিলেন।

বিজন কুমারের কথা

বিজন কুমার রায় ভারতে এসেছেন বেশ কয়েক বছর। না, তিনি জীবন ধারণের জন্য কোন কাজই করেন না। তবু চলে যায়। বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের আগে নাম ছিল পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কল্যাণ পরিষদ। পরে নিউ ব্যারাকপুরে একটি মিটিং-এ কিছু লোকের অনুরোধে তাদের নেতা চিত্ত ছুতার নাম পরিবর্তন করেন। তাদের সদস্য ১৫/২০ হাজার হবে। তবে বলতে গেলে লাখ লাখ উদ্বাস্তু সবাই তাদের সমর্থক। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান-এসব জায়গায় তাদের সংগঠনের জোর তৎপরতা রয়েছে। তাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, হিন্দু উদ্বাস্তু এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক সাহায্য দেওয়া। অকথ্য অত্যাচারের জন্যই দলে দলে হিন্দুরা চলে আসছে। ধর্ষণ, যুবতী হরণ, জমি দখল, ধান লুট-এসবে হিন্দুরা অতিষ্ঠ। গণতন্ত্র এলেও কোন লাভ নেই। এই খালেদা জিয়ার স্বামীইতো সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' ঢুকিয়েছিল। ইসলাম এনেছিল, এরা সবাই এক। সুশান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য এলে পরে ছবি তুলবেন, আজ নয়।

বাপি জানিয়েছিলেন আহ্বায়ক সুশান্ত বাবুর সঙ্গে দেখা করতে দিন দশেক পরে আসার জন্য। সেদিন বিস্তারিত কথা হবে। সেদিন উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের অন্যতম মূল সংগঠক শ্রী বিপদভঞ্জন বিশ্বাস। উনি শহরতলীতে থাকেন। মূল সংগঠক হলেও চাকরী করেন বলে বাপিরা তাঁর নাম ব্যবহার করেন না।

দিন দশেক পরের সাক্ষাৎকারে শ্রী বিপদভঞ্জন বাবু হাজির না থাকলেও ছিলেন সুশান্ত সাহা। বাপিও মওজুদ ছিলেন। বাপি সেদিনের মত আজও সুশান্ত বাবুর বক্তব্যের গাইড হিসাবে কাজ করেন। সুশান্ত বাবুর বয়সও বছর ৩৫/৩৬। পেশী বহুল সবল চেহারা।

সুশান্ত বাবুর কথা

সুশান্ত সাহা ১৯৮৩ সনে চিত্ত ছুতারের এই সংগঠনে যোগ দেন। সুশান্ত বাবু, আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন করতেন। ১৯৭৩ সালে তিনি মাগুরার হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী কলেজের ভিপি ছিলেন। '৭৫-এ এমএ পাঠরত অবস্থায় ডিস্ট্রিক্ট ছাত্র লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যখন প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করল, তিনি তখন ভারতে চলে এলেন। উদ্দেশ্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ, তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারকে উৎখাত করা। আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় আনার ব্যাপক প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণও হয়েছিল। সুশান্ত নিজে বনগাঁতে সামরিক ট্রেনিং গ্রহণ করেন মতিগঞ্জে বি এস এফ ক্যাম্পে। আরও দু'শত যুবক সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়। (বাপি বাবুর কথায় এ সময় সুশান্ত বাবু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন)। বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা আসছে হাজারে হাজারে। কারণ হচ্ছে অত্যাচার। বিশেষ করে হিন্দু নারীদের প্রতি অত্যাচার, চলছে ধর্ষণ, কিডন্যাপিং, খুন। কোন

বিচার নেই। মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরাও তো আসছে? হ্যাঁ আসছে। তবে ওরা আসছে টাকা কামাবার ধান্দায়, ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা বড়ানোর জন্য। সুশান্ত বাবুদের সংগঠনের মূল দাবী কি? তারা কি ভারতে পুনর্বাসন চান, না বাংলাদেশে ফিরে যেতে চান? সুশান্ত বাবু জানালেন, ভারতে পুনর্বাসন মূল দাবী! তবে তিনি এখন ভারতের নাগরিকত্ব নেবেন না। কিন্তু ভারতেই থাকবেন। তবে যদি ভারত সরকার এবং জাতিসংঘ গ্যারান্টি দেয়, তবে বাংলাদেশে ফিরে যেতে রাজী আছেন। নইলে সংগ্রাম চলবে। পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশের মধ্যে কোন ফারাক নেই। নামটাই শুধু চেঞ্জ হয়েছে।

বাপির কথা

বাপি ছুতার জানালেন বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের তেমন কোন গঠনতন্ত্র বা Setup নেই। দু'জন আহ্বায়ক খাড়া করে সংগঠন চালানো হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী করে দেখা গেছে পদ নিয়ে ঝগড়া হয়, ব্যক্তিগত প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা চলে। তাই তার বাবা চিত্ত ছুতার এখন এভাবে সংগঠন চালানোর পক্ষপাতি। এতে ঝামেলা নেই। তাদের এই বাড়ি সানি ভিলার বাংলাদেশ যুদ্ধে বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কথায় 'যোগাযোগ' করতে '৬৯ সালে এই চিত্ত বাবু ভারতে আসেন। '৭০ সালে এই বাড়িটা ভাড়া নেন। এখন অবশ্য বাড়িটার মালিক তারাই। এখানে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের প্রায় সব নেতাই এসেছেন। আর এ জন্যই বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের সদর দপ্তর হিসাবে তারা সানি ভিলার নাম ব্যবহার না করে দমদমের ইটাল গাছা রোডের ঠিকানা ব্যবহার করেন। 'সানি ভিলার' নাম-ঠিকানা বাংলাদেশে অনেকেই জানে। তারা বুঝে ফেলবে।

বাপি বাবু কয়েকটি বাসের মালিক। ভবানীপুর এলাকায় 'বাপি' বললেই প্রায় সবাই চিনবে। বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের জন্য তার বাবা চেষ্টা করে চলেছেন। পশ্চিম বাংলার নেতারা বিশেষ করে কংগ্রেস নেতারা তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। উমাশঙ্কর দিক্ষীত যখন রাজ্যপাল ছিলেন-তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর মাধ্যমে কথা হয়েছে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় তাদের প্রতি দরদ রাখেন। অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন তার বাবা চিত্ত ছুতারের সঙ্গে প্রণব বাবুর বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছে। তবে ভারত সরকারের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া এখনও পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক শান্তিময় রায়ও তাদের সাহায্য করে থাকেন (দিল্লীর 'লিঙ্ক' পত্রিকায় লেখা বাংলাদেশ হতে মুসলিম অনুপ্রবেশ ও হিন্দু বিতাড়ন সংক্রান্ত শান্তিময় রায়ের একটি লেখার XEROX কপি বাপিদা আমাদের দিলেন)।

সেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় থেকেই তার পিতা চিত্ত ছুতার বাংলাদেশ তৈরির জন্য সক্রিয় ছিলেন। আগরতলা মামলাতে চিত্ত বাবু জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশী নেতা কাদের সিদ্দিকী, ঢাকার আওয়ামী লীগের মাসলম্যান হিসাবে পরিচিত ঔরং-এরা

নির্বাচনের আগে পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন। চিত্ত বাবুদের এখানে তাদের আসা যাওয়া ছিল। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা কলকাতায় এলে বা দিল্লীর পথে কলকাতায় যাত্রা বিরতি করলে মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে চিত্ত বাবুর দেখা হয়। শেখ হাসিনা চিত্তরঞ্জন ছুতারের কথা বাংলাদেশ সংসদে তুলেছেন। তাঁকে সসম্মানে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দাবী তুলেছেন। কিন্তু তাঁরা এখন ফিরে যাবেন না। বাপি ভারতেই থাকতে চান। তবে ভারতের নাগরিকত্ব নিতে ব্যক্তিগতভাবে তিনি এখন রাজী নন। তাঁর বাবা বাংলাদেশে তখনই ফিরে যাবেন যদি '৭১ সালের পরিবেশ এবং সংবিধান ফিরিয়ে আনা হয়। তবে সত্যি বলতে কি, আওয়ামী লীগও ভালো নয়। আসলে ওরাও তো মুসলমান। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হয়েছে। কিন্তু মানুষগুলোতো একই রয়েছে। থানায় সেই একই মুসলমান দারোগা, মুসলমান অফিসার, মুসলমান জজ। এরা মোটেই পাল্টায়নি। গাধাকে ঘোড়া সাজানো হলেও গাধা গাধাই থেকে যায়। সে কখনো ঘোড়া হয় না। তেমনি মুসলমানও খুব একটা পাল্টায় না।

'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ'ও তো বিদেশমন্ত্রী মুস্তাফিজুর রহমানের ভারত সফর উপলক্ষে উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের সঙ্গে পাশাপাশি গণ অবস্থান করল। তা তাদের মধ্যে কি কোন যোগাযোগ আছে-না, কোন যোগাযোগ নেই, বাপি জানালেন। কিন্তু আপনাদের লিফলেট, পোস্টার দুটিই একই জায়গায় একই টাইপে ছাপা হল কিভাবে? বাপি উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন। শেষে বললেন, হ্যাঁ মোহাজির সংঘের লোকদের আমরা চিনি মাত্র। আমার বাবা আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন। অনেক মুসলমান আমার বাবার কাছে আসে। 'তা মোহাজির সংঘের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে যোগাযোগ কিভাবে হবে?' বাপি রইসউদ্দিন বিশ্বাসের নাম ঠিকানা, কোন্ সময় ঠিক কোন জায়গায় পাওয়া যেতে পারে আমাদের বলে দিলেন-যদিও খানিক আগে যোগাযোগ নেই বলে জানিয়েছিলেন। 'মোহাজির সংঘ প্রেসক্লাবে যে সাংবাদিক বৈঠক করে তাতে জনৈক দেবেন বাবু বক্তৃতা করে। দেবেন বাবু কি আপনি?'না, মানে একথা ঠিক যে আমার ভালো নাম শ্রীদেবব্রত ছুতার। তবে প্রেসক্লাবে আমি বক্তৃতা করিনি। অন্য দেবেন করেছিল। হ্যাঁ, আমি অবশ্য মোহাজির সংঘের সাংবাদিক বৈঠকের সময় প্রেসক্লাবে উপস্থিত ছিলাম। 'আর এস এস-এর সুজিব ধর তো আপনাদের খুব ঘনিষ্ঠ?' না, না, তেমন কিছু ঘনিষ্ঠ নয়। উনি আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক, পরিবারের বন্ধু দীর্ঘদিন ধরে-এইমাত্র। বাপি কিছুতেই তার কিংবা উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের আহ্বায়কদের ছবি দিলেন না। অসুবিধা আছে-বাবা পছন্দ করেন না-এই ছিল তার উত্তর।

রইসউদ্দিনের গোপন কথা এবং ঝুলির বেড়াল

মোহাজির সংঘ নিয়ে অন্তর্তদন্ত শুরু করে এর সভাপতির সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রায় চার মাস পর গত ২২ ডিসেম্বর সকাল সাতটা নাগাদ রইসউদ্দিন বিশ্বাসের সঙ্গে পুনরায়

মুখোমুখী আলাপচারিতার জন্য কাশীপুরে তার ঝুপড়িতে হাজির হলাম। সঙ্গে ছিলেন সহযোগী মুহাম্মদ আলী। ক্যাসেট বন্দী এই মুলাকাতে 'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘের' প্রেসিডেন্ট রইসউদ্দিন বিশ্বাস তাঁর 'গুপ্তকথা' অকপটে বলে ফেলেন। ফলে পর্দা সরে গিয়ে মোহাজির সংঘের আসল চেহারা প্রকট হয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্ট রইসউদ্দিনের সঙ্গে আলাপচারিতার কিছু অংশের উদ্ধৃতি-

০ রইস ভাই, এবার কিন্তু আমরা বাপি বাবুর কাছ থেকে ঘুরে আসছি। বাপি ছুতারই আমাদের আপনার কথা বললেন। বললেন, আপনার সঙ্গে মুলাকাত করলে আরও অনেক কথা জানা যাবে।

০ (একটু বিব্রত হয়ে) অ, তাইলে তো বাল কথা।

০ আপনাদের দাবীর কথা আর একবার বলুন।

০ আমরা গরীব মানুষ, এই দেশে আমাদের বেঁচে থাকা দরকার, একটা শিক্ষা-দীক্ষা দরকার। ছেলেপুলেদের জন্য তো এসব দরকার। লিফলেটেও লেখা আছে আমাদের বিশ্ব মানবাধিকার দরকার।

০ এ ব্যাপারে বাপির বাবা চিত্তরঞ্জন ছুতার আপনাদের সাহায্য করেন না?

০ উনি চেষ্টা করেন। কিন্তু আসল তো হচ্ছে সরকার।

০ আমরা ভবানীপুরের সানি ভিলাতে গিয়েছিলাম। ওরা অনেক কথা আমাদের বলেছেন। চিত্তরঞ্জন ছুতার মহাশয়ই তো এসব করছেন। উনি আপনাদের মোহাজির সংঘের মাথা, আবার উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদেরও মাথা উনি। বুদ্ধি-শুদ্ধি, টাকা-পয়সা, নেতৃত্ব সব তেনারা দেন তাই না?

০ হ্যাঁ, সেইটা ঠিক। আপনারা তো এখন সব জানেন।

০ রইস ভাই, এই যে আপনারা আন্দোলন করছেন, মিছিল করছেন-এতে তো আপনাদের বিপদ। পুলিশ জেলে ঢুকাবে, বলবে বাংলাদেশে চলে যাও। তাই না?

০ আশা করি না যে বলবে। তবে ভয় আছে। কিন্তু কি করব? ছুতার সাহেব বলেছেন 'সরকার মারবে না হয় বাঁচাবে'।

০ বাংলাদেশে এখন যে খালেদা জিয়ার সরকার চলছে- তাদের কাছে কোন বক্তব্য রাখবেন?

০ তাদের কাচে বক্তব্য রাইখে কি হবে। আমি তো কিছু বুঝি না। এখানে তারা কি করবে?

০ তাহলে ওদের বিদেশমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিলেন কেন?

০ (রইসভাই এর কোন উত্তর দিলেন না)।

০ চিত্তরঞ্জন ছুতার সাহেব তো আওয়ামী লীগের এম পি ছিলেন। তা এখন উনি আপনাদের কি এডভাইস্ দিচ্ছেন?

০ ছুতার সাহেব বলছেন, সংগঠন কর। সংগঠন না করলে কিছু করতে পারব না।

০ আপনাদের বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ আমাদের প্রণব মুখার্জী-উনি খুব বড় নেতা-ওকে নিয়ে নিউ ব্যারাকপুরে ২৮ ডিসেম্বর মিটিং করছে। আপনি জানেন?

০ হ্যাঁ জানি, আমি ঐ মিটিং-এ যাবো।

০ আপনি পরিষদের অফিসে গেছেন?

০ হ্যাঁ, গেছি।

০ প্রণব বাবুকে কি মোহাজির সংঘের ঝুপড়ি দেখাতেও নিয়ে আসবেন?

০ আমি ছুতার সাহেবকে বলেছি। উনি বলেছেন, যে এটা হয়ে যাক। তারপর আমি চেষ্টা করে দেখি যদি উনি স্বীকার হয়, তাহলে নিয়ে আসবো।

০ সুশান্ত সাহা, বিজন রায় ভবানীপুরে সানি ভিলাতে থাকে এদের সঙ্গে আলাপ আছে?

০ হ্যাঁ, আছে।

০ যোগাযোগ কি করে হয়?

০ আমি সপ্তাহে একবার ভবানীপুরে যাই, তখন আলাপ হয়। এই ধরেন রাত ন'টার সময় যাই। কথাবার্তা হয়। রাত্তিরে ঐখানে থাইকে ভোরে চইলে আসি।

০ বাংলাদেশ আপনি কোন পার্টি করতেন?

০ আওয়ামী লীগ।

০ রইস ভাই, প্রথমবার কিন্তু আপনি ছুতার সাহেবদের কথা আমাকে বলেননি। বলেছিলেন অসুবিধা আছে। কিন্তু আমরাও লেগেছিলাম। তাই না?

০ আমার মত মানুষের কি ক্ষমতা আছে এতবড় একটা কাজ করবার? কিন্তু তখন বললে দোষের হয়ে যেত। এখন আপনারা নিজেরাই জেনে নিছেন। এখন আমার কোন অসুবিধা নাই। আমি অশিক্ষিত হইলেও আমার একটা জ্ঞান আছে। যে লোকের দ্বারা আমার উপকার হচ্ছে, তাঁর নাম যদি আমি আগেই বলে ফেলি তাহলে তো সেটা অসুবিধারই হবে।

এই লুকোচুরি খেলা কেন?

বাহ্যিক প্রমাণ এবং বিশ্বস্ত নানা সূত্রের খবর-উভয় দিক থেকে বিচার করলে পরিস্কার বুঝতে পারা যায়, শুধু বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ নয়, বাংলাদেশ মোহাজির সংঘও আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সংসদ সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন ছুতার মহাশয়ের সৃষ্টি এবং তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে ভাঙ্গার পেছনে শ্রী ছুতার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সঙ্গত কারণেই ভারত সরকার এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ দেশের স্বার্থে তাঁর সংযোগকে কাজে লাগিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পর আবারো ভারতে এসে শ্রী ছুতার যে সব কাজ-কর্মে লিপ্ত রয়েছেন তা পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসন পাক এটা তিনি চান না, আবার তারা বাংলাদেশে ফিরে যাক-তাও তাঁর কাম্য নয়। তিনি চান গণ্ডগোল পাকাতে, ভারত-বাংলাদেশ-এই দুই দেশের সম্পর্কাবনতির ঘোলা জলে মাছ ধরতে। তাতে যদি হাজার হাজার মানুষের জীবন, সম্পত্তি নষ্ট হয়তো হোক। নিজের মামলাকে জোরদার করার জন্য মুসলিম অনুপ্রবেশকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তাই তিনি খাড়া করেছেন এক নয়া সংগঠন 'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ।' প্রকৃত অনুপ্রবশেকারীরা যে কখনই এ ধরনের সংগঠন করতে যাবে না-তা বুঝতে পারা কারো জন্যই কস্টকর নয়।

সরেজমিনে অনুসন্ধানের সময় অনেকে একথা বলেছেন যে এক বিশেষ উদ্দেশে এবং এক বিশেষ মহলের সহায়তায় শ্রী চিত্ত ছুতার তার কয়েকজন গরীব মুসলিম অনুচরকে ভারতে নিয়ে এসেছেন। এদেরই মোহাজির সংঘের কর্মকর্তা হিসাবে পেশ করা হয়। বিক্ষোভ ও মিছিলের সময় সীমান্ত পার করে আওয়ামী লীগের বেশ কিছু হিন্দু-মুসলিম কর্মীকে চিত্ত ছুতার নিয়ে এসে থাকেন বলেও অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায়। তাঁর এ সমস্ত কুকর্মের লক্ষ্য একটাই। অস্থিরতা ও উত্তেজনা পয়দা করে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ এবং বাংলাদেশ মোহাজির সংঘের লিফলেট, পুস্তিকা, পোস্টার এবং সাবধানপত্র পড়লে স্পষ্টই দেখা যায় এদের নির্দিষ্ট কোন দাবী নেই। না ভারত সরকারের কাছে, না বাংলাদেশ সরকারের কাছে। আর কিছু বক্তব্য শুধুই কথার কথা। যেমন, প্রেসক্লাবে বিতরিত মোহাজির সংঘের লিফলেটে এক জায়গায় বলা হয়েছে 'খুবই আনন্দের বিষয় যে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জয়যুক্ত হইয়াছে। সেখানে অবাধ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলিতেছে। নির্বাচনোত্তরকালে সমাবেশ ও মিছিল করিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য ও দাবী দাওয়া উত্থাপনের আশা রাখি' হাজার কথা হচ্ছে নিজেদেরই বক্তব্য অনুযায়ী মোহাজির সংঘ ভারতে ঢুকেছে, তারা ভারতে আয়-উপায়, রোজগারের ব্যবস্থা করে নিয়েছে এবং ভারতে তারা 'বিশ্ব মানবাধিকার' চান। সে জন্য তাদের আন্দোলন। অথচ 'বাংলাদেশে নির্বাচনোত্তরকালে' বাংলাদেশ সরকারের কাছে তারা সমাবেশ ও মিছিল করে বক্তব্য উত্থাপনের আশা রাখেন। ভারতে তাদেরকে 'বিশ্ব মানবাধিকার' প্রদান করার জন্য বাংলাদেশ সরকার যে কিছুই করতে পারবেন না-তা বোধহয় একটি শিশুও জানে। আসলে চিত্তবাবুরা যেন তেন প্রকারে একটি ইস্যু খাড়া করতে চান। আর সে জন্যই এতসব পাঁয়তারা।

এজন্য চিত্তবাবুরা যে কার্যক্রম স্থির করেছেন, তাদের লিফলেট ও প্রচার পুস্তিকা থেকে সে সম্বন্ধে খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়। বাংলাদেশ বিদেশ মন্ত্রীকে দেওয়া 'সাবধানপত্রে' উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ জানিয়েছে 'উদ্বাস্তু আগমনের বর্তমান হার অব্যাহত থাকিলে-১. কোন এক সময় বাংলাদেশ প্রায় সংখ্যালঘু শূন্য হইয়া পড়িবে। ২· এইরূপ অবস্থায় বাংলাদেশ সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য রাজ্য উদ্বাস্তু-ভারে অর্থনৈতিক দিক থেকেই শুধু বিপন্ন হইবে না, সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা আয়ত্তের বাইরে চলিয়া যাইবে। ৩· বাংলাদেশ সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দিলে বাংলাদেশ (ভারত থেকে বিতাড়িত) মুসলমান উদ্বাস্তু-ভারে জর্জরিত হইবে। ৪· ভারত ও

বাংলাদেশের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হইবে এবং অবজ্ঞা-উপেক্ষায় উদ্বাস্তু-মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে সেই সুযোগ ভারত ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক শত্রুরা অবশ্যই গ্রহণ করিবে। ৫· পারস্পরিক তিক্ততা এবং আন্তর্জাতিক শত্রুদের বা প্রভুদের তৎপরতায় তখন বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের এই পূর্বাঞ্চলে কি ঘটিবে-তাহা বলা যায় না'।

না বলা গেলেও তা ঘটানোর জন্যই কিন্তু চিত্ত ছুতার মহাশয়রা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। একথাও ঠিক যেভাবেই হোক শ্রী চিত্ত ছুতার যথেষ্ট প্রভাব ধরেন। তাঁর প্রসাদোপম বাড়ি, দু'তিনটে গাড়ি, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রহরী, নবাবী চাল-চলন ও জীবনযাত্রার জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজনে ক'জন শরণার্থী বা উদ্বাস্তুর এতো টাকার উৎস কোথায় তা একটি প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে রয়েছে।

দূরদর্শন ও আকাশবাণীও শ্রী চিত্তরঞ্জন ছুতার ও তাঁর অঙ্গ সংগঠনগুলি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সদয়। বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ এবং বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ যে কোন স্মারকলিপি বা প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিক কিংবা মিছিল, বিক্ষোভ, অবস্থান সমাবেশ করুক-আকাশবাণী ও দূরদর্শন তা সাড়ম্বরে প্রচার করবেই। বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বা নাগরিক সংগঠনের কাজকর্ম কিন্তু সরকারের প্রচার মাধ্যম দু'টিতে 'সময়াভাবে' মোটেই স্থান পায় না। মুসলিম সংগঠন হলে তো কথাই নেই। প্রকাশ যে, দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে দু'জন কর্মকর্তার সঙ্গে শ্রীছুতারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলেই এটা সম্ভব হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা গেছে অনেক সময় মোহাজির সংঘের প্যাডে প্রেসিডেন্ট রইসউদ্দিন বিশ্বাসের স্বাক্ষরসহ আকাশবাণী ও দূরদর্শনে যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি সমূহ দেওয়া হয়-'প্রেসিডেন্ট সাহেব' স্বয়ং তার বিন্দুবিসর্গ খবর রাখেন না!

বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ বর্তমানে প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা ও যোজনা পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পরিষদ ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯১-তে নিউ ব্যারাকপুর ও নদীয়াতে প্রণব বাবুকে নিয়ে সভা তাঁকে উদ্বাস্তুদের 'ঝুপড়ি-ঘর পরিদর্শন করানোর' পরিকল্পনা নিয়েছে। পরিষদের মতে 'ভারতের কৃতি সন্তান' প্রণব বাবুও এতে রাজী হয়েছেন। এ ধরনের সন্দেহজনক ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে প্রণব বাবু না জেনে-বুঝে যে ভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছেন- তা তাঁর সেকুলার অনুগামীদের যে ক্ষুণ্ন করবে-তাতে সন্দেহ নেই।

সর্বশেষ প্রশ্নটি হলো, শ্রীচিত্ত ছুতার ও তার সহচররা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী বাংলাদেশী নাগরিক না ভারতের নাগরিকত্ব প্রার্থী সাধারণ উদ্বাস্তু-তা সর্বসাধারণের জানা প্রয়োজন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী প্ররোচক তৎপরতা চালানোর স্বাধীনতা তাকে দেওয়া উচিত নয়।

আর আমাদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের যে সুনাম-দুর্নামই থাকুক না কেন-তারা 'সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন' এই অভিযোগ কেউ কোন দিন করেনি। অথচ দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম বাংলার একটি বিশেষ সম্প্রদায় মুসলমানদের সম্বন্ধে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের

সংখ্যা ৫ থেকে শুরু করে ৬০ লাখে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, ভুঁইফোঁড় মোহাজির সংঘের ভুয়া তৎপরতা প্রদর্শন করিয়ে অনুপ্রবেশকে 'প্রমাণসিদ্ধ' ঘোষণা করা হচ্ছে-কিন্তু গোয়েন্দা দপ্তর ও পুলিশ সব জেনে বুঝে চুপ করে রয়েছেন। আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন সত্ত্বেও তারা বিভ্রান্তি দূর করতে বিন্দুমাত্র সচেষ্ট নন। উল্টো বরং তারা নিজেরাই 'এর সঙ্গে পাকিস্তানী মোহাজির কওমী মুভমেন্টের সম্পর্ক' আবিষ্কার করার জন্য জল্পনা-কল্পনা করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়াকে আরও কুয়াশাচ্ছন্ন করে তুলছেন। তাঁদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা কিন্তু ভিন্ন রকম।

পরিষ্কার কথা হচ্ছে, যদি আমাদের দেশের স্বার্থে শ্রী চিত্তরঞ্জন ছুতার ও তার অনুচরবর্গের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোন উপযোগিতা থেকে থাকে তবে তাকে সযত্নে সামাল দিয়ে রাখা হোক-কারো সামান্যতম আপত্তিও নেই। কিন্তু তাঁর কর্মতৎপরতা ভারতীয় নাগরিক হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সন্দেহের বীজ ছড়াক কিংবা উত্তেজনার সৃষ্টি করুক- দেশের স্বার্থে তা কখনো কাম্য হতে পারে না।

আরেক কাসিমবাজার কুঠি : কলকাতার সানি ভিলা 'বঙ্গভূমি' নেতা চিত্তরঞ্জন ছুতারের সেই রহস্যময় বাড়িটিতে যা ঘটে

যবনিকা উন্মোচন

এদিকে বঙ্গভূমি আন্দোলনের নেতা চিত্তরঞ্জন ছুতার কলকাতায় যে বাড়িটিতে বসে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা চালান সেই বাড়ি সম্পর্কেও অনেক চমকপ্রদ কিন্তু ভয়াবহ তথ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'র'-এর নির্দেশে কিভাবে সেখানে বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র ও কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে সে ব্যাপারে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক আগামী' পত্রিকার ১৫/৫/৯২ সংখ্যায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। 'র'-এর পলিসি মেকার ও বঙ্গভূমি'র নেতৃবৃন্দ কতটা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন প্রতিবেদনটিতে তাই তুলে ধরা হয়। ওয়াজেদ মির্জা রচিত ঐ প্রতিবেদনটির উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হলো ঃ বাইরে থেকে আপাতদৃষ্টিতে বাড়িটিকে অন্য আর দশটি বাড়ির মতোই নিতান্ত নিরীহ, নিষ্পাপ আর নিরপরাধ বলেই মনে হয়। প্রাথমিক এই অনুমান যে কতটা ভুল, তা যে কোনো অন্যমনস্ক পথচারীর পক্ষেই হাড়েহাড়ে টের পাওয়া সম্ভব-যদি তিনি নিজের অজান্তে একাধিকবার এই বাড়িটার আশপাশ দিয়ে চলাফেরা করেন। কারণ দ্বিতীয়বার থেকেই লোকটির পেছনে 'ফেউ' লেগে যাবে। তৃতীয় এবং চতুর্থবার যদি পথচারী লোকটি সে বাড়ির দিকে মনের ভুলেও দু'একবার তাকান, তাহলে রক্ষা নেই। মুহূর্তের মধ্যেই দেখতে পাবেন তিনি ঘেরাও হয়ে গেছেন। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ। সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারলে সর্বনাশ। লোকটিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে বাড়ির ভেতরে। কোনো রকম ওজর-আপত্তি ঘাইঘুই চলবে না। চিৎকার চেচামেচির কথা তো চিন্তাই করা যায় না। কারণ পিঠেঘাড়ে ততক্ষণে স্পর্শ করে আছে হিম শীতল লৌহ কঠিন রিভলবারের নল। অথবা

অন্য কিছু।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লোকটিকে নিয়ে যাওয়া হবে বাড়িটির ভূগর্ভস্থ গোপন কক্ষে। প্রথমে যান্ত্রিক পরীক্ষা। লোকটির কাছে বিস্ফোরক দ্রব্য, ইলেকট্রনিক্সের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আছে কি না। এই পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটির নিম্নাঙ্গের সকল কাপড় চোপড় খুলে ফেলা হবে। উদ্দেশ্য মধ্যযুগীর পন্থায় নিশ্চিত হওয়া লোকটি হিন্দু না মুসলমান। যদি হিন্দু হয় তাহলে তার বাড়ি কোথায়, এখানে কেন ইত্যাদি জেনে নিশ্চিত হলে, লোকটির কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলা হবে, 'বাংলাদেশে প্রতিদিন শত শত হিন্দুকে হত্যা করা হচ্ছে। হিন্দুদেরকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ করা হচ্ছে। বাড়িঘর সহায়সম্পদ সব লুটপাট করে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সেই সমস্ত নির্যাতিত হিন্দুকে রক্ষার জন্য আমরা এখানে একটা সংগঠন গড়ে তুলেছি। কিন্তু বাংলাদেশের গোয়েন্দা দপ্তর তা হতে দিতে চায় না। তারা হাজার হাজার আত্মঘাতী কমান্ডো পাঠিয়ে দিয়েছে। যাদের একটাই উদ্দেশ্য এই বাড়িকে উঁড়িয়ে দেয়া। সেজন্যই এই সাবধানতা। দয়া করে মনে কিছু করবেন না। কাউকে বলবেন না'। লোকটি যদি কিঞ্চিৎ পরিষ্কার মাথার কেউ হন এবং মুখ ফসকে বলে বসেন, 'বলেন কি হাজার হাজার....। বাংলাদেশের কি এত সাহস আছে? দিল্লী কিংবা জ্যোতি বাবু করছেটা কি?'

সঙ্গে সঙ্গে তাকে তীব্র ভর্ৎসনা শুনতে হবে, 'বাংলাদেশের লোকদের চেনেন, ওরা যেমন বর্বর তেমনই হিংস্র। ওরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই। আর-দিল্লী ব্যবস্থা নিচ্ছে বলেই তো আমরা এখানে। তবে জ্যোতি বাবুর কথা বলবেন না। তার বামফ্রন্ট তো পশ্চিম বঙ্গকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দিতে চায়।'

যদি ধৃত লোকটি মুসলমান হন তাহলে রক্ষা নেই। তার ওপর চলবে জিজ্ঞাসাবাদের ঝড়। তাতে নিশ্চিত হওয়া না গেলে শুরু হবে নানা প্রকার দৈহিক নির্যাতন। লোকটি যদি সত্যি সত্যি ভারতের নাগরিকও হয় (যাদের ধরা হয়েছে তারা সবাই ভারতের নাগরিকই ছিল) তাহলেও তাকে সন্তোষজনক জবাব দিতে হবে। নইলে তাকে আধমরা অবস্থায় তুলে দেয়া হবে সরাসরি ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর হাতে।

কেন এত সাবধানতা?

১৫ জনেরও বেশি সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত সাদা পোশাকের লোক ঘিরে থাকে বাড়িটির চারদিক। ওই সাদা পোশাকধারী রক্ষীদের মধ্যে যেমন রয়েছে বাংলাদেশী হিন্দু যুবক, তেমনই রয়েছে অবাঙালী রক্ষী। রয়েছে 'র'-এর নিজস্ব স্টাফ। বাড়িটির সদর দরজা ও চারদিকের দেয়ালে পাতা রয়েছে কম্পিউটার পরিচালিত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা। কারো সাধ্য নেই বিনা অনুমতিতে ওই সতর্ক ব্যবস্থাকে ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। এছাড়া বাড়ির ভেতরে রয়েছে অনেক সশস্ত্র লোক। দিন রাত ওই বাড়িতে ব্যস্ততা। লোকজনের ছুটোছুটি। জিজ্ঞাসা শুধু আমাদের নয়। জিজ্ঞাসা কলকাতার ভাবনীপুরের প্রতিটি সাধারণ মানুষের। এই বাড়িটিতে কি হচ্ছে? কারা থাকে?

কেনই বা সতর্কতা?

এই সব জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে-খুঁজতে ওই বাড়িটির রহস্যভেদ করেছে ভারতেরই একটি মাসিক পত্রিকা। তাদের ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে কেঁচো খুঁড়তে বেরিয়ে পড়েছে সাপ। এবং যে সে সাপ নয়। একদম খাঁটি গোখরো সাপ। হিংস্র এবং বিষধর! এই বাড়টি আসলে তথাকথিত 'বঙ্গভূমি' আন্দোলনের প্রধান দপ্তর। 'বঙ্গসেনাদের সেনা সদর'। 'বঙ্গভূমি'র স্বপ্নদ্রষ্টা, বঙ্গসেনার তাত্ত্বিক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য, 'মহা মহাপুরুষ' শ্রী চিত্তরঞ্জন ছুতারের সরকারী আবাসভবন। তথাকথিত 'বঙ্গভূমিওয়ালাদের' কাছে এটাই প্রেসিডেন্ট হাউজ। অত্যন্ত গোপন এবং গর্বের ধন।

বিশ্বাসঘাতকের সেই বাড়ি

বিশ শতকের শেষ পাদে বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘৃণিত, সবেচেয়ে কুৎসিৎ বিশ্বাসঘাতক চিত্তরঞ্জন ছুতারের এই আবাস ভবনটির নাম 'সানি ভিলা'। ঠিকানা; সানি ভিলা.... ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ রোড, নর্দান পার্ক, কলকাতা-৭০০০..... ফোন নম্বর ৭৫১০... এবং ৭৫৬৯...। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশকে অপমান করার ও বেকায়দায় ফেলার জন্য গড়ে ওঠা তথাকথিত 'বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতি' ও 'বাংলাদেশে মোহাজির সংঘ'-এর সদর দপ্তরও ওই 'সানি ভিলা'।

চট্টগ্রামে বন্দরটিলা নৌ ঘাঁটিতে বিশৃংখলা সৃষ্টিতে ইন্ধন দান

বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন হওয়ার পর 'র' এজেন্টরা যেমন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত ছিল তেমনি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে বেসামরিক জনগণের বিভেদ সৃষ্টিতেও অত্যন্ত সুকৌশলে ইন্ধন জুগিয়েছে 'ঘটনা সৃষ্টি'র লক্ষ্যে। এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের বন্দরটিলা নৌ ঘাটির ঘটনা উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। যদিও আপাতদৃষ্টিতে পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট পড়ে যে কারো মনে হবে যে, উচ্ছৃংখল ও সিভিলয়ান বিদ্বেষী কতিপয় নৌ সেনার অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকান্ডের ফলেই এধরনের ঘটনা ঘটেছে। তবে পরবর্তিতে ব্যাপক অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয় এই দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্য 'র'-এজেন্টদের উস্কানীমূলক তৎপরতাই মূলতঃ দায়ী। সেসময় জনগণের মনে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সম্পর্কে কিছুটা হলেও বিরূপ মনোভাব বিরাজ করছিল। কারণ, '৯০ সালে গণআন্দোলনের সময় ও এর পূর্বে সামরিক শাসন ও সামরিক বাহিনীকে বিরোধী রাজনৈতিক দল দমনে ব্যবহার করায় সে সময় স্বভাবতই দু'পক্ষের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। সুযোগসন্ধানী 'র'-এই বিভেদকেই আরো উস্কে দিতে চেয়েছে।

উল্লেখ্য, ৩রা জানুয়ারি '৯৩ তারিখে বন্দরটিলার ঘটনায় নৌ সদস্যদের গুলিতে ৪জন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয় ও শতাধিক আহত। এর ফলে সরকারী সিদ্ধান্তনুযায়ী 'দোষী ৪জন নৌ অফিসারসহ ১৯ জন বরখাস্ত হয়, যাদের মাঝে চট্টগ্রামস্থ কমোডর কমান্ডিং চিটাগাং (COMCHIT)- ও ছিলেন অথচ পরবর্তিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ব্যাপক অনুসন্ধান করে নিরীহ জনগণকে নৌ সেনাদের মুখোমুখি অবস্থানে নেয়ায় ইন্ধন

দানের অভিযোগে দু'জন 'র' এজেন্টকে গ্রেফতার করে। সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে যাদের গ্রেফতার করা হয় তারা হলেন – ডাঃ হরিপদ চৌধুরী ও জনৈক এস কে দাস। এরা বন্দরটিলা এলাকাতেই বসবাস করতেন বলে জানা যায় এবং জিজ্ঞাসাবাদে এরা উক্ত ঘটনা সৃষ্টিতে নিজেদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন।[৫]

রাজীব গান্ধী হত্যায় বাংলাদেশকে জড়িয়ে ভারতীয় অপপ্রচার, উদ্দেশ্য বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতাকে যুক্তিগ্রাহ্য করা

বেগম খালেদা জিয়া বা বিএনপি'র ক্ষমতাসীন হওয়াকে ভারতীয় নীতি নির্ধারকগণ কখনোই মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু একথাও তাদের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না যে, ১৯৯১ সালে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়েই বিএনপি বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় এসেছে। এছাড়া এ দলের রয়েছে ব্যাপক জনসমর্থন। সবচেয়ে বড় কথা দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রামের পর প্রতিষ্ঠিত একটি গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে হঠাৎ করেই 'কিছু একটা' করা সম্ভব ছিল না। তাই ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের নির্দেশনায় 'র' বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য ভিন্নপথের আশ্রয় নেয়। এক্ষেত্রে রাজীব গান্ধী হত্যাকান্ডে বাংলাদেশ জড়িত ছিল এমন একটি সংবাদ ফলাও করে প্রচার করা হয় পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে। ১৬ জুলাই '৯১ তারিখে 'র' স্পন্সরড এই খবরটি প্রচার করে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক বর্তমান'। এ ব্যাপারে ঢাকার পত্রিকা দৈনিক শক্তিতে[৬] প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়–

"নির্বাচিত ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে দেশের ভেতরে বাইরে গভীর ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে। এখানে সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাগুলো এমর্মে প্রাপ্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত ও তথ্য গভীরভাবে বিশ্লেষণ করছেন।

গত ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার ভারতীয় দৈনিক বর্তমান পত্রিকায় ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রের বরাত দিয়ে প্রকাশিত একটি খবরে রাজীব গান্ধী হত্যার সাথে বাংলাদেশকে জড়ানো হয়েছে। পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, রাজীব হত্যার নীল নক্সা প্রণীত হয়েছিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে।

পাকিস্তানের একজন পদস্থ সেনা অফিসারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে LTTE, ULFA, NSCN এবং PLA এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন বলে খবরে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সরকারীভাবে কোন প্রতিক্রিয়া ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করেছে বলে জানা যায়নি।...

তবে সরকারী মহল বিশেষ করে দু'একজন মন্ত্রীর সাথে আলাপ করে দেখা গেছে তারা এটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। একজন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'বিশ্বাস করবে বলুন, এর কোন ভিত্তি আছে?' কিন্তু ঢাকাস্থ কূটনৈতিক মহলে এ বিষয়টি দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একটি প্রভাবশালী দেশের জনৈক কূটনীতিক

৫। Tapan Khan, *10 including former minister, held as RAW men*, The New Nation, 15 August '93 issue

৬। ২১ জুলাই '৯১ সংখ্যা

রটনাটিকে নিছক বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেয়ার অবকাশ নেই বলে মন্তব্য করেন। তিনি বেগম জিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত ও জোরদার করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। একে একটা গ্রাউন্ড বা যৌক্তিকতা সৃষ্টির কৌশল বলে অভিজ্ঞমহল মত প্রকাশ করেন।

রাজীব হত্যার পরিকল্পনা ঢাকায় হয়েছিল এই প্রচারণা চালানোর উদ্দেশ্য হলো–ঢাকা, বিশেষ করে বর্তমান সরকারকে রাজীব হত্যার চক্রান্তের সাথে জড়িত করে কংগ্রেস সরকারের বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা ও ভূমিকা যুক্তিগ্রাহ্য করা। কংগ্রেস রাজনীতির সম্পূরক দলকে সহায়তা দেয়ার একটা ছুঁতা (Plea) খাড়া করার জন্যে ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র একটি বিশেষ দৈনিকের মাধ্যমে এ খবরটি ছড়িয়েছে।"

বাংলাদেশে বিশৃংখলা সৃষ্টির চক্রান্ত,
প্রয়োজনে বেগম খালেদা জিয়াকে হত্যার পথে এগিয়ে যাওয়া

১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেও সে সরকার ছিল দূর্বল। জেনারেল জিয়া যেভাবে ভারতীয় চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর ও বাস্তবানুগ অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন যে কোন কারণেই হোক বেগম জিয়ার সরকার সেরকম সতর্ক ও সচেতন ছিল না। অথচ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে প্রত্যক্ষভাবে বিদেশী এজেন্টদের কুপোকাত করা যায় না সেখানে সবসময়ই একটি শক্তিশালী কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। কিন্তু বিএনপি সরকার প্রথম থেকেই কোন এক অজ্ঞাত কারণে এদিকটিতে নজর দেয়নি। উল্টো কার বা কাদের পরামর্শে জানা না গেলেও সে সময় দেশের প্রধানতম গুপ্তচর সংস্থা ডিজিএফআইতে মহাপরিচালক হিসেবে এমন একজন মেজর জেনারেলকে নিয়োগ দেয়া হয় যার সম্পর্কে বরাবরই সন্দেহ পোষণ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পরবর্তিতে দেখা গেছে বেগম জিয়ার সামনে অতি অনুগত সেজে এই কর্মকর্তাটি গোপনে তাঁর উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার পথে যেমন এগিয়ে গেছেন তেমনি কোন এক অজ্ঞাত কারণে দেশব্যাপী সৃষ্টি করেছেন গোপন অস্থিতিশীলতা। বিভিন্ন সূত্র প্রাপ্ত তথ্যে এব্যাপারে ধারণা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, উক্ত কর্মকর্তার বিশেষ নির্দেশে ও ব্যবস্থাপনায় সেসময় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, গণআদালত যেমন সৃষ্টি হয়েছে তেমনি তসলিমা নাসরিন ইস্যুকে ব্যাপকাকারে আন্তর্জাতিকীকরণ করায়ও এ কর্মকর্তাটি সুনিপুন ইন্ধন জুগিয়েছেন। আবার একই সাথে ঘাদানি কমিটির বিরুদ্ধে যুব কমান্ড ও তসলিমা'র বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনকে জঙ্গী মনোভাব নিয়ে মাঠে নামায় প্ররোচনাদানকারী হিসেবেও তার সংশ্লিষ্টতার কথা জানা যায়।

যাহোক, বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সূক্ষ অসহযোগিতার সুযোগেই 'র' ও এদেশীয় সহায়তাকারী মহলটি '৯১ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে পুর্নোদ্যমে মাঠে নেমে পড়ে। এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে বিশৃংখলা সৃষ্টির পূর্বে সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবী, পত্র-পত্রিকায় এবং রাজনৈতিক অঙ্গনের কতিপয় 'এজেন্টের' মাধ্যমে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে প্রাথমিক পর্যায়েই বিএনপি সরকারের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া হয়। লোকে

খারাপ বলছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা গেল গেল ইত্যাদি প্রকরণে বিএনপি কাবু হয়ে পড়ে। ফলে প্রশাসনে যেমন সরকার বিপুল সংখ্যক ভারতপ্রেমীকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাখতে বাধ্য হয় তেমনি জেনেশুনেও অনেক ক্ষেত্রে সময়ানুযায়ী কঠোর ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারেনি। বলা চলে সাপের বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রেখে দুধ কলা দিয়ে বিএনপি নিশ্চিন্তে লালন পালন করেছে। হতে পারে এটা গণতান্ত্রিক উদারতা। কিন্তু অতি উদারতা দেখাতে গিয়ে তারা প্রতি পদে পদে যেমন নিজেদের দুর্বল করে ফেলেছে তেমনি বাংলাদেশের সার্বিক নিরাপত্তাকেও করেছে বিঘ্নিত।

লক্ষ্য করা যায়, '৯১ সালের জুন-জুলাই মাস থেকেই বাংলাদেশের প্রায় সকল সরকারী, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান, শ্রমজীবী, পেশাজীবী সংগঠনে ব্যাপক অসন্তোষ ও তৎপ্রেক্ষিতে আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। একের পর এক শুরু হয় পরিবহণ ধর্মঘট, শ্রমিক ধর্মঘট, জ্বালাও পোড়াও ইত্যাদি। এসব কেন ঘটতে থাকে সে সম্পর্কে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক সেসময় বলা হয়–

"ইতোমধ্যেই 'র' এজেন্টদের তৎপরতা লক্ষ্যণীয়। তাদের পরিকল্পনার অংশ হলো দেশে এক অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাতে সরকার সন্ত্রাস, হরতাল, ধর্মঘট, কর্মবিরতি, খুন, ডাকাতি সর্বোপরি আইন শৃংখলা রক্ষা করতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়বে এবং প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট মহলও বিরক্ত হয়ে উঠবে, সাধারণ মানুষ হতাশ ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে যে, এ সরকার ব্যর্থ। যখন এমনি একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে তখনই মুখোশধারী 'র'-এর এজেন্টদের মাধ্যমে নীল নক্সা বাস্তবায়নের সিগন্যাল দিবে। তখন কোন কিছু ঘটলে মানুষও তেমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে না। কারণ প্রতিদিন খুন, ডাকাতি, অস্ত্রবাজি, মারামারি, অপহরণ, ধর্ষণ, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, দ্রব্যমূল্য, সংবাদপত্রে একাধারে সরকারী ব্যর্থতার খবর, কর্মচারীদের মিছিল, ভ্যাট বিরোধিতার নামে খেলাফী ঋণওয়ালাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পন্ড করার চক্রান্ত। সারাদিনই মিছিল, মিটিং- এর কারণে যানজট, গাড়ী ভাংচুর ইত্যাদি অস্থিরতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ খালেদা জিয়ার সরকারের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠবে এবং ভাবতে শুরু করবে যে, একে সরাতে পারলেই বোধ হয় পরিস্থিতি উন্নত হবে। এমন মানসিকতার দ্বারপ্রান্তে জনগণ উপনীত হলেই বিএনপি'তে অবস্থানকারী ডাবল এজেন্টরা হিট করবে। যারা এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ তারা ইতোমধ্যেই এসব আলামত লক্ষ্য করছেন। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি স্থানে চিহ্নিত ব্যক্তিরা এবং স্বৈরাচারের বিশ্বস্ত দোসররা পুনর্বহাল হচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট মহল চমকে উঠছেন। বিশেষ করে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনকারী পুলিশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ যাদের কাছে তারা বর্তমান সরকারের প্রতি মোটেই অনুগত নয়। প্রশাসনে অবস্থানকারী জাতীয়তাবাদী ও ভারত বিরোধী অংশ সম্পূর্ণ কোণঠাসা ও হতাশ হয়ে পড়েছে।

তারা বুঝতে অক্ষম যে, খালেদা জিয়া কাদের পরামর্শে চলেন বা কোন সিদ্ধান্তের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা?

জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, জনগণ আন্দোলন করেছে ভোট দিয়ে, ক্ষমতায় এনেছে বিএনপিকে, আর বেগম জিয়া দেশ তুলে দিয়েছেন চিহ্নিত আসামীদের হাতে–এর রহস্য কোথায়? অথচ পুরো অবস্থার শিকার হবে বিএনপি সরকার আর 'র'-এর নীল নক্সা অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও দৈহিকভাবে বেগম জিয়া।"[৭] এছাড়া ঠিক একইরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় দৈনিক নগরিকের ২৭ জানুয়ারি '৯২ সংখ্যায়। এখানে উক্ত রিপোর্ট পত্রস্থ করা হলো।

সরকারের ভেতরে বাইরে বিভিন্ন স্তরে ৩০ হাজার 'র'–এর এজেন্ট তৎপর

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ বাংলাদেশের সরকার, প্রশাসন, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাংক, বীমা বিভিন্ন করপোরেশন, রেলওয়ে, বিমান, রেল পরিবহণ তথা যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা, খনিজ, পররাষ্ট্র, শিক্ষা সংস্কৃতিসহ প্রতিটি স্তরে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে।

প্রশাসনের কোন কোন ক্ষেত্রে 'র' এর পুরো নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়েছে। চিহ্নিত বিরোধী দল ছাড়াও অন্যান্য সংগঠনগুলোতে তাদের এজেন্টরা সক্রিয়। সারা বাংলাদেশে সর্বমোট ৩০ হাজারেরও বেশী 'র' এর এজেন্ট তৎপর রয়েছে।

মন্ত্রী, এমপি, আমলা, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রকাশক, অফিসার, কর্মচারী ইত্যাদি পর্যায়ের লোকজনই শুধু নয় ছাত্র, শ্রমিক, কেরানী, পিয়ন, রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, পোর্টার, কুলী, ট্যাক্সী ড্রাইভার, ট্রাভেল এজেন্ট, ইন্ডেন্টিং ব্যবসায়ী, সিএন্ডএফ এজেন্ট, নাবিক, বৈমানিক, আইনজীবীসহ বিভিন্ন স্তরে তাদের এজেন্ট সক্রিয় রয়েছে।

অত্যন্ত শক্তিশালী কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক ছাড়া এসব ছড়িয়ে থাকা এজেন্টদের সনাক্ত করা বা তাদের কাউন্টার করা সম্ভব নয়। হয়ত গোয়েন্দা অফিসেই কাজ করছে বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারী অথচ সে লোকটিই 'র'-এর পে-রোলে কাজ করছে।

ঢাকা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম, মঙ্গলা সমুদ্র বন্দরসহ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের নদী বন্দরগুলোতেও 'র'-এর এজেন্টরা সক্রিয়। সচিবালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর অফিস পর্যন্ত তাদের নেটওয়ার্ক রয়েছে।

বার্মার সৈন্য সমাবেশ, ভারতের চর দখল, ৫৩ জন জেলে ধরে নিয়ে যাওয়া, দেশের অভ্যন্তরে নানাবিধ বিক্ষোভ, ধর্মঘট, কর্মবিরতি, দাবীদাওয়া উত্থাপন, চরম সময়সীমা ঘোষণা, রেল স্টেশনে আগুন, বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারীদের ধ্বংসাত্মক আন্দোলন, শিক্ষকদের কর্মবিরতি ইত্যাদি প্রতিটি কর্মকান্ড নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে।

৭। দৈনিক শক্তি ২১-৭-৯১ সংখ্যা

বর্তমান সরকার চোরাচালানী বন্ধের জন্যে কঠোর পদক্ষেপ নেয়াতে ভারত বছরে ২ হাজার কোটি টাকারও বেশী আয়ের ১২ কোটি মানুষের একটি বাজার হাতছাড়া হয়ে গেছে দেখে পাগলপ্রায় হয়ে পড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হার প্রায় সমান সমান। বেসরকারীভাবে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে মুদ্রার মান বেড়ে গেছে। মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে তিন বার। এ অবস্থা ভারতের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

বিদ্যুৎ শ্রমিকদের ধর্মঘটের পেছনে উদ্দেশ্য হলো, বিদ্যুৎ সেকটরে বিশৃংখলা থাকলে শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়াস ব্যর্থ হবে। ব্যাংক সেকটরে উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো সরকারের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পর্যুদস্ত করে দেয়া। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস চালানোর জন্যে নিত্য নুতন রিক্রুট চলছে, অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে যেন কোন অবস্থাতেই সরকার সন্ত্রাস বন্ধ করতে না পারে।

সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চক্রান্ত সম্পর্কে যাতে কোন খবর কোন পত্রিকায় প্রকাশ করা না হয় সেজন্য বেহিসেবী খরচ যোগান দেয়া হচ্ছে। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের নামে বাকস্বাধীনতার নামে সরকারের প্রতিটি উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এসব কর্মকান্ডের সাথে যারা সরকারের ভেতরে বা বাইরে থেকে এসব ব্যাপারে সার্বক্ষণিক লিয়াজো রক্ষা করছে একান্ত আপনজনের মুখোশ পরে, তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হলে হুমকী, খুন করার চেষ্টা করা হয়। বার্মার সৈন্য সমাবেশের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ব্যরিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার বি বি সি'র সাথে যে সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন তাতে যথার্থই জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে।

গোয়েন্দা কার্যক্রম কিভাবে চালানো হচ্ছে তা সবিস্তার ব্যাখ্যা করা সম্ভবও নয় আবার তা বিপজ্জনকও। জীবনের ঝুঁকির প্রশ্ন জড়িত। ইতোমধ্যেই আমরা নলের মুখে অবস্থান করছি।

বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ইন্ডেন্টিং ফার্মের আড়ালে বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের আর্থিক প্রয়োজন মেটানো হয়। তৃতীয় চতুর্থ হাত দিয়ে তথ্য আদান প্রদান করা হয়।

এই নেটওয়ার্কের সাথে সরকারের প্রভাবশালী গ্রুপের ব্যক্তিবর্গ সরাসরি জড়িত। এমনও হতে পারে তিনি যে লোকটার সাথে সম্পর্ক রাখেন বা গোপন কথাবার্তা বলেন সে লোকটি এমন লোকের সাথে সম্পর্ক রাখে যে হলো বিদেশী গোয়েন্দা এজেন্ট। কাজেই তার কাছ থেকে সব তথ্য তারা পাচ্ছে।

সম্প্রতি ৮০টি এম্বুলেন্স জাপানী অনুদানে জাপান থেকে ক্রয়ের চেষ্টা করা হলে জনৈক মন্ত্রীর ভাই সেগুলো ভারত থেকে ক্রয় করার ব্যবস্থা করার জন্যে সচিবকে সেখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করেছেন-এটা কিভাবে সম্ভব হলো? 'র' এর সাথে সংশ্লিষ্ট এ গ্রুপটি আজ থেকে নয় বহু আগে থেকে অর্থাৎ '৮৪-'৮৫ সাল থেকে বিএনপি-বিশেষ করে বেগম জিয়ার পেছনে লেগে আছে। ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পী পঙ্কজ উদাসের গজল শোনার জন্য বেগম জিয়াকে গুলশানে ভারতীয় হাই কমিশনারের বাসভবনে নেয়ার

মাধ্যমে নেটওয়ার্ক চ্যানেলাইজ করা হয়। একজন মহিলা নেত্রী সহ কতিপয় ব্যক্তির মাধ্যমে বিগত নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের একজন ক্যাডার নেতাকে এমপি নির্বাচিত হবার পথ পরিষ্কার করার জন্য জাতীয় পার্টির একজন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে মনোনয়ন দেওয়ানোর পেছনে যাদের হাত তারাই এখন সরকারের মধ্যে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

এসব যাবতীয় তথ্য উদঘাটন করার দায়িত্ব সরকারের সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা বিভাগের। কিন্তু সেসব সংস্থার অভ্যন্তরেও এক অনীহার ভাব লক্ষ্যণীয়। তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। একটি পদস্থ সূত্র জানান, সন্ত্রাস বন্ধ করতে হলে আইন প্রয়োগ কার্যক্রম ও পদ্ধতিতে আমূল সংস্কার সাধন প্রয়োজন। দেশের বাছা বাছা, অভিজ্ঞ, দক্ষ ও পরীক্ষিত সাফল্য প্রদর্শনকারী পুলিশ ও গোয়েন্দা অফিসারদের সমন্বয়ে বিশেষ 'অপারেশন বুলডোজার' জাতীয় অভিযান চালাতে হবে। এমন একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা পেশ হলেও তা আর এগিয়ে নেয়া যায়নি। সম্প্রতি একজন ক্যাডার নেতার প্রায় অর্ধশত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অনুসারী দেশে এসেছে। ঐ ক্যাডার নেতা চলার সময় আগে পেছনে ১০/১২ টি অস্ত্রের পাহারা থাকে-হোন্ডা, মাইক্রোবাস ও গাড়ীতে। এমন নিখুঁত নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেশের প্রধানমন্ত্রীরও নেই। কিন্তু সরকারের ঐ শক্তিশালী মহলের সাথে তাদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের ভারতে পড়াশোনায় উদ্বুদ্ধ করা

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোয় ব্যাপক অস্ত্রবাজি, পেশী শক্তির মহরা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমর্থিত ক্যাডারদের উপস্থিতি এসব শুরু হয় স্বাধীনতার পর থেকেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃংখলার জন্য যেমন সাধারণ শিক্ষার্থীদের অসহায় অবস্থায় পড়তে হয় তেমনি সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান বা স্ট্যান্ডার্ডও হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস হলে শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বভাবতই নিরাপত্তাবোধের অভাব দেখা দেয় ও সৃষ্টি হয় সেশন জটের। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে মান ছিল, পাশ করা একজন শিক্ষার্থী যতোটুকু স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখতে পারতেন, স্বাধীনতার পর সে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে মারাত্মক পর্যায়ে। ফলে অর্থ ব্যয় করে যে অভিভাবক তার সন্তানকে ভালভাবে লেখাপড়া করাতে চান তিনি সঙ্গতকারণেই এ অবস্থায় তাঁর ব্যয়িত অর্থের পূর্ণ ফল আশা করবেন এবং এ কারণেই প্রায় সমপরিমাণ অর্থ খরচ করে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভারতে পাঠাতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। এক্ষেত্রে তাদের লাভ দু'টো। প্রথমত ভারত প্রতিবেশী দেশ ও সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যয় বাংলাদেশের মতোই। তার উপর সেখানে সেশনজট নেই বলে অতিরিক্ত সময় বা অর্থ অপচয়ের আশঙ্কা নেই। দ্বিতীয়ত ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস না থাকায় সন্তানের নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তা করতে হয় না। এছাড়া মান বা স্ট্যান্ডার্ডের প্রশ্ন তো আছেই। মূলত ঃ এভাবেই ভারত এদেশের অভিভাবকদের সাইকোলজিক্যালি বাধ্য করেছে তাদের সন্তানদের ভারতে পাঠানোর

জন্য। আবার এতে ভারতেরও লাভ হচ্ছে দু'ভাবে। একদিকে তারা যেমন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে তেমনি অন্যদিকে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী যুবক-যুবতীর মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারছে ভারতীয় আদর্শ। অন্যকথায় একে সুদূর প্রসারী লক্ষ্যে ব্রেইন ওয়াশ করাও বলা যেতে পারে।

এধরনের বিশ্লেষণ শুধু কথার কথা তা নয় বরং 'র'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে এব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে অশোক রায়না লিখিত 'ইনসাইড 'র' ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায়' বইয়ে বলা হয়েছে যে, 'র'-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো বিদেশী ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে বা অন্যকোনভাবে ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। আজ এদেশে যেভাবে একশ্রেণীর পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে ও সেগুলোতে যে আদর্শের কথা প্রচার করা হচ্ছে তাতে খুব সহজেই বোঝা যায় ভারত বেশ সাফল্যের সাথেই একটি বিপুল সংখ্যক ভারতপন্থী পাঠক বা মানস তৈরীতে সক্ষম হয়েছে। শিল্প-সংস্কৃতির সকল পর্যায়েও এখন ভারতমুখীনতা। এবং ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বা গুনগ্রাহী হওয়া ভিন্ন এসবের টিকে থাকাও সম্ভব নয়। যেহেতু এগুলো টিকে আছে ও দিন দিন এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই একথা বলা মোটেও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, 'র'-এর লক্ষ্য কিভাবে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌছেছে। সবচেয়ে বড় কথা একটি দেশের ব্যাকবোন অর্থাৎ শিক্ষিত শ্রেণী যারা প্রশাসন, ব্যবসা, সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করে তারা যদি ভারত শিক্ষিত হয় তাহলে একদিন না একদিন এদেশে আনুষ্ঠানিকভাবেই সকল কিছু ভারতায়ন হয়ে যাবে। বিনা যুদ্ধে একটি দেশকে সমান্তরাল আদর্শের বলয়ে নিয়ে আসায় এরচেয়ে আর কোন সহজ পথ আছে কী?

এদিকে, ঢাকার অন্যতম শিক্ষাঙ্গন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বুয়েট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস উস্কে দেয়া বিশেষ করে অস্ত্র, অর্থ ও নির্দেশ দেয়ার জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় কমিশনের 'র'-উইং সবসময়ই তৎপর থাকে। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে ভারতীয় দূতাবাসের শিক্ষা সচিব পদের আড়ালেই 'র'-কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয় বেশী। এছাড়া অপরাপর সকল দূতাবাস গুলশান, বারিধারার ডিপ্লোমেটিক জোনে থাকলেও ভারত ধানমণ্ডির দুই নম্বর রাস্তা থেকে তাদের দূতাবাস স্থানান্তরে রাজী নয়। এমনকি গুলশানে জায়গা বরাদ্দ দেয়ার পরও ভারত এ ধরনের কোন পদক্ষেপ নেয়নি। অভিযোগ রয়েছে নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'নিশ্চিন্তে' অপারেশন চালানোর জন্যই ভারত বরাবর রহস্যজনকভাবে দূতাবাস স্থানান্তরে গড়িমসি করে এসেছে।

এভাবে এক হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার ছাত্র ছাত্রী ভারতে পাড়ি জমাচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এবং এসব শিক্ষার্থীর পড়ালেখার খরচ চালানোর নামে প্রতিবছর ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছে প্রায় পনের হাজার মিলিয়ন টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। এব্যাপারে The New Nation পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে – "Successive post Mujib governments have failed either to free campuses from armed gangsters masquerading as student leaders or to maintain an academic calendar. A student is lucky if he or she is

able to physically survive the recurrent cross-firing between rival gangs and complete the three years BA honours couse in seven / eight years and get his or her result within a couple of years. The quality of their hard-earned degree is as vapid as the length of their misspent years. In such a situation, many parents are finding it necessary to send their children to Indian schools, colleges and universities. Such students now mumber around 1,70,000 apart from having a chance of mass production of Indianised Bangladeshis. This has also caused Bangladesh to drain out an estimated Tk. 15,000 million per year to India. Some of this amount she is using in drawing young Bangladeshi academics on various fellowships and in paying retainership to Bangladeshi academics and intellectuals serving the cause of Indianisation." [৮]

এদিকে বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলের প্রাথমিক ধাপে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোয় ব্যাপক বিশৃংখলা দেখা দেয়। যেখানে স্বৈরশাসনের পতনে ছাত্র অসন্তোষ বা আন্দোলন হ্রাস পাবার কথা ছিল সেখানে '৯১ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এর মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এব্যাপারে সে সময় 'সাপ্তাহিক সৈনিক'-এর ২৮ আগস্ট '৯১ সংখ্যায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসের নেপথ্যে 'র'

সৈনিক রিপোর্ট ঃ 'রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং' সংক্ষেপে 'র' (RAW) ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার নাম। প্রায় সমগ্র বিশ্বেই এর নেটওয়ার্ক। বিশেষ করে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের ছোট দেশগুলোর রাজনীতিতে এরা বিশেষভাবে তৎপর। ভারতীয় শাসকচক্রের বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে উক্ত গোয়েন্দা সংস্থাটি এসব ছোট দেশগুলোর রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের পরিবর্তন ঘটায়। নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসাবার জন্য যথোপযুক্ত পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন, রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি ইত্যাদি করে থাকে। ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন সরকার বা রাষ্ট্র স্থিতিশীলতা অর্জন করুক এটা 'র'-এর কাম্য নয়। এজন্য গড়ে তোলা হয় শিখন্ডী দল। অনেক সময় বড় বড় দলে অনুপ্রবেশ ঘটে এদের। বাংলাদেশের বর্তমান আইন শৃংখলা পরিস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের পিছনে তাকালেই আরো পরিস্কার হয় 'র' এর কলাকৌশল। এর পরও রয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নামে শিখন্ডী সংগঠন। তাদের বক্তব্য 'র'-এর লক্ষ্যের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। শোনা যাচ্ছে তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের হোতাদের সঙ্গে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সুন্দর যোগাযোগ আছে।

আরো শোনা যায় যে, ভারতে কংগ্রেস ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর 'র'-এর শীর্ষ পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন শাসক গোষ্ঠী নতুন পরিকল্পনা মাফিক এগুচ্ছেন। 'র'-

---

৮ । Salahuddin shoaib choudhury, *Bangladesh-India relations : Truth must be told,* The new Nation, 19 December 1996

এর মধ্যে বর্তমানে দু'ধরনের রাজনৈতিক উপাদান বিদ্যমান। কংগ্রেস পন্থী ও বিজেপি পন্থী। উল্লেখ্য, ইন্দিরা গান্ধী নিজ হাতে এক সময় গড়ে তুলেছিলেন এই সংস্থা। উদ্দেশ্য ছিল উপমহাদেশের সর্বত্র ও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অপ্রতিরোধ্য আধিপত্য গাড়ে তোলা। পরবর্তীতে এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিজেপি'র ধর্মোম্মাদনা। দলীয় বিভেদ থাকলেও তাতে পার্থক্য নেই বললেই চলে।

শিক্ষাঙ্গনগুলোতে বিভিন্ন সময় যে চকচকে উন্নত ধরনের অস্ত্রগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে, আশংকা হয়, এগুলো 'র'-এর হাত হয়েই আসছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাস ও গোলযোগ সৃষ্টির জন্য বিশ্বব্যাপী তাদের একটি চ্যানেল আছে। অনেকের ধারণা, সে পথ ধরেই ক্যাম্পাসে অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয়, শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ দেশের উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। আরো একটি বিপদজনক কথা হচ্ছে, বিগত কয়েক মাসে বিভিন্ন সীমান্ত পথে আগমন-নির্গমনের সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সচেতনমহল শংকিত। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৮১-র এপ্রিল মাসে জিয়া হত্যার পূর্বে এমনটি হয়েছিল। আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হচ্ছে, ইদানীং ভারতের বিজেপি'র অনুকরণে বাংলাদেশেও বিজেপি নামের একটি নতুন রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষণীয়। ঢাকার বেশ কিছু জায়গায় দেয়ালে দেয়ালে দেশীয় বিজেপির নানা দেয়াল লিখন ইত্যাদি চোখে পড়ছে। কাজেই, কিছু একটা ঘটবার আগেই আমাদের সবাইকে হতে হবে সতর্ক। সতর্ক হতে হবে সরকারকে।

মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সে 'র'- এজেন্ট অনুপ্রবেশের অভিযোগ ও দেশের গোপন তথ্য পাচার

বাংলাদেশের প্রশাসন, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে 'র' অনুপ্রবেশে সক্ষম হলেও সাধারণ জনগণের মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে, সেনাবাহিনীতে হয়তো 'র' হাত বাড়াতে পারেনি। যদিও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই সেনাবাহিনীতে ভারতীয় গুপ্তচর ছিল যাদের তৎপরতা '৭১-এর পর পুর্নোদ্যমে অব্যাহত থাকে; কিন্তু কখনোই 'র' সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীতে অনুপ্রবেশ করেছে এমন কথা শোনা যায়নি। অথচ, '৯১-এর পর কোন এক অজ্ঞাত কারণে, হতে পারে বিএনপি'র শিথিল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সুযোগে 'র'-সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীতে অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়। এব্যাপারে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কোন সুনির্দিষ্ট মন্তব্য পাওয়া না গেলেও "১৯৯২ সালে কলকাতার 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় বাংলাদেশ সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী সম্পর্কে একটি ভয়াবহ খবর ছাপা হয়। খবরে বলা হয় যে, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের কিছু সামরিক অফিসার ভারতের পক্ষে কাজ করছে। আনন্দবাজারের খবরে বলা হয় যে, পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা 'আই এস আই' নাকি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে বাংলাদেশে ট্রেনিং ও অস্ত্র দিচ্ছে।

বাংলাদেশে ডি এফ আই-এর একটি অংশ নাকি পাকিস্তানের ঐসব সামরিক তথ্য ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী, বিশেষ করে 'র'-এর এজেন্টদের হাতে তুলে দিচ্ছে।"[৯] আনন্দবাজারের রিপোর্টে যদিও বাংলাদেশ ইন্টেলিজেন্সের নাম হিসেবে ছাপা হয়েছে- ডিএফআই কিন্তু এটা বোঝা যায় যে, তারা মূলতঃ ডিএফআই বলতে ডি জি এফ আই বা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের কথাই বলতে চেয়েছেন। এছাড়া আনন্দবাজার আই এস আই'কে জড়িয়ে যে কথা বলেছে সেটি সম্পূর্ণ মনগড়া একটি প্রচারণা হলেও বাংলাদেশ গুপ্তচর সংস্থা বা সামরিক বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে যে 'র'-অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়েছিল তা অনেকটা সত্য। বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলের প্রথম দিকে সেনাবাহিনীর এরকম একজন অফিসারের ধরা পড়ার ঘটনাকে এপর্যায়ে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। উল্লেখ্য ১৯৯১ সালের জুন মাসে সেনাবাহিনীর একজন মেজর পদবীর কর্মকর্তাকে 'র'-এর কাছে তথ্য পাচারের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। এব্যাপারে ১৯৯২ সালের ২৩ শে আগস্ট অধুনালুপ্ত ইংরেজী দৈনিক 'The Telegraph'-এ একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল RETD MAJOR FACES TRIAL FOR PASSING SECRETS TO INDIA. উক্ত রিপোর্টে বলা হয়,

"অবসরপ্রাপ্ত মেজর সামছুল আরেফিন মূল্যবান গোপন রাষ্ট্রীয় তথ্য বিদেশে পাচারের অভিযোগে বিচারের সম্মুখীন। এসব গোপন তথ্যের মধ্যে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গোপন তথ্যও রয়েছে। ঢাকার সেশন জজ মামলাটি গত শনিবার মুখ্য মহানগর হাকিমের কাছে পাঠিয়েছেন। অভিযোগে প্রকাশ, ১৯৯১ সালের ৮ই এপ্রিল এবং ১৫ই মে তারিখে আসামি মেজর সামছুল আরেফিন ভারতীয় একজন অফিসারের নিকট গোপন তথ্য পাচার করেছেন। তার এই অপরাধের কারণে ৭ই জুন ক্যান্টনমেন্ট থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত মেজর সামছুল আরেফিন গত ৪ঠা জুন পুলিশী জেরার মুখে এই মর্মে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, সে ভারতীয় দূতাবাসের ভিসা অফিসার ডি,কে, চক্রবর্তীর নিকট রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য পাচার করেছে। সে ভারতীয় অফিসারকে জানিয়েছে যে, ১৯৯১ সালের মার্চ মাসের ঘূর্ণিঝড়ে ১০৭টি জঙ্গী বিমান, ১৬টি হেলিকপ্টার এবং ২৬টি রণতরী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

উল্লেখ করা প্রয়োজন, মেজর সামছুল আরেফিন যখন ভারতীয় দূতাবাস কর্মকর্তার কাছে তথ্য পাচার করেন তখন তিনি একটি ইন্টেলিজেন্স সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। 'র'-এর কাছে গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হলেও পরবর্তিতে কোন এক অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় তিনি ছাড়া পেয়ে যান এবং 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বপক্ষে' বই পুস্তক লেখা ও সেমিনারে 'বিশিষ্ট আলোচক' হিসেবে অংশ নিতে থাকেন।

৯। আসিক আরসালান, *দেশের গোপন তথ্য পাচার প্রসঙ্গ*, দৈনিক সংগ্রাম, ৮ মে '৯৭

রাজশাহীতে 'র'-এর পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ নেতা গ্রেপ্তার

বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সংখ্যালঘুদের কথিত স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের আড়ালে 'র'-তৎপরতা কতোটা ব্যাপকতা লাভ করেছে তা হয়তো কখনোই এদেশের জনগণের কাছে সরকার প্রকাশ করতে পারবে না। কারণ, সাংস্কৃতিক অঙ্গন ও সংখ্যালঘুদের কোন প্রতিষ্ঠান স্বাভাবতই স্পর্শকাতর। তাই দেশ পরিচালনাকারী রাজনীতিবিদদের অনেক কিছুই ছাড় দিয়ে চলতে হয়। আবার এদেশে যখন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী কোন দল ক্ষমতায় থাকে তখন এসব গ্রুপের বিরুদ্ধে কোনরূপ পদক্ষেপ নেয়া আরো দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তখন প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে ফেলার জন্য বিপরীত মেরুর রাজনৈতিক সংগঠনটি এধরনের কোন ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক ইস্যু হিসেবে চিত্রিত করে। এছাড়া এদের সমর্থন করার জন্য তো একশ্রেণীর পত্রিকা সবসময়ই প্রস্তুত থাকে ব্যাপক প্রচারণার লক্ষ্যে।

তাই দেখা গেছে ১৯৯১ সাল থেকে এধরনের বহু ঘটনা ঘটলেও তদানীন্তন বিএনপি সরকার এব্যাপারে খুব একটা কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। মূলত ঃ দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে যে জাতীয় ঐক্যমতের প্রয়োজন তা বিএনপি শাসনামলে কখনোই অর্জন করা যায়নি। আ'লীগের বিরোধিতাই ছিল ঐক্যমত গঠনে প্রধান অন্তরায়। অথচ, জাতীয় ইস্যুতে ভারত, পাকিস্তানসহ পৃথিবীর কোন দেশেই ভিনদেশী গুপ্তচরবৃত্তির পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থনের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাহোক, ১৯৯১ সালে যখন একটি নড়বড়ে অবস্থায় বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন ভারত তার সরকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চতুর্দিক থেকে। সর্বব্যাপী এই গুপ্তচরবৃত্তির ভয়াবহতা সামাল দিতে তখন সরকারকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই চলতে থাকে অস্থিতিশীলতা, গুপ্তচরবৃত্তির তান্ডব। এরই একটি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে রাজশাহীতে সাতজন ভারতীয় গুপ্তচরের ধরা পড়ার ঘটনা। এ ব্যাপারে ২৬ মে '৯৩ সংখ্যা দৈনিক দিনকালে 'রাজশাহীতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির মামলা ৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয় "ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি মামলার আসামী গয়ানাথ, বলরাম মাহাতো, রামপদ সরকার, সঞ্জীব রায় মিন্টু, চিত্ত রঞ্জন, তাপস মিশ্র ও আয়েজুদ্দিনের বিরুদ্ধে পুলিশ সম্প্রতি চার্জশীট দিয়েছে। এই ৭ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ দলিল ভারতে পাচার এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার ষড়যন্ত্রের দায়ে তাঁদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ডবিধির ১২৪ (ক) ১২০ (ক) ধারায় অভিযোগ আনা হয়।

অভিযুক্তদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের কর্মী বলরাম মাহাতো হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের রাজশাহী জেলা শাখার সাধারণ

সম্পাদক সঞ্জীব রায় মিন্টু, কৃষি মজুর গয়ানাথ এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আয়েজুদ্দিনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অপর ২ আসামী কারিতাস কর্মচারি চিত্তরঞ্জন ও বিভাগীয় কমিশনার অফিসের কেরানী তাপস মিশ্র পলাতক রয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানার দিয়াড় মানিকচর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ গোপন সরকারী দলিলপত্র ভারতে নিয়ে যাওয়ার সময় বিডিআর জোয়ানদের হাতে গয়ানাথ ধরা পড়ে। পরে সে পুলিশের কাছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির কথা স্বীকার করে। তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ ১৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহী মহানগরীর ঘোড়ামারা থেকে সঞ্জীব রায় মিন্টুকে গ্রেফতার করে। পরে পুলিশ আয়েজুদ্দিনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। বাকি দু'জনকে পুলিশ ধরতে পারেনি। তারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গয়ানাথ, বলরাম, রামপদ ও আয়েজুদ্দিন গোদাগাড়ী থানা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছে।

জানা গেছে, নভেম্বরের মধ্যে তদন্তের কাজ সমাপ্ত হলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতির অভাবে চার্জশীট প্রদানে বিলম্ব ঘটে। ২৭ এপ্রিল এই অনুমতি গোদাগাড়ী থানায় পৌছলে থানার ওসি হাবিবুর রহমান গত ৫ মে মামলার চার্জশীট দেন। আসামীদের স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, দলিলপত্র ছাড়াও তারা বিভিন্ন সরকারী ও সামরিক স্থাপনার মাস্টার প্ল্যান ও ম্যাপ ভারতে পাচার করেছে। আসামীদের নিকট প্রাপ্ত একটি রাজনৈতিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দেশে ব্যাপক রাজনৈতিক হত্যা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য ভারতীয় ও বাংলাদেশী কিছু আন্ডার গ্রাউন্ড সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন পরিকল্পনা নিয়েছে। এ সম্পর্কিত একটি রেজুলেশন থেকে জানা যায়, গত ২৪ ডিসেম্বর একটি গোপন পার্টির কংগ্রেস দিনাজপুরে হওয়ার কথা ছিল। এতে দু'জন ভারতীয় নেতার যোগদানের মাধ্যমে দু'দলের যুক্ত হওয়ারও কথা ছিল।

উদ্ধারকৃত কাগজপত্র থেকে জানা যায়, গত ৩ নভেম্বর থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত ভারতের দু'জন নেতা গোপনে বাংলাদেশের জেলাগুলো সফর করে সংগঠন গড়ে তুলবেন। একজন স্থানীয় নেতা ওই নেতাদের নিয়ে জেলা কমিটির সঙ্গে মিটিং করে পরিকল্পনা করবেন।

ওই রেজুলেশনে ৬২ জনের নাম, ঠিকানাসহ স্বাক্ষর রয়েছে। এদের বেশিরভাগই নদীয়া ও বর্ধমানের বাসিন্দা। আসামীদের কাছে আরো যেসব কাগজপত্র পাওয়া গেছে তার মধ্যে রয়েছে এ অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার হিন্দুদের ব্যক্তিগত পর্যায়ের জমিজমা ও সামাজিক গোলযোগকে কেন্দ্র করে থানায় দায়েরকৃত মামলা ও অভিযোগের অনুলিপি, স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট প্রেরিত রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের ফরওয়ার্ডিং লেটারসহ অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তির দাবি সম্বলিত জামায়াতের নীলফামারী শাখার স্মরকলিপি প্রভৃতি। এসব ভারতে পাঠানোর জন্য সংগৃহীত হয়েছিল বলে আসামীরা স্বীকারোক্তি করে।

গোদাগাড়ী থানার ওসি হাবিবুর রহমান বলেন, দেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড সংঘটিত

করে এদেশে ও ভারতে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করা এবং রাজনৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টির কাজে এই গুপ্তচর চক্রটি নিয়োজিত ছিল।"

এছাড়া ঢাকার আরেকটি ইংরেজী পত্রিকা 'দৈনিক টেলিগ্রাফের' ১৩ নভেম্বর '৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১লা অক্টোবর '৯২ তারিখে অনুকূল বিশ্বাস নামক অপর ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক অনুকূল বিশ্বাস 'র'-এর গুপ্তচর বলে সন্দেহ প্রকাশ করে রিপোর্টে বলা হয় বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতার কারণেই তাকে (অনুকূল বিশ্বাস) চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থানা সন্নিহিত মেদিনীপুর সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

'দি টেলিগ্রাফের' উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ভারতীয় 'র'-এর আরেকজন গুপ্তচর হলো উমা রানী নামের এক যুবতী। সে সিরাজগঞ্জে আস্তানা গাড়ে। রাজশাহীতে যখন সাতজনের গুপ্তচর চক্র ধরা পড়ে তখন উমা রানী ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিল। পথে বেনাপোল সীমান্ত থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। প্রকাশিত রিপোর্ট মতে, উমা রানীর কাছে রাষ্ট্রীয় অনেক গোপন তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র পাওয়া যায়।

এদিকে ঐ একই সময়ে '৭২-'৭৫ সাল পর্যন্ত জাসদ গণবাহিনীর সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত ডাচ নাগরিক পিটার কাস্টারস্-এর ব্যাপারেও বিভিন্ন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশী পত্র-পত্রিকায়। পিটার কাস্টারস বরাবরই একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন। ভারতীয় লবীর সাথেও তার ছিল ঘনিষ্ট যোগাযোগ। '৯২ সালের দিকে এই রহস্যময় ডাচ নাগরিক কলকাতা হয়ে ঢাকায় প্রবেশ করেন। সে সময় তার সন্দেহজনক গতিবিধি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় 'দি টেলিগ্রাফের' ৩ রা নভেম্বর '৯২ সংখ্যায়। উল্লেখ্য, জে. জিয়ার শাসনামলে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে পিটার কাস্টারসকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এরকম আরো বহু ঘটনাই বিএনপি শাসনামলে ঘটে যার বিবরণ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। পর্দার আড়ালে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা তদানীন্তন সরকার কি কারণে চেপে যান তা তারাই ভাল বলতে পারবেন। কিন্তু একথা হয়তো কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বেগম খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে 'র' যেভাবে সাড়াশি আপারেশন পরিচালনা করে তা ইতিপূর্বে আর কোন সরকারের সময় লক্ষ্য করা যায়নি। এক্ষেত্রে বিএনপি সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল এই যে, তারা গণতন্ত্রের নামে দেশের অর্থনীতি, প্রশাসন, সাংস্কৃতিক ও প্রচারণা অঙ্গনে এমন অবাধ, উন্মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করেন যাতে 'র'-এর পক্ষে প্রায় বিনা বাধায় সেই উন্মুক্ততাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করা খুবই সহজ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ, গণতন্ত্র রেখে একটি ছোট দেশকে বড় প্রতিবেশীর বিপরীতে টিকে থাকতে হলে যে শক্তিশালী ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা চালাতে হয় সেই অমোঘ সত্যকে বিএনপি বরাবরই অবহেলা করেছে। এক্ষেত্রে ইসরাইলের উদাহরণ উপস্থাপন করে বলা যায় ছোট গণতান্ত্রিক দেশকে টিকে থাকতে হলে থাকতে হবে কার্যকর প্রতিরক্ষা বাহিনী ও গুপ্তচর সংস্থা। অন্যথায় বৃহৎ

বৈরী প্রতিবেশীর মোকাবিলা করা ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। আর অর্থনৈতিক অগ্রগতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন তো দূরে থাক। কারণ, শক্তিশালী ইন্টেলিজেন্স ছত্রছায়া ব্যতীত এসব খাতে বৈরী গুপ্তচর সংস্থার ধ্বংসাত্মক তৎপরতা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

দুই বাংলা একত্রীকরণের অপপ্রচার

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যেভাবে ও যে হারে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীগণ পঙ্গপালের ন্যায় ঢাকায় আসতে শুরু করেছিলেন অনেকটা সেভাবেই '৯১-এর পর তারা আবার এদেশে এসে গার্জিয়ানসুলভ বক্তব্য প্রদান শুরু করে। এছাড়া ভারত থেকেও ভয়াবহ সব বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালানো হয়। এসবের মাঝে উল্লেখযোগ্য একটি ছিল দুই বাংলাকে একত্রীকরণের প্রচারণা। এব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের প্রথম প্রমাণ পাওয়া ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯২ তারিখে ঢাকার জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে। বিশ্ব শান্তি পরিষদ ও বাংলাদেশ শান্তি পরিষদ নামের দু'টি সংগঠনের যৌথভাবে আয়োজিত এই সেমিনারের বিষয় ছিল–'দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নয়া তাগিদ'। উক্ত সেমিনারে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতেই ভারতীয় ও বাংলাদেশী ক'জন বক্তা প্রকাশ্যে অবিভক্ত ভারত প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। কেউ আবার দুই জার্মানী একত্রীকরণের উদাহরণ টেনে দুই বাংলাকে একত্রিত করার উপদেশ দান করেন। তবে স্বাধীন দু'টি দেশ পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী একত্রিত হলেও পশ্চিমবঙ্গ কি স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশের সাথে যোগ দিবে নাকি বাংলাদেশ পরাধীন পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ ভারত ইউনিয়নে লীন হয়ে যাবে সে প্রসঙ্গ কিন্তু কোন বক্তাই উত্থাপন করেননি।

এদিকে সেসময় আলোচ্য সেমিনারে প্রদত্ত বক্তব্য নিয়ে বাংলাদেশে হৈ চৈ শুরু হলে 'ক্ষণিকের জন্য' ভারতকেন্দ্রিক প্রচারণা থমকে যায়। তবে তাই বলে ভারতীয় নীতি নির্ধারক মহল দুই বাংলা একত্রীকরণের আবেগমিশ্রিত কথার আড়ালে বাংলাদেশকে গ্রাস করার ভয়াবহ চক্রান্ত থেকে মোটেই পিছিয়ে যাননি। এমনকি তদানীন্তন ভারতীয় তথ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা কলকাতায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে দুই বাংলাকে এক করার দাবী জানান। এ ব্যাপারে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক আগামী' পত্রিকায় ১১ সেপ্টেম্বর '৯২ সংখ্যায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। 'বাংলাদেশকে গ্রাস করার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রঃ ভারতের তথ্যমন্ত্রী হঠাৎ দুই বাংলাকে একত্রীকরণের স্বপ্ন দেখার দুঃসাহস পেলেন কোথায়' শিরোনামের উক্ত প্রতিবেদনে প্রতিবেদক হামিদ হামিদুল হক উল্লেখ করেন- "খবরটি চমকে ওঠার মতো। কলকাতা থেকে ২৯ আগস্ট খবরটি এসেছে। কলকাতা দূরদর্শনের শ্রেষ্ঠ বিদেশী দর্শকের পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার কালিতলা গ্রামের আসাদুজ্জামান চৌধুরী। ১৯ বছরের আসাদুজ্জামান বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির প্রথম বর্ষের ছাত্র। কলকাতা প্রেস ক্লাবে কেন্দ্রীয় বেতার মন্ত্রকের আন্তঃমাধ্যম প্রচার সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অজিত পাঁজা আসাদুজ্জামানের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। তথ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা বলেন, 'কলকাতা দূরদর্শনের অনুষ্ঠান দুই বাংলার মানুষই দেখেন।'

বাংলাদেশের দর্শকরা আগ্রহ নিয়ে কলকাতা দূরদর্শনের অনুষ্ঠান দেখায় তিনি অভিনন্দন জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'এতে দুই দেশের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে।' তিনি

এরপর বলেন, 'গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা হয়ে থাকলে দুই বাংলার মধ্যে কেন বাধার প্রাচীর থাকবে? দুই জার্মানী এক হতে পারলে দুই বাংলা এক হবে না কেন?' তার আশা 'আসাদুজ্জামানের জীবদ্দশাতেই দুই বাংলা এক হবে।' ঢাকার একটি দৈনিকে খবরটি ছাপা হয়েছে। কলকাতা প্রেস ক্লাবের এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার সৈয়দ নূর হোসেনও উপস্থিত ছিলেন। ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দুই বাংলা একত্রীকরণের আকাঙ্খা বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনারের মাঝে কতটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তা জানা যায়নি। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও এ ব্যাপারে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজা কি তাহলে পশ্চিমবাংলাকে দিল্লীর শাসন থেকে মুক্ত করে দুই বাংলার একত্রীকরণ চান? একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও ডাকসাঁইটে কংগ্রেস নেতা কিছুতেই ভারতের কোনো অংশ ভেঙে যাক তা চাইতে পারেন না। সাম্রাজ্যবাদ সমর্থিত বড় বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের দল কংগ্রেস শোষণ ও পণ্য বাজারের স্বার্থেই অখন্ড ভারতের সম্প্রসারণ চায়। প্রতিবেশী দেশগুলোতে এদের সম্প্রসারণবাদী তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সিকিম গ্রাস করে ২২ তম রাজ্য ঘোষণা করা ভারতীয় শাসক শ্রেণীর একটি বড় অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

রুশ জাতি কর্তৃক অ-রুশ বিভিন্ন জাতির ওপর শোষণ-লুণ্ঠনের কারণে লেনিন জার শাসিত রাশিয়াকে 'জাতিসমূহের কারাগার' নামে উল্লেখ করেছিলেন। বর্তমানে দিল্লীর শাসক শ্রেণীর উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন জাতির ওপর নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে। ফলে ভারতও আজ জাতিসমূহের আরেক কারাগারে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের মিথ্যা ও প্রতারণাকে অস্বীকার করে নিপীড়িত বিভিন্ন জাতি দিল্লীর শাসন থেকে মুক্তির জন্য লড়াই করছে। অগ্নিগর্ভ পূর্বাঞ্চলে নাগা, মিজো, অহমীয়া, গুর্খা ও ঝাড়খন্ডীদের লড়াই চলছে। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে স্বাধীনতাকামীদের সাথে প্রতিদিনই ভারতীয় বাহিনীর বন্দুকযুদ্ধ চলছে। মূলত বন্দুকের জোরেই ভারতীয় শাসক শ্রেণী শোষণের স্বার্থে ভারতকে অখন্ড রেখেছে। ভারতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজা এগুলো ভাল করেই জানেন।"

এছাড়া জার্মানীর একত্রীকরণ ও দুই কোরিয়ার একত্রীকরণের উদযোগ দুই বাংলার অনেক সংগঠন ও ব্যক্তিকেও বাংলার একত্রীকরণে সে সময় অনুপ্রাণিত করে। এক্ষেত্রে গত ২১ ফেব্রুয়ারী '৯৪-এ পশ্চিম বাংলার একটি পত্রিকা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'র'-এর আশীর্বাদপুষ্ট পত্র-পত্রিকা জিটিভি, দূরদর্শনেও '৯২-'৯৩-'৯৪ সালে দু'বাংলা একত্রীকরণ কনসেপ্ট ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। সেসময় 'জিটিভি'তে 'ফিরে এলাম' নামে একটি ধারাবাহিক প্রদর্শিত হয় দীর্ঘদিন ধরে। এর কাহিনী ছিল বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গকে নিয়ে। এতে কিছুক্ষণ বাংলাদেশের প্রসঙ্গ দেখানো হতো, কিছুক্ষণ দেখানো হতো পশ্চিম বঙ্গের প্রসঙ্গে। এই সিরিজ নাটকের সংলাপে প্রায়ই উচ্চারিত হয়েছে 'দুই বাংলা' ধারণার কথা। সাথে সাথে আভাসে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে দুই বাংলাকে এক করার বিভিন্ন 'সুফলের' প্রসঙ্গ।

একই লক্ষ্যে ৩১ অক্টোবর '৯৩ তারিখে কলকাতার 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয় বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে। ঐ ক্রোড়পত্রে বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের 'বন্দী আমি' শিরোনামের একটি নিবন্ধ ছাপা হয়। সেখানে তিনি অনেক আক্ষেপ প্রকাশের পর লিখেন, "আমরা কবে এক হবো, হাঁটবো বনগাঁ থেকে বেনাপোল।"

এসব প্রচার প্রচারণা যে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা ছিল তা মনে করার কোন কারণ নেই। বরং নির্দ্বিধায় বলা যায় অজিত পাঁজা, বিশ্ব শান্তি পরিষদ, আনন্দবাজার, তসলিমা নাসরিন, জিটিভি-এরা সবাই একই সুতোয় বাঁধা। ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের বেঁধে দেয়া সূত্র মতে 'র'-এদের মাধ্যমেই বাংলাদেশকে গ্রাস করার চক্রান্ত বাস্তবায়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেছে; এটা বোঝা দু'য়ে দু'য়ে চার হিসাব মেলানোর মতোই সহজ।

বাংলাদেশকে খণ্ড খণ্ড করায় উস্কানি দান

১৯৯৪ সালের দিকে হঠাৎ করে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বিভাগ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মাথাচারা দিয়ে ওঠে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটি নিছক এলাকার 'মান সম্মান' বাড়ানোর লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে। একথাও হয়তো সত্য যে, যে বা যারা তাদের স্ব-স্ব এলাকায় বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন তারাও নিছক এলাকার স্বার্থ রক্ষার জন্যই তা করেছেন এবং স্বভাবতই স্ট্র্যাটেজিক ইন্টেলিজেন্স তৎপরতার গোপন উদ্দেশ্য এসব সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে বুঝে উঠা সম্ভব না। কিন্তু লক্ষ্যণীয় হলো-সে সময় এমনভাবে একটির পর একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয় যা একদিকে যেমন কোন সরকারের পক্ষেই মেনে নেয়া সম্ভব না, তেমনি এক পক্ষের দাবী মানলে অন্যান্য এলাকায় সরকারের অজনপ্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও থাকে প্রচুর।

মূলতঃ বিএনপি'কে তটস্থ রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের মাঝে বিচ্ছিন্নতার বীজ বা দর্শন অনুপ্রবেশ করানোই ছিল এসব কথিত আন্দোলনের লক্ষ্য। যদি তাই না হবে তাহলে '৯৬-এর পর এসব বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবী গেল কোথায়?

যাহোক, সে সময় এ নিয়ে অক্টোবর '৯৪-এ একটি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত লেখকের একটি নিবন্ধ এখানে হুবুহু তুলে ধরা হলো–

আঞ্চলিকতার হুজুগ ও দায়িত্বশীলতার দাবী

বাংলাদেশের ইতিহাস-আন্দোলনের ইতিহাস। সংগ্রামী জাতি হিসেবে বাংলাদেশীদের বিশেষ পরিচিতি আছে। কিন্তু এই সেই বাংলাদেশ, যেখানে 'হুজুগ' বলেও একটি বিশেষ শব্দ, বিশেষভাবে মনযোগের দাবী রাখে। যে কেউ ঢাকা শহরের যে কোন জায়গায় একটি মুখরোচক হুজুগ উঠিয়ে দিন, দেখবেন ২/১ দিনের মাঝেই তা সারা ঢাকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে যাবে। আর তা যদি কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে লালিত-পালিত-চর্চিত হয় তবে তো কথাই নেই। মুনির নামে জনৈক খুনীর ফাঁসি হলো; তাকে কবর দেয়া হলো। অথচ চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় বড় বড় হেডিংয়ে লেখা হলো যে, মুনির কলকাতায় পালিয়ে গেছে ও তাকে আসলে ফাঁসি দেয়া হয়নি, টাকা পয়সা খেয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এসব খবর পড়ে সারা দেশের লাখ লাখ ব্যক্তির 'মুনিরের ফাঁসি' নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রী নেয়ার মত অবস্থা। অবশ্য এ রকম হুজুগ ব্যক্তিপর্যায়ে ক্ষতিকারক হলেও দেশীয় পর্যায়ে ততটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের দেশে একটি আঞ্চলিকতার ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ হুজুগ বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতিকে ক্রমশঃই জটিল হতে জটিলতর

করে তুলছে। আজ সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় এলাকায় ব্যাপক আন্দোলন চলছে বহু বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য। এইতো সেদিন ০৬/৯/৯৪ তারিখে রংপুর জেলায় বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবিতে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হলো। এর পূর্বে 'রংপুর বিভাগ আন্দোলন'-এর নেতা-কর্মীরা ঢাকায় ২৫/০৭/৯৪ তারিখে জনসমাবেশের আয়োজন করে ও ৯/৮/৯৪ তারিখে আরেকটি হরতাল পালন করে। তাদের যাবতীয় দাবী দাওয়ার মাঝে উল্লেখযোগ্য দাবী দাওয়া হলো রংপুরের মত এত ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল আর হয় না। এত পুরনো পৌরসভাও বাংলাদেশে খুব কম আছে, রংপুরের সাহায্য না হলে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোক দু'দণ্ডও টিকতে পারে না, রংপুরের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে হলেও বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা জরুরী, বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে উক্ত অঞ্চলে সোনার ডিম পাড়া হাসের সংখ্যা সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি, ইত্যাদি! আমি যদিও শুধুমাত্র রংপুরের কথা উল্লেখ করছি, তবুও শুধুমাত্র রংপুরেই যে এরূপ দাবি-দাওয়া সম্বলিত আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তা নয়। বরং রংপুরের প্রতিবেশী বগুড়া, বাংলাদেশের লণ্ডনীয় জনতার আবাস সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহে একই দাবী দাওয়া ও একই প্রকৃতিতে আন্দোলন চলছে। ইতিমধ্যে প্রতিটি বিভাগ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে, পোস্টার-লিফলেট দেদারছে বিলি বন্টন করা হয়েছে, মিছিল-মিটিং-হরতাল-হুমকি সব অস্ত্রই প্রয়োগ করা হয়ে গিয়েছে। এর সাথে আবার চিরাচরিত প্রথামাফিক সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার মওকা পেয়ে একদল বিরোধী পেশাদার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ঐ সব আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন ও বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ তো একধাপ এগিয়ে সিলেটবাসীদের বিমান বয়কটের আহবান পর্যন্ত জানিয়েছেন। তাঁর সাথে সরকার বিরোধিতার 'মোয়া'র সন্ধান পেয়ে জাতীয় পার্টির মোয়াজ্জেম সাহেবেও গলা মিলাচ্ছেন।

বাংলাদেশ জনসংখ্যানুপাতে মাশাল্লা বৃহৎ হৃষ্টপুষ্ট হলেও আকার অবয়বে যে 'হার্ডি'র পাশে 'লরেল' তা সকলেই জানেন। এখানে টেকনাফে কেউ হাঁচি দিয়ে সরকারকে উক্ত হাঁচি আসার কারণে দোষারোপ করলে তেঁতুলিয়ার জনগণও সাথে সাথে সে খবর পেয়ে যায়, সেখানে যদি কেউ হরতালের ধুয়া তোলে তবে তো কথাই নেই। এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন ও জনস্বার্থ দেখা সরকারের দায়িত্ব। সেখানে সমতার ভিত্তিতে সুযোগ সুবিধা প্রদানও একটি বড় শর্ত। বর্তমানে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে এরূপ সমতা নিশ্চিত করার জন্য কোটা পদ্ধতি চালু আছে। সেনাবাহিনীতে সৈনিক ভর্তির কোটা যদি কেউ পত্রিকায় দেখেন তবে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপরও যদি কোন এলাকার জনগণ মনে করে যে, তাদের আরো বেশী কিছু পাওয়া উচিত তবে অবশ্যই তারা সে দাবি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পেশ করতে পারেন। যদি থানাকে জেলা, জেলাকে বিভাগ, বিভাগকে প্রদেশ বানিয়ে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে 'সাদ্দাদের বেহেশত' বানানো সম্ভব হয়, তবে যত শ্রীঘ্র সম্ভব সেরূপ পদক্ষেপ নেয়া উচিত। কিন্তু যখন আভাসে, ইঙ্গিতে এসব আন্দোলনে আঞ্চলিকতার গন্ধ পাওয়া যায়, আবেগের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ও কোন অদৃশ্য মহল জনগণের আবেগকে উস্কে দিয়ে বিভাগ

আন্দোলনের আড়ালে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করেন তখন এ সব ব্যাপার স্যাপার নিয়ে চিন্তিত না হয়ে পারা যায় না। এমনিতেই বর্তমানে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট চলছে। সাথে সাথে সকল পর্যায়ে আন্দোলন, অস্থিরতা সৃষ্টি করা হচ্ছে, যেখানে একটির অবসান হলে আরেকটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে যেখানে একটি দরিদ্র দেশের সরকার কতটুকু ভার বহন করতে সক্ষম? রংপুর, বগুড়া বিভাগ হলে কি সকল সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান হবে? এখন সেখানে একজন ডিসি আছেন সেখানে একজন বিভাগীয় কমিশনার বসবেন, কয়েকটি বড় বড় সরকারী পোস্ট সৃষ্টি হবে। কয়েকজন আমলার ত্বরিৎ পদোন্নতি হবে। কিছু দালান কোঠা বাড়বে (তাও বেশ ক'বছর পর আর্থিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে), সরকারী নথিপত্রের আনাগোনা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে অবধারিতরূপে দুর্নীতিরও প্রসার ঘটবে। অবশ্য এ সবই যে একদম হুবহু ঘটতে থাকবে তাও নয়। হয়তো আসলেই উন্নয়ন ঘটবে। কিন্তু যাই ঘটুক বা ঘটানোর চেষ্টা করা হোক না কেন তা হওয়া উচিত দেশের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে। এদেশ তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা আমীর ওমরাহের বিচরণভূমি নয় যে, যা দাবি করলাম তাই দেওয়ার মত সামর্থ্য সরকারের আছে। আর ওসব দেশেও 'চাহিবা মাত্র' দাবি পূরণ করা হয় না বা অযৌক্তিক দাবি হলে মানাও হয় না।

বর্তমান বিভাগ আন্দোলনের পশ্চাতে আন্দোলনকারীদের নিশ্চয় কিছু মহৎ উদ্দেশ্য আছে। আপন এলাকা নিয়ে মঙ্গল চিন্তা অত্যন্ত স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কিছুকেই যুক্তির কোন সূত্রানুযায়ীই যৌক্তিক বলে মেনে নেয়া যায় না। যেমন রাজশাহী বিভাগে রংপুর ও বগুড়া উভয় জেলাকে বিভাগ বানানোর কথা বলা হচ্ছে। এ তিনটি অঞ্চল একদম পাশাপাশি অবস্থিত। এখন তিনটিকে বিভাগ বানানো কোন মতেই কোন যুক্তির মাঝে আনা যায় না। এখানে আঞ্চলিকতা, রাজনীতির ব্যাপারটিকে যে কত সূক্ষভাবে ভেবে চিন্তে ব্যবহার করা হচ্ছে তা উক্ত অঞ্চলের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য বা 'Political Trend' বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। রাজশাহী ও বগুড়া উভয় অঞ্চলেই বিএনপি'র একক প্রাধান্য বিরাজমান। তবে বগুড়া শহীদ জিয়ার নিজ এলাকা বলে বগুড়াবাসীর নিকট বিএনপি বিশেষভাবে 'আবেগমিশ্রিত' প্রিয় একটি দল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, রাজশাহী অঞ্চলে একটি টিভি উপকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ঐ অঞ্চলের সীমান্ত সংলগ্ন জনগণ এমনিতেই দূরদর্শনের প্রভাবে, অত্যাচারে অতিষ্ঠ। বিটিভির অনুষ্ঠান ভালমত দেখা যায় না। পাল্টা প্রভাব বিস্তারের জন্য ও সীমানার ওপারে ভালভাবে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের পরিধি বিস্তারের জন্য রাজশাহীতে টিভি উপকেন্দ্র স্থাপন সবদিক দিয়ে যুক্তিসঙ্গত। সরকার সে মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন। আর যায় কোথায়? বগুড়ার আওয়ামী বলয় তৎক্ষণাৎ তাদের স্বভাব মত এ ব্যাপারটিকে একটি আঞ্চলিক মান-সম্মানের ইস্যুতে পরিণত করে। তারা বগুড়ার লোকজনকে সভা-সমাবেশ করে ক্রমাগত বোঝাতে থাকেন যে, বিএনপি শুধু ভোটের জন্য তোমাদের তোষামোদ করে, কিন্তু শহীদ জিয়ার নিজ এলাকা হওয়ার পরও বগুড়ায় টিভি কেন্দ্র স্থাপন করছে না। আবার রাজশাহীতে

প্রচার চলতে থাকে যে, বগুড়া জিয়ার নিজ এলাকা বলে ওখানে টিভি কেন্দ্র স্থাপনের ষড়যন্ত্র (!) চলছে, সরকার কোনমতেই বগুড়ার লোককে চটাবে না। এভাবে দু'এলাকার 'মান-সম্মান' নিয়ে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়। দু'অঞ্চলের সীমানায় মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাস চলাচল বন্ধ থাকে। হরতাল, মিছিল ধুমসে গতি লাভ করে। তখন বিএনপি সরকারের অবস্থা হয় 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থার মত। এবারও বগুড়ার বিভাগ দাবি আন্দোলনের গতি প্রকৃতি অনেকটা সে রকম। সাথে আবার যোগ হয়েছে 'রংপুর সিনড্রোম'। রংপুরে জাতীয় পার্টির প্রচারণায় এমনিতেই রংপুরের লোক সরকার বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। তাই ওখানে হুজুগ তোলা অত্যন্ত সোজা। এখন সরকার কি করবেন? রাজশাহীর গায়ে গা লাগা বগুড়ায় আরেকটি বিভাগ করে 'ভোট' রক্ষা করবেন? নাকি রংপুরে হৃত ভোট পুনরুদ্ধারের জন্য বগুড়ার পাশে আরেকটি বিভাগ করবেন? অর্থাৎ একত্রে পাশাপাশি তিনটি বিভাগ! আর যদি না করেন? তবে কি রংপুর-বগুড়ার লোকদের মাঝে রেষারেষি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে? এ ইস্যু নিয়ে অঞ্চলিভিত্তিক স্বাধিকারের চেতনা জেগে উঠাও অস্বাভাবিক নয়।

ইতিমধ্যেই গত ২১/৭/৯৪ তারিখে বগুড়ায় বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবিতে হরতাল পালিত হয়েছে। এরপর বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটি দাবি না মানলে লাগাতার হরতাল, ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ, রেল অবরোধ, গণ অনশন কর্মসূচী পালন করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। সিলেট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা নিয়েও অবস্থা অনেকটা এ রকম। কুমিল্লা বিভাগ আন্দোলন কমিটি ৪/৯/৯৪ তারিখে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে। গত এক মাসে লক্ষ্যণীয়ভাবে বিভাগ প্রতিষ্ঠা আন্দোলন জোরদার হয়েছে। এর সাথে ডাক্তার, প্রকৌশলী, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক অর্থাৎ প্রায় সকল পেশাজীবী ধর্মঘটের মত কর্মসূচীও নিয়েছেন। এভাবে যদি সকলেই শুধু চাই-চাই করেন তবে সরকার কি তাদের জন্য অন্য কাজ ফেলে শুধু 'দাবী আদায় মন্ত্রণালয়' নামে একটি দপ্তর খুলবেন? যশোর অঞ্চলে আরেকটি বিভাগ, দিনাজপুরে বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবিও জোরদার হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো ৬৪টি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর সবাই বিভাগের অধিবাসী বলে প্রদেশ তৈরী নিয়ে প্রচারণা আরম্ভ করবেন। এরপর প্রদেশ নিয়ে সন্তুষ্ট না হলে কি দাবি উঠতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ও কথা বললে নির্ঘাৎ জেলে যেতে হবে। আবুল মনসুর আহমদের জনসেবা ইউনিভার্সিটির মত সুন্দর উদাহরণ!

দাবি আদায়, অধিকার প্রতিষ্ঠা, সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা অত্যন্ত সঙ্গত ব্যাপার। কিন্তু আজ যারা হঠাৎ করে এ সমস্ত দাবি আদায়ে নেতা সেজে বসেছেন ও সহজ সরল জনগণকে উস্কে দিচ্ছেন তারা কি একবারও দেশের সার্বিক অবস্থার কথা ভাবছেন? তারা কি একটু ধৈর্য ধরে, যুক্তি মেনে সময়ের অপেক্ষা করতে পারেন না? তারা কি ভাবতে পারেন না যে, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট কোন বড় কথা নয়, বড় কথা আমাদের দেশটি ছোট ও এর পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে এ রকম যত্রতত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করতে পারে? যদি কোন জায়গায় একটি নির্দিষ্ট

অঞ্চল নিয়ে বিভাগ গঠনের প্রয়োজন পড়ে তবে তা হতে হবে আবেগবর্জিত যুক্তিনির্ভর। অন্যে তাল দিবে, কেউ নেতা হবে, কোন রাজনৈতিক নেতা তাতে গলাবাজির সুযোগ পাবে এ সব বিবেচনা করে সকলের আগানো উচিত। সকলের মনে রাখা দরকার আমার-আপনার দেশ রংপুর, কুমিল্লা, সিলেট নয়, বরং একটি মাত্র দেশ 'বাংলাদেশ' এবং আমরা সবাই 'বাংলাদেশী'।

বিএনপি শাসনামলে যে কারণে শান্তিবাহিনী সমস্যার সমাধান হয়নি

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে শান্তিবাহিনীর 'শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। যদিও অনেকে এ চুক্তিকে দেশবিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তারপরও বলতে হয় কেন ও কোন সূত্রে আ'লীগ ক্ষমতায় আসার মাত্র বছর দেড়েকের মাথায় শান্তিবাহিনী তড়িঘড়ি করে চুক্তি সম্পাদনে এগিয়ে এলো? আর কেনইবা বিএনপি শাসনামলে হাজারো নমনীয়তা দেখানোর পরও শান্তিবাহিনী ন্যূনতম ছাড় দিতে রাজী হলো না? এর উত্তর সচেতন সবারই জানা। এ ব্যাপারে '৯৫ সালে দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত লেখকের একটি নিবন্ধে পর্দার আড়ালের কিছু ঘটনার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে ঃ

বাংলাদেশ সরকার শত চেষ্টা করার পরও শান্তিবাহিনী সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। বরং সম্প্রতি শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্রবিরতি চুক্তি ভঙ্গ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন সৈনিককে গুলি করে হত্যা করেছে। এদিকে গত ক'বছর ধরে 'আসি-আসি' করেও চাকমা শরণার্থীরা ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারেনি বা তাদের আসতে দেয়া হয়নি। অথচ, শান্তিবাহিনী সমস্যা সমাধানে চাকমাদের আপন বাসভূমিতে ফিরিয়ে আনায় বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিকতায় ন্যূনতম কোনো খাদ ছিল না। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে, সামরিক কার্যক্রমের রাশ টেনে ধরে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেই বেছে নেয় সমস্যা সমাধানের 'হাতিয়ার' হিসেবে এবং বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে যে ভণিতা বা সময়ক্ষেপণের কোনো ছলচাতুরী ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের গভর্ণর রমেশ ভান্ডারীর কথা হ'তে। উল্লেখ্য, জনাব ভান্ডারী গত বছর বাংলাদেশ সফরে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে যান শুধুমাত্র চাকমা শরণার্থী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সরেজমিনে অবলোকন করতে। তার সফরকালীন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ২০/৪/৯৪ তারিখে বাসস পরিবেশিত খবরে বলা হয়- "ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সফররত গভর্ণর রমেশ ভান্ডারী বলেছেন, তিনি প্রত্যাবাসনকারী চাকমা পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট। রামগড়, দীঘিনালা, পানছড়ির পুনর্বাসন এলাকাগুলো পরিদর্শনের পর তিনি বলেন, প্রশাসন চাকমা শরণার্থীদের জন্য যা করেছে তিনি তাতে অভিভূত। ...... তিনি ইঙ্গিত দেন, ত্রিপুরায় শরণার্থী শিবিরে শরণার্থীদের কোনোরূপ বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে কেউ সফল হবে না"। এছাড়া ওই একই সংবাদে এও উল্লেখ করা হয় যে, জনাব ভান্ডারী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অঙ্গীকারে এতটাই মুগ্ধ হয়েছেন যে, তিনি পুনর্বাসিত পরিবারসহ সকলকে সর্বত্রই

বারবার বলেছেন, "এটা একটা অত্যন্ত ইতিবাচক ব্যাপার। অন্যান্য স্থানের তুলনায় এটা অনেক বেশি ইতিবাচক।"

জনাব ভান্ডারীর কথা হতে বোঝা যায়, রাজনৈতিক-কূটনৈতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি ও তিনি ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমাধান প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু ভারতে, ভারতীয় নির্বাচিত সরকার বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে অনেক ক্ষেত্রেই কোনো একটি অদৃশ্য 'শক্তি'র ইশারায় বা চাপে পরিচালিত হয়, বাধ্য হয় অনাকাংখিত বহু পদক্ষেপ গ্রহণে, তার বড় প্রমাণ হতে পারে শান্তিবাহিনী সমস্যার পুনঃজীবন লাভ।

এখানে অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যে সময় জনাব রমেশ ভান্ডারী পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের কাছে বাংলাদেশ সরকার গৃহীত পদক্ষেপকে চিত্রিত করেছিলেন 'ইতিবাচক' বলে, ঠিক সে সময়টিতেই, রমেশ ভান্ডারী বাংলাদেশে থাকা অবস্থাতেই ভারতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শান্তিবাহিনী নিয়ে বিশেষ লবী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ভন্ডুল করার চক্রান্তে মেতে ওঠে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতীয় 'এশিয়ান নিউজ এজেন্সী'র প্রভাবশালী প্রত্রিকা 'News Behind The News'-এর ২৫ এপ্রিল '৯৪ সংখ্যায়। ওই পত্রিকায় প্রকাশিত 'Chakma Repatriation : Bhandari's Dhaka Mission প্রতিবেদনে বলা হয়, "Mr. Bhandari's visit has been criticised in some circles in Agartala saying it was ill-timed. Mr. Bhandari has been tricked by the Bangladesh Government into giving them a certitficate of good intentions on the eve of the Aid-Bangladesh Consortium's visit about the rehabilitation of Chakma refugees .... " অর্থ্যাৎ ভারতের ওই 'বিশেষ লবী'র কথা মতে, বাংলাদেশ নাকি প্যারিসে অনুষ্ঠিত কনসোর্টিয়াম বৈঠকে সুবিধা আদায়ের আশাতেই জনাব ভান্ডারীকে কৌশলে বাংলাদেশে নিয়ে আসে! এদিকে শান্তিবাহিনী সমস্যার সূত্রপাত ও মূল কারণ হিসেবে শুধুমাত্র 'মুসলমান'দের পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশকে দায়ী করে ওই একই পত্রিকা এও দাবি করে যে, যতদিন পর্যন্ত না পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলিম বাংলাদেশীদের অভিবাসন বা জোর-জবরদস্তিমূলক অনুপ্রবেশ বন্ধ না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত নাকি শান্তিবাহিনী সমস্যার সমাধান হবে না।

এরপর আমরা আশাবাদী বাংলাদেশীরা দেখলাম, জনাব রমেশ ভান্ডারী তাঁর 'ভান্ডারে' একরাশ 'ইতিবাচক আশা' নিয়ে ভারতে ফিরে গেলেন ঠিকই, কিন্তু চাকমা শরণার্থীরা আর ফিরে এলো না। কেন, কাদের ইশারায়, কাদের স্বার্থে চাকমা শরণার্থীরা আর ফিরে এলো না বা শান্তিবাহিনী সমস্যার সমাধান হতে হতেও হলো না তা সেই বিশেষ ভারতীয় মহলই ভাল বলতে পারবে। তবে অবস্থাদৃষ্টে যা মনে হয়, তাতে শান্তিবাহিনী সমস্যা জিইয়ে রাখার পিছনে নিম্নলিখিত কারণগুলোর উল্লেখ করা যায়ঃ

১। বাংলাদেশকে নিরন্তর চাপের মধ্যে রাখার জন্য শান্তিবাহিনী হলো একটি তুরুপের তাস। এমনিতেই ভারত বাংলাদেশে রাজনৈতিক পর্যায়ে শত চাপ প্রয়োগেও সফল হচ্ছে না, অন্যদিকে বঙ্গভূমি আন্দোলনও প্রায় ব্যর্থ। এখন তাদের হাতে রয়েছে কেবল

ফারাক্কা ও শান্তিবাহিনী। তাতে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, ভারত তাদের তাঁবেদার একটি দলকে ক্ষমতায় আনার শর্তেই কেবল বাংলাদেশীদের মাথার ওপর হতে শান্তিবাহিনীর 'অশান্তি খড়গ' উঠিয়ে নিতে পারে। এখানে তাদের উদ্দেশ্য হলো, শান্তিবাহিনী বা ফারাক্কা সমস্যা সমাধান করে বাংলাদেশের মানুষকে সন্তুষ্ট করা, যার বিনিময়ে তারা হয় ট্রানজিট সুবিধা নিবে নয়তো রণকৌশলগত সুবিধা আদায় করবে। কারণ, বাঙালী জাতীয়তাবাদী শক্তির ক্ষমতার মঞ্চে উপস্থিতির অর্থ হলো-দীর্ঘদিন যাবৎ গড়ে ওঠা চীনের সাথে সামরিক ও রণকৌশলগত সম্পর্কে চিড় ধরা যা মূলতঃ এ অঞ্চলের ক্ষমতার ভারসাম্যকে দারুণভাবে ব্যাহত করবে।

২। ভারতীয় স্বাধীনতাকামী মিজো ও নাগা গেরিলাদের মধ্যে ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশ ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যাহত করার জন্য চাকমাদের ব্যবহার করা। এখানে চাকমা ও মিজোদের চেহারা, আকার-আকৃতি একইরূপ বলে ভারত বহু পূর্ব থেকেই এ পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

৩। অব্যাহতভাবে বাংলাদেশকে একটি মানবাধিকার লংঘনকারী বর্বর দেশ হিসেবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে চাকমাদের ত্রিপুরায় আটকে রাখা হচ্ছে। যেহেতু আজকের বিশ্বে উন্নত বা দাতা দেশগুলোর সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে মানবাধিকারের প্রতি বিশেষ মর্যাদা দান, তাই শরণার্থীরা নিঃসন্দেহে হয়ে উঠতে পারে একটি 'ভয়াবহ অভিশাপ'।

এখানে উল্লেখ্য, শান্তিবাহিনী সমস্যার ব্যাপারে জনাব রমেশ ভান্ডারীর বাংলাদেশে আসার সময় সর্বদলীয় কমিটির প্রধান যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমদ সংসদে বলেছিলেন, "২৫ এপ্রিল '৯৪-এ চাকমা নেতারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে আসার পর তারা ত্রিপুরায় ফিরে গেলে পুনরায় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে ও তা অব্যাহত থাকবে"[১০]। কিন্তু জনাব রমেশ ভান্ডারী এদেশে থাকার সময় ভারতীয় বিশেষ মহলে যে নেতিবাচক কর্মকান্ড শুরু হয়েছিল, সে কথার সত্যতা প্রমাণ করে ২৫ এপ্রিল '৯৪-র পর চাকমা শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া জোরদার না হয়ে, ঝিমিয়ে পড়ায়। এতেই বোঝা যায় রাজনৈতিক-কূটনৈতিক সদিচ্ছা নয় বরং বিশেষ একটি ভারতীয় লবীর গোপন কার্যক্রমই পরিচালনা করছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক।

শান্তিবাহিনী সমস্যা ও চাকমাদের নিয়ে ভারতীয় সরকারের আগ্রাসী মনোবৃত্তি সম্পর্কে কমবেশি জানতে হলে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ৯ নভেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যা 'মাসিক আলোকপাত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'চাকমারা কি স্বভূমিতে ফিরতে পারবে' নিবন্ধের উল্লেখ করতে হয়। ওই নিবন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট (!) ভাষায় বলা হয়, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল- আমরা হিন্দুস্তানের সঙ্গে থাকতে চাই, পাকিস্তানের সাথে নয়। "১৯৭১-এ

১০। দৈনিক দিনকাল ১৯-৪-৯৪ সংখ্যা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ও তৎকালীন চাকমা নেতারা চেয়েছিলেন যদি ভারতের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুড়ে দেয়া যায়।" অর্থাৎ ভারত যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে গ্রাস করতে চায়, তাই প্রকাশ পেয়েছে ওই প্রতিবেদনে।

এদিকে ভারতই যে শান্তিবাহিনী সৃষ্টি করেছে ও এখনো এর লালন-পালন করে যাচ্ছে তারই প্রমাণ দিয়ে 'আলোকপাতে' আরো বলা হয়-"এখন ১০ লাখ চাকমার মিলিশিয়া বাহিনী যে ভারতীয় সাহায্যেই পুষ্ট এটা ত্রিপুরার ছোট বাচ্চারাও জানে"। কি ভয়াবহ, নির্লজ্জভাবে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ভারত গোপন পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারে, তা বোধ করি আলোকপাতের প্রতিবেদন পড়েই স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে ভারত যে শুধু শান্তিবাহিনী তৈরি করেই ক্ষান্ত নয়, বরং বাংলাদেশ সরকার তার কথামতো না চললে এদেশে 'আগুন' জ্বালিয়ে দেয়া হবে, সে ব্যাপারেও ভারত কোনো রাখ-ঢাক করছে না। উপরোক্ত প্রতিবেদনে প্রতিবেদক একজন তথাকথিত শান্তিবাহিনী কমান্ডারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "আজকাল পৃথিবীর কোনো জঙ্গীবাহিনীতেই রকেট লাঞ্চার থাকাটা কোনো ব্যাপারই নয়। তাই দিয়ে যদি একবার কাপ্তাই বাঁধ আর চন্দ্রঘোনা পেপার মিলটা উড়িয়ে দেয়া যায়....."।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল এস এস উবানের (মুজিব বাহিনীর সংগঠক) নেতৃত্বে মিজো গেরিলাদের দমনের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন ঈগল' পরিচালিত হয়। সেখানে এক পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী হেলিকপ্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় কমান্ডো নামিয়ে দেয়।[১১] মূলতঃ ওই কমান্ডো দল নামিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল গোপনে শান্তিবাহিনী সংগঠিত করা যাতে যদি কখনো বাংলাদেশ সরকার ভারতবিরোধী কোনো স্ট্যান্ড নেয় তাহলে যেন তৎক্ষণাৎ চাপ প্রয়োগ করা যায় সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর মাধ্যমে।

এ প্রক্রিয়া সেই যে শুরু হলো, তার রেশ আমরা এখনো টেনে চলেছি, এভাবেই বাংলাদেশকে রাখা হচ্ছে সার্বক্ষণিক চাপের মধ্যে। এখানে বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান চাইলেও 'আলোকপাত'-এর প্রতিবেদনে উল্টো বলা হচ্ছে-আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হলে হবে, "নইলে তো শান্তিবাহিনী রয়েছেই শেষ আঘাত হানার জন্য।"

জন্মাষ্টমীর মিছিলে হামলা ও দুর্গাপূজা নিয়ে চক্রান্ত

তসলিমা নাসরীন ইস্যু সৃষ্টি ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ বিঘ্নিত–শ্লোগান তুলে বাংলাদেশকে যেভাবে সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তেমনি জন্মাষ্টমীর মিছিলে কথিত হামলার অভিযোগে বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে কতিপয় চিহ্নিত ব্যক্তি ব্যাপকহারে অপপ্রচারণায় মেতে উঠে। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের ১০ আগস্ট মঙ্গলবার হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্মাষ্টমী মিছিলে হামলা ও বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগ করা হয়। জানা যায় ১০ আগস্ট '৯৩ তারিখ বিকালে ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে জন্মাষ্টমীর বর্ণাঢ্য মিছিলটি যাত্রা শুরু করে। "মিছিলটি তখন ছিল সম্পূর্ণ ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যে পূর্ণ ও উত্তেজনামুক্ত।

১১। Maj Gen. S.S. Uban, *Phantoms of Chittagong : The Fifth Army in Bangladesh,*

শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে আসার সময় হঠাৎ মিছিল থেকে বেরিয়ে গিয়ে কতিপয় যুবক তিনটি রিকশা ভাঙচুর করে। ঠিক একই সময় জগন্নাথ হলের কাছে একজন বেবীটেক্সি চালক মারাত্মকভাবে প্রহৃত হয়। মিছিল হাইকোর্টের মোড়ে আসার পর কিছু যুবক লাঠিসোঁটা নিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের দিকে ছুটে যায়। ... মিছিল যখন প্রেসক্লাবের কাছাকাছি আসে তখন কয়েকজন যুবক এসে ক্লাবের সামনে দাড়ানো কয়েকজন ফটো সাংবাদিককে জানায়, মিছিল গুলিস্তান পৌছলে গন্ডগোল হতে পারে। অতঃপর মিছিলটি নবাবপুর মোড়ের কাছে পৌছলে মিছিল থেকে ক'জন যুবক স্থানীয় হকারদের ধাক্কা মারে। হকাররাও পাল্টা আঘাত করলে দু'দলে হাতাহাতি, মারামারি শুরু হয়ে যায়। এরই মাঝে হঠাৎ মিছিলের অভ্যন্তরে বিকট শব্দে ককটেল বিস্ফোরিত হয়। প্রায় একই সময়ে ট্রাকে করে একদল সশস্ত্র যুবক এসে পথচারী, যানবাহন, দোকানপাটের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এদিকে এই গোলযোগের সময় ও পরে বিভিন্ন স্থানে প্রায় অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়, ৭/৮টি গাড়ি ভাঙচুর হয় এবং মিছিলকারীদের হাতে তাদের একটি ভ্যান গাড়িও ভস্মীভূত হয়। এছাড়া একদল যুবক ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটেও ব্যাপক ভাঙচুর করে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ১৪ জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।" [১২]

আপাতদৃষ্টিতে জন্মাষ্টমীর মিছিলে পরিচালিত এই হামলা বা বিশৃংখলাকে অপর দশটা রাজনৈতিক ঘটনার মতো মনে হতে পারে। আবার এও মনে হতে পারে যে, বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক যারা সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্ম পালনে বাধা না দিয়ে পারে না। এবং ঠিক এই কথাই প্রচার করা হয়েছে দেশে-বিদেশে। বলা হয়েছে–বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা নেই, এমনকি ধর্মীয় অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। পাশাপাশি একশ্রেণীর অতি তৎপর সংখ্যালঘু নেতা দেশে হিন্দুদের ধর্ম পালনে বাধা দেয়ার প্রতিবাদ স্বরূপ দুর্গাপূজা সাড়ম্বরে উদযাপন না করার আহ্বান জানান। তারা যুক্তি হিসেবে এও বলেন যে, যেহেতু হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব জন্মাষ্টমীতে হামলা চালানো হয়েছে তাই দুর্গাপূজা ঢাকঢোল পিটিয়ে পালনেও নিরাপত্তা নেই। এনিয়ে 'বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ' ঢাকাস্থ ঢাকেশ্বরী মন্দির মেলাঙ্গনে এক সভায় দুর্গাপূজা না করার ঘোষণা প্রদান করে। তাদের দেয়া ঘোষণা মতে, ২৪ অক্টোবর '৯৩ অর্থাৎ ১০ কার্তিক দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি পালিত হবে। আর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য পূর্ববর্তী দু'দিন তথা ২২ ও ২৩ অক্টোবর ঐচ্ছিক ছুটি থাকবে। উল্লেখ্য, পূজা পরিষদের নেতাদের মধ্যে ছিলেন সাবেক বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য, সাবেক জেনারেল সি.আর. দত্ত প্রমুখ। সেবার পূজা উদযাপন না করার কারণ হিসেবে পূজা পরিষদ তাদের বিবৃতিতে বলে, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি অবনতিশীল। এই পূজা পরিষদের পাশাপাশি 'হিন্দু ঐক্যফ্রন্ট' ও 'হিন্দু কল্যাণ পরিষদ' নামের অপর দু'টি সংগঠন দুর্গাপূজা পালন করার জন্য শর্ত আরোপ করে যে, জন্মাষ্টমীর মিছিলে হামলাকারীদের শাস্তি প্রদান করতে হবে। সরকার এসব দাবী না মানলে শারদীয় আড়ম্বরপূর্ণ দুর্গাপূজার পরিবর্তে অনাড়ম্বর ঘটপূজা করা হবে বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়।

১২। দৈনিক ইনকিলাব ১৪/৮/৯৩

এদিকে জন্মাষ্টমীর মিছিলে হামলা যে পরিকল্পিত ছিল এবং বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এঘটনা ঘটানো হয়েছিল তা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায়। মূলতঃ তদানীন্তন সরকারকে চাপের মধ্যে রাখার উদ্দেশ্যেই অন্যান্য আরো ঘটনার পাশাপাশি জন্মাষ্টমী মিছিলে হামলা চালানো হয়েছিল। এখন অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, এধরনের ঘটনা সৃষ্টিতে যে 'র'-ই জড়িত ছিল তার কি নিশ্চয়তা আছে? হ্যাঁ, একথা মানতেই হবে যে, পৃথিবীতে কখনো কোন গুপ্তচর তৎপরতা অংকের সূত্রের মতো প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯৯১ সাল থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত যেভাবে ও যে হারে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে এজাতীয় ঘটনা ঘটানো হয়েছে তাতে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে-এসবকিছুই সুসমন্বিত, প্রফেশন্যাল গুপ্তচরবত্তি বৈ কিছুই নয়। কারণ, স্বাধীন বঙ্গভূমি তৎপরতা, মোহাজির সংঘ সৃষ্টি, তসলিমা নাসরিন ইস্যু, ঘাদানির জন্ম এসব কিছুরই পশ্চাতে বলা হয়েছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা নেই ও বিএনপি সরকার স্বাধীনতা বিরোধীদের তোষণে ব্যস্ত। জন্মাষ্টমীর মিছিলে হামলার পর কি সে ধরনের প্রচারণা চালানো হয়নি? এ থেকেই কি বোঝা যায় না এধরনের প্রতিটি উদ্যোগের পিছনে ছিল একটি মাত্র 'সূত্রের' হাত। তাই যদি না হবে তাহলে '৯৬ সালের পর কেন বঙ্গভূমি, মোহাজির সংঘ ইত্যাদি চুপ মেরে গেল? কেন আর হামলা হলো না সংখ্যালঘু কতিপয় নেতার ভাষায় 'সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে' হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর?

এছাড়া ১৯৯৩ সালে জন্মাষ্টমীর মিছিলে পরিচালিত হামলা যে একটি চক্রান্তের অংশ হিসেবে করা হয়েছিল সে সম্পর্কে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও স্পষ্ট করে মন্তব্য করেছিলেন। এব্যাপারে মত প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "একটি চিহ্নিত মহল এধরনের অপচেষ্টার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট, বিভ্রান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টি করতে চায়।" যে চিহ্নিত মহল তাদের অশুভ চক্রান্তের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যে সহায়তা করতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বানও জানান। অন্যদিকে বেগম জিয়ার পাশাপাশি 'বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পরিষদ' দেশে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার অসৎ উদ্দেশ্যে বিশেষ মহল কর্তৃক জন্মাষ্টমীর মিছিলে গোলযোগ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করে। এদিকে এই হামলা সম্পর্কে একটি জাতীয় দৈনিকের উপসম্পাদকীয় কলামে ঘটনা বিশ্লেষণ পূর্বক বলা হয় "ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলে গোলযোগ সৃষ্টির অপতৎপরতা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসূত কোনো ঘটনা নয়। কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় ঐ অপ্রীতিকর ও দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে দায়ী নয়। একটি বিশেষ মহল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে ঐ অপতৎপরতা চালিয়েছে। এই বিশেষ মহলটির পরিচয়ও প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পরিষদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। দেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার একটি প্রবণতা কয়েকটি রাজনৈতিক মহলে লক্ষ্য করা যায়। এরা হিন্দু সম্প্রদায়কে তাদের 'ভোট ব্যাংক' হিসাবে বিবেচনা করে। প্রধানমন্ত্রীর জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে যোগদানে এদের নাখোশ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী ঢাকার জন্মাষ্টমীর

মিছিলে গোলযোগ সৃষ্টির অপচেষ্টার জন্যে এদেরই দায়ী করেছেন। অতঃপর বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই ঘটনা সাম্প্রদায়িক নয়-রাজনৈতিক। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পরিষদের কাছেও এই ব্যাপারটি অস্পষ্ট নেই। পরিষদ এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে বক্তব্য রেখেছে-এ প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। পরিষদ এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে বিভিন্ন কৌশলে রাজনৈতিক কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার না করার জন্যে সকল মহলের প্রতি আবেদন জানিয়েছে। এই সঙ্গে পরিষদ মিছিলে গোলযোগ সৃষ্টি সম্পর্কিত ঘটনাবলী, তার কারণ ও উদ্দেশ্যসমূহ নির্ণয়ের জন্যে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানিয়েছে এবং উত্তেজনা ও অহেতুক ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে এমন বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্যে সকল মহলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।

জন্মাষ্টমীর মিছিলে গোলযোগ সৃষ্টির অপচেষ্টা যে উদ্দেশ্যমূলক এবং পরিকল্পিত-পূর্বাপর ঘটনাবলী তার প্রমাণ বহন করে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকালে ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে বের হওয়া জন্মাষ্টমীর বর্ণাঢ্য মিছিলটি তখন ছিল সম্পূর্ণ ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যে পূর্ণ ও উত্তেজনামুক্ত। শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে আসার সময় হঠাৎ মিছিল থেকে বেরিয়ে গিয়ে কতিপয় যুবক তিনটি রিকশা ভাঙচুর করে। ঠিক একই সময় জগন্নাথ হলের কাছে একজন বেবী ট্যাক্সী চালক মারাত্মকভাবে প্রহৃত হয়।

শান্তিপূর্ণ মিছিল চলাকালে জগন্নাথ হলের সামনে বেবী ট্যাক্সী চালকের ওপর হামলা, শহীদ মিনারের কাছে রিকশা ভাঙচুর, হাই কোর্টের মোড়ে যানবাহনে হামলার চেষ্টা, গুলিস্তানে মিছিলে হামলা হতে পারে-সাংবাদিকদের এ খবর আগাম প্রদান করা, নবাবপুরের মোড়ে বিনা উস্কানিতে হকারদের ওপর চড়াও হওয়া, অস্ত্র সজ্জিত হয়ে ট্রাকে করে আসা যুবকদের তাণ্ডব, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ভাঙচুর ইত্যাদি থেকে পরিস্কার হয়ে যায় যে, একটি বিশেষ মহলের চরেরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে মিছিলকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা সৃষ্টির জন্যে তৎপর ছিল এবং যা কিছু ঘটেছে তাদের উস্কানিমূলক কাজ কর্মের কারণেই ঘটেছে।

যারা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে চায়, পরিকল্পিত নীল নকশা অনুযায়ী জাতির মধ্যে বিভেদ, সংঘাত ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায়, এরা আর যাই হোক-দেশ ও জনগণের মিত্র নয়।"[১৩]

আবার বঙ্গভূমি

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের পর থেকে স্বাধীন বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় চক্রান্ত ক্ষণিকের জন্যও থেমে থাকেনি। তবে '৯১ সাল থেকে '৯৩-এর শেষ পর্যন্ত (প্রায়) 'র' মোহাজির সংঘ গঠন, পুশব্যাক, তসলিমা ইস্যু, ঘাদানি সৃষ্টি ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকায় বঙ্গভূমি ততোটা আলোচিত হবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু '৯৩ সালের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর থেকে স্বাধীন বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র আবার লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এমনকি এসময় তথাকথিত 'বঙ্গসেনা'র সদস্য হিসেবে রীতিমতো পরিচয়পত্র ইস্যু করা হয় কতিপয় সংখ্যালঘুর নামে। পাশাপাশি বাংলাদেশী একটি মহলের সহায়তায় চলে

১৩। এদেশ-বিদেশঃপর্যটক, দৈনিক ইনকিলাব ১৪/৮/৯৩ সংখ্যা

অন্যান্য গোপন কার্যক্রম। সে সময় বঙ্গভূমি তৎপরতা কিভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৪ নভেম্বর '৯৩ সংখ্যা দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে। 'টার্গেট খুলনা–কর্মীদের কাছে কালিদাস বৈদ্যের চিঠি, পরিচয়পত্র বিতরণঃ দক্ষিণাঞ্চলের ৫ জেলায় তথাকথিত বঙ্গসেনাদের ব্যাপক তৎপরতা' শিরোনামের উক্ত রিপোর্টে প্রতিবেদক আলীমুজ্জামান হারুন উল্লেখ করেন, "তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমিওয়ালাদের টার্গেট এখন খুলনা। ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর, কুষ্টিয়া ও পটুয়াখালীতেও তাদের তৎপরতা বেড়েছে। গত ২৭ অক্টোবর বঙ্গভূমির স্ব-ঘোষিত প্রেসিডেন্ট ডাঃ কালীদাস বৈদ্য 'নিহার' নামে এক বঙ্গসেনার কাছে ভারত থেকে পাঠানো এক চিঠিতে একথা উল্লেখ করেছেন।

তথাকথিত বঙ্গসেনাদের নামে 'বঙ্গভূমি' সরকারের পরিচয়পত্র ইস্যু করা হচ্ছে। ডাঃ কালীদাস বৈদ্য এতে স্বাক্ষর করছেন। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে বঙ্গসেনা পরিচয়পত্র নিয়ে অনেকেই কাজ করছেন। সরকারের বিভিন্ন সংস্থার আড়ালে তারা তাদের তৎপরতা চলিয়ে যাচ্ছে। পরিচয়পত্র মনোগ্রামের মাঝখানে 'শ্রী', ওপরে বঙ্গভূমি সরকার। নিচে স্বাক্ষর করেছেন ডাঃ কালীদাস বৈদ্য। এ ধরনের সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত তিনটি পরিচয়পত্র আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এর একটি রণজিত কুমার রায়, পিতা-মৃত তারেক চন্দ্র রায়, বয়স ৩৭ বছর। ঠিকানা-চরবানিয়ারী, পোঃ খাসেরহাট, জেলা-খুলনা। দ্বিতীয় পরিচয়পত্রটি হচ্ছে শ্রী কালিদাস বড়াল, পিতা নগেন্দ্রনাথ বড়াল, বয়স ৩৬ বছর, ঠিকানা-চরবানিয়া, পোঃ খাসেরহাট, জেলা–খুলনা। তৃতীয় পরিচয়পত্রটি হচ্ছে নিহার রঞ্জন সাহা, পিতা-বিরাজ মোহন সাহা, বয়স ২৯ বছর; ঠিকানা-সাগর কাঠি, পোঃ-দৈবজ্ঞাহাটী, জেলা-খুলনা। নিহারকে সে লিখেছে, 'যুবকদের সংগঠিত করতে হবে, আর বেশি দিন নেই স্বাধীন বঙ্গভূমি কায়েম হবেই হবে।' চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর, কুষ্টিয়া ও পটুয়াখালীর কর্মীরা আশানুরূপ কাজ করছে, কিন্তু যেখানে আমার বড় আশা সেই খুলনা, সেই মম জন্মস্থান 'সামন্তনগর' যাকে গর্ব করে তোরা রাজাধানী করতে চাস সেখানে আশানুরূপ কাজ হচ্ছে না। যাক কালা (একজন বঙ্গসেনার নাম) কিছু নতুন নতুন প্রোগ্রাম নিয়ে যাচ্ছে। পুরানো পোস্টার ও লিফলেটও কিছু পাঠাচ্ছি। সাবধান, অদক্ষ লোকজনদের দিয়ে প্রচার করবি না। একটু কষ্ট কর। তোদের এই বন্দীদশা থেকে অচিরেই মুক্ত করবো।" এদিকে ১৯৯৪ সালের শুরুতে 'বঙ্গসেনা' বাহিনী বাংলাদেশের বেনাপোলে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করে। এব্যাপারে জানা যায় যে, ২৮ জানুয়ারি '৯৪ তারিখে বেনাপোলে অভিযান চালাবার লক্ষ্যে জানুয়ারির প্রথম থেকেই বঙ্গসেনারা ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে এবং ডাঃ কালিদাস বৈদ্যের নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন ট্রেনে ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তারা অবস্থান নেয়। সেসময় তাদের ব্যানারে লেখা থাকতো 'কলকাতা বঙ্গভূমি দূতাবাসে চল'। এছাড়া ১৯৯৩ সালের ১২ ডিসেম্বর রামলাল বাজারে বঙ্গসেনাদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে অভিযান চালাবার লক্ষ্যে।

বঙ্গসেনাদের এসব অপতৎপরতা '৯৬ সালের নির্বাচন পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। এমনকি এমন রিপোর্টও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, বঙ্গসেনাবাহিনী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে একটি বিশেষ দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণাও চালায়। এব্যাপারে ২৩ মে '৯৬ সংখ্যা দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট এখানে উল্লেখ করা হলো–

বঙ্গসেনা সদস্যরা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে একটি বিশেষ দলের নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছে

শাহ মন্‌ওয়ার জাহান ঃ পার্শ্ববর্তী একটি দেশে অবস্থান গ্রহণকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তথাকথিত 'বঙ্গসেনা'দের একটি অংশ এখন দেশে অবস্থান করছে। বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রার্থীদের পক্ষে তারা প্রচারণা চালাচ্ছে। পুলিশসহ বিভিন্ন সূত্র থেকে এতথ্য জানা যায়। ঢাকায় পদস্থ একজন পুলিশ কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে তাদের কাছে এ ধরনের কিছু তথ্য রয়েছে। তবে কত সংখ্যক কথিত বঙ্গসেনা ঢুকেছে তা তারা জানাতে পারেননি। উক্ত কর্মকর্তা নিজ পরিচয় গোপন রাখার শর্ত আরোপ করে বলেন, স্থানীয় লোকজন এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার মাধ্যমে অপরিচিত ব্যক্তিদের সনাক্ত করা হচ্ছে। সূত্রগুলো জানিয়েছে রাজশাহী জেলার দরগাপাড়া, রক্তারপুর, বনগ্রাম, চরশ্যামপুর, গোদাগাড়ী; নওগাঁ জেলার কালপাড়া, সাগরপুর, চাংলা, আমবাট, নজিরপুর; ফেনী জেলার পরশুরাম, মধুগ্রাম, বল্লবপুর, মুন্সিরহাট; কুমিল্লা জেলার জিয়ার বাজার, বিবিরবাজার, শশীদল; ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিষ্ণুপুর, কশবা, গোসাইমহল, আখাউড়া, আজমপুর; সাতক্ষীরা জেলার, ভোমরা, বৈকারী, বাশদ, রতনপুর, বসন্তপুর, পরানপুর; যশোরের বেনাপোল, দৌলতপুর, সাদিপুর, প্রভৃতি সীমান্ত দিয়ে তথাকথিত বঙ্গসেনারা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। খুলনা বিভাগের যশোর, সাতক্ষীরা দিয়ে প্রবেশ করে তারা মাদারীপুর, শরিয়তপুর বরিশালের কয়েকটি নির্বাচনী এলাকায় অবস্থান নিয়েছে। একই সঙ্গে রাজশাহী অঞ্চল দিয়ে প্রবেশকারীরা নওগাঁ, বগুড়া, নাটোরসহ কয়েকটি এলাকায় তৎপরতা চালাচ্ছে। বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীরা যে সব আসনগুলোতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, ওইসব আসনে ওই দলটির প্রার্থীদের পক্ষে তারা তৎপর। ভোটারদের তারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে। টাকাও বিতরণ করছে। এসব তথাকথিত 'বঙ্গসেনা'দেরকে প্রতিবেশী একটি দেশে চিত্তরঞ্জন ছুতার নামক এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে অস্ত্র পরিচালনাসহ নাগরিকদের প্রভাবিত করার মতো প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে।

পুশইন-পুশব্যাক ইস্যু

গণতন্ত্র বলে-সব সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। গণতন্ত্র শিক্ষা দেয়-মানবাধিকার রক্ষা করতে হবে সবার আগে। স্বৈরতন্ত্রের সাথে গণতান্ত্রিক বিধি বিধানের পার্থক্য এখানেই। ভারত কাগজে-কলমে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশেও সূচিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক রাজনীতির। আশা করা গিয়েছিল ভারত বড় প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের সাথে এমন আচরণ করবে যাতে সদ্য সূচিত গণতান্ত্রিক ধারা শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং বাংলাদেশে কোন অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি না হয়। কিন্তু যেখানে ভারতের লক্ষ্য ছিল 'বন্ধুভাবাপন্ন' একটি রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় আনা সেখানে বিএনপি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত দল হলেও ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের চোখে বরাবরই 'অবন্ধুসুলভ' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। তাই প্রথম থেকেই একটির পর একটি ঘৃণ্য কৌশলে ভারত বাংলাদেশ সরকারকে রেখেছে ব্যতিব্যস্ত। এরকমই একটি কৌশলগত গুপ্তচর তৎপরতা হলো 'পুশইন' ষড়যন্ত্র। এব্যাপারে ভারতীয় নীতি নির্ধারক মহলের হৃদয়হীন অমানবিকতা, আধিপত্যবাদী মনোভাব ও সর্বোপরি ক্ষুদ্র প্রতিবেশী বাংলাদেশকে বেকায়দায় ফেলার ঘটনাবলী নিয়ে ১৯৯২-'৯৩ সালে এদেশের প্রচারণা মাধ্যমে বিস্তর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ভারতীয় কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের বাংলাদেশ বিরোধিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ঐসব রিপোর্টে। প্রায় সব পত্রিকাতেই একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে, কংগ্রেস সরকার 'র'-এর পরামর্শ মতে বা 'র'-এর চাপে 'পুশইন' ইস্যু তৈরী করে বেগম খালেদা জিয়াকে চাপের মুখে রাখার উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে ভারতীয় কংগ্রেস যে তার ঐতিহ্যানুযায়ী বাংলাদেশ বিরোধিতায় তৎপর ছিল সে সম্পর্কে একটি সাপ্তাহিকে মন্তব্য করা হয়– "বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত একের পর এক বাংলাদেশের জন্য সমস্যা (ইস্যু) সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে নাজেহাল করার চেষ্টা করছে। গত মে মাসেও (১৯৯২) নয়াদিল্লীতে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার বৈঠকে যেখানে দ্বি-পাক্ষিক সমস্যাবলী চিহ্নিত করে তা নিরসনে চেষ্টার কথা বলা হয়েছে, সেখানে আক্ষরিক অর্থেই দ্বিপাক্ষিক সমস্যা আরো বেড়ে যাচ্ছে। ভারতই সৃষ্টি করছে এসব সমস্যা। যার সর্বশেষ নমুনা 'অপারেশন পুশব্যাক'।

ভারতের আচরণ সৎপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক উন্নয়নের অনুকূল নয়। ফারাক্কা থেকে পুশব্যাক প্রভৃতি সমস্যা ও সঙ্কট তার প্রমাণ। '৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর ইন্দিরা থেকে শুরু করে নরসীমা রাও পর্যন্ত প্রতিটি কংগ্রেস সরকার বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে এসেছে। বাংলাদেশকে বেকায়দায় ফেলতে বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইন্দিরা আমলে সৃষ্টি হয়েছে ফারাক্কা ইস্যু। রাজীব আমলে শান্তিবাহিনী ইস্যু। গত প্রায় দু' দশকের ইতিহাসে একমাত্র জনতা দলের মোরারজী দেশাই সরকার এবং ভিপি সিং এর ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকার আমলে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন ছিল। এই সময়কালে বাংলাদেশসহ ভারত তার অন্যান্য প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়।

কিন্তু দলীয় কোন্দল এবং সর্বভারতব্যাপী দলীয় ভিত্তি জোরদার না থাকায় এ সময়কালের দু'টি সরকারই খুব স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে ফের কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছিল। ফলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়নি ভারতের।"[১৪]

এদিকে 'পুশইন' অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা 'পুশব্যাক' সে সম্পর্কে ১৩ অক্টোবর '৯২ সংখ্যা 'সাপ্তাহিক খবরের কাগজে' একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। 'পুশব্যাক টুর্নামেন্টঃ ভারত বনাম বাংলাদেশ-আসল রহস্য কি?' শিরোনামে প্রকাশিত উক্ত প্রতিবেদনে প্রতিবেদক শহিদুল ইসলাম মিন্টু উল্লেখ করেন– "মেরী মাম্মী মেরে লিয়ে রোতা হ্যায়। জরুর আভতক কুছ খায়া ভি নেহি; ম্যায় ভি কুছ নেহি খায়ঙ্গী। একথা বলতে বলতে মেয়েটির ডাগর দু'টি চোখ ভরে উঠলো স্বচ্ছ পানিতে। সে তার মা-বাবাকে হারিয়েছে। হিন্দীভাষী এই বালিকার সন্ধান পাওয়া যায় ৩০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, দক্ষিণ কমলাপুর এলাকায়। নাম শিল্পী। ঐদিন তাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখে জনৈক ভদ্রলোক তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। জানতে পারেন, শিল্পী তার মা-বাবাকে হারিয়ে ফেলেছে। অতঃপর ১ অক্টোবর তাকে নিয়ে আসেন একটি জাতীয় দৈনিকের অফিসে। সেখানে এ প্রতিবেদকের সাথে তার কথা হয়। শিল্পী জানায়, হিন্দী ছাড়া সে অন্য ভাষায় কথা বলতে পারে না এবং তার জন্ম ভারতের দিল্লীর নিজামউদ্দিন স্টেশনের পাশের বস্তিতে। বাবা রিক্সাচালক। সে পড়াশুনা করতো স্থানীয় জংপাড়া স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে। ওরা পাঁচ ভাই দু'বোন। বাবার নাম আবুবকর। মা'র নাম রাশিদা। বাবা মা ওকে 'বুড়িয়া' বলে ডাকতো। ক'দিন আগে ওরা দিল্লি ছেড়ে প্রবেশ করে বাংলাদেশে। স্ব ইচ্ছায় নয়। বিএসএফ-এর সদস্যরা ওদের পুরো পরিবারকে জোর করেই বাংলাদেশে পাঠায়। ঠেলে দেয় সীমান্তের ওপার থেকে বাংলাদেশের ভেতরে। এর পর নিজেদের উদ্যোগে যাত্রা করে রাজধানী ঢাকার উদ্দেশ্যে। এখানে ওদের আত্মীয় স্বজন রয়েছে। কিন্তু শিল্পী তাদের নাম-ঠিকানা বলতে পারে না। ঢাকায় আসার পর পরই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় শিল্পী। হারিয়ে ফেলে তার মা-বাবা, ভাই-বোনদেরকে। কালো রঙের গোলগাল মুখের এই মেয়েটি অত্যন্ত সপ্রতিভ। বাংলা বলতে পারে না মোটেই। ওর কপালে রয়েছে একটি দাগ। এখন সে ৫, দক্ষিণ কমলাপুরের বাসিন্দা সেলিনা আক্তারের হেফাজতে। শিল্পী এই প্রতিবেদকের সাথে কথা বলার সময় থেমে থেমে, আবার কখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। বলছিলো, আপ মেরা মাম্মীকো লে আওনা।

প্রিয় পাঠক, এই মেয়েটি সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত, ভারত সরকারের একরোখা পদক্ষেপ 'অপারেশন পুশ ব্যাক'-এর শিকার। অপারেশন পুশ ব্যাকের নামে ভারত সরকার নতুন খেলায় মেতে উঠেছে। সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাঙালী, যারা ইতিমধ্যে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত, ভোটার লিস্টে নাম থাকায় যারা দু'থেকে তিনবার ভোট দিয়েছে, যাদের রয়েছে রেশনিং কার্ড, এমনকি কেউ কেউ স্থানীয় ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নিয়েছে, তাদেরকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী 'বিএসএফ' জোর করে

১৪। সাপ্তাহিক মেঘনা, ২৪/১০/৯২ সংখ্যা

বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকাগুলোতে ঠেলে দিচ্ছে। যা ইতিমধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছে 'অপারেশন পুশ ব্যাক' হিসেবে। আর ভারত সরকার এই অপারেশনের নাম দিয়েছে 'অপারেশন মেক্সিকান লাইন।' উল্লেখ্য, মেক্সিকো থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারীদেরকে এভাবে প্রতিনিয়ত পুশব্যাক করা হয়ে থাকে।

যেভাবে শুরু

৯ সেপ্টেম্বর দিল্লীর উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা বস্তি এলাকাগুলোতে আকস্মিক অভিযান চালায় 'ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন' (এফ.আর.আর.)। এদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে ভারতীয় পুলিশ বাহিনী। প্রথম দফায় এ এলাকার ১৩২ জনকে বেআইনী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জোর করে তুলে দেয়া হয় কলকাতাগামী ট্রেনে। বাংলাদেশে ঠেলে পাঠাবার আগে বিএসএফ সকল পুরুষদের মাথার চুল কামিয়ে দেয়। বাঙালীদের সাথের সকল প্রকার জিনিসপত্রে আগুন লাগিয়ে দেয়। কেড়ে নেয় তাদের সব কিছু। তারপর সীমান্ত পথে এদেরকে ঠেলে দেয় বাংলাদেশে। বিএসএফ বাংলাদেশের বিডিআর এবং পুলিশদের জানায়, এরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। তাই নিয়ম মাফিক এদের পুশব্যাক করা হচ্ছে। বিডিআর একথার প্রেক্ষিতে ঐ সব বাঙালী নর-নারীদের গ্রহণ করে। এ ঘটনা ঘটে ১৫ সেপ্টেম্বর। এরপর বিডিআর কর্তৃপক্ষ ঢাকায় যোগাযোগ করে আসল রহস্য জানতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন পুশব্যাক অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় পাল্টা পুশব্যাক করার। এভাবেই এখনো পুশব্যাক, পাল্টা পুশব্যাক অব্যাহত রয়েছে।

পুশব্যাক এবং ...

'অপারেশন পুশব্যাক' সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হলেও তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় আরো আগে। এবং বাংলাদেশে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন এদেশের কতিপয় মুখচেনা স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি গঠন করে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ নামে একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন। বিভিন্ন সময় এদের বক্তৃতা-বিবৃতি দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। ভারতের মাটিতে যখন তথাকথিত বঙ্গভূমিওয়ালারা তৎপর হয়ে উঠে তখনই এদেশে শুরু হয় এই ঐক্য পরিষদের তৎপরতা। অথচ এই আন্দোলন এদেশে বিন্দুমাত্র সমর্থন পায়নি। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভূমি আন্দোলন এদেশের মাটিতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর একটি টেস্টকেস। এই টেস্টকেস ব্যর্থ হবার পর শুরু হয় এই তথাকথিত অপারেশন পুশব্যাক। ভারতের মৌলবাদী দল বিজেপি'র দাবি, সেখানে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ লোককে অবিলম্বে ফেরত পাঠাতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় ভারতীয় সরকারের নির্দেশে বিএসএফ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৩২ জন বাঙালীকে ঠেলে দেয় বাংলাদেশে। কিন্তু এরপর বিডিআর তাদের সাহসী তৎপরতার ফলে বিএসএফ'র সকল প্রকার পুশব্যাক পাল্টা প্রতিরোধ করে। শুরু করে পাল্টা পুশব্যাক। এ পর্যন্ত প্রায় কয়েক হাজার বাঙালী নর-নারীকে পুশব্যাক-এর পাল্টা পুশব্যাক করা হয়।

অন্যদিকে বিএসএফ বিভিন্ন বস্তি এলাকাগুলো থেকে বাঙালীদের ধরে এনে সীমান্তবর্তী

শিবিরগুলোতে জড়ো করছে। তাদের ওপর চালাচ্ছে অমানুষিক নির্যাতন। এদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন খোদ ভারতেরই কয়েকটি রাজনৈতিক দল। ১৪সেপ্টেম্বর স্থানীয় আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় কলামে লিখেছে, 'তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ নাৎসীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মহাপরিচালক অর্চিস্মান ঘটক রাজ্য সরকারের কাছে এ বিষয়ে পাঠিয়েছেন একটি লিখিত প্রতিবাদলিপি। পশ্চিমবঙ্গের বাম ফ্রন্টের শরিক আরএসপি বলেছে, 'যারা দু'তিনটি নির্বাচনে ভোট দিয়েছে তাদেরকে কিভাবে বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।' ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেন, 'ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য কারণে লোকজন সীমান্ত অতিক্রম করে এদেশ থেকে ভারতে এবং ভারত থেকে এদেশে আসা যাওয়া করে। কিন্তু তাদের এ আসা যাওয়া নিতান্তই সাময়িক।' ভারতের প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেক্স' ২০ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় কথিত অনুপ্রবেশকারীদের দিল্লী থেকে কলকাতা পর্যন্ত আনার পথে বাংলাভাষীদের ওপর অমানবিক আচরণের এক মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'গোটা ব্যাপারটা করা হয়েছে নির্মমভাবে এবং কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে।'

অন্যদিকে কথিত অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মতের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। ভারতীয় পত্রপত্রিকার মতে গোয়েন্দা সংস্থার অতিগোপনীয় প্রতিবেদন, যেটি গত দু'সপ্তাহ আগে প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের কাছে দেয়া হয়েছে, তাতে বলা হয় ১ কোটির ওপর বাংলাদেশী ভারতে আছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, অনুপ্রবেশকারীরা মূলতঃ আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে জড়ো হয়ে আছে। সবচেয়ে বেশি আছে পশ্চিমবঙ্গে। সেখানে আছে কয়েক লাখ অনুপ্রবেশকারী। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলেছে অন্য কথা। তাদের মতে এসংখ্যা বড় জোর কয়েক হাজারের বেশি হবে না।

পুশব্যাকের নেপথ্যে

কংগ্রেস দলের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭১ সালে দিল্লীর উপকণ্ঠে গড়ে ওঠে অনেকগুলো বস্তি এলাকা। বস্তিবাসীদের অধিকাংশই পেশায় রিক্সাচালক, মজুর, রাজমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রীর সহকারী। আবার কেউ কেউ ছোট খাটো ফেরিওয়ালা। '৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বেশ কিছু বাঙালী ওই বস্তিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলো পশ্চিমবঙ্গ অধিবাসী। প্রভাবশালী বিজেপিও ঐ বস্তি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় ১৯৯১ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়। বস্তিতে ভোট ব্যাংক ঠিক রাখতে প্রভাব বিস্তারের খেলায় মেতে ওঠে দু'শক্তিশালী বিজেপি এবং কংগ্রেস। ১৫ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, গত লোকসভা নির্বাচনে এ এলাকায় ২০ হাজার ভোটের মাত্র ১৬৭ ভোট পায় কংগ্রেস। এর পর শুরু হয় নিপীড়ন, বস্তিবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষাভাষীদের বিতারণের নয়া পদক্ষেপ।

বেগম খালেদা জিয়ার সরকার বর্তমানে সীমান্ত এলাকায় অবাধ চোরাচালান কঠোর

হাতে দমনে সচেষ্ট। এই অবাধ চোরাচালান কিছুটা বন্ধ হওয়ায় ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় বাংলাদেশের মুদ্রার মান বেড়েছে। এছাড়া অবাধ আমদানীর ক্ষেত্রে সরকার কিছুটা বিধি নিষেধ আরোপের কথা ভাবছিলেন। অন্যদিকে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা নিজেরাই এখন হতাশাগ্রস্ত। ভারত বুঝে গেছে বাংলাদেশের ওপর চাপ প্রয়োগের এই কৌশলটি এখন আর কার্যকরী হচ্ছে না। সুতরাং প্রয়োজন এমন এক ইস্যু যা বাংলাদেশ সরকারের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকার দিল্লী সরকারের দ্বারস্থ হবেন। আর বিজেপি'র 'বিদেশী খেদাও' আন্দোলনের নামে বাংলাভাষী বাঙালী বিশেষ করে মুসলমানদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার জোর দাবি তো প্লাস পয়েন্ট হিসেবে থাকছেই। তাই সন্দেহ নেই দিল্লীর শাসকদের এ ধরনের পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য অপারেশন পুশব্যাক পরিচালিত করা হচ্ছে।

কূটনৈতিক তৎপরতা

কয়েক দফা পুশব্যাকের পর ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ভারত সরকারের পুশব্যাক কর্মকান্ডের বিরোধিতা, বাংলাদেশ পক্ষের তৎপরতা তদারকি ও সমন্বয়ের জন্যে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। সারাদেশের সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশ রাইফেলস্‌কে সতর্ক করে দেয়া হয়। তথাকথিত অভিবাসীদের ঢুকতে না দেয়ার জন্যে জরুরী নির্দেশ দেয়া হয়। বৈঠকে ভারতের এ প্রচেষ্টাকে বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বৈঠকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানসহ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার কে. রঘুনাথকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে ভারত সরকারের পুশব্যাক নীতির মৌখিক প্রতিবাদ জানানো হয়। বাংলাদেশ পক্ষকে আগে ভাগে কোনো সংবাদ না দিয়ে, কোনো মতামত না নিয়ে পুশব্যাক করায় বাংলাদেশ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তবে এ ব্যাপারে বাংলাদেশ কোনো আনুষ্ঠানিক লিখিত প্রতিবাদ জানায়নি বলে জানা গেছে। পরে কে. রঘুনাথের সাথে মঞ্জুরুল করিমের বৈঠকের মধ্য দিয়ে বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভারতীয় স্বরাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রসচিবকে দিল্লী সফরের আমন্ত্রণ জানান।

অন্যদিকে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম বি চ্যাবন লন্ডনে বিবিসিকে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে এ বিষয়ে বলেছেন, 'বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে বসবাসকারী যে লোকের কাছে উপযুক্ত দলিল বা প্রমাণ নেই, তাদের সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ভারতে বাংলাদেশীরা অবৈধভাবে বসবাস করছে। তাদের ভারতে থাকার কোনো অধিকার নেই। এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী ১৩২ জনকে পাহারা দিয়ে সীমান্ত পার করে দিয়েছে।' এছাড়া চ্যাবন ২৮ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন, 'ভারতে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণ করা হবে। তিনি বলেন, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পাহারা দেয়ার জন্যে ভারত সরকার ১৭৩০ মাইল সড়ক পথ নির্মাণ করবে। এবং বেড়া তৈরী করবে ৫৩৭ মাইলব্যাপী। প্রকৌশলীরা ইতিমধ্যে ২১৬ মাইল সড়কপথ নির্মাণ করেছে এবং সীমান্তে ৪৬ মাইল বেড়া তৈরি করেছে। আর সীমান্তে পাহারা জোরদার করবে

৮০ হাজার বিএসএফের আধা সামরিক জোয়ান। বিএসএফের গানবেডের সংখ্যাও বাড়ানো হবে।'

অন্যদিকে বাংলাদেশ সব সময় বলে আসছে এখান থেকে কেউ বেআইনীভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করছে না। সম্প্রতি ভারত সফরকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওকে একই কথা বলেছেন। তবে উভয় প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে দু'দেশের সীমান্ত দিয়ে বেআইনী অনুপ্রবেশের বিষয়টি আলোচনায় উঠেছিলো এবং তা স্থান পেয়েছিলো যুক্ত ঘোষণায়। সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্র সচিব জেএন দীক্ষিত ঢাকা সফরকালে পররাষ্ট্র সচিবসহ বিভিন্ন কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের ব্যাপারে তাদের মনোভাব বিস্তারিতভাবে অবহিত করেছিলেন বলে জানা গেছে। ঢাকার সরকারি মহল ভারতের অপারেশন মেক্সিকানলাইন (অপারেশন পুশ ব্যাক) নীতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া, পরবর্তীতে বণিজ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীর দিল্লী সফরের মধ্য দিয়ে দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে উন্নতি ঘটেছিলো তা পুশব্যাক চেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে ভারতে বৈধ ভ্রমণের জন্য ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কড়াকড়ি নিয়ম আরোপ করেছে। কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ভারতে প্রবেশের হিসেব রাখা এবং তা বিভিন্ন প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরণ, ভারতে বর্ধিত অবস্থানের মেয়াদ কমিয়ে আনাসহ ইত্যাদি নিয়ম কানুন প্রয়োগ করতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন, ভারতীয় ইমিগ্রেশন, কাস্টমস এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে এসব বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছে। ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় ভারত সরকার কর্তৃক কথিত অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণের কাহিনী প্রকাশিত হওয়ায় সে দেশে পুশব্যাকের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছে। আবার সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি কথিত ১ কোটি ৭০ লাখ অনুপ্রবেশকারীকে অবিলম্বে বাংলাদেশে ফেরত না পাঠালে আন্দোলন শুরু করার হুমকি দিয়েছে।

এসমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করে ঢাকার সরকারি মহল মনে করছে, ভারতের ক্ষমতাসীন বর্তমান সংখ্যালঘু সরকার বিজেপিসহ চরম দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোর চাপে এ ধরনের নীতি গ্রহণ করেছে। যা দু' দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করবে।

ওপেন সিক্রেট বিষয়

চোরাচালানের কারণে সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে লোক চলাচল অনেক আগে থেকেই অব্যাহত ছিলো। চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ভারত-পাকিস্তানে যুবক-যুবতী পাচারের সংবাদ প্রায়শঃ আমাদের চোখে পড়ে। যুবতীদের অনেককেই আবার বিক্রি করে দেয়া হয় স্থানীয় পতিতালয়গুলোতে। এছাড়া এদেশে দন্ড পাওয়া অনেক দাগী অপরাধী ভারতে বিশেষ যত্নে লালিত পালিত হচ্ছে। এদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। ভারত সরকারের কাছে এরা অনুপ্রবেশকারী নয়।

ভারত সরকার এদেশের অর্থনীতেকে পঙ্গু এবং নিজ দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে সীমান্ত পথে চোরাচালানকে উৎসাহিত করে থাকে। এ অভিযোগ অনেকের।

বাংলাদেশে ভারতীয় আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের মতোই চোরাচালানও ভারতের অনুকূলে। দু'দেশের বাণিজ্যে বাংলাদেশের ঘাটতির পরিমাণ ১৩০ কোটি ডলার। আর ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ রাইফেলস বাংলাদেশ–ভারত সীমান্ত থেকে মোট ৭৪ কোটি ৬৮ লাখ টাকার পণ্য আটক করে। এর মধ্যে ভারত থেকে আসার পরে আটক করা হয় ৬০ কোটি ৭৫ লাখ টাকার পণ্য। আর বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচারের সময় আটক করা হয় মাত্র ১৪ কোটি টাকার পণ্য। অর্থাৎ, বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ পণ্য ভারতে যায়, তার ৪.৩৩ গুণ বেশি পণ্য সেখান থেকে আসে। তাও এটা আটককৃত পণ্যের হিসেবে অনুযায়ী। প্রকৃত চোরাচালান হয় আরো বেশি। অন্যদিকে এই চোরাচালানের সাথে বিরাট সংখ্যার একটি জনসাধারণ জড়িত। এরা কখনো এদেশে আবার কখনো ভারতে বসবাস করে। এদের আড্ডা সীমান্তবর্তী হোটেলগুলোতে। বাংলাদেশ সরকার এদের ব্যাপারে মাঝে মধ্যে কড়াকড়ি আরোপ করলেও ভারত সরকার থাকে উদাসীন। এই বিরাট সংখ্যার একটি চোরাকারবারীদের ভারত সরকার অনুপ্রবেশকারী হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে না। তবে একথা সত্য যে, স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন এবং পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু বাংলাদেশী কাজের সন্ধানে ভারতে যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক লোকই সেখানে চলে যায়, তাদের আত্মীয় স্বজনদের কাছে থাকবার জন্যে। তাদের খুব বেশি সংখ্যকই দেশে ফিরে আসে। যারা সেখানে থেকে যায়, তারা সেখানে বসবাস শুরু করে এবং এক সময় নাগরিকত্ব লাভ করে। ভোট দেবার অধিকার লাভ করে। আবার কেউ কেউ ব্যাংক ঋণ নিয়ে বাড়ি, জমি ক্রয় করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার ভারত সরকার প্রদত্ত রেশনিং কার্ড-এর মালিক। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে এদেরকেই অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। আর বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষও এদের গ্রহণ করতে অস্বীকার জানিয়ে পাল্টা পুশব্যাকের নীতি গ্রহণ করেছে।

বিএসএফের শেষ কৌশল

বিএসএফ পুশব্যাক সফল করতে সর্বশেষ দু'টি কৌশল অবলম্বন করছে। কৌশল দু'টি হচ্ছে অভুক্ত রেখে এমন নির্যাতন চালানো হবে যাতে স্বেচ্ছায় ঐসব এলাকায় বসবাসরত বাংলাভাষীরা ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। এবং অস্ত্রের মুখে সীমান্তে ঠেলে দিয়ে বর্ডার সীল করে দেয়া হবে। যাতে বিডিআর পাল্টা ঠেলে দিলেও কেউ যেনো ভারতের মাটিতে পুনঃপ্রবেশ করতে না পারে। অন্যদিকে কট্টর মৌলবাদী বিজেপির 'বিদেশী খেদাও' আন্দোলন তো আছেই। আর পাশাপাশি চলবে বিএসএফের নির্যাতন।

আর্তনাদ করছে মানবতা

এক. গান্ধিজীর অহিংস ভারত, নেহেরুজীর ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত, বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত, প্রাচীন সভ্যতার দেশ ভারত আরো কতো সুন্দর সুন্দর বিশেষণ! কিন্তু মেকাপের নীচে, আলখেল্লার তলায় একি কুৎসিত রূপ তার। লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে, সভ্যতা–ভব্যতা, শিষ্টাচার, মানবতা বিসর্জন দিয়ে এখন সে মেতে

উঠেছে প্রতিবেশীর হৃদয়ে নিত্য নব ত্রাস সঞ্চারের বর্বর উল্লাসে। এক সময় যে বিভৎসতাকে সকলে ঘৃণা করতো। মনে করতো এটি আরণ্যক পাশবিকতা, সেই বিশ শতকের দোড়গোড়ায় এসে সেই পাশবিকতা'ই সওয়ার হয়েছে ভারতের পৃষ্ঠ দেশে। রক্ষক পুলিশ ধরে আনছে গৃহবধুকে। তারপর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পাগলা কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেই অসহায় গৃহবধুর ওপর। সারারাত পালাক্রমে ৬ জন চালিয়েছে ধর্ষণ। লুট করেছে তার ইজ্জত। ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত করেছে তার দেহ। সে বাঙালী কথিত অনুপ্রবেশকারী কথা বলে বাংলায়। তার স্থান ভারতের মাটিতে হবে না। তাকে যেতে হবে বাংলাদেশে। তাই, ধর্ষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন-এতো বাড়তি পুরস্কার। ভারতের উগ্র মৌলবাদী সংগঠনগুলোর পান্ডারা কথিত অনুপ্রবেশ-কারীদেরকে নিজ নিজ বাড়িঘর থেকে ধরে আনছে। তাদের বাড়িঘর, বসত ভিটে লুট করছে। তারপর শেষ চিহ্নটুকু মিশিয়ে দিচ্ছে মাটিতে। ছাগল ভেড়ার মতো ঠেঙাতে ঠেঙাতে এনে তুলছে সীমান্তের বন্দী শিবিরে। সেখানে খাবার নেই, নেই পানি। নির্যাতিত অনাহারক্লিষ্ট মানুষগুলোকে রাইফেলধারী ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা (বিএসএফ) নিয়ে আসছে 'নো ম্যানস লাইনে।' ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে চাইছে বাংলাদেশ ভূ–খন্ডে। সদা সতর্ক বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) ছুটে যাচ্ছে সেখানে। তারা আবার ঐ সব হতভাগাদের করছে পাল্টা পুশব্যাক। অমনি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে নেকড়ের মতো বিএসএফ। চালাচ্ছে বেধড়ক লাঠি চার্জ। ওপারের লাঠি, এ পারের লাঠি, দুই লাঠালাঠির শিকার হয়ে এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যবর্তী স্থানে অসহায় বাঙালী আর্তনাদ করছে। অট্টহাস্যে ফেটে পড়ছে ইবলিস শয়তান। এই হতভাগ্যরা কোথায় যাবে? না, যাওয়ার জায়গা নেই। ওদের থাকার জায়গা নেই। কারণ ওরা বাংলাদেশের নাগরিক নয়। অন্যদিকে ভারতের দৃষ্টিতে ওরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। এ দৃশ্য গোটা ভারত-বাংলা পশ্চিম সীমান্তের।

দুই. ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যদিও এই অপারেশনকে মেক্সিকান লাইন হিসেবে অভিহিত করেছে তবুও এটি এখন 'পুশব্যাক' নামেই বেশি পরিচিত লাভ করেছে। এই পুশ ব্যাক PUSH BACK কথাটাই চরম অসত্য এবং অবমাননাকর। 'পুশব্যাক' বলতে বোঝা যায়, যে স্থান থেকে এসেছিলো, সেখানেই ঠেলে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু, দিল্লীতে বসতকারী এসব বাঙালী তো পশ্চিম বাংলার। দিল্লী থেকে যাদেরকে মাথা ন্যাড়া করে 'প্রিজনার-অব-ওয়ার' বানিয়ে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করে দেওয়া হলো, তাদের ভারতীয় নাগরিকত্বের বৈধ কাগজপত্র-ছিলো। আরো ছিলো রেশন কার্ড। এসব প্রমাণাদি ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা ধ্বংস করে দিয়েছে। ভোটার তলিকায়ও আছে তাদের নাম-সাকিন। এগুলো কিভাবে অস্বীকার করা যাবে? দিল্লীর ১৩টি বস্তীতে বসবাসরত কয়েক লাখ অধিবাসীর মধ্যে কে বাংলাদেশী, আর পশ্চিমবঙ্গবাসী, তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। অথচ দিল্লী ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিস দেড় লাখ বস্তিবাসীর মধ্যে ১৯ হাজারকে বাংলাদেশী হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। যাকে ইচ্ছে তাকে ধরে নিয়ে ঘোষণা করলেই কি সে অমুক দেশের নাগরিক হয়ে গেলো। বছরের পর বছর ধরে তারা সেখানে আছে। পশ্চিম বাংলাও যা, দিল্লীও তা। কানপুর, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ,

বোম্বাই সবই এক অবস্থা।

তিন. ভারতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের অজুহাত অলীক এবং মিথ্যা। সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে বলা হচ্ছে, অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সীমান্তবর্তী ভারতীয় জেলাগুলোতে সীমান্ত বিচ্ছিন্ন জেলাগুলোর তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সালওয়ারী প্রবণতা '৪৭-এর পূর্বকালীন সময়েও বেশি ছিলো এবং এখনো বেশি। এর অর্থ এই নয় যে, অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আবার ১৯৯১ সালের ভারতীয় আদমশুমারী মোতাবেক জেলাওয়ারী জনস্ফীতির হার ১৯৮১-৯১ এই দশকে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও নদীয়ায় কমেছে। পশ্চিম দিনাজপুরেও কমেছে কিছুটা।[১৫] এগুলো সীমান্ত লাগোয়া জেলা। এগুলোর জনসংখ্যা কমলো কিভাবে? এইতো মাত্র কয়েক দিন আগে আসামের মুখ্যমন্ত্রী সাঈকিয়া বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের অভিযোগ ভিত্তিহীন।

চার. বিজেপি'কে তুষ্ট করতে, বাংলাদেশের ওপর মানসিক চাপ প্রয়োগের কৌশল হিসেবে ভারত সরকারের এ ধরনের কার্যকলাপ মেনে নেয়া যায় না। দু'দেশের কূটনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যদি তা না হয়, তাহলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করা উচিত। কেননা, এটি বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়। আর কোনো মহলকে এ ইস্যুতে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা থেকে বিরত রাখতে হবে। সেটি করবে এ দেশের সচেতন বীর জনতা। সে আকাংখা সবার এবং আমাদের।

বাংলাদেশে ভারতীয় নাগরিকদের গোপন অনুপ্রবেশ

নিছক ব্যবসা বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক ভারতীয় বাংলাদেশে প্রবেশ করে প্রায় প্রতিবছর। কিন্তু এদের এক বিরাট অংশ বাংলাদেশে থেকে যায় গোপনে এবং এরা কোথায়, কিভাবে, কি করছে তা প্রায়শই বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে খুঁজে দেখা সম্ভব হয় না। নৃতাত্বিক ও ভাষাগত মিল থাকায় এসব ভারতীয় অনায়াসেই বাংলাদেশের জনগণের সাথে যেমন মিশে যেতে পারে তেমনি এদেশের ভারত অনুগত গোষ্ঠি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাবতীয় উপায়ে। অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর যেহেতু ষাট দিনের এলপি বা ল্যান্ডিং পারমিট পাওয়া যায়, পূর্বে ভিসা সংগ্রহ না করলেও চলে সেজন্য এসুযোগকে কাজে লাগিয়ে যে কোন ভারতীয়ের পক্ষেই এদেশে অনুপ্রবেশ সম্ভব। এরপর পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এসব ভারতীয় আবার ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবেদন করে মাত্র দু'শ টাকা ফি দিয়ে। এতে আবার একটি দালাল চক্রের মাধ্যমে কোন অনুসন্ধান ছাড়াই যে কারো পক্ষে অতিরিক্ত শ'খানেক / শ' দুয়েক টাকা ব্যয় করে ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে নেয়া যায়। অনেকে আবার ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর তোয়াক্কাই করে না। এভাবে বাংলাদেশের প্রায় সব শহরেই বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী বৈধ-অবৈধভাবে বসবাস করে

১৫। ডেমোগ্রাফিক ডাইভারসিটি অব ইন্ডিয়াঃ ১৯৯১ সেশন্স

আসছে। ক্ষেত্রবিশেষে এরা বাংলাদেশের অনেক ব্যবসার মূল কলকাঠি নাড়ার মত অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। ১৯৯৬ সালে শেয়ার মার্কেটে যে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে তার পিছনেও ছিল এধরনের ভারতীয় ব্যবসায়ী চক্রের হাত যারা 'র'-এর পরিকল্পনা মতো এদেশের অর্থনীতির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল। এছাড়া হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিক অত্যন্ত সুপরিকল্পিত উপায়ে বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত কোম্পানীর উচ্চপদ থেকে শুরু করে শ্রমিক পর্যায়েও চাকুরীতে অনুপ্রবেশ করেছে। এদের কোন হিসেব, পরিসংখ্যান বা কে কোথায় আছে তার খবর বাংলাদেশ সরকারের কাছে নেই। ব্যবসায়ী, ট্যুরিস্টের ছদ্মবেশে এধরনের অনুপ্রবেশের পাশাপাশি প্রতিবার নির্বাচনের সময়ও সীমান্ত এলাকাগুলোয় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সমর্থন জানাবার জন্য প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে থাকে। যাহোক, বাংলাদেশে ঠিক কতজন ভারতীয় গোপনে বসবাস করছেন তা হয়তো কখনোই বাংলাদেশের 'সুদক্ষ প্রশাসনের' পক্ষে বের করা সম্ভব হবে না। তবে এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ক'টি রিপোর্টের উল্লেখ করা যেতে পারে। এব্যাপারে প্রয়াত সাংবাদিক জনাব শামছুর রহমান এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশ থেকে কি ভারতে শুধু বাংলাদেশী নাগরিক যায়? ভারতীয় নাগরিকরা কি বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে না? বিভিন্ন মহলের খবরঃ ১৯৮২ সালের পর বরং প্রচুর ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এদের অনেকে পঞ্চাশ ও ষাট দশকে বাংলাদেশ ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়েছিল। তাদের একটা অংশ বাংলাদেশে আসছে চোরাপথে। চোরাচালানীদের মাধ্যমে। অন্য অংশ পাসপোর্টের মাধ্যমে। পাসপোর্টে বাংলাদেশে এসে তারা আর ফিরে যায়নি। বেনাপোল কাস্টমস্-এর একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত ভারত থেকে ১ লাখ ৯২ হাজার ৮শ' ৪ জন বাংলাদেশে আসে। আর একই সময়ে ভারতে যায় ১ লাখ ৭৮ হাজার ২ শ' ৮৫ জন। অর্থাৎ ১৪ হাজার ৫শ' ১৯ জন, যাদের অধিকাংশ ভারতীয় নাগরিক তারা বাংলাদেশে রয়ে গেছে।'[১৬] এছাড়া ১৩ অক্টোবর '৯২ সংখ্যা সাপ্তাহিক খবরের কাগজে বলা হয়–

রূপকথা নয়, সত্যি

'ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বস্ত একটি সূত্রমতে, বেনাপোল সীমান্ত পথে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯৯২ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত বৈধ পাসপোর্টে প্রায় ৭২ হাজার ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এর মধ্যে '৮৬ সালে ১০ হাজার ৫১২ জন, '৮৭ সালে ১০ হাজার ৪৭২ জন, '৮৮ সালে ১০ হাজার ৮১১ জন, '৮৯ সালে ১০ হাজার ৫৮৬ জন, '৯০ সালে ১০ হাজার ২৫ জন, '৯১ সালে ১১ হাজার ৩১ জন, '৯২ সালের ২৯ আগস্ট পর্যন্ত ৭ হাজার ৮১৫ জন। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর এদের মধ্যে ১২ হাজার ৬৪৫ জন ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে অবস্থান করছে। বেনাপোল

১৬। শামছুর রহমান, *বঙ্গভূমিওয়ালাদের ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী ঐক্য পরিষদ কাজ করছে,* দৈনিক বাংলা, ২৩/৫/৯২ সংখ্যা

ইমিগ্রেশন, চেকপোস্ট থেকে বরাবরই ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ ভারতীয় নাগরিকদের তালিকা মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। কিন্তু ইতিপূর্বে অবৈধভাবে অবস্থানকারী ভারতীয় নাগরিকদের ব্যাপারে কোনো খোঁজ-খবর নেয়া হয়নি। ঐ সূত্রমতে, ১৯৪৬ সালের ফরেনার্স কন্ট্রোল অব এন্ট্রি এ্যাক্ট FCEA-XXI অনুযায়ী অবৈধভাবে অবস্থানকারী ভারতীয় নাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে।'

এদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কিভাবে একশ্রেণীর বাংলাদেশীর সহায়তায় ভারতীয়রা অনুপ্রবেশ করছে তার একটি চিত্র পাওয়া যায় ২৬ মে '৯৬ সংখ্যা দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে। 'সিলেটে স্থায়ী বাসিন্দাঃ হিন্দিতে কথা বলেঃ ওরা কারা' শিরোনামের ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়ঃ

সিলেটে স্থায়ী বাসিন্দা ঃ হিন্দিতে কথা বলে ঃ ওরা কারা

'সীমান্ত শহর সিলেটে কিছু দিন আগে দেখা হয়েছিল ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরখপুর-এর রাম শংকর যাদবের সাথে। বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন না। হিন্দীতে বললেন, তারা ৯ জন সিলেটে আসার আগে ভারতীয় আধা সামরিক সংস্থা বর্ডার রোড টাস্কফোর্সে কাজ করতেন। তিনি জানিয়েছিলেন তাদের বাংলাদেশে থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। মাস তিনেক আগে তারা আগরতলা থেকে সিলেট আসেন। তার পর থেকে সিলেট শহরের লামা বাজারস্থ মণিপুরী রাজবাড়ীর কাছে এক বস্তিতে বসবাস করছেন।

ব্যস্ত থাকায় রাম শংকরের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ হয়নি। তার অনুরোধ অনুযায়ী তাদের বস্তিতে কয়েকদিন পরে শিব শংকরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। তাদের সঙ্গীরা বললেন দলপতি কুমিল্লা গেছেন, গরু কিনতে।

কবি সুফিয়া কামালের জামাতা সুপ্রিয় চক্রবর্তী রনজুর বাসার পাশে একটি ঝুপড়িতে তারা থাকেন।

ওদের সঙ্গে আলাপ হলো বিস্তারিত। আলাপচারিতায় তারা অত্যন্ত সতর্ক মনে হলো। বললো, ৪৫ বছর ধরে তারা সিলেটে আছেন ভারতের সঙ্গে কেনো সম্পর্ক নেই। দেশে কিংবা সিলেটে স্ত্রী-পুত্র পরিজন কেউই নেই। এতো বছর সিলেট থাকা সত্ত্বেও সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা তো দূরের কথা, ওরা একমাত্র হিন্দী ছাড়া বাংলায়ও কথা বলতে পারেন না। আলাপে মনে হলো ওরা কিছু একটা গোপন করতে চাইছেন।

ওদের ছবি দেখলে মনে হয় না ওরা ৪৫ বছর আগে বাংলাদেশে এসেছেন। কিভাবে, কোন পাকে, ঠিক কবে তারা বাংলাদেশে এসেছেন এ প্রশ্ন তারা এড়িয়ে গেছেন, অত্যন্ত সচেতনভাবে।

পেশা সম্বন্ধে বললেন, ওরা ছোট একটা গরুর খামার করেছেন। ১০/১২ বাসায় দুধ দেন।

ওরা যেসব বাসায় দুধ দেন তাদের একজন হলেন রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক ওরফে রবীন্দ্রনাথ সরকার নামে একজন পুলিশ কর্মকর্তা। এই ভদ্রলোকের কোনো স্থায়ী

ঠিকানা নেই। বাড়ি ছিল নাটোর জেলার সিংড়া থানার শেরকুল ইউনিয়নের মাঞ্জপাড়া গ্রামে। তাঁর বাবা রশিক চন্দ্র প্রামাণিক বাড়ি ঘর-জমিজমা বেচে চলে গেছেন ভারতের মালদায়। সাধারণত হিন্দু পুরুষের পদবীর কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এই পুলিশ কর্মকর্তা তার পদবী পরিবর্তন করেছেন। বিয়ে করেছেন সিলেটে। ছেলেমেয়েদের নামের সঙ্গে পিতার নাম লেখেন রবীন্দ্রনাথ সরকার। তার বড় ছেলে অনুপ কুমার সরকার, পিতা রবীন্দ্রনাথ সরকার, ডাকঘর ও গ্রাম লাল বাজার, নাটোর-ওই স্থায়ী ঠিকানা লিখে পাসপোর্ট করেছেন। পড়াশুনা করে দিল্লীতে অথচ লাল বাজারে স্থায়ী ঠিকানায় রবীন্দ্রনাথ সরকার নামে কেউ থাকেন না। রবীন্দ্র বাবুর সরকারি কর্মস্থলই হলো তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা।

উত্তর প্রদেশের এইসব গোয়ালারা আলাপচারিতায় জানালেন, সিলেটের মানুষ ভীষণ সরল। আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল। চিন্তাধারা বহির্কেন্দ্রিক। কবে লন্ডন, নিউইয়র্ক কিংবা কানাডা যাবে সর্বক্ষণ এই চিন্তাই করে। ফলে তাদের পক্ষে সিলেট থাকা নিরাপদ। কেউ প্রশ্ন করে না তাদের দেশ কোথায়। সিলেট ঘুরে এসে এসব ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে আলাপে বোঝা গেল গত অসহযোগ আন্দোলনের সময়ই এরা বাংলাদেশে সম্ভবত অনুপ্রবেশ করেছে।

প্রশ্ন জাগে, ওরা আসলে সিলেটে কিভাবে অবৈধভাবে বসবাস করছে? ওদের উদ্দেশ্যই বা কি? স্থানীয় প্রশাসন ওদের ব্যাপারে নির্লিপ্তই বা কেন? স্থায়ী ঠিকানা ছাড়া কেমন করে একজন পুলিশ কর্মকর্তা বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কাজ করছেন?'

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন হওয়ার পর একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী এমন প্রচার-প্রচারণা শুরু করে দেন যে, জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে সরকার গঠন করে বিএনপি স্বাধীনতার চেতনা বিসর্জন দিয়েছে এবং জামায়াতই হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র সমস্যা। এদের প্রচারণা এতোটাই সমন্বিত ও সর্বব্যাপী ছিল যে, সরকারও একপর্যায়ে ঘাবড়ে যায়, ভাবতে থাকে না জানি কে কি মনে করছে। ফলশ্রুতিতে বিএনপি'র দ্যোদুল নেতৃত্ব ২৩ মার্চ '৯২ তারিখে সবাইকে অবাক করে দিয়ে জামায়াতের আমীর জনাব গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিলের পাশাপাশি তাকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে প্রেরণ করে। এর মাত্র দু'দিন পর ২৬ শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় ঘাদানি অর্থাৎ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে এই কমিটি কাদের সহায়তায়, কোন সূত্রে প্রাপ্ত অর্থে সারাদেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণাযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তা বিবেচনায় না এনেও বলা যায় শুধুমাত্র বিএনপি'কে বিপদে ফেলা ও জামায়াতের কাছ থেকে আলাদা করে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেয়াই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। এ যুক্তির স্বপক্ষে বিস্তারিত তথ্য প্রমাণ উপস্থাপনেরও প্রয়োজন নেই। শুধু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ১৯৯৪ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে সৃষ্ট আন্দোলনে জামায়াত আ'লীগের শরীকে পরিণত হওয়ার সাথে সাথেই এই ঘাদানি কমিটির সকল দাবী হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। তাই তারা একসময় গণআদালত গঠন করে 'ঘাতক গোলাম আযমের' ফাঁসি দাবী করলেও আ'লীগ-জাপা

জামায়াত জোট গঠনের পর একটিবারের জন্যও সেই ফাঁসির রায় কার্যকর করার টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

এদিকে ঘাদানি গঠন ও এর উদ্দেশ্য যে 'ঘাতকদের' বিচার নয় ভিন্ন কিছু ছিল সেব্যাপারে ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে কর্নেল কাজী নুরুজ্জামানের উৎসাহে ক'জন মুক্তিযোদ্ধা '৭১ এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও প্রতিরোধ কল্পে একটি কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়। এদের বেশীরভাগই সরাসরি আ'লীগ বা অন্যকোন বুর্জোয়া দলের সদস্য বা সমর্থক ছিলেন না। জানা যায়, আলাপ আলোচনার পর আলোচ্য কমিটির নাম রাখার সিদ্ধান্ত হয় 'ঘাতক দালাল প্রতিরোধ কমিটি'। এটি '৯১ সালের ডিসেম্বর-এর কথা। এর মাঝে লে. কর্নেল নুরুজ্জামানের এককালীন ঘনিষ্ট এক 'বিশিষ্ট' সাংবাদিক হুট করে এই কমিটির নাম থেকে 'প্রতিরোধ' শব্দ বাদ দিয়ে 'নির্মূল' শব্দ ব্যবহারের কথা বলেন। এরপর কোথা দিয়ে কি হলো, স্রোতের মতো এগিয়ে এলেন জাহানারা ইমামসহ অসংখ্য ভারতপন্থী ব্যক্তিত্ব।[১৭] নির্দলীয় মুক্তিযোদ্ধাদের আইডিয়া পরিবর্তিত আকারে হাইজ্যাক হয়ে গেল কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই। সুযোগ বুঝে আ'লীগ নেতৃবৃন্দ ভাগ বসালো 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। কিন্তু যখন পারপাস সার্ভ হয়ে গেল তখন 'ঘাতক' জামায়াতই আবার হয়ে গেল 'মুক্তিযোদ্ধা'দের আন্দোলনের সাথী। এরপর ১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই ঘাদানি'র কোন সাড়াশব্দ ছিল না। বিএনপি, জাপা, জামায়াত, ইশা আন্দোলন একজোট হওয়ার মুহূর্তে আবার চারদিকে 'ঘাতকদের ষড়যন্ত্র' খুঁজে পায় ঘাদানি। অথচ, ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে তাদের পছন্দনীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর একবারও 'ঘাতক গোলাম আযমের' ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবী জানায়নি ঘাদানি নেতৃবন্দ। এথেকেই কি বোঝা যায় না, কি উদ্দেশ্যে, কাদের স্বার্থে ও কাদের বিরোধিতা করার জন্য এই কমিটির সৃষ্টি?

বেগম খালেদা জিয়ার 'ফারাক্কা ভাষণ' ও 'র'-এর ৪শ' কোটি রুপীর বাজেট

তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯৩ সালের ১ অক্টোবর জাতিসংঘের ৪৮ তম অধিবেশনে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। তার এ ভাষণে বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের প্রাণের ভাষা অনুরণিত হয়। সর্বস্তরের মানুষ এ ভাষণ থেকে হয় নতুনভাবে বলীয়ান। আত্মপ্রত্যয় হয় দৃঢ়। আত্মমর্যাদাবোধ, জাতীয় অহমিকা বৃদ্ধি পায় বহুগুণ। বিশেষ করে ফারাক্কা ইস্যু নিয়ে বেগম জিয়া বিশ্বসভায় যে দৃঢ় মনোভাব দেখান তা ছোট বড় সকল দেশকেই অবাক করে দেয়। তাঁর এই সত্য উচ্চারণে ভারতীয় প্রতিনিধিরা হতবাক হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য, বেগম জিয়া যে জাতিসংঘে এতো কঠোর ভাষায় ভারতের সমালোচনা করবেন তা বিএনপি'র দলীয় নেতা, এমপি থেকে শুরু করে সরকারী কর্মকর্তারাও আঁচ করতে পারেননি। এমনকি বেগম জিয়া জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে প্রেস ব্রিফিং-এর সময় পররাষ্ট্র সচিব রিয়াজ রহমানও এ সম্পর্কে কোন পূর্বাভাস দিতে

১৭। ঘাতক দালাল প্রতিরোধ কমিটি গঠনের সাথে জড়িত নাট্যকার, সাংবাদিক আহমেদ মুসার সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার

পারেননি। আলোচ্য ভাষণে বেগম জিয়া যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন সে সম্পর্কে একমাত্র 'পঞ্চম বাহিনী'র সদস্যরা ছাড়া সর্বস্তরের বাংলাদেশী জনগণ উচ্ছাসে ফেটে পড়ে। এ ভাষণ সম্পর্কে ঢাকার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, "... গোটা বিশ্বের মানবতাকামী শান্তিকামী মানুষের সচকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার এ ভাষণ। সমস্যা সংকুল বাংলাদেশের ইতিহাসে তার ভাষণ সৃষ্টি করেছে এক তরঙ্গায়িত স্রোতধারা। তিনি সকল জল্পনা-কল্পনা, বিরূপ প্রচারণা, সন্দেহবাদীদের সন্দেহ সবকিছু উড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা ফারাক্কা বাধের মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্ব সভাকে অবহিত করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তুলে ধরেছেন ফারাক্কা বাধ কিভাবে বাংলার বার কোটি মানুষের জন্য মরণ ফাঁদের ভয়ালরূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে ভারতের এই মানবতা ও নীতি বিবর্জিত কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বেগম জিয়া তার ভাষণে জাতির এই জীবন-মরণ সমস্যাকে দ্বিপক্ষীয়তার ঘেরাটোপ থেকে বিশ্ব সভার অঙ্গনে নিয়ে গিয়ে বিশ্ব সভ্যতা ও বিশ্ব বিবেকের দরজায় সজোরে করাঘাত এবং ফারাক্কা বাধের উপর সাহসী কুঠারাঘাত করেছেন।"[১৮] তবে একইসাথে বেগম জিয়ার এই সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠারও সৃষ্টি হয় এদেশের জনগণের মাঝে। তারা ভাবতে থাকেন- ভারত কখনোই এজন্য বাংলাদেশকে ক্ষমা করবে না। এধরনের আশঙ্কার কথা জানিয়ে একজন কলামিস্ট মন্তব্য করেন, "এই দরিদ্র বিষণ্ন মানচিত্রের আবেগ, আকাংখা ও স্পন্দনের প্রতিনিধিত্বকারী একটি ভাষণ, সেটি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতিসংঘে দিয়েছেন, গোটা বাংলাদেশে সঞ্চার করেছে দুর্লভ সাহস। আলোড়িত করেছেন বিশ্বকে। বাংলাদেশের মানুষ উৎফুল্ল হয়েছে, আশান্বিত হয়েছে, উদ্দীপ্ত হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে হয়েছে উৎকণ্ঠিত। এই উৎকণ্ঠা হচ্ছে সাহসের সঙ্গে সত্য বলার বিপদ সম্পর্কে। কারণ, আমাদের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এই গ্রহের শক্তিমানেরা আর যা-ই সহ্য করুক, একজন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীর স্বাধীন অহংবোধকে সহ্য করতে চায় না। সত্য উচ্চারণের পর হাজার হাজার ধারালো সিং তেড়ে আসে। রক্তচক্ষু মেলে ভয় দেখায়। লাখ লাখ ব্যারেল, কোটি কোটি বুলেট তাক করে হুমকি দেয় মাথা নোয়ানোর জন্য, স্বাক্ষর করতে হয় কখনো কখনো মৃত্যু-পরোয়ানায়ও। ইতিহাস হয়তো তাদের জন্য বরাদ্দ করে অমরত্ব। কিন্তু তবুও এই ঝুঁকি ক'জন নিতে পারে?"[১৯]

একদিকে বেগম জিয়ার 'ফারাক্কা ভাষণ' দেশজ দৃষ্টিকোণ থেকে উৎসারিত হলেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে তদানীন্তন প্রধান বিরোধী দল আ'লীগের ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এ দলের নেতৃবৃন্দের মন্তব্য পর্যালোচনা করে যে কারোরই মনে হতে পারে তারা বেগম জিয়ার ভারতকে অভিযুক্ত করে ভাষণদানে মোটেও খুশী হতে পারেননি। এব্যাপারে আ'লীগ নেতৃবৃন্দের মন্তব্য উল্লেখ করলে দেখা যায়, ফারাক্কা ভাষণ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আ'লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর

১৮। সাপ্তাহিক সুগন্ধা ০৮/১০/৯৩ সংখ্যা

১৯। আহেমদ মুসা, *কালের সাহসী বাক্যগুলোর একটি প্রেরণা সঞ্চারী ভাষণ,* দৈনিক দিনকাল ৭/১০/৯৩

রহমান ৬ অক্টোবর '৯৩ তারিখে কিশোরগঞ্জের এক জনসভায় বলেন, "জাতিসংঘে ফারাক্কা সমস্যার কথা বলে ভারত থেকে পানি আনা যাবে না। এমনকি বাংলাদেশ যদি মরুভূমিতেও পরিণত হয় তবুও ভারত পানি দেবে না। কাজেই জাতিসংঘে ফারাক্কার কথা বলে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শুধু ভুলই করেননি, জনগণকে ধোঁকা দিয়েছেন। ...." এছাড়া ১৭ অক্টোবার '৯৩ তারিখে আব্দুল মালেক উকিল স্মরণসভায় আ'লীগ নেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে উল্লেখ করেন, "......আওয়ামী লীগ কিছু জানে না, তিনি ভাষণ দিয়ে এলেন জাতিসংঘে।" অন্যদিকে বেগম জিয়া যখন জাতিসংঘে ফারাক্কা ভাষণ দিচ্ছিলেন, "তখন আ'লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক, মহিউদ্দিন আহমদ ও রহমত আলী এক রহস্যময় কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছিলেন। আব্দুর রাজ্জাক এমপি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ প্রধান ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা। তিনি মার্কিন কর্মকর্তা, সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানদের সাথেও মোলাকাত করেছেন। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদীদের তৎপরতা সম্পর্কে তিনি তাদের সাথে আলোচনা করেছেন।"[২০] এদিকে আলোচ্য ভাষণ নিয়ে ভারতের প্রতিক্রিয়া ও 'র'-এর বাজেট বরাদ্দ নিয়ে সে সময় একটি চমকপ্রদ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক সুগন্ধা'য়। "ফারাক্কা বাধে খালেদার কুঠারাঘাত ঃ 'র'-এর বাজেট ৪শ' কোটি রূপী" শিরোনামের ঐ রিপোর্টে বলা হয় ঃ

'র'-এর ৪শ' কোটি রূপী বাজেট

"জাতিসংঘে ফারাক্কা প্রশ্নে- খালেদা জিয়ার বক্তব্যের বিষয়টিকে ভারত কোনক্রমেই সহজভাবে নেবে না। জাতিসংঘে কেবলমাত্র বেগম জিয়া ভাষণ দিয়েছেন তা নয়, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যখন সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন নিউইয়র্কের জাতিসংঘ ভবনের বাইরে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। একটি সূত্র জানায়, প্রবাসী বাংলাদেশীদের এ বিক্ষোভ সংগঠিত করার জন্য বিএনপি'র দু'জন এমপি আগেভাগেই যুক্তরাষ্ট্রে যান। সামগ্রিক বিষয়াবলীকে ভারত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। খালেদা জিয়া যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ভারতীয় প্রতিনিধিরা হতচকিত হয়ে নিজেদের মধ্যে কানাকানি শুরু করে দেন। ঢাকার কূটনৈতিক মহলেও বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার ঝড় তুলেছে। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, ভারত এখন নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করবে। একটি সূত্রে জানা গেছে, ভারতের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর বাজেট যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী ও জাপানে খরচ হবে এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। 'র'-এর এ বাজেট ব্যয়িত হবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলংকায় তাদের পর্যবেক্ষণ এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। বর্তমান প্রেক্ষাপটে 'র' বাংলাদেশে দু'ধরনের কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হবে বলে পর্যবেক্ষক মহল আশংকা প্রকাশ করছেন। প্রথমতঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে

২০। হাফিজ মকবুল হোসেন, *বিশ্বসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, মেঠো ইঁদুরের ছুটোছুটি,* সাপ্তাহিক বিক্রম, ১১-১৭ অক্টোবর '৯৩ সংখ্যা

নানাবিধ অজুহাতে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। দ্বিতীয়ত ঃ খলেদা জিয়ার প্রাণনাশ কিংবা যেনতেনভাবে বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টা চালাতে পারে।...."[২১]

বাংলাদেশে 'র'-এর তৎপরতা ও বিজেপি

'র'-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন বলতে গেলে তার দিকনির্দেশনাতেই 'র'-পরিচালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে 'র'-এ তিনি বেছে বেছে কট্টর কংগ্রেস সমর্থক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন। ফলে একপর্যায়ে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতায় অন্যকোন মধ্যপন্থী দল ক্ষমতায় এসে বেশীদিন টিকতে পারেনি। ১৯৭৭ সালে মোরারজী দেশাই যখন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন তখন 'র'-ই পর্দার আড়ালে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে, জনতা দল সরকারের পতন ঘটে। মধ্যপন্থী ও প্রতিবেশীদের প্রতি উদার মোরারজী দেশাইকে 'র' কর্মকর্তারা তো সহ্য করতে পারতোই না, এমনকি তদানীন্তন 'র'-প্রধান শংকর নায়ার একবার ক্ষিপ্ত হয়ে মোরারজী দেশাইকে 'ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার প্রধান শত্রু'[২২] বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কংগ্রেস প্রভাবিত 'র'- কিভাবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর উপর নজর রাখতো সে সম্পর্কে 'র' কর্মকর্তারা বরাবর অস্বীকৃতি জানিয়ে আসলেও ভারতীয় একটি পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, 'র' যেমন রাজনীতিবিদদের টেলিফোনে আড়ি পেতে থাকে তেমনি সাংবাদিক, সরকারী কর্মকর্তা এমনকি বিচারপতিদের টেলিফোন সংলাপ রেকর্ড করাও 'র'-এর অন্যতম কাজ। এক্ষেত্রে এককালীন ভারতীয় প্রধান বিচারপতি ওয়াই. ভি. চন্দ্রচুড়-এর রেকর্ডকৃত টেলিফোন সংলাপ একবার একজন বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদ ফাঁস করে দিলে 'র'-এর 'অপকর্ম' জনসম্মুখে প্রকাশ পেয়ে যায়।'[২৩]

একথা সন্দেহাতীত যে, 'র'-বরাবরই ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতায় উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিকে অধিষ্ঠিত করা ও টিকে থাকায় সহায়তা প্রদান করেছে। যদিও বৈদেশিক গুপ্তচরবৃত্তির বাইরে আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে 'র'-এর হস্তক্ষেপ করার কোন আইনগত ভিত্তি নেই, কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বরাবরই এর উল্টোটি লক্ষ্য করা গেছে। এক্ষেত্রে 'র'-এর নিজস্ব গোপন নেটওয়ার্ক ও সরকারী বরাদ্দের বাইরে বিশেষ ব্যবস্থায় অর্থ সংগ্রহের সুযোগ থাকায় কংগ্রেসপন্থী 'র' কর্মকর্তারা কখনোই কোন মধ্যপন্থী উদার রাজনৈতিক শক্তিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বেশীদিন টিকে থাকতে দেয়নি। তাই দেখা যায়, মোরারজী দেশাই, ভিপি সিং, দেব গৌড়াসহ কোন কংগ্রেস বিরোধী উদার প্রধানমন্ত্রীই পূর্ণ মেয়াদ পূরণ করতে পারেননি।

এদিকে আশির দশকে এসে ভারতের রাজনীতিতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, জনতা দলের মতো মধ্যপন্থী রাজনৈতিক শক্তিসমূহ ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এটি নেহরু দর্শনে অনুরক্তদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে সময় থেকেই 'র'-অত্যন্ত গোপনে কংগ্রেসের সমান্তরালে একটি উগ্রবাদী ধর্মীয় দল হিসেবে বিজেপিকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে থাকে। ঘটনা বিশ্লেষণে তারা বুঝতে পারে ব্যাপকভাবে

২১। সাপ্তাহিক সুগন্ধা ০৮/১০/৯৩ সংখ্যা

২২। Asoka Raina, *Inside RAW : History of India's Secret Service*, Chapter-9

২৩। *Our Intelligence Agencies :* The Illustrated Weekly of India, Oct. 14.1990 p. 14

দুর্নীতিগ্রস্ত ও পারিবারিক নেতৃত্ব বহাল থাকার কারণে কংগ্রেস আর আগের মতো জনসমর্থন পাচ্ছে না। এবং এধারা যদি চলতে থাকে তাহলে অবধারিতভাবেই মধ্যপন্থীদলগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে 'মহাভারত' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন হবে ধুলিস্যাত। এছাড়া সমগ্র ভারতব্যাপী পরিচালিত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনও নীতি নির্ধারকদের দিন দিন ভাবিয়ে তুলছিল। তাই তাদের বিবেচনায় এটা নির্ধারণ করা হয় যে, একমাত্র হিন্দু ধর্মীয় আবেগই পারে ভারতের অখন্ডত্ব বজায় রাখতে। মূলতঃ এধরনের চিন্তা থেকেই বিজেপি'কে দেয়া হয় যাবতীয় পৃষ্ঠপোষকতা।

এদিকে বিজেপি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটির পর একটি চক্রান্ত করে আসছে। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন, হিন্দুদের দেশত্যাগ, বঙ্গভূমি আন্দোলন, মোহাজির সংঘ গঠন, পুশব্যাক ইত্যাদি সকল ইস্যুতেই প্রকাশ্যে বিজেপি'কে দেখা যায় উস্কানীদাতা হিসেবে। বাংলাদেশ বিরোধী এসব তৎপরতায় 'র' খুব সার্থকভাবেই বিজেপি'কে ব্যবহার করতে পেরেছে–এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। এপর্যায়ে বাংলাদেশে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকান্ড ছাড়াও সীমান্তের ওপার থেকে পরিচালিত তৎপরতার উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে সবাইকে এটা মনে রাখতে হবে যে, গুপ্তচরবৃত্তি কখনো সরাসরি গুপ্তচর সংস্থার অপারেটিভ দ্বারা প্রকাশ্যে সংঘটিত নাও হতে পারে। বরং বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমেই 'নিরাপদ গুপ্তচরবৃত্তি' পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। নির্দোষ রাজনৈতিক দাবী আদায়ের আড়ালে অনেক সাম্প্রদায়িক সংগঠনই এদেশে বিজেপি অর্থাৎ 'র'-এর দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করে আসছে বাধাহীন ভাবে। এখানে এধরনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ উপস্থাপন করা হলো–

১। সংখ্যালঘু নির্যাতনের কল্পকাহিনী ও বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে চিহ্নিতকরণ

'র'-এর প্ররোচনায় বিজেপি শুধুমাত্র স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন ও মোহাজির সংঘ তৈরী করেই ক্ষান্ত হয়নি, ১৯৯১ সাল থেকে বিএনপি শাসনামলে যাবতীয় উপায়ে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে একটি উগ্র হিন্দু বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করাই ছিল 'র'-এর অন্যতম লক্ষ্য। ভারতে অব্যাহত মুসলমান নির্যাতন, সংখ্যালঘু বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য মূলত 'র'-এই পথে অগ্রসর হয়। এছাড়া এধরনের প্রচারণার আরেকটি উদ্দেশ্যে ছিল অব্যাহত প্রচারণার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলা। তবে সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় ছিল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে দাঙ্গা সংঘটনে এগিয়ে যাওয়া। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, '৯০ সালে ভারতে বাবরী মসজিদ ইস্যুকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশে হিন্দুরা নিরাপদে নেই এধরনের প্রচারণা জোরদার করা হয়। এরকম একটি প্রচারণা চালিয়েছিলেন বঙ্গভূমি আন্দোলনের নেতা ও ভারত সেবা আশ্রম সংঘের অধ্যক্ষ বিজয়া নন্দজী মহারাজ। এব্যাপারে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ রেলস্টেশন সংলগ্ন একটি মিলনায়তনে বঙ্গভূমিওয়ালাদের এক আলোচনা সভায় যে বক্তব্য রাখেন তাতে প্রচন্ড মুসলমান বিদ্বেষ ও বাংলাদেশের ছয়টি জেলা নিয়ে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়। ঐ আলোচনা সভায় বিজয়া নন্দজী যে বক্তৃতা দেন তার একটি

ক্যাসেট পরবর্তিতে হস্তগত হয় সাংবাদিক জনাব এলাহী নেওয়াজ খানের। এব্যাপারে তিনি ১৯৯২ সালের জুনে দৈনিক মিল্লাতে একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। পরবর্তিতে ১৯৯৬ সালের মে মাসে "বাংলাদেশঃ 'র'-এর তৎপরতা, বিজেপি এবং একটি দল" শিরোনামে তার একটি বই প্রকাশিত হয়। উক্ত বইয়ে জনাব এলাহী নেওয়াজ খান বিজয়া নন্দজী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ সম্পর্কে উল্লেখ করেন –

"বিজয়া নন্দজী তার ভাষণে ভারতের সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে মুসলমানদের দায়ী করে চরম বিদ্বেষ ছড়িয়েছেন। এই বিজয়া নন্দই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পর ইন্দিরা গান্ধীর চিঠি নিয়ে বাংলাদেশে এসে প্রথমে তাজউদ্দিন ও পরে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে ত্রাণ তৎপরতা চালানোর নামে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। এর পাশাপাশি সে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অবিভক্ত ভারতের স্বপ্ন চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তাদেরকে সংগঠিত করতে শুরু করে। এজন্য তারা প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বঙ্গভূমি আন্দোলনকে সামনে নিয়ে এসেছে।

বিজয়া নন্দজী তার ভাষণে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্য মুসলমানদের দায়ী করে তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনার মাধ্যমে ভারতের সাধারণ হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তোলার প্রয়াস চালায়। অথচ ভারত সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। এমনকি আমাদের সরকারও তাদের বহুমুখী তৎপরতার ব্যাপারে নীরবতা পালন করে চলেছে। তার ভাষণের মধ্যে ফুটে উঠেছে যে, ভারত সরকারের নির্দেশ ও অনুপ্রেরণাতেই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে লোক দেখানো ত্রাণ তৎপরতার নামে তারা বাংলাদেশে তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলনের কাজ শুরু করে। বিজয়া নন্দের ভাষণের মধ্য দিয়ে সে সব বিষয় ফুটে উঠেছে।

বিজয়া নন্দজী বনগাঁয়ে তার ভাষণে বলেন, 'স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে হিন্দু জাতির দুর্গতি চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। ৪২টি বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই, ভারতের প্রান্তে প্রান্তে প্রাদেশিকতা দেখা দিয়েছে। আসাম থেকে শুরু করে কন্যাকুমারী পর্যন্ত, জম্মু-কাশ্মীর থেকে শুরু করে প্রান্ত প্রদেশ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদের লেলিহান শিখা, চারিদিকে অশান্তির আগুন, ভারতকে খণ্ডিত করে স্বাধীন সাম্রাজ্যের স্বপ্ন-দর্শন করছে ভারতের অনেকগুলো রাজ্য। শুধু আসাম, মেঘালয়ই নয় বা ত্রিপুরার খ্রীষ্টান সমাজই নয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরামের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'ল্যান্ড অফ ক্রাইস্ট' রূপে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের স্বপ্ন কল্পনা করছে। শুধু তাই নয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে দ্বি-খণ্ড, ত্রি-খণ্ডিত করে কোথাও গুর্খাল্যান্ড, কোথাওবা স্বাধীন ঝাড়খণ্ড, কোন কোন একটি বা দুটি জেলা নিয়ে ক্ষমতাপুরি কামতাপুর, উত্তরাখণ্ড, আবার নদীয়া, মুর্শিদাবাদ মালদহ জেলাকে বাংলাদেশের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে ইসলামিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। বিহারের সৈয়দ শাহাবুদ্দিন, কেরালার জিএস বানাতোওয়ালা, অন্ধ্র প্রদেশের সালাহউদ্দিন ওয়েসিস প্রমুখ, পশ্চিমবঙ্গের কালামউদ্দিন শামছু প্রমুখ মুসলিম 'সাম্প্রদায়িক' নেতা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যেখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্থাৎ শতকরা ৩০ অথবা ৩৫ ভাগ সেখানকেই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে মুসলিম হোমল্যান্ডের দাবি তুলেছেন।'

বিজয়ানন্দ বলেন, 'ভারতের প্রায় প্রতিটি মুসলমানই থাকেন ভারতে। এদেশের

মাটিতে ফসল ফলিয়ে তারা অন্ন গ্রহণ করে জীবন ধারণ করেন। ভারতের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে জীবিকা অর্জন করেন। ভারতের আকাশ থেকে বাতাস গ্রহণ করে তারা জীবন নিয়ে বেঁচে থাকেন। অথচ তাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য পাকিস্তানের দিকে বা ইসলামিক বাংলাদেশের দিকে। আজ ভারতের ক্রিকেট দল যদি আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে জয়লাভ করে; তাহলে ভারতের দিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ হিন্দুর ঘর-বাড়ি আক্রমণ করে জ্বালিয়ে দেন। ভারত সরকারের অফিস জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা চালান।'

তিনি বলেন, 'বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারণ করে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে মুক্তির মন্দির তলে কত প্রাণ বলিদানের মাধ্যমে আমরা ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলাম; ৬০ কোটি হিন্দুর কোন পবিত্র স্থান অর্থাৎ ভারত ভূমিকে ৬০ কোটি হিন্দুর জন্য চিহ্নিত করিনি। আমার মাতৃত্বের অঙ্গচ্ছেদন করে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি করলাম, আমার পিতৃপুরুষের জন্মভূমি, সংস্কৃতির ভূমি, লীলাভূমি, সিন্ধু যার নাম থেকে হলো হিন্দু, সেই হিন্দু দেশকে আমরা পাকিস্তানকে অর্পণ করলাম। তারপরেও আমরা ভারতকে হিন্দুস্তান বলে চিহ্নিত করিনি। ভারতে ১৯৪৭ সালের ৩ কোটি মুসলমান সংখ্যায় ১১ কোটি হয়ে এখন তারা ভারতকে বিভক্ত করে একটি, দুটি, তিনটি পাকিস্তানের দাবী জানাচ্ছে ভারতের মাটিতে। আমাদের ১৪ হাজার সৈন্যের জীবনের বিনিময়ে, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে, আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলাম, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে সংগঠিত করেছিলাম। আমি তখন ঢাকায় বাস করি। ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে, তারই পত্র নিয়ে মুজিবর রহমানের সঙ্গে দেখা করে আমরা সেবা কার্য আরম্ভ করি। অবশ্য যখন সেবা কার্য শুরু করি তখন মুজিব রাওয়ালপিন্ডির জেলে বন্দী। তাই তাজউদ্দিন, কামরুজ্জামানসহ আরো কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করে সেবা কার্য শুরু করেছিলাম। তারপর মুজিবর রহমান বন্দীদশা থেকে ঢাকা ফিরে এলে তার সাথে আমার দেখা হয়। তখন মুজিব আমাকে বলল, 'আপনারা যথেষ্ট করেছেন আমার দেশের জন্য। তাই আপনারা সেবা কাজ চালিয়ে যান। আপনারা মহান দেশের মহান নেতা, আমরা আপনাদের সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করবো।' মুজিবর রহমান আমাদের সন্ন্যাসীদের প্রণাম করে, হেলিকপ্টার দিয়ে, গাড়ি দিয়ে, ট্রাক্টর দিয়ে সেবা কার্যের ব্যবস্থা করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লাসহ বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে প্রায় সব কয়টি জেলায় আমরা দু'বছর ধরে কাজ করি।

বিজয়ানন্দ বলেন, 'ভারত সরকার বার বার বাংলাদেশ সরকারকে নির্দেশ দেয় ভারত সেবাশ্রম সংঘকে সর্বতোভাবে সহায়তা করার জন্য। আওয়ামী লীগ সরকার তা করেছে।' বিজয়ানন্দজীর এই ভাষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারত সেবাশ্রম সংঘের মাধ্যমে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, প্রান্তরে এজেন্ট নিয়োগের কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন নামে আরো সংঘ কাজ করছে। বিজয়ানন্দ তার বক্তৃতায় ঐ সময়ের ঘটনার বিবরণ দিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে অভিহিত করেছে। বিজয়ানন্দ ঘটনার বর্ণনা করেন এভাবে 'আমি সাভারে গ্রামে গ্রামে ঘুরছি। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ দেখে তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করছি। একদিন এইভাবে ঘুরছি, হঠাৎ দেখি আমার সামনে কতকগুলো ছাত্রী দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে

বাংলাদেশের পতাকা এবং পিঠে শ্লোগান সম্বলিত পোস্টার লাগানো, কণ্ঠে তাদের প্রতিবাদের ধিক্কার ধ্বনি। তারা বলছে হিন্দু হেড মিস্ট্রেস চলবে না, চলবে না। আরে ব্যাপারটি কি? যে হিন্দুস্তানের তাজা রক্ত দিয়ে তোমরা স্বাধীনতা পেলে, যে হিন্দুস্তানের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে তোমাদের দেশ স্বাধীন হলো, যে হিন্দুস্তান ১৪ হাজার মিলিটারীর বলিদানের বিনিময়ে যে দেশকে স্বাধীন করে দিল– আর মাত্র ছয়টি মাসের মধ্যে তার পরিণতি কি এই, হিন্দু হেড মিস্ট্রেস চলবে না! অর্থাৎ সাভারের গার্লস হাই স্কুলের হেড মিস্ট্রেস ছিলেন পাকিস্তানী মনোভাবাপন্ন একজন মুসলিম মহিলা। তাকে বোধ হয় আওয়ামী লীগ অথবা কোন মুক্তিফৌজ হত্যা করেছে। তার পরবর্তী যিনি এ্যাসিসট্যান্ট হেড মিস্ট্রেস ছিলেন, তিনি ছিলেন হিন্দু। সরকার তাকে প্রমোশন দিয়ে হেড মিস্ট্রেস করেছেন। তাই প্রতিবাদে স্কুলের ছাত্রী সম্প্রদায় বলছেন, হিন্দু হেড মিস্ট্রেস চলবে না। কি বিশ্বাসঘাতক, কি নিমকহারামের দল! এই জাতিকে একবার চিন্তা করুন? শহরে শহরে পোস্টার পড়ে গেল 'মুজিব যদি বাঁচতে চাও ইন্দিরাকে তালাক দাও।'

বিজয়ানন্দ তার ভাষণে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে ভারতের ঘনিষ্ঠ মিত্র শেখ মুজিবকেও সাম্প্রদায়িক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে হিন্দু নিধনকারী দাঙ্গাবাজ হিসাবে চিত্রিত করেছেন। রেসকোর্স ময়দানের নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান করাতেও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিজয়ানন্দ বলেন, 'আমরা স্বাধীন বঙ্গভূমি চাই। ভারতের মুসলমানরা যদি ভারতে স্বাধীন হোমল্যান্ডের দাবী করতে পারে তবে আমরা কেন বাংলাদেশে স্বাধীন বঙ্গভূমি করতে পারবো না? তিনি বলেন, আমরা মিলিটারী গঠন করেছি। আমরা ঐ বাংলার মাটিকে দখল করে নিয়ে প্রমাণ করে দেব হিন্দুরা আজো মরেনি। আজো বেঁচে আছে তাদের সর্বশক্তি নিয়ে। আজো তারা ধর্মকে ধরে, সংস্কৃতিকে বুকে নিয়ে, তারা অভিযান চালাবে দিকে দিকে।'

তিনি বলেন, 'আমরা জাতিসংঘ থেকে চিঠি পেয়েছি। তারা বিষয়টি দেখছে বলে জানিয়েছে। কিন্তু এ দেখা সহজ ব্যাপার নয়। তাই আন্দোলন গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের বুকে। আন্দোলনে হতচকিত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের সরকার।' শ্রী বিজয়ানন্দ 'বঙ্গেসেনায়' যোগদান করে বাংলাদেশের বুকে আঘাত হেনে তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমি সৃষ্টি করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিজয়ানন্দ তার ভাষণে বাংলাদেশীরাও 'বঙ্গভূমি' আন্দোলন করছে বলে যে দাবী করেছে তার সমর্থনে অনেক প্রমাণাদিও পাওয়া গেছে। তারা বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে এখানে কাজ করছে। তাদের স্বপ্ন হচ্ছে একটা অবিভক্ত ভারত কায়েম করা। তার প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলন। কিন্তু একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে কিভাবে তারা ষড়যন্ত্র করছে, কিভাবে তারা অপতৎপরতা চালাতে পারছে সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

১৯৯১ সালের ২৪ অক্টোবর খুলনা থেকে তমিজুল হক নামে এক ব্যক্তি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে একটি অভিযোগপত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রের অনুলিপি প্রদান করা হয় স্বরাষ্ট্র সচিব, খুলনা বিভাগের কমিশনার, পুলিশের খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি, খুলনা জেলা প্রশাসক, খুলনা পুলিশ সুপার, খুলনা মেট্রোপলিটান পুলিশ

সুপার ও তৎকালীন পাইকগাছা উপজেলা চেয়ারম্যানকে। তার একটা অনুলিপি আমাদের কাছেও প্রেরণ করা হয়। ঐ পত্রে তমিজুল হক অভিযোগ করেছেন যে, তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলনের নেতা কালিদাস কর্মকার ভারত হতে ৩টি ইট পাইকগাছার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পাঠিয়েছেন। এসব ইটে রামের মূর্তি আঁকা আছে। ইউএনও মিহির কান্তি মজুমদারের বাসায় এ অঞ্চলের তথাকথিত বঙ্গসেনাদের নিয়মিত বৈঠক চলছে। ৩টি ইট দিয়ে দেশের তিনটি জায়গায় তিনটি রাম মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। একটি রাম মন্দির হবে পাইকগাছায়। পত্রে এ ব্যাপারে তমিজুল হক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থাপন সচিবের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এই অভিযোগপত্র প্রেরণের পর ৮ মাস কেটে গেছে। সরকারের পক্ষ থেকে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি। তবে ঐ পত্রের বিবরণ থেকে এ সত্যটি বেরিয়ে এসেছে যে, সরকারের অভ্যন্তরে থেকেও তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলনের জন্য এক শ্রেণীর সংখ্যালঘু কাজ করছে। এছাড়াও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশে সংখ্যলঘুদের বিভিন্ন নামের সংগঠন বঙ্গভূমি আন্দোলনের সাথে জড়িত। এইসব সংগঠনের সাথে ভারতের বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিব সেনা, বজরঙ্গ ইত্যাদি চরম সাম্প্রদায়িক সংগঠনের রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

বাংলাদেশে যেসব সংগঠন বাংলাদেশ বিরোধী অপতৎপরতা চালাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, প্রণব মঠ ও সেবাশ্রম, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বাংলাদেশ সন্ত মহামণ্ডল, বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশন, বিশ্ব ধর্ম ও শান্তি সম্মেলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ চৈতন্য সাংস্কৃতিক সংঘ, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ ইত্যাদি। এসব সংগঠন আবার নিয়মিত পত্রিকা বের করে। যেমন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির পত্রিকার নাম হচ্ছে 'সমাজ দর্পণ'। এই সমাজ দর্পণের কভার ছাপা হয়ে আসে কলিকাতা থেকে। এর কারণ হিসাবে জানা গেছে 'সমাজ দর্পণে'র কভারে হিন্দু দেব-দেবীর বিভিন্ন পোজের যে ছবি ছাপানো হয় তা বাংলাদেশে সহজলভ্য নয়। তাই কলিকাতা থেকে ছাপিয়ে আনা হয়। সমাজ দর্পণের সম্পাদক হচ্ছেন শ্রী শিবশংকর চক্রবর্তী। কে এম দাস লেনস্থ ভোলাগিরি আশ্রম থেকে এটি প্রকাশিত হয়। নিয়মিত পত্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পুস্তিকা ও প্রচারপত্র তারা বের করছে। এইসব পুস্তিকা ও প্রচারপত্রে বঙ্গভূমি আন্দোলনসহ অবিভক্ত ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে লালন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের ঐসব সংগঠন মূলতঃ ভারতের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠনের শাখা হিসাবে কাজ করছে। আর এই কাজের সমন্বয় সাধন করে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা। অর্থাৎ ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশের ঐসব সংগঠনের কভারে তৎপরতা চালায়। কত সুচতুরভাবে যে অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে তা খতিয়ে দেখলে সবাই বিস্মিত হয়ে যাবেন। বাইরে মনে হবে তারা নিছক ধর্মীয় তৎপরতা চালাচ্ছে। আসলে তারা ধর্মীয় তৎপরতার নামে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিকল্পনাটিই কার্যকর করছে। তাই ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান শ্রী বিজয়া নন্দজী বনগাঁয় বঙ্গভূমিওয়ালাদের এক সমাবেশে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে তৎপরতা চালানোর লক্ষ্যে ভারত সরকার বারবার তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, ভারত

সেবাশ্রম সংঘকে সর্বতোভাবে সহায়তা করো। ইন্দিরা গান্ধী নিজেই এই নির্দেশ বারবার দেন বলে বিজয়ানন্দ উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, ভারত এইসব সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটলে ভারত সেবাশ্রমের ভারতীয় কর্মকর্তারা বাংলাদেশ থেকে পাততাড়ি গুটায়।

অন্য নাম দিয়ে কর্মতৎপরতা চালানোর ব্যবস্থা করে যায়। পরবর্তীতে গত ১৭ বছরে তাদের কর্মতৎপরতার আরো ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের শাখা সংগঠন হিসাবে এখানে দুটি সংগঠন কাজ করছে। তবে নাম ভিন্ন। যেমন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বাংলাদেশে জাতীয় হিন্দু সংস্কার সমিতির ছত্রছায়ায় কাজ করে যাচ্ছে। এর সভাপতি শ্রী শিব শংকর চক্রবর্তী। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলাদেশস্থ তিনজনের মধ্যে অন্যতম অপর দু'জন হচ্ছে বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিনোদ বিহারী চৌধুরী ও বিশ্ব ধর্ম ও শান্তি সম্মেলন বাংলাদেশ-এর সাধারণ সম্পাদক আর এন দাস গুপ্ত। অপরদিকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ বাংলাদেশে 'প্রণব মঠ সেবাশ্রমের' আশ্রয়ে কাজ করছে। এছাড়া 'ইস্‌কন'[২৪] নামে একটি সংগঠন কাজ করছে। এর সদর দফতর নদীয়া জেলার পাশে মায়াপুরে। মূলত এটা ইহুদীদের একটি সংগঠন বলে জানা গেছে। এই সংগঠনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে উস্কানিমূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত লেখার আগে শিব শংকরকে নিয়ে আলোচনা করা দরকার। কে এই শিব শংকর চক্রবর্তী? এই ব্যক্তিটি একাধারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং বাংলাদেশে প্রধান সমন্বয়কারী, নেপাল ভিত্তিক বিশ্ব হিন্দু মহাসংঘের নির্বাহী কমিটির সদস্য, সরকার অনুমোদিত বাংলাদেশ হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি, এপেক্স গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজের চীফ একাউন্টেন্ট ও 'সমাজ দর্পণ' নামক ম্যাগাজিনের সম্পাদক। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে বাংলাদেশে কাজ করছেন বলে জানা গেছে। তার কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যেই নানা ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করেছে।

শ্রী শিব শংকর '৮৮ সালের মার্চে নেপালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিশ্ব হিন্দু মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে আরো ১৮৮ জন এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে আরো দু'জন ছিলেন, তারা হলেন, বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের বিনোদ বিহারী চৌধুরী ও বিশ্ব ধর্ম ও শান্তি সম্মেলন বাংলাদেশ-এর আর এন দাস গুপ্ত। এছাড়া এই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ভারত থেকে যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি ভি.এইচ ডালমিয়া, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী অশোক সিংজী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহ-সভাপতি রাজমাতা সিন্দিয়াজী প্রমুখ। উল্লেখ্য, এই রাজমাতা বিজেপি'রও একজন বিশিষ্ট নেত্রী। এদের উপস্থিতি থেকেই বোঝা যায় নেপালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিন্দু মহাসম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই ধরনের সম্মেলন '৮৮ সালে মরিসাসে ও '৮৯ সালে ভারতের এলাহাবাদ, গোরখপুরে অনুষ্ঠিত

২৪। ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ

হয়। শ্রী শিব শংকর সবগুলো সম্মেলনেই উপস্থিতি ছিলেন।

শ্রী শিব শংকর তার 'সমাজ দর্পণ' পত্রিকায় এই সম্মেলনে গৃহীত ৪টি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। এই সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে দিয়ে উগ্র হিন্দুবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যা বিজেপি'র রাজনৈতিক নীতিমালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৭ নং সিদ্ধান্তে নেপালকে বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করে বলা হয়েছে, নেপাল হবে হিন্দু সংস্কৃতির সংরক্ষক এবং নেপাল থেকে হিন্দু সংস্কৃতি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

১৩নং সিদ্ধান্তে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বসবসাকারী হিন্দুদের নির্যাতন ও নৃশংসতার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রয়োজনে ঐসব হিন্দুদের মৌলিক ও ধর্মীয় অধিকার অর্জনে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করা হয়। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, ভারতে বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অব্যাহতভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে যে, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এই উপ-মহাদেশে ভারত ও নেপালের পর বাংলাদেশেই বহু সংখ্যক হিন্দু বসবাস করে। বলা যায়, সারা বিশ্বে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের পরে মরিসাসে অধিক সংখ্যক হিন্দু বসবাস করলেও মোট জনগোষ্ঠীর তারা শতকরা মাত্র ৮ ভাগ। কিন্তু বাংলাদেশে কখনোই সংখ্যালঘু কোন জনগোষ্ঠীর ওপর কোন নির্যাতন বা অবিচার চালানো হয়নি। তারা সমঅধিকার ভোগ করছে। তথাপি ভারতের উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলো বরাবরই বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের কল্পিত কাহিনী প্রচার করছে। এই প্রচারে মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন শিব শংকর বাবুরা। যেমন ১৯৯০ সালে অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে বাংলাদেশে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার ওপর কল্পিত কাহিনী ফেঁদে বসেন এই শিব শংকর বাবু। তিনি বাংলাদেশের সর্বত্র একটি জরিপ কাজ চালান। এই জরিপের ফলাফল ছিল মিথ্যাচারে ভরা। অথচ তাদের এ জরিপটি ভারতের শাসক গোষ্ঠির কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এই জরিপেরই ফলাফল ফাদার টিমও সারাবিশ্বে প্রচার করে। শিব শংকর বাবুর 'সমাজ দর্পণ' পত্রিকাতেও এই জরিপের অংশবিশেষ ছাপা হয়।

সুতরাং নেপাল হিন্দু সম্মেলনের লক্ষ্য যে বাংলাদেশ তা সহজেই অনুমান করা যায়, আর বাংলাদেশে অবস্থানকারী শিব শংকর বাবুরাই বিদেশে এই অপ্রপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

সম্মেলনের ১৫ নং সিদ্ধান্তে বলা হয়, 'রামের জন্মভূমি অযোধ্যা এবং সেখানে উপাসনা করা সকল হিন্দুদের জন্মগত অধিকার। আর বিলম্ব না করে অযোধ্যাকে হিন্দুদের কাছে অর্পণ ও উপাসনা করার অনুমতি দেয়া হোক।' এই সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যায়, বিশ্ব হিন্দু মহাসম্মেলনের উদ্যোক্তারা কি চায়?

২৪ নং সিদ্ধান্তে বলা হয়, 'হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের সুষ্ঠু প্রচারণার উদ্দেশ্যে নেপালে একটি ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন রেডিও স্টেশন থেকে বিশ্বের তাবৎ ভাষায় প্রচারণার কাজ চলবে।'

৩৬ নং সিদ্ধান্তে বলা হয়, 'গো-হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে এবং গো-হত্যাকে মনুষ্য হত্যারূপে গণ্য করা হবে।' এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে তাদের মুসলিম বিদ্বেষের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মুসলমানেরা গরুর গোস্ত ভক্ষণ করে। বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোকই গরুর গোস্ত খায়। শ্রী শিব শংকর বাবু কি

বাংলাদেশে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার আন্দোলন করবেন? অপরদিকে গো-হত্যাকে মনুষ্য হত্যারূপে গণ্য করায় কার্যত মুসলমানদেরকে মনুষ্য হত্যাকারী হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। শ্রী শিব শংকর কি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মানুষ হত্যাকারী মনে করেন?

বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা শুরু হয় সেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে। এই দীর্ঘ সময়ে তাদের কৌশল পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্নরূপে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই সংস্থা একটা মারাত্মক সুযোগ পেয়ে যায়। ঐ সময় তারা মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বিরাট অংশকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করতে সক্ষম হয়। 'র'-এর তত্ত্বাবধানেই সৃষ্টি হয় 'মুজিব বাহিনী'। এই বাহিনীর একমাত্র কাজ ছিল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নির্মূল করা। জেনারেল উবানের নেতৃত্বে উক্ত বাহিনীর সৃষ্টি করা হয় এবং স্বাধীনতার পর নানাবিধ ছদ্মাবরণে 'র'-এর অপতৎপরতা চলে।

১৯৮১ সালের ৩০ মে 'র'-এর পরিকল্পনামাফিক চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়। জিয়াকে হত্যা করার পর বিএনপিই কিছুদিনের জন্য ক্ষমতাসীন থাকে। তারপর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। তখন থেকে বাংলাদেশে 'র' এর কর্মকাণ্ড বিভিন্নমুখী করে তোলা হয়। সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন সংগঠনের লোকদের ঐক্য পরিষদ সুযোগ বুঝে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন হচ্ছে ইত্যাদি কল্পকাহিনী প্রচার করে বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে এবং করছে। এর পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা কলকাতায় গিয়ে মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম হওয়ার কারণে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন বেড়ে গেছে। বাংলাদেশের একটি বড় রাজনৈতিক দলের নেত্রী যখন খোদ ভারতে গিয়ে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের বয়ান করেন, তখন স্বাভাবিকভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর প্রভাব পড়ে।

এখন বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান কৌশল হচ্ছে 'ডিইসলামাইজেশন' নীতি। অর্থাৎ ক্রমাগতভাবে ইসলামী মূল্যবোধে আঘাত হানা। এ জন্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে 'ধর্মনিরপেক্ষতাকে'। এটাকে তারা ব্যবহার করছে বিভিন্ন কায়দায়। প্রথমত, এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের মাধ্যমে প্রচার করছে যে, ইসলাম সেকেলে জীবন পদ্ধতি, এটা এই আধুনিক যুগে অচল। একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতাই হচ্ছে সবচেয়ে আধুনিক 'কনসেপ্ট'। মজার ব্যাপার হচ্ছে ভারত এই ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে যেমন, তেমনি আবার ভারতে সংখ্যালঘু মুসলামানদের কৌশলে 'সংখ্যালঘু' মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার মধ্যে ফেলে দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করছে। দু'জায়গাতেই তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানরা। দ্বিতীয়ত, ধর্মনিরপেক্ষতার নাম দিয়ে হিন্দু সংগঠনগুলোকে উগ্রবাদী করে তোলা হচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হওয়ায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নির্যাতিত হচ্ছে। যদিও এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। তথাপি অজুহাত হিসাবে দাঁড় করা হচ্ছে। এসবের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়া। বর্তমানে বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনগুলো এ লক্ষ্যেই কাজ করছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশের এসব হিন্দু সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব প্রদান করছে মূলত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা। এর সঙ্গে বাংলাদেশের অতি সাধারণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে এদের

সম্পর্ক নেই। কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতিতে তারা সমুজ্জ্বল। তাই ষড়যন্ত্রকারীরা মাঠে নেমেছে ধর্মের নামে। ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে উস্কানি দেয়াই হচ্ছে এই হিন্দু সংগঠনগুলোর কাজ।

বাংলাদেশের জনগণ গত কয়েক বছর ধরে শ্রী কৃষ্ণের জন্ম অষ্টমী পালন হতে দেখছে। শুধু তাই নয় সরকার শ্রী কৃষ্ণের জন্ম অষ্টমী দিনে সরকারী ছুটি পর্যন্ত ঘোষণা করেছে। অথচ ভারতেও শ্রী কৃষ্ণের জন্ম অষ্টমীতে সরকারী ছুটি দেয়া হয় না। কিন্তু বাংলাদেশে জন্ম অষ্টমীতে সরকারী ছুটি প্রদান করা হয়েছে।

১৯৯০ সালে প্রথম বাংলাদেশে জন্ম অষ্টমী পালন শুরু হয় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মহাসাড়ম্বরে। এরপর থেকে প্রতিবছর এই দিনে হিন্দুরা মিছিল বের করে। অথচ ইতিপূর্বে কখনোই এভাবে শ্রী কৃষ্ণের জন্ম অষ্টমী পালিত হয়নি। জেনারেল এরশাদ তার মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীকে দিয়ে প্রথমে এটা আরম্ভ করান। এ জন্য নিতাই রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস (ইস্কন)'। ১৯৯০ সালের ১৩ আগস্ট ঢাকার ওয়ারীস্থ শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দিরে তিন দিনব্যাপী শ্রী কৃষ্ণের জন্ম অষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইস্কনের সভাপতি শ্রী কে বি রায় চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। জানা গেছে যে, এই ইস্কনই বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে ৫শ' কিলোওয়াটের একটি রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠা করে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, নেপালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

'বাংলাদেশে প্রণব মঠ ও সেবাশ্রম' একটি হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন। অভিযোগ রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাথে এই সংগঠনের যোগসাজশ রয়েছে। আর ভারত সেবাশ্রম সংঘ হচ্ছে বিজেপি'র একটি অংগ সংগঠন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এই ভারত সেবাশ্রম সংঘ এদেশে এসেছিল ত্রাণ তৎপরতা চালানোর নামে ভারতীয় রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দুদেরকে সংগঠিত করতে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, তারা এসেছিল ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিকল্পনা মাফিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটলে ভারত সেবাশ্রম সংঘ বাংলাদেশ থেকে পাততাড়ি গুটায়। সেস্থলে কর্মতৎপরতা শুরু করে প্রণব মঠ ও সেবাশ্রম। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সভাপতি শ্রী বিজয়া নন্দজী বনগাঁতে তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলনের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে তার সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনি তার বক্তৃতায় তার বাংলাদেশে থাকাকালীন অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশের শহরে শহরে পোস্টার পড়ে গেল যে, মুজিব যদি বাঁচতে চাও ইন্দিরাকে তালাক দাও।' সযত্নে এর দু'খানি পোস্টার আমি তুলে নিলাম। তাজউদ্দীন আহমদ তখন মন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে পোস্টার দু'টি দেখিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে মুজিবের অফিসে গিয়ে পৌছুলাম। তাকে বললাম ভাই, এই কি ভারতবর্ষের প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা? আমরা রমনা কালিবাড়ির 'ভেঙ্গে ফেলা' মন্দিরের বর্ণনা দিয়ে মুজিবের কাছে আবেদন জানালাম, 'রমনা কালিবাড়ির মন্দিরটি যদি আপনারা তৈরী করে দেন কিম্বা আমাকে তৈরী করার অনুমতি দেন, তাহলে আমি প্রতিটি হিন্দুর দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে, ভিক্ষা করে রমনার এই ঐতিহাসিক কালিমন্দির প্রতিষ্ঠা করবো এবং প্রমাণ করবো বাংলাদেশ

অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র'। কিন্তু তা হলো না। সেটি হলো সোহরাওয়ার্দী পার্ক। অথচ এই সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৬ সালে পাথরঘাটার বুকে অর্থাৎ সমগ্র বাংলা অর্থাৎ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলায় দাঙ্গা বাঁধিয়ে কয়েক হাজার হিন্দুকে হত্যা করেছিল। এই সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের উদগাতা। তারই নির্দেশে সাম্প্রদায়িক মুজিবর রহমান প্রত্যহ কলেজ থেকে এসে মাথায় রুমাল বেঁধে হাতে ছোরা নিয়ে হিন্দু নিধন করতে নির্গত হতেন। আর সেই সোহরাওয়ার্দীর নামে করা হলো পার্ক'।

ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শেখ মুজিবকে বিজয়ানন্দ কেন সাম্প্রদায়িক বলেন? এর উত্তর একটাই যে, মুসলমান বিদ্বেষ প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা কাউকেই ছাড় দিতে রাজি নয়।

বিজয়া নন্দজী তার বক্তৃতায় আরো বলেন যে, 'যারা আজ আমাদের দেশের বুকে মুসলিম লীগ রচনা করেছে যারা আজ আবার আমাদের দেশের বুকে বসে হিন্দুস্তানকে ভাগ করে দারুল ইসলামের দাবী জানাচ্ছে, তাদের আর সহ্য করা সম্ভব নয়। যারা আমাদের বুকের রক্তে আমাদের জোওয়ানের রক্তে গড়া বাংলাদেশের বুকে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সেখানের দেড় কোটি হিন্দুকে ধ্বংস করে দেবার সাধনা চালাচ্ছে, তাদের আর ক্ষমা নয়, আর ক্ষমা নয়। আমি রাজীব গান্ধীকে বলেছিলাম পাকিস্তান দখল করে নিন। যদি না পারেন, রাশিয়াকে বলুন, আফগানিস্তানের মত দখল করে নিয়ে দশ বছর রেখে দিক। কিন্তু তিনি তা করেননি। আমি ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলাম, বাংলাদেশে দেড় কোটি হিন্দু জিম্মি হয়ে আছে। জিম্মি অর্থ জিয়ানো মাছ। একটি ইসলামী রাষ্ট্রে অন্য ধর্মাবলম্বীরা এই জিয়ানো মাছের মত। বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্র হবার পর হিন্দুদের বলা হচ্ছে যে, তোমরা ভারতে যেতে পারবে না। ভারত সরকার তোমাদের স্থান দেবে না। বিদেশী বলে একবার তোমাদের আসাম থেকে তাড়িয়েছে, বেঙ্গল থেকে তাড়াচ্ছে। সুতরাং তোমরা যেতে পারবে না, বরং ইসলামকে বরণ কর। আমাদের দেশেই থাকো, আমরা ঠিক সুযোগ-সুবিধা করে দেব। এ এক জাতীয় প্রলোভন। অন্যদিকে সাদা কাগজে বলে দেওয়া হচ্ছে, তোমার কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ যদি সাত দিনের মধ্যে দিতে না পার, তবে আমরা তোমার কন্যাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসবো।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে জাকের পার্টি নামে একটি দল তৈরী হয়েছে। সেই দলের উদ্দেশ্য হচ্ছে- দুই হাজার খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বা দশ বছরের মধ্যে দেড় কোটি হিন্দুকে যেকোনভাবে ধর্মান্তরিতকরণ, জবরদস্তি, কন্যা অপহরণ, কিছু কিছু অস্ত্রের সাহায্যে নিধন। এই বিশ্ব জাকের পার্টির টাকা আসছে আরব থেকে, অস্ত্রও আসছে। অতি সম্প্রতি দুই শত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এসেছে এই পার্টির নামে বিদেশ থেকে।'

শ্রী বিজয়া নন্দ বলেন, 'সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে একজন হিন্দু আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, আগামী ২০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আপনারা ইনকিলাব ও কাফেলাসহ বিভিন্ন পত্রিকা পড়লে দেখবেন যে, তাতে শুধু লেখা হচ্ছে যে, হিন্দুরা বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এর পাশাপাশি লিখছে যে, বিএলএ, কালিদাস বৈদ্য, সুব্রত চ্যাটার্জী, স্বামী বিজয়া নন্দ এরা সবাই আমাদের দেশকে সর্বনাশ করে দিতে চাইছে ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচারণ অনবরত চালানো হচ্ছে।'

বিজয়া নন্দ আরো বলেন, 'আমরা ওপারে বসবাসকারী দেড় কোটি ভাইয়ের স্বাধীনতার

দাবী জানাবোই। তাদের শান্তির জন্য, তাদের মা জননীর মর্যাদার জন্য, তাদের ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য অন্ততঃ বাংলাদেশের ছয়টি জেলা খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, পটুয়াখালী ও বরিশাল আমাদের চাই-ই। বাংলাদেশকে খণ্ডিত করে, বাংলাদেশকে কেটে আমরা ঐ ছয়টি জেলাকে স্বাধীন করবোই। .... পূর্ব বাংলার হিন্দুদের জন্য স্বাধীন হোমল্যান্ড চাই।'

বিজয়া নন্দ তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন করে তোমরাই তো সেদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা দান করেছিলে। তোমারই পূর্ব পুরুষ সেদিন পাঠান মোগলদের অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দু সমাজ ও মন্দির রক্ষার জন্য ঐ পাঞ্জাবের বুকে গুরু গোবিন্দ সিংয়ের নেতৃত্বে শিখ জাতি সেদিন জেগে উঠেছিল। তোমারই, তোমার পূর্ব পুরুষ সেই যুবক দল আওরঙ্গজেবের অত্যাচারের কবল থেকে হিন্দু ধর্ম, সমাজ রক্ষার জন্য শিবাজী মূর্তি ধারণ করে সেনাবাহিনী গঠন করেছিলে। সেই সেনাবাহিনী সেদিন আওরঙ্গজেবের বুকে পদাঘাত করে ভারত বর্ষের বুকে হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল, হিন্দু স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল। আরেকবার বাংলার যুবক, ভারতের যুবক তোমরা বঙ্গসেনাবাহিনীতে যোগদান করে আঘাত হানো, আক্রমণ করো বাংলাদেশের ঐ ছয়টি জেলার বুকে। আমরা চাই স্বাধীন বঙ্গভূমি। আমরা চাই স্বাধীন দেশ। জাতিসংঘ স্তম্ভিত হোক, আমেরিকা বিস্মিত হোক, বাংলাদেশ ভীত-সন্ত্রস্ত হোক। ভারতের মুসলিম জাতি বুঝুক হিন্দু আজো বেঁচে আছে।'

বিজয়া নন্দ দাবী করেন 'হিন্দু কোন দিন সাম্প্রদায়িক নয়। যে হিন্দু সাপকে দুধ কলা খাইয়ে মনসা পূজা করে, যে হিন্দু জানে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজিত, সেই হিন্দু সাম্প্রদায়িক নয়। তোমরা যারা হিন্দু-মুসলমানের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ করেছো, দ্বি-জাতিতত্ত্ব মেনে নিয়ে আমার জননী জন্মভূমিকে বিভক্ত করেছো, তোমরাই সাম্প্রদায়িক। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা জানে না। মৌলভীরা শিক্ষা দিচ্ছেন যে, হিন্দুর গৃহ থেকে কন্যা হরণ করে বিবাহ কর। তাই আজো ভারত বর্ষে নারী হরণ চলে। কিন্তু আমাদের কোন ধর্মীয় পুরুষ এটা শিখান না। হিন্দু নারীকে বাস বোঝাই করে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে চালান দেওয়া হয় আজো। বাংলাদেশ থেকে আমার হিন্দুস্তানের মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে আমার পুলিশ। কিন্তু কোন মুসলমান মেয়ে হিন্দু চুরি করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে না সারা ভারতবর্ষে। হিন্দু ইচ্ছা করলে অনেক অত্যাচার করতে পারে। কিন্তু করে না। দেখান, কোথায় হিন্দুরা মসজিদ ভেঙ্গেছে, মহররমের শোভাযাত্রায় বাধা দিয়েছে? কোথাও তার প্রমাণ পাওয়া যাবে না। অথচ মুসলমানরা আজো ভারতের বুকে বসবাস করে দুর্গা প্রতিমার শোভাযাত্রাকে বন্ধ করে দিতে চায়, কালিমূর্তি ভঙ্গ করে দেয়, মন্দির কলুষিত করে। এই সেদিনের কথা বাংলাদেশের বুকে খুলনা শহরে ৪৮টি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে মুসলমান এসে হিন্দু নেতাদের হত্যা করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে ভারত যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে, তাহলে ভারতের ১০ কোটি মুসলমান পাকিস্তানকে সহায়তা করবে। অথচ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আরএসএস, ভারত সেবাশ্রমকে সাম্প্রদায়িক বলা হচ্ছে।'

'আজ আমাদের দুর্দশা দেখুন ৬০ কোটি হিন্দুর জন্য ভারতের বুকে এক ইঞ্চিও জমি রিজার্ভ করা নেই সংবিধানে। সংবিধানে বলা হয়নি যে, ভারতবর্ষ মুসলমানদের নয়। পাকিস্তান করে দিলাম তোমরা মুসলমানরা সেখানে থাক। কিন্তু ভারতবর্ষ থাকবে

হিন্দুদের জন্য। তবে বলা উচিত নয় যে, মুসলামনদের তাড়িয়ে দেও। তারা থাকবেন, কিন্তু তাদের সুনাগরিক হয়ে থাকতে হবে। ভারতের মোরাল সিটিজেন হয়ে থাকতে হবে। ভারতের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য দিয়ে বাস করতে হবে। তবেই মুসলমানরা ভারতবর্ষের নাগরিক হবেন। যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, পাকিস্তানের আনুগত্য নিয়ে থাকবেন, তারা ভারতের নাগরিক নয়। আজ আমার দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য, আমার ধর্ম, সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদে হিন্দুত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষের বুকে ৬০ কোটি হিন্দুকে সংগঠিত হতে হবে। এটা সাম্প্রদায়িকতা নয়। এটা সাম্প্রদায়িকতার অনেক উর্দ্ধে। আজ যদি ভারত বিপন্ন হয়, আর হিন্দু যদি সেই ভারতকে রক্ষা না করে তাহলে আর কে করবে? আমাদের প্রাণের তাগিদেই তা করতে হবে। কারণ হিন্দুর আর কোন দেশ নেই। এই দেশ হিন্দুর জন্য। এই ভারত আমার পূণ্যভূমি, পিতৃভূমি, দেবতার লীলাভূমি। যুগ-যুগান্তরের জন্মভূমি। আজ যদি ভারত চলে যায় তাহলে হিন্দুদের কি দশা হবে? মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে। হিন্দুর সংখ্যা কমছে। কারণ হিন্দুর একটি বিবাহ, দুটি তিনটি সন্তান হওয়ার সাথে সাথে হাসপাতালে অপরাশেন হয়। কিন্তু মুসলমানদের সে বালাই নেই। হিন্দুর জন্য দু'সন্তান, মুসলমানের জন্য পাঁচ সন্তান। এটা কোন দেশের নীতি? কোন মুসলমানের পাঁচটি বিবাহের অনুমতি নাই। ভারতে সে অনুমতিও দেয়া হয়েছে। দেশ বিভাগের সময় ভারতে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি এখন হয়েছে ১১ কোটি।'

১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে কিছুটা উত্তেজনা দেখা দেয়। কিন্তু তা বেশিদূর গড়াতে পারেনি। মিটিং ও মিছিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠির চিরকালের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণেই উত্তেজনা দ্রুত প্রশমিত হয়ে যায়। রাজনৈতিক দলগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে ইসলামী দলগুলো ইসলামের সুমহান শিক্ষার আলোকে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তথাপি ইসলামী দলগুলোকে দোষারোপ করে হিন্দু সংগঠনগুলো মন্দির ভাঙ্গার ও হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের কল্প-কাহিনী প্রচার করে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ। এই পরিষদটি হচ্ছে বাংলাদেশের সকল হিন্দুধর্মীয় সংগঠনের 'সুপার স্ট্রাকচার'। এই পরিষদ প্রথম মন্দির ভাঙ্গা ও হিন্দুদের ওপর কথিত নির্যাতনের বিবরণ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে। যার মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই। এই পুস্তিকা ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানকার সাম্প্রদায়িক হিন্দু সংগঠনগুলো এটা নিয়ে হৈচৈ ফেলে দেয়। ফাদার টিম নামক একজন বিদেশীও একইভাবে মন্দির ভাঙ্গা ও হিন্দু নির্যাতনের ওপর একটি কল্পকাহিনী রচনা করেন। ফাদার টিম বাংলাদেশে কাজ করছে তথাকথিত 'কমিশন ফর জাস্টিস এন্ড পিস' নামক একটি এনজিও'র মাধ্যমে।

২। '৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ ধ্বংস ও তৎপরবর্তী তৎপরতা

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বিজেপি ও এর অঙ্গ সংগঠন শিবসেনা, আর এস এস-এর সদস্যরা ভারতের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। ফলে সমগ্র ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। নিহত হয় শত শত নিরপরাধ ভারতীয়। স্বভাবতই এসব ঘটনায় সমগ্র বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এদিকে ভারতের প্রতিবেশী ও একটি মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বাবরী মসজিদ

ভাঙ্গার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেলেও এনিয়ে কোন বড়মাপের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি। বরং বাংলাদেশের আপামর জনগণ সর্বান্তকরণে যে কোন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমনে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনা স্তিমিত না হতেই কোন এক অদৃশ্য সুতোর টানে একটি কুচক্রী মহল এদেশে হিন্দু নির্যাতনের কল্পকাহিনী প্রচার করতে থাকে। প্রচারণা পুস্তিকা, লিফলেট ছাপিয়ে বলা হয় বাংলাদেশে হাজার হাজার হিন্দুকে নির্যাতন করা হয়েছে, ধর্ষিতা হয়েছে অগণিত হিন্দু নারী। এমনকি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও প্রচারণা মাধ্যমে এধরনের বহু কাল্পনিক ঘটনার খবর জানানো হয় বিশেষ একটি মহল থেকে। এভাবে বাংলাদেশকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর লক্ষ্য ছিল বিশ্বকে বলা– দেখো শুধু ভারতেই নয়, বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িকতার কোন কমতি নেই। এধরনের বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা যে শুধুমাত্র ভারত থেকেই চালানো হয়েছে তা নয়। বরং বেশীরভাগ অপপ্রচার হয়েছে বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশী রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে। এরূপ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী অপপ্রচার-এর উদাহরণ হতে পারে 'পাক্ষিক দিকপাল' নামের একটি পত্রিকা। এই পত্রিকাটির উপদেষ্টা আবার কোন যেনতেন ব্যক্তি ছিলেন না। ডঃ আহমদ শরীফের মতো একজন 'বিখ্যাত' নাস্তিক অধ্যাপকের নাম এই পত্রিকাটিতে ছাপা হতো উপদেষ্টা হিসেবে। উল্লেখ্য, বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা হয় ৬ ডিসেম্বর '৯২ তারিখে। এর মাত্র দশদিনের মাথায় ১৬-৩১ ডিসেম্বর সংখ্যা 'পাক্ষিক দিকপাল' প্রকাশ করে বাংলাদেশে 'ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতনের' কাহিনী। এব্যাপারে ২৮ ডিসেম্বর '৯২ সংখ্যা দৈনিক দিনকালে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের পাঁয়তারা' শিরোনামে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়– "বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির অশুভ লক্ষ্যে একটি পাক্ষিক পত্রিকার চরম উস্কানিমূলক ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করার গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পত্রিকাটির গত ১৬-৩১ ডিসেম্বর সংখ্যাটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়। এতে ব্যানার হেডে প্রকাশিত সংবাদটির শিরোনাম 'সাম্প্রদায়িকতার শিকার হিন্দু সম্প্রদায়–সারাদেশে মন্দির ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট'। ডঃ আহমদ শরীফ পত্রিকাটির উপদেষ্টা, সন্দীপ কুমার বিশ্বাস সম্পাদক। ২৪, রাধিকা মোহন বসাক লেন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতার নাম লেখা রয়েছে–'খোকা বাবু'। সম্পাদক সন্দীপ কুমার বিশ্বাস আবার ন্যাশনাল হিন্দু পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য উল্লেখ করে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা করা হয়েছে। মূল সংবাদটির প্রতিটি লাইনে এর সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম দিকের একটি লাইন- 'নিরাপত্তার অভাবে লালবাগসহ বিভিন্ন এলাকার ১০০টি পরিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে এসে আশ্রয় নিয়েছে'। এভাবেই পুরো পত্রিকায় মিথ্যাচারে ভরা। 'সারাদেশে ৩৩টি জেলায় তিন শতাধিক মন্দির ভাঙচুর, দোকানপাট, বাড়ি, গাড়িতে অগ্নিসংযোগ,' এমনকি নারী ধর্ষণের ভিত্তিহীন (অন্য কোনো জাতীয় পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হয়নি) অভিযোগ করে মূলত 'পাক্ষিক দিকপাল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি গোষ্ঠী তাদের সাম্প্রদায়িক হীন স্বার্থ-চরিতার্থ করারই প্রয়াস চালাচ্ছে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন। এই দুঃসাহসের উৎস কোথায়-জাতি আজ তা জানতে চায়।"

এধরনের প্রচারণার শুধু একটি নয় হাজারো উদাহরণ দেয়া যায়। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এগুলো ছিল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, অর্গানাইজড্ এ্যাকশন নয়। বরং সাম্প্রদায়িক ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতার সূত্রপাত হয় ২০ জানুয়ারী '৯৩-এর পর থেকে।

৩। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে সংসদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ এরপর ভারতীয় হুমকী।

ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার তীব্র নিন্দা করে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ২০ জানুয়ারী '৯৩ তারিখে একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে। যদিও আ'লীগ ও গণতন্ত্রী পার্টি উল্টো বাংলাদেশে 'হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে'ও একই সাথে প্রস্তাব পেশের দাবী জানায়। তদানীন্তন সরকারী দল-বিএনপি ঐ প্রস্তাব না মানায় আ'লীগ সংসদে গৃহীত নিন্দা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দানে বিরত থাকে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের ভোটে নিন্দা প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এদিকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে এই নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের ঘটনা ক্ষিপ্ত করে তোলে ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের এবং ২৩ জানুয়ারী '৯৩ তারিখে ভারত সরকার অত্যন্ত অশোভন ভাষায় বাংলাদেশকে 'সাবধান' করে দেয়। ভারত সরকার প্রদত্ত বিবৃতিতে বলা হয়, 'একটি বিতর্কিত ভবন ভেঙ্গে দেবার ব্যাপারে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তা আমরা গভীর দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি। আমাদের নীতি ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার প্রকাশ্যে নিন্দা জ্ঞাপন করে যে নাক গলাচ্ছে এবং যে বিষয়ে তার আইনগত অধিকার নেই সেসব বিষয়েও আমাদের উপদেশ দেয়ার মত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে, এ বিষয়গুলোকে আমরা কঠোরভাবে বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছি। ....

মৌলবাদীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত মহলের অসুদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যে উপদেশ দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে তা সামগ্রিক উত্তেজনা প্রশমনের পথকে শুধু বাধাগ্রস্তই করবে।' উক্ত বিবৃতিতে তারপর যে সব ভয়ংকর কথা বলা হয় তা সাধারণ কূটনৈতিক শিষ্টাচার পরিপন্থী হওয়ার পাশাপাশি সরাসরি বাংলাদেশকে শাসানোর পর্যায়ে পড়ে। ভারতীয় সরকার প্রদত্ত উক্ত বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'বাংলাদেশে যে শত শত মন্দির ধ্বংস হয়েছে ও সহিংস ঘটনা ঘটেছে, তাতে করে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি মডেল হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। .... তাই ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের ভবিষ্যত পদক্ষেপের ওপর মনোযোগ সহকারে নজর রাখবে।'

ভারতীয় সরকারের এই 'নজর' রাখাই পররবর্তিতে বাহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করায় মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

৪। 'লজ্জা' ও তসলিমা নাসরিন ইস্যু সৃষ্টি

বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে গৃহীত নিন্দা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারত সরকার প্রচ্ছন্ন হুমকী প্রদর্শন করে ২৩ জানুয়ারি '৯৩ তারিখে। এর মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় শুরু হওয়া একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয় তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা'। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নেই, হিন্দুদের উপর চলছে নির্যাতন এসব কাল্পনিক কথামালাই ছিল 'লজ্জা' উপন্যাসের মূল উপজীব্য। এই উপন্যাসের মাধ্যমে যে বিষবাষ্প ছড়ানো হয়েছে তাতে সে সময় সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি

দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতে নয়, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চলছে–'লজ্জা' উপন্যাসের মাধ্যমে 'র' সে কথাই প্রতিষ্ঠিত করেছে সার্থকভাবে।

একথা হয়তো সাধারণ সাহিত্য সমালোচক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 'লজ্জা' নিছক একটি উপন্যাস। কিন্তু তসলিমা নাসরিনের সৃষ্টি বা 'লজ্জা'র প্রকাশ কখনোই কোন গতানুগতিক সাংস্কৃতিক বিষয় ছিল না। বরং 'লজ্জা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে 'র'-বাংলাদেশে 'নজর' রাখার হুমকী দেয়ার মাত্র সপ্তাহখানেকের ব্যবধানে চরমতম প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আপাত 'নির্দোষ' একটি সাহিত্যকর্মের সাহায্যে একটি দেশকে কখনো কেউ এতো বড় বিপদে ফেলে দিতে পারেনি - যা 'র'- সার্থকভাবেই করেছে।

তসলিমা নাসরিন যে 'র'-এর সৃষ্টি ও তার লজ্জা উপন্যাস যে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য প্রকাশ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে পরবর্তিতে অনেক তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। এমনকি ভারতীয় বিশ্লেষকগণও তসলিমা নাসরিনের 'র'-সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এদেরই একজন হলেন-ভারতের 'ইন্সটিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের' গবেষক অশোক. এ. বিশ্বাস। ৩১ আগস্ট '৯৪ সংখ্যা 'দি নিউ নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত `Raw's role in furthering India's foreign policy' শীর্ষক এক নিবন্ধে মি. অশোক বিশ্বাস উল্লেখ করেন যে, বিএনপি সরকারকে বিশ্ব দরবারে সাম্প্রদায়িক, সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী হিসেবে চিত্রিত করার জন্য 'র'-তসলিমা ইস্যু সৃষ্টি করেছে। তিনি একে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 'র'-এর অন্যতম বড় সাফল্য বলেও মন্তব্য করেন। তার ভাষ্যমতে, 'এই অনৈতিক, তৃতীয় শ্রেণীর লেখিকাকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে কলকাতার প্রচার মাধ্যম এবং তাঁকে পুরো আর্থিক সহায়তা দিয়েছে 'র'.... এবং 'র' খুব ভালভাবেই জানতো যে তসলিমা ইস্যু কিভাবে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে ও একথা মনে রেখেই তারা বাংলাদেশের ভেতরে গোলযোগ সৃষ্টি ও পাশাপাশি পশ্চিমী নারীবাদী সংগঠনসহ ইসলাম বিরোধী লবীকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়ার জন্যই 'লজ্জা' সহ অন্যান্য উগ্র কাজে তসলিমাকে লেলিয়ে দেয়।'

এদিকে বাংলাদেশে 'লজ্জা' উপন্যাস প্রকাশের সমান্তরালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিসহ অন্যান্য হিন্দু সংগঠনগুলো তসলিমার সমর্থনে এগিয়ে আসে। এছাড়া আনন্দবাজার গোষ্ঠী ব্যাপক কভারেজ দেয় তসলিমা নাসরিনকে। এরা 'লজ্জা'কে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে একথাই প্রচার করে যে বাংলাদেশে আশঙ্কাজনক হারে হিন্দুদের উপর নির্যাতন চলছে। এনিয়ে সেসময় বাংলাদেশে কি ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় চোখ রাখলেই বোঝা যেতো। এখানে উল্লেখ্য, 'র'-এর প্রচারণা সহায়তাকারী আনন্দবাজার গোষ্ঠী পরবর্তিতে তসলিমাকে আনন্দ পুরষ্কারে ভূষিত করে। এরপর দীর্ঘদিন তসলিমা পশ্চিমা দেশগুলোয় বসবাস করে কোন উন্নত সাহিত্য কর্ম উপহার দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৯৯ সালে আবার ফিরে আসে ভারতে। এবারও তাকে পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে আনন্দবাজার গ্রুপ। এমনকি ২০০০ সালে দ্বিতীয় বারের মতো তসলিমা নাসরিন ভূষিত হন 'আনন্দ পুরস্কারে'!

এছাড়া ১৯৯৩-'৯৪ সময়কালে ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে মৌলবাদী সংগঠন বিজেপিসহ অপরাপর রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরাও তসলিমার সমর্থনে

মিছিল, মিটিং-এর আয়োজন করে। এমনকি কোন এক অদৃশ্য সূত্রে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে একটি বিশেষ মহল 'লজ্জা' উপন্যাসের হাজার হাজার কপি ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিলি করেছে। এব্যাপারে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'কলম' পত্রিকার ১ আগস্ট '৯৩ সংখ্যায় বলা হয়- "নারী কর্তৃক পুরুষদের অবাধ ধর্ষণের প্রবক্তা আনন্দ পুরস্কার-ভূষিতা তসলিমা নাসরিনের সাম্প্রতিক একটি বইয়ের নাম 'লজ্জা'। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে কিন্তু বিক্রি হয়েছে পশ্চিম বাংলায়। বেস্ট সেলার লিস্টে উঠে আসায় বইটির কলকাতার সংস্করণও দেখতে পাওয়া গেছে। এ বঙ্গে বইটির জনপ্রিয়তার কারণ বিজেপি ও বিজেপি মানসিকতাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের আনুকূল্য। তারা ঝোলা ব্যাগে বয়ে বয়ে বইটি 'পুশ সেল' করে বেড়াচ্ছেন। এক শিল্পপতি নাকি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য বইটির বহু কপি আগাম খরিদ করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এক 'সেকুলার' অধ্যাপক (বর্তমানে বিজেপি মানসিকতাসম্পন্ন) নিজ খরচে বইটির ফটোকপি বিলি করে বেড়াচ্ছেন। 'লজ্জা' নিয়ে এত মাতামাতির কারণ কিতাবটিতে তসলিমা নাসরিন নাকি বাংলাদেশের মুসলমান মৌলবাদীদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। বাংলাদেশে হিন্দুরা খুন, বলাৎকার, শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনা, অপমান, লাঞ্ছনা এবং অবিরাম দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গণহত্যার মধ্যে কিরকম 'মানবেতর' জীবন-যাপন করছেন, তারই নাকি 'সত্যনিষ্ঠ, রগরগে' বর্ণনা রয়েছে 'লজ্জা'-র দুই মলাটের মধ্যে।

সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকা পরিবেশিত এক খবরে জানা গেল বাংলাদেশ সরকার নাকি 'লজ্জা' বইটি নিষিদ্ধ করেছেন। অভিযোগ: মিথ্যা তথ্য পরিবেশন ও সাম্প্রদায়িক উস্কানি।

অনেক বুদ্ধিজীবী বইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিরোধী। মাত্র কয়েকবছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রসিদ্ধ বক্তা মেমারির গোলাম আহমদ মোর্ত্তজা সাহেবের একটি পুস্তক 'ইতিহাসের ইতিহাস' নিষিদ্ধ করেন সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের অভিযোগে। অথচ বইটিতে ইতিহাসের কিছু প্রমাণিত তথ্যকে তুলে ধরা হয়েছিল। কোনও সম্প্রদায়কে আক্রমণ বা ছোট করার প্রয়াস তাতে ছিল না।"

এভাবে শুধুমাত্র ভারতে প্রচারণা করেই 'র' ক্ষান্ত হয়নি বরং সমগ্র বিশ্বেই বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করতে তাদের সেসময় 'অতি তৎপর' থাকতে দেখা গেছে। এসব প্রচার প্রচারণায় তখন বাবরী মসজিদ ইস্যু চাপা পড়ে সে জায়গায় স্থান পায় তসলিমা সিনড্রোম। অর্থাৎ, সহজ কথায় ভারত সাফল্যজনকভাবে নিজের অপকীর্তি আড়াল করতে সক্ষম হয় বাংলাদেশে তসলিমা সৃষ্টি করে। একেই বলে চানক্য বুদ্ধি, জনমত প্রজ্বলিত বা প্রভাবিত করা। আর এটাই হচ্ছে গুপ্তচরবৃত্তির ক্ল্যাসিক্যাল উদাহরণ।

সেসময় ভারতীয় মহল কিভাবে পৃথিবীব্যাপী বাংলাদেশকে মৌলবাদী ও নিবর্তনবাদী একটি দেশ হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রচারণা মাধ্যমের প্রচারণা থেকে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের সিএনএন থেকে শুরু করে 'নিউইয়র্ক টাইমস' ও 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর মত প্রভাবশালী পত্রিকাতে তসলিমা নাসরিনের সমর্থনে বাংলাদেশকে একটি মধ্যযুগীয় মৌলবাদী দেশ হিসেবে প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। ৬ জুলাই '৯৪ সংখ্যা

'নিউইয়র্ক টাইমস্'-এ তসলিমা নাসরিনের ওপর লেখা 'সেন্সরশীপ বাই ডেথ' শিরোনামের এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশকে ধিক্কার জানানো হয় তসলিমার 'লজ্জা' বইয়ের নামে 'শেম' শব্দ দিয়ে। ১৩ জুলাই '৯৪-এ ঐ একই পত্রিকায় তসলিমার ছবিসহ তিন কলাম শিরোনামে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এর ঠিক পরদিন ১৪ জুলাই '৯৪ তারিখে আবার তসলিমাকে লেখা সালমান রূশদীর খোলা চিঠি সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে 'নিউইয়র্ক টাইমস্'।

এদিকে বিদেশী পত্র পত্রিকায় কিভাবে, কাদের মাধ্যমে তথ্য পেয়ে এ ধরনের বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চলতে থাকে তা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা সম্ভব না হলেও সচেতন দৃষ্টির কাছে এটা ধরা পড়তে বাকী থাকেনি যে, বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ভারতীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই 'র' সফলভাবে তসলিমা ইস্যুকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত বৈরী প্রচারণা সম্পর্কে একইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক ঠিকানার মন্তব্য প্রতিবেদন থেকে। 'নিউইয়র্ক টাইমস্' ও 'ওয়াশিংটন পোস্টে' তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত কিন্তু সমন্বিত বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা সম্পর্কে সে সময় 'সাপ্তাহিক ঠিকানা'য় বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে হেয় করার ও প্রচারণায় বাংলাদেশ বিরোধী একটি সংঘবদ্ধ দল-এর সক্রিয় থাকার কথা উল্লেখ করা হয়। এনিয়ে প্রকাশিত একটি বিশেষ প্রতিবেদনে আরো বলা হয় 'বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অযুহাতে বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে এনে বাংলাদেশ বিরোধী এই সংঘবদ্ধ দল বাংলাদেশের বিরূদ্ধে ন্যাক্কারজনক তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। এখন তসলিমা নাসরিনকে কেন্দ্র করে তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাদের এই তৎপরতারই ফসল হচ্ছে ৬ জুলাই 'নিউইয়র্ক টাইমসের' 'সেন্সরশীপ বাই ডেথ' সম্পাদকীয়টি। বাংলাদেশ বিরোধী এই সংঘবদ্ধ দল কখনও সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব, কখনও বাংলাদেশের পোষাক শিল্পে অবৈধভাবে শিশু শ্রম নিয়োগ, কখনওবা চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে কথিত গণহত্যা অথবা মন্দির, গীর্জা ধ্বংসের অভিযোগ এনে জোর অপপ্রচার চালিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে তথ্য, ছবি, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ভিডিও-অডিও ক্যাসেট প্রভৃতি সংগ্রহ করে সেগুলির প্রয়োজনীয় ইংরেজী অনুবাদ করে এরা যথাযোগ্য স্থানে সরবরাহ করে থাকে।'[২৫] এখন প্রশ্ন হলো-এই সংঘবদ্ধ চক্রটি কাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে? কারা ভিডিও, অডিও, তথ্য, প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংগ্রহ করে ইংরেজীতে অনুবাদ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরবরাহ করতো?

৫। বিজেপি'র হুমকীঃ দুই কোটি মুসলমানকে বিতাড়িত করবো ও বাংলাদেশকে অঙ্গরাজ্য বানাবো

তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' কে বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন ও মুসলমান অনুপ্রবেশের প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে বিজেপি ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত হয়। আড়ালে এদের ইন্ধনদাতা হিসেবে থাকে 'র'। সেসময় যে কোন উপায়ে বাংলাদেশকে অব্যাহত চাপের মুখে রাখাই ছিল এসব প্রচারণার লক্ষ্য। উল্লেখ্য, কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকায় ২৭ সেপ্টেম্বর '৯৩ সংখ্যার এক খবরে বলা হয়-'বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় যেতে পারলে একমাসের মধ্যে ২ কোটি মুসলমানকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধ হবে এবং তারপর বাংলাদেশ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যে

২৫। মনজুর আহমদ, *যুক্তরাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ দলের বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার*, দৈনিক বাংলা ১৯ জুলাই '৯৪ সংখ্যা

পরিণত হবে।' ঐ রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায় যে, বিদ্যার্থী পরিষদের ব্যানারে বিজেপি'র অঙ্গ সংগঠন আর এস এস আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বিজেপি'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি তপন শিকদার এমন হুংকার ছাড়েন।

৬। খালেদা জিয়ার ফারাক্কা ভাষণ ও কংগ্রেসের ৪৫ পৃষ্ঠার রিপোর্টে অর্ধেকের বেশী স্থান জুড়ে বাংলাদেশ বিরোধী কল্পকাহিনী

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৯৩ সালের শুরু থেকেই ভারত যাবতীয় উপায়ে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করায় তৎপর হয়ে উঠে। বাংলাদেশে যাতে বিদেশী পুঁজি না আসে, গণতান্ত্রিক পথচলা যাতে বাধাগ্রস্ত হয় ও অন্যান্য বার্নিং ইস্যু যাতে ধামাচাপা পড়ে যায় মূলত এলক্ষ্যেই বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদী জঙ্গী রাষ্ট্র হিসেবে চিত্রিত করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে 'র'। এই ভয়ানক ও বিস্তৃত কৌশলগত গুপ্তচরবৃত্তি শুধুমাত্র 'র'-এর নিজ কর্মকর্তা কর্মচারী বা অপারেটিভদের মাধ্যমে পরিচালিত করা সম্ভব ছিল না। তাই তারা 'সঙ্গত কারণেই' বেছে নেন কংগ্রেস ও বিজেপি'র মতো রাজনৈতিক দলগুলোকে।

এদিকে ১৯৯৩ সালের ১লা অক্টোবর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জাতিসংঘে ভাষণ দেয়ার কথা ছিল। ঢাকাস্থ বাংলাদেশী এজেন্ট মারফত এব্যাপারে 'র'-আভাস পায় যে, বেগম জিয়া জাতিসংঘে ভারতের সাথে অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে কড়া বক্তব্য দিতে পারেন। তাই 'র' বিএনপি সরকারকে ঐ ভাষণের পূর্বেই বিশ্ব দরবারে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে বেশক'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর একটি ছিল কংগ্রেসের রিপোর্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা ও এর সমান্তরালে বাংলাদেশস্থ অনুগামীদের সাহায্যে 'হিন্দু নির্যাতন' সংক্রান্ত প্রচারণা জোরদার করা। এছাড়া বিশ্বব্যাপী যেখানেই চিহ্নিত বাঙালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে সেখানেই তাদের মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এব্যাপারে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক কলম' ও ঢাকার দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত কংগ্রেসী দলিলে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ভয়ঙ্কর কল্পকাহিনী সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া কংগ্রেসের ৪৫ পৃষ্ঠাব্যাপী ঐ রিপোর্টের অর্ধেকেরও বেশী স্থান জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশ বিরোধী বিষোদগার। এখানে ভারতের কংগ্রেস, বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ ও বিদেশে অবস্থানরত ভারতপন্থী কতিপয় বাঙালী কিভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত এক রিপোর্টে। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়—"সম্প্রতি ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা জোরদার করা হয়েছে। এই প্রচারণায় শামিল রয়েছে ভারতের কোন কোন সংবাদপত্র, সংগঠন এবং প্রবাসী ভারতীয় নাগরিকরা। এসব মিথ্যা প্রচারণার লক্ষ্য হচ্ছেঃ বাংলাদেশের উপর মিথ্যা তোহমদ আরোপ করা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে, বিভিন্ন দেশের কাছে বাংলাদেশকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এ ধরনের প্রচারণায় এই অঞ্চলের পর্যবেক্ষক মহল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন উঠেছে—আসলে ভারত কি চাইছে?

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কংগ্রেস সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের একটি রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সম্প্রতি একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে দি পাইওনিয়ার

পত্রিকায়। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সাধারণ সভার উপর ঐ রিপোর্টটি তৈরী করা হয়। পাইওনিয়ার-এর খবরে বলা হয়েছে যে, কংগ্রেসের ঐ ৪৫ পৃষ্ঠার রিপোর্টের অর্ধেকের বেশী পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিষয়। রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে : বাংলাদেশে এখন প্যান ইসলামিক আন্দোলন চলছে এবং ঐ আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে, ভারতে বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কিয়ে দেয়া। কংগ্রেসের ঐ প্রতিবেদনটিতে চরম ও ঘৃণ্য মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে বলা হয়েছে যে, বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর চট্টগ্রামে ৭০ জন হিন্দু মহিলা শ্রমিককে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং ভোলায় বার হাজার মহিলা ও বালিকাকে কনকনে শীতের মাস ডিসেম্বরে তিনদিন ধরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরানো হয়েছে। রিপোর্টে ঐ এলাকায় গণধর্ষণের কথাও বলা হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়েছে : বাংলাদেশে জনসংখ্যা এবং দারিদ্র্য যে হারে বাড়ছে; তাতে করে প্রাকৃতিকভাবেই এক সময় বাংলাদেশ থেকে ভারতের পূর্বাঞ্চলে জনতার ঢল নামবে–কারো সাধ্য হবে না তাকে ঠেকাবার। আর এভাবেই তারা ভারতের পূর্বাঞ্চলকে দখল করে নেবে। রিপোর্টটিতে এই মর্মে আর একটি ভীতিকর মিথ্যাচারের অবতারণা করা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের কয়েকটি সীমান্তবর্তী জেলার পরিস্থিতিকে অস্থির করে তোলার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি (তথাকথিত) পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে, এসব অঞ্চলে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ হচ্ছে-মুসলমান। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ব্লিৎস-এর কলকাতা ডেটলাইনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছেঃ বাবরী মসজিদ ধ্বংস হওয়ার পর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে এবং পশ্চিমবঙ্গের অনেক অংশে যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে, তাতে মনে হয়, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এক সাথে মিলে কাজ করছে এবং ভারতের এসব অঞ্চলের পরিস্থিতিকে অস্থির করে তোলার জন্য তাদের যৌথ উদ্যোগ অব্যাহতভাবে চালু রয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনটিতে ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে যে, কলকাতায় বোমা হামলা এবং বাংলাদেশ থেকে অব্যাহত উদ্বাস্তু আগমন থেকেই বোঝা যায় যে, পাকিস্তানের আইএসআই (রণ কৌশলগত গবেষণা সংস্থা) এবং বিআইএসএস (বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ)[২৬] হাতে হাত মিলিয়ে এক সাথে ভারতের বিরুদ্ধে কাজ করছে। ব্লিৎস বলেছে, 'বিআইএসএস হচ্ছে: আমাদের পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিবেশীর একটি গোয়েন্দা সংস্থা।'

অপরদিকে কানাডার মন্ট্রিয়েল থেকে প্রকাশিত 'দি গেজেট' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছেঃ "মন্ট্রিয়েলে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এই মর্মে প্রচারণা চালাচ্ছে যে, বাংলাদেশে জাতিগত ও ধর্মীয় শুদ্ধি অভিযান চলছে। কিন্তু আদতে তারা বাংলাদেশী না-কি ভারতীয় তা স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য যে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরাও এ ধরনের প্রচারণার ব্যাপারে নিজেদেরকে বাংলাদেশী বলে চালিয়ে যাচ্ছে– অনেক জায়গা থেকে এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ধরনের লোকেরা হয়তো অতীতের কোন এক সময়ে এ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলো। দি গেজেটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঐ গোষ্ঠীতে ১শ' ৭৫টি পরিবার আছে এবং তারা সেখানে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ গঠন করেছে। পরিষদ দি গেজেটকে দেয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, বাবরী

২৬। এটি মূলত হবে BIISS অর্থাৎ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ

মসজিদ ঘটনার পর বাংলাদেশে হিন্দুদের ২৮ হাজার বাড়ী ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২,৭০০টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং ৩,৬০০টি মন্দির ও অন্যান্য উপাসনালয় ধ্বংস করা হয়েছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। প্রায় দু'হাজার লোক আহত হয়েছে, নিহত হয়েছে ১২ জন। এছাড়া ২৬০০ মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ঐ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি গত জানুয়ারীতে ঢাকায় সংসদ সদস্যদের মধ্যেও বিলি করা হয়েছিলো। জানা গেছে, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ একই বিজ্ঞপ্তি জাতিসংঘ, ওআইসিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ফোরামের কাছেও পাঠিয়েছে। তারা বলেছে: বাংলাদেশ সরকার এমন কড়া সেন্সরশীপ আরোপ করেছে যে, কোন খবরই বাংলাদেশ থেকে বাইরে আসতে পারছে না। বাংলাদেশে অব্যাহত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দুদের সর্বনাশ করা হচ্ছে বলে গত কয়েক মাস যাবৎ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ বিশ্বব্যাপী যে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে এসেছে, তা আসলেই বিশ্ববাসীর কাছে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় এখন তারা যেখানেই বাংগালী হিন্দু রয়েছে সেখানেই তাদেরকে দিয়ে আর এক মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে যে, বাংলাদেশে হিন্দু শুদ্ধি অভিযান চালানো হচ্ছে। কানাডার অটোয়ায় এই প্রচারণাটির কপি তারা বাংলাদেশ হাই কমিশনারকেও দিয়েছে বলে মন্ট্রিয়েল গেজেটের খবরে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে : বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে এ ব্যাপারে কোন মন্তব্যই প্রকাশ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, বিদেশে কিংবা আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহে যখন বাংলাদেশ সম্পর্কে মিথ্যাচার চালানো হয়, বাংলাদেশকে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়, সে সময় আমাদের কূটনৈতিক মিশনগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে এ ধরনের মিথ্যা প্রচারণা প্রতিহত করে বাংলাদেশের মান-মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, অনেক স্থানে, অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো তা করতে ব্যর্থ হয়েছে।"

৭। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের তৎপরতা

অংকের সূত্রের মতো হয়তো প্রমাণ দেয়া যাবে না যে, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ বাংলাদেশে ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে যাচ্ছে বা তাদের কোন কোন নেতা 'র'-এর সাথে যুক্ত। তবে ১৯৮৮ সালের ২০মে জন্ম নেয়া এই সংগঠনটি বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ, তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও ইতিহাস, ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে আসছে একের পর এক। ১৯৮৮ সালে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দেয়ার পর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির তথাকথিত স্বার্থ রক্ষাকারী এই 'ঐক্য পরিষদ' প্রতিটি পর্যায়েই মাঠে নেমছে সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার আড়ালে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব বিনাসের লক্ষ্য নিয়ে। এমনকি ২০০০ সালে এরা সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বাদ দেয়া না হলে পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র গঠনেরও হুমকী প্রদান করে। এসব থেকেই বোঝা যায়, ঐক্য পরিষদের সহজ, সরল লক্ষ্য হলো যে কোন উপায়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি বা গৃহযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে 'সংখ্যালঘুর জীবন বাঁচানোর' দাবী নিয়ে প্রতিবেশী দেশের হস্তক্ষেপের পথ সুগম করা। ১৯৯১ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্তও এই সংগঠনটি একই লক্ষ্য নিয়ে একের পর এক বিভ্রান্তিকর ও উস্কানীমূলক প্রচারণা চালিয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯০ সালে ভারতের বাবরী মসজিদ নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনা ও ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্র হিন্দু কর্তৃক বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার পর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ ব্যাপক পরিসরে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতায় ঝাপিয়ে পড়ে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হলো-ভারতে বিজেপি বা

উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলো বাংলাদেশের বিপক্ষে যেসব প্রচারণা চালিয়েছে এদেশে ঠিক তার সমান্তরাল কর্মসূচীই পালন করেছে ঐক্য পরিষদ। বলতে গেলে এদের সরবরাহকৃত কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য উপাত্তসমূহকেই ভারতীয় সরকার ব্যবহার করেছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করায়। এখানে এদের উল্লেখযোগ্য ক'টি অপতৎপরতার কথা উল্লেখ করা হলো :

(ক) ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর সে ঘটনার কোন প্রতিবাদ না করে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান উল্টো বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত অত্যাচারের উল্লেখ করে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আকুল আবেদন জানায়। এব্যাপারে বঙ্গভূমি আন্দোলনকারীদের চেয়ে আরেক ধাপ ওপরে উঠে অপপ্রচার চালায় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ। সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত অত্যাচারের উল্লেখ করে এই পরিষদ ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত 'উদ্ধারের জন্যে আকুল আবেদন' শীর্ষক পত্রে লিখে "বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চলছে। হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। সশস্ত্র মুসলিম মৌলবাদীদের দ্বারা হিন্দু-বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানদের হাজার হাজার বাড়িঘর লুণ্ঠিত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, ধর্ষিতা হয়েছে তাদের নারীরা। বাংলাদেশ সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে। ক্ষেত্র বিশেষে সরকারী সহায়তায় সশস্ত্র মৌলবাদী দুস্কৃতকারীরা হামলা চালিয়েছে সংখ্যালঘুদের ওপর। ঘর-বাড়ি-সম্পদহারা হাজার হাজার সংখ্যালঘু এখন জীবনের নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে। মানবতার দোহাই দিয়ে ঐক্য পরিষদ বিশ্ব সম্প্রদায়কে সরাসরি বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের উদ্ধারের আকুল আবেদন জানায়। একই সঙ্গে ওই আবেদনে ঐক্য পরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের পরিকল্পিত নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের কথা বলা হয়। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী স্বাক্ষরিত ওই পত্র প্রেরিত হয় ১৫ ডিসেম্বর। ওই পত্র দেশের বিভিন্ন এনজিও এবং বিদেশী দূতাবাসগুলোতে পাঠানো হয়। এরপর কি একথা বলা অন্যায় হবে যে, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ বঙ্গভূমিওয়ালাদের কার্বন কপি, তাদের সহায়ক শক্তি কিংবা এদেশীয় এজেন্ট?"[২৭]

(খ) ১৯৯৩ সালের ২২ জুলাই হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের অঙ্গ সংগঠন 'বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ' এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে মূল সংগঠনের এক নেতা দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সরকার ও জনগণের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে যদি একটি ছেলেকেও গ্রেফতার করা হয়, কারাগারে নেওয়া হয় তবে বাংলাদেশের কবর রচনা করা হবে।' সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করে তিনি আরো বলেন, 'বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করা হচ্ছে। আমরাই আমাদের দেখাশোনা করবো। এর জন্যে আমরা প্রস্তত হচ্ছি।' তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র' বলায় তিনি সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে মন্তব্য করেন, 'সাহস থাকলে বাংলাদেশকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দিন, তখন দেখবো

২৭। শেখ নূরুল ইসলাম, *তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলন ঃ বর্তমান তৎপরতা ও তার নেপথ্য কাহিনী*, দৈনিক দিনকাল, ৪ ডিসেম্বর '৯৩ সংখ্যা

আমরা কি করতে পারি। সাবধানে কথা বলবেন। আমরা ৩ কোটি সংখ্যালঘু রয়েছি।'[২৮] ঐ অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে আরও একজন নেতা যা বলেছিলেন এ প্রসঙ্গে তা-ও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। সেই নেতার মতে, 'যদি আমরা জানতাম, বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে বিসমিল্লাহ বা রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করা হবে তাহলে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম না।'[২৯]

(গ) ১৯৯৪ সালে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান স্মৃতি সংসদ আয়োজিত এক সভায় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ সভাপতি মেজর জেনারেল সি আর দত্ত (অপসারিত) সকল মুক্তিযোদ্ধাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে 'আবার বাংলাদেশকে স্বাধীন করার' আহ্বান জানান।[৩০]

(ঘ) ১ জুন '৯৪ তারিখে খেলাঘর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মেজর জেনারেল সি আর দত্ত (অপসারিত) বলেন, 'এখন দেশে গৃহযুদ্ধ লাগতে পারে।'[৩১]

৮। বিজেপি'র সশস্ত্র গ্রুপের সহযোগিতায় বাংলাদেশে অস্ত্র প্রশিক্ষণের অভিযোগ

১৯৯৩ সালের শুরুর দিকে 'প্রণব মঠ' নামের একটি সংগঠনের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই ব্যাপক অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। ভারতের 'সেবাশ্রম সংঘের' বাংলাদেশ শাখা হিসেবে চিহ্নিত করে 'বাংলাদেশ মন্দির মিশন' হিন্দুত্ব বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানান। এব্যাপারে মন্দির মিশনের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৩ জানুয়ারি '৯৩ তারিখ সকাল ১০ টায়। ঢাকার রথখোলা মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় বাবু রতন কুমার সরকারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন হিরালাল, প্রেমরঞ্জন দেব ও উত্তম কুমার বসাক। সভায় প্রণব মঠের প্রদীপ ব্রক্ষচারী ও বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সংগ্রাম কমিটির মহাসচিব এডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর হিন্দুত্ব বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে ভারত সেবাশ্রম সংঘের বাংলাদেশ শাখা প্রণব মঠের প্রদীপ ব্রক্ষচারী এবং প্রণব মঠের গোপন সংযোগকারী এডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর সহিংস কার্যক্রম লক্ষ্য করছি। তারা এতদিন বিজেপির সশস্ত্র গ্রুপের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সংগোপনে দেশের বিভিন্ন স্থানে অস্ত্র প্রশিক্ষণ কাজ চালাতো। এখন ঢাকায় হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের ছত্রছায়ায় প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া প্রদর্শন করে টিন এজার হিন্দু যুবকদেরকে ভ্রান্ত সহিংস কাজে উৎসাহিত করছে এবং একটি রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রকাশ্যে সংযোগ স্থাপন করে হিন্দু সমাজের জ্ঞানবান নেতৃবর্গকে প্রাণনাশের জন্য নীলনকশা প্রণয়ন করছে। বিজেপির অনুসৃত সহিংস আন্দোলনের জন্য সংগঠনটির সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করে দেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রদীপ ব্রক্ষচারী ও সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর প্রতি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।' তারা প্রণব মঠের কার্যকলাপ অচিরেই বন্ধ করে 'উলফা-শান্তিবাহিনী-বঙ্গ সেনার' লিয়াজোঁকারী সন্ত্রাসী সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।[৩২]

২৮। দৈনিক ইনকিলাব, ২৩ জুলাই '৯৩

২৯। বাংলাবাজার পত্রিকা, ২৪ জুলাই '৯৩

৩০। দৈনিক দিনকাল, ০৬ এপ্রিল '৯৪ সংখ্যা

৩১। দৈনিক বাংলা-২ জুন '৯৪

৩২। দৈনিক দিনকাল ২৯-৩-৯৩

৯। মৌলবাদ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংক্রান্ত প্রাচারণা

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান ঘটেছে ও এর ফলে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে এমন প্রচারণা কম করা হয়নি। বরং এধরনের হাজারো উদাহরণ দেয়া যাবে। এমনি প্রচারণার উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ সালে একটি সাপ্তাহিকে সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। উক্ত রিপোর্টে 'বাংলাদেশে উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার একটি বেসরকারী উদ্যোগ' শীর্ষক বই থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হয়। ঐ উদ্ধৃতিতে একজন প্রাক্তন কূটনীতিকের বরাতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রায় সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘুই না-কি এখন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। প্রতিনিয়তই না-কি সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছে। আর এই আক্রমণের কারণেই না-কি হিন্দুদের দেশত্যাগের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। হিন্দুদের সঙ্গে বৌদ্ধ (চাকমা) এবং খ্রীষ্টানরাও না-কি আক্রান্ত হচ্ছে। তবে, তারা দেশত্যাগ করছে কি-না তা উল্লেখ করা হয়নি। উদ্ধৃতাংশের শেষ দুই বাক্য এই : 'মৌলবাদের উত্থানের ফলে উত্তরোত্তর মানুষের অধিকার লংঘিত হচ্ছে বলে আমরা উদ্বিগ্ন। এতে নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশী'[৩৩]।

১০। দুর্গাপূজা ইস্যু সৃষ্টি

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নেই ও সেজন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনও নিরাপদ নয় এ অজুহাতে একটি মহল ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এরা হিন্দুদের দুর্গাপূজা পালনে বাধা প্রদান করে। পাশাপাশি বাংলাদেশে পূজা হচ্ছে না একথা প্রচার করে দেয় বিশ্বব্যাপী। এদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সে সময় 'সাপ্তাহিক সুগন্ধা'র ৮ অক্টোবর '৯৩ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় বলা হয়– 'বাংলাদেশে এবার হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা নিয়ে রাজনৈতিক টালবাহানা শুরু হয়েছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গনে সম্মেলন করে তাদের ৩২ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রতিবাদ কর্মসূচী হিসেবে এ বছর আড়ম্বরতার সাথে দুর্গাপূজা না করে কেবলমাত্র ঘটপূজা করার আহ্বান জানিয়েছে। তাদের এ কর্মসূচীর প্রেক্ষাপট থেকেই আসন্ন দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক টালবাহানার সূত্রপাত। বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি কে বি রায় চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক স্বপন কুমার সাহা হলেও এ সংগঠনের নেপথ্য নেতৃবৃন্দ হলেন মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্ত, বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুধাংশু শেখর হালদার এমপি, ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ। এদের প্রত্যেকেরই ঘোষিত এবং অঘোষিত রাজনৈতিক অবস্থান রয়েছে। বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের অন্যতম সহযোগী সংগঠন হলো-বহুল আলোচিত মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্তের নেতৃত্বাধীন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ। আরো গভীরতায় গেলে এ দু'টি সংগঠনের পেছনে দেশের কয়েকটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সক্রিয় মদদ রয়েছে।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ আড়ম্বরতার সাথে দুর্গাপূজা না করার কেবল আহ্বান জানিয়েই বসে থাকেনি, তারা তাদের কর্মসূচীকে সফল করার জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ে নিজেদের সংগঠিত করেছে। ইতোমধ্যে পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ এবং গণফোরাম নেতৃবৃন্দসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের

৩৩। পর্যটক, *স্বদেশ-বিদেশ,* দৈনিক ইনকিলাব ১৭ জুলাই '৯৩ সংখ্যা

নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেছেন। এদিকে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের প্রতিটি কর্মকান্ড এবং এ সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা-বিবৃতির কথা ভারতের আকাশবাণী থেকে গুরুত্বসহকারে প্রচারও করা হচ্ছে।

এরইমধ্যে বেশ কয়েকটি হিন্দু সংগঠনের নেতা ভিন্ন ভিন্নভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। প্রেম রঞ্জন দেবের নেতৃত্বাধীন জাতীয় হিন্দু পরিষদ এক বিবৃতিতে এবার আড়ম্বরতার সাথে পূজা না করে ঘটপূজা করার আহ্বান জানিয়েছে। হিন্দু ঐক্যফ্রন্টের চেয়ারম্যান মণীন্দ্র নাথ সরকার ও হিন্দু কল্যাণ পরিষদের নেতা নকুল চন্দ্র সাহা, সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী পূজা কামিটির নেতা রানা দেওয়ানজী, চট্টগ্রাম জাতীয় হিন্দু পরিষদ নেতা দীবেশ চৌধুরী, ফরিদপুর পূজা উদ্‌যাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ কেবলমাত্র ঘটপূজা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

পক্ষান্তরে ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেনন এমপি, বাংলাদেশ তফসিল জাতি ফেডারেশনের সভাপতি সুধীর চন্দ্র সরকার প্রমুখ বাংলার শাশ্বতকালের অন্যতম হিন্দু ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা যথাযথ উৎসাহ উদ্দীপনা ও আড়ম্বরতার সাথে উদ্‌যাপনের আহ্বান জানিয়েছেন'।

জাপানী পুঁজি বিনিয়োগ ও হরতাল-ধর্মঘট যোগসূত্র

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সবচেয়ে বেশী জোর দেয় অর্থনৈতিক খাতে। এতে একদিকে যেমন তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যান, ভেঙ্গে ফেলেন দীর্ঘদিন যাবত চলে আসা রাজনৈতিক সংস্কারের অচলায়তন তেমনি বেগম জিয়াও তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন মূলত 'অর্থনৈতিক কূটনীতির' লক্ষ্যে। এক্ষেত্রে, বিএনপি সরকার হাজারো জটিলতা, সমালোচনার মধ্যেও অর্থনৈতিক সাফল্যের পথে এগিয়ে যায়। বিশেষ করে লোকসানী সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বেসরকারিকরণ, গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরদার করা, খনিজ সম্পদ আহরণের চেষ্টা, ভ্যাট প্রথা প্রবর্তন ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে বিএনপি সরকারকে পাইওনিয়ার বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শুধু বিএনপি'র নাম বলার অর্থ এই নয় যে বাকী সব রাজনৈতিক দল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাঁধা স্বরূপ। বরং বলা যায়-গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকার পাশাপাশি আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক থাকলে যে কোন সরকারের আমলেই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক খাতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাতে পারে। এবং এজন্যই এই সম্ভাবনাময় দেশটিতে যাতে কোন সরকারই সুস্থিরভাবে অর্থনীতির দিকে নজর দিতে না পারে ও যাতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীরাও এদেশে পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন সেজন্য 'র'-বরাবরই বিভিন্ন কৌশলে হরতাল, ধর্মঘট, নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড, শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদির আড়ালে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এবং সম্ভবত কখনোই বাংলাদেশ এই রাহু থেকে মুক্তি পাবে না।

এদিকে, বেগম খালেদা জিয়া সূচিত অর্থনৈতিক কর্মসূচী কিভাবে সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাচ্ছিল সে সম্পর্কে দু'য়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে ১৯৯৩ সালে একটি দৈনিক পত্রিকায় কলামিস্ট অনু রহমান উল্লেখ করেন, "বেগম জিয়া যে অর্থনৈতিক কূটনীতির সূচনা করেন, তাতে বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য দাতা দেশগুলোর সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বেগম জিয়ার

নেতৃত্বে দেশে যে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী চালু রয়েছে বিশ্বব্যাংক তার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে। ..... ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংক প্রধান মি. ক্রিস্টোকার উইলোবি গত ৫ এপ্রিল (১৯৯৩) ঢাকায় বলেছিলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ম্যাক্রো ও মাইক্রো উভয় পর্যায়েই অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের নেয়া অর্থনৈতিক সংস্কার ভালভাবে চলছে ও অতীতের তুলনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীও ভালভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ..." ৩৪

অর্থনৈতিক কূটনীতির এই ধারাবাহিকতায় তদানীন্তন বিএনপি সরকার বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগে যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে তারই এক পর্যায়ে বেগম জিয়া জাপান সফরে যান-জাপানী পুঁজি আকর্ষণের লক্ষ্যে। ১৯৯৪ সালের ২৮ শে মার্চ বেগম জিয়ার এই জাপান সফরের ফলাফল ও বাংলাদেশে সম্ভাব্য জাপানী পুঁজি বিনিয়োগ নিয়ে সেসময় অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। ধারণা করা হয়েছিল বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনায় বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ খুঁজে পাবেন পুঁজি বিনেয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ। এ ব্যাপারে সে সময় একটি জাতীয় দৈনিকে বলা হয় "প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জাপান সফরের পর জাপানের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। জাপানে উচ্চ উৎপাদন ব্যয়ের জন্য যেসব ভোগ্যপণ্য শিল্প এখন আর লাভজনক নয়, সেসব শিল্প বাংলাদেশে স্থানান্তরের চেষ্টা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুবিধাগুলি জাপানের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত বিশিষ্ট শিল্পপতি এম মোরশেদ খান পত্রিকান্তরে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো, বাংলাদেশ ও জাপান দ্বিপক্ষীয়ভাবে 'বিনিয়োগ গ্যারান্টি চুক্তি'র জন্য আলোচনা শুরু করতে সক্ষম হয়েছে। ..... এ চুক্তি চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষর হলে যেকোন জাপানী বিনিয়োগকারী এখানে বিনিয়োগ করে কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে জাপান সরকার ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেবে। ভারত ও পাকিস্তান জাপানের সঙ্গে এ চুক্তির জন্য ভীষণ চেষ্টা তদ্বির করেছে। কিন্তু আমরা যতোটা এগিয়েছি, ততটা তারা পারেনি। .... এছাড়াও জাপানের বহু শিল্পপতি মনে করেন, দক্ষিণ এশিয়ায় বাণিজ্য সম্প্রসারণে উৎপাদন স্থান হিসাবে বাংলাদেশ আদর্শ জায়গা। ...... বাংলাদেশে জাপানী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সম্ভব হলে এবং বর্তমান বিনিয়োগ পরিবেশ ধরে রাখা গেলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ হবে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী একটি দেশ। এজন্যও দরকার শান্তি, স্থিতি ও গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা। ..." ৩৫

কিন্তু কোন এক অদৃশ্য সুতোর টানে ঠিক তখন থেকেই বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটির পর একটি 'অদ্ভুত' ঘটনা ঘটতে থাকে। উল্লেখ্য, বেগম জিয়ার জাপান সফরের মাত্র মাস তিনেকের মাথায় ১১ জুন '৯৪ তারিখে জাপানের ৪০ সদস্য বিশিস্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে আসেন পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে। কিন্তু ঠিক একই দিন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি' জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে ও ১৪ জুন '৯৪ তারিখে হরতালের ঘোষণা দেয়।

৩৪। অনু রহমান, *বিএনপি সরকারের তিন বছরঃ বৈদেশিক নীতিতে সাফল্য,* দৈনিক দিনকাল, ১১ চৈত্র ১৪০০ বাংলা

৩৫। রেজোয়ান সিদ্দিকী, *সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্য কী?* দৈনিক বাংলা ১৩/৪/৯০ সংখ্যা

হরতাল, ধর্মঘট আহ্বান নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক অধিকার এবং আপাত দৃষ্টিতে সবাই মনে করতে পারেন শিক্ষক সমাজ রাজনীতির বাইরে তাই সেটা নিতান্তই নিরীহ প্রকৃতির হরতাল। কিন্তু প্রশ্ন হলো কে বা কারা 'শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি'কে ঠিক ঐদিন থেকে কর্মসূচী পালন করতে উস্কে দিল যেদিন থেকে জাপানী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের ঢাকায় আসার কথা। যদি এখানে কোন 'কিন্তু' নাই থাকতো তাহলে তো শিক্ষক সমাজ জাপানী বিনিয়োগকারীরা ফিরে যাবার পরও আন্দোলনে নামতে পারতেন। অথচ, তারা শুধু হরতালই আহবান করেননি বরং তাদের ব্যানারে (হতে পারে) ভিন্ন কেউ যারা শিক্ষকের ছদ্মবেশে মিছিলে অনুপ্রবেশ করে সেদিন অর্থাৎ ১৪-৬-৯৪ তারিখে সোনারগাঁ হোটেলের চারপাশে বোমা, ককটেল ফাটিয়ে এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সোনারগাঁ হোটেলে তিনদিন প্রায় আটক অবস্থায় অবস্থানরত জাপানী বিনিয়োগকারীরা এসব ঘটনায় ভড়কে যান ও পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব দেখিয়ে ফিরে যান বিশৃংখল এক বাংলাদেশ থেকে। জাপানীরা এদেশের ব্যাপারে সঙ্গতকারণেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। প্রশ্ন হলো ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা না হলে কেন সময় বেছে নিয়ে ধর্মঘট, হরতাল উস্কে দেয়া হয়েছিল? আর কেনইবা সোনারগাঁ হোটেলের চারপাশে সৃষ্টি করা হয়েছিল তান্ডবলীলা? পরবর্তিতে দেখা যায় বাংলাদেশে যেসব খাতে জাপানীরা পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছিল ঠিক সেসব খাতেই ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করেন জাপানী ব্যবসায়ীরা। বলা চলে ভারতীয়রাই জাপানীদের 'দিক পরিবর্তন' করে সাফল্যের সাথে।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন বিএনপি সরকারের পতন ঘটাতে বিপুল অস্ত্র আমদানীর ষড়যন্ত্র

বিএনপি সরকারের পতন ঘটাতে যে ব্যাপক বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল তা আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক আন্দোলন হলেও এর আড়ালে 'র' বরাবরই ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে তৎপর থেকেছে। সে সময় বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য সরাসরি 'র'-কে অভিযুক্ত না করলেও একটি সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত খবরে জানানো হয় যে, 'বিএনপি সরকারের পতন ঘটাতে গত মার্চে আড়াই কোটি টাকার বেআইনী অস্ত্র কেনা হয়েছিল।' ১৮ মে '৯৬ সংখ্যা দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত উক্ত রিপোর্টে বলা হয়, "গত মার্চে বেআইনীভাবে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র কেনা ও পাঠানোর চুক্তি হয়েছিল। এ অস্ত্র কেনা হয়েছিল রাশিয়ার মস্কো থেকে। কেনার সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীটি হচ্ছে নিউইয়র্কে, স্ব-নির্বাসিত এক বাংলাদেশী সাবেক কূটনীতিকের এবং যুক্তরাষ্ট্রের টরেন্টোয় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী জনৈক বাংলাদেশীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

চাঞ্চল্যকর এই খবরটি মর্যাদাশীল ইংরেজি সাপ্তাহিক 'হলিডে'তে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে অস্ত্র আনয়নকারীদের নাম-ধাম সরাসরি প্রকাশ না করা হলেও, পর্যবেক্ষকদের ধারণা, অস্ত্র আনার উদ্দেশ্য ছিল বিগত খালেদা জিয়ার সরকারের শাসনামলকে আরও অস্থির করে তোলা ও বিশেষ লক্ষ্য অর্জন করা। খালেদা সরকারের শেষ ৫টি মাস ছিল বিরোধী তিন দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রবল বিরোধিতাপূর্ণ যখন লাগাতার হরতাল-অবরোধ-অসহযোগ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিরোধিরা ব্যাপক সশস্ত্র সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়েছিল। কার্যত, এই অস্ত্র পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল বিরোধীদের শক্তিকে জোরদার করার জন্যই।

অস্ত্র কেনার সঙ্গে যুক্তদের একজনের বিবেকের পীড়নে'র কারণে সমস্ত বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তবে হলিডে'র প্রতিবেদনে সে সূত্রটির পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি, যদিও বলা হয়েছে, অস্ত্র ব্যবসায়ী চক্রটির সঙ্গে সূত্রটির বিচ্ছিন্নতার অপরাধে বাংলাদেশে তার আত্মীয়-স্বজনকে প্রাণনাশেরও হুমকি দেয়া হচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে লেন-দেনের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কারণে অস্ত্রের চালানটি বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছিল কিনা সূত্রটি তা জানাতে পারেনি। তবে অস্ত্রের চালানটি অতি গোপনে জাহাজে করে বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য চুক্তি হয়েছিল এবং আড়াই লাখ ডলার অর্থাৎ এক কোটি টাকা পরিশোধও করা হয়েছিল।

অস্ত্রের চালানের সঙ্গে ছিল ২৫টি এসএমজি, ১১টি রকেট লাঞ্চার, ২৯টি সেল্ফ লোডেড রাইফেল, ১৫৫টি গ্রেনেড, ১০০টি রাইফেল, বিভিন্ন ক্যালিবারের পিস্তল এবং উপরোক্ত অস্ত্রগুলোর গুলি। হলিডে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অস্ত্রের প্যাকেজ ও সময় বাছাই থেকে চিত্র পাওয়া যায় যে, একটি সুনির্দিষ্ট অপারেশন পরিচালনার জন্য এগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাস্তিল দুর্গের মতো অবস্থানকে ঝটিকা গতিতে পতন ঘটানোর জন্য এ অস্ত্র ছিল যথেষ্ট।"

২০ মে '৯৬-এর ক্যুদেতা'র পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্তে ভারতীয় সেনা সমাবেশ

২০ মে '৯৬ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তদানীন্তন প্রধান লে. জেনারেল আবু সালেহ মো. নাসিম সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটনে পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী বিদ্রোহী তৎপরতা শুরু করেন। সে সময় কি কারণে, কাদের ইঙ্গিতে সংসদ নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে লে. জে. নাসিম এ ধরনের হঠকারিতার আশ্রয় নিয়েছিলেন তা বোঝার জন্য প্রত্যক্ষ তথ্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণেই এক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে যায় কারা এই ঘটনা ও এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকে লাভবান হতে চেয়েছিল।

যাহোক, ২০ মে '৯৬ তারিখে যখন বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছিল লে. জে. নাসিমের ছক মতো ঠিক তখনি সীমান্ত এলাকায় ভারত তার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে আশঙ্কাজনকহারে। এ ব্যাপারে ২৩ মে '৯৬ তারিখের (বৃহস্পতিবার) দৈনিক দিনকাল পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করা যায়। 'প্রেক্ষিত বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ ভারতীয় বাহিনীর ১০ লাখ সৈন্য সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায়' শিরোনামের এক প্রতিবেদনে প্রতিবেদক নুরুল হাসান খান উল্লেখ করেন, "হাজারে হাজারে বাংলাদেশী সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করতে পারে– এই আশংকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের ১০ লাখেরও বেশি সদস্যকে গত সোমবার থেকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানীতে ট্যাংক মোতায়েন ও বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন ভারত এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

হংকং থেকে প্রকাশিত 'সাউথ চায়না পোস্ট' পত্রিকায় গত মঙ্গলবারের প্রকাশিত সংবাদ ও ঐদিন আকাশবাণীতে প্রচারিত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর বক্তব্য থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সেনাবাহিনীর শৃংখলা বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে, সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস গত সোমবার বরখাস্ত করেন। এর সাথে সাথেই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় রাখা এবং হাজারে

হাজারে বাংলাদেশীর ভারতে প্রবেশের আশংকা প্রকাশকে রাজনৈতিক মহল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন।

পদচ্যুত সেনাবাহিনী প্রধানকে যথাযথ নিয়মে বরখাস্ত করার পরও তিনি দীর্ঘ সময় সেনাবাহিনীর প্রধানের কার্যালয়ে অবৈধভাবে অবস্থান করেন। বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে ঔদ্ধত্যপূর্ণ সাক্ষাৎকার দেন এবং সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার সেনানিবাসে অবস্থান এবং অনুগত সৈন্যদের ঢাকা অভিমুখে আসার নির্দেশ দেন। একই সময়ে পার্শ্ববর্তী বৃহৎ দেশের বিপুল সেনা সদস্য, আধা সামরিক বাহিনীকে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়। রাজনৈতিক মহল মনে করছেন, প্রেসিডেন্ট যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে এবং সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যরা কার্যকর ব্যবস্থা নিতে না পারলে পরিস্থিতি একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার পরিকল্পিত ব্লু প্রিন্ট অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারতো। যা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকেই হুমকির সম্মুখীন করে দিতে পারতো।

সাউথ চায়না পোস্ট পত্রিকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, 'বাংলাদেশের রাজধানীর রাস্তায় ট্যাংক 'মুভ' করেছে। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি।'

রিপোর্টে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের সাথে সীমান্তবর্তী আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, পশ্চিম বাংলা ও মনিপুরে নিয়োজিত হাজার হাজার আধা সামরিক বাহিনীর সীমান্ত রক্ষী 'বিএসএফকে'ও উচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। সামরিক মুখপাত্র বলেন, পরিস্থিতি এখনো সুস্পষ্ট নয়। তবে বাংলাদেশের সামরিক বৈরিতা শুরু হলে হাজারে হাজারে বাংলাদেশী সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করতে পারে।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও আহমেদাবাদে এক জনসভায় ভাষণ দেবার সময় বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং আসামের হিংসাত্মক ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ পরিস্থিতিতে তিনি সকলকে সতর্ক থাকার আহবান জানান। গত মঙ্গলবার আকাশবাণীর খবরে এই আহবানের কথা প্রচারিত হয়।

রাজনৈতিক সূত্রটি মনে করেন, ইতিপূর্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বরখাস্তকৃত দু'জন সামরিক কর্মকর্তার কর্মকান্ড, কিছু কিছু বেসামরিক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার প্রকাশ্যে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের মঞ্চে বক্তব্য প্রদান, ৬ষ্ঠ সংসদে পাস করা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে বিএনপি'র ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ঐ মহলটির আসন্ন নির্বাচনে একটি বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সংকটপূর্ণ করে রাখা এবং সর্বশেষ সামরিক বাহিনীতে সংগঠিত ঘটনাবলীর পেছনে ঐ বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকা রয়েছে। মহলটি বলছেন, আওয়ামী শাসনামলে ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত ২৫ বছর মেয়াদী গোলামি চুক্তির শেষ বছরে একটি সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠিত এসব ঘটনা দেশকে অস্থিতিশীল করার বৃহৎ পরিকল্পনারই অংশ।

টাকা দেবে 'র' আওয়ামী লীগের টার্গেট ২০০ আসন

১৯৯৬ সালের টালমাটাল দিনগুলোর শেষ পর্যায়ে 'র' কিভাবে তৎপরতা চালিয়েছিল সে সম্পর্কে সাপ্তাহিক সুগন্ধায় [৩৬] প্রকাশিত উপরোক্ত শিরোনামের রিপোর্টে বলা হয়ঃ

বাজারে জোর রটনা, বাংলাদেশের নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' তৎপর হয়ে উঠেছে। আসন্ন নির্বাচনে ভারত আওয়ামী লীগকে ৩০০ কোটি টাকা

৩৬। সাপ্তাহিক সুগন্ধা, ২৬-৪-১৯৯৬ সংখ্যা

দেবে। তবে '৭১ ও '৭৫-র খুনী'রা বাদে পুরোনো সকল আওয়ামী লীগারকে এক মঞ্চে নিয়ে আসার শর্ত রয়েছে। ভারত চায় আওয়ামী লীগ তাদের শর্ত পূরণ করুক এবং আগামীতে ক্ষমতায় আসুক। আওয়ামী লীগও শর্ত পূরণে রাজি। সে লক্ষ্যেই তারা বিভিন্ন দলে অবস্থানরত পুরোনো আওয়ামী লীগারদের সাথে যোগাযোগ করছে। আসন্ন নির্বাচনে তাদের টার্গেট কমপক্ষে ২০০ আসনে জয়লাভ করা। সেভাবেই মনোনয়নদানের প্রস্তুতি চলছে। এদিকে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার মি. দেব মুখার্জি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং পুরোনো আওয়ামী লীগার জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরীর সাথে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাত করেছেন। রাজশাহীতে দু'জন 'র'-এর এজেন্টও ধরা পড়েছে।

আওয়ামী লীগ ভারতের শর্ত অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কমপক্ষে ২০০ আসনে জয়লাভের টার্গেট নিয়ে তারা কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন দলে অবস্থানরত পুরোনো আওয়ামী লীগারদের সাথে তারা যোগাযোগ করছে। সূত্র জানায়, জাতীয় পার্টির মিজানুর রহমান চৌধুরী, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, মনিরুল হক চৌধুরী, শেখ শহিদুল ইসলামসহ পুরোনো আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কথা বলেছেন। এসব নেতাদের শীগগিরই আওয়ামী লীগে ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্র জানায়।

আওয়ামী লীগ নেতারা গণফোরাম নেতা ডঃ কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এবং মোস্তফা মোহসিন মন্টুর সাথেও কথা বলেছেন। ব্যারিস্টার আমিরুল ইতিমধ্যেই গণফোরোমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন। তিনি শ্লোগানও দিতে শুরু করেছেন 'জয় বাংলা, জয় হাসিনা'। ডঃ কামাল গত মুজিবনগর দিবসে মেহেরপুরে জোহ্রা তাজউদ্দিনের মঞ্চে বক্তব্য রেখে আওয়ামী লীগে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মোস্তফা মহসিন মন্টুও পুরোনো দলে ফিরতে প্রস্তুত, তিনি শুধু পরিবেশের অপেক্ষায় আছেন।

সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ এবার ২০০টি আসন বন্টন করবে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে। বাকি ১০০টি আসন শিল্পপতি, পত্রিকার মালিক-সম্পাদক এবং সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে বন্টন করবে। নাট্যাভিনেতা আসাদুজ্জামান নূরকে তারা মনোনয়ন দেবার কথা ভাবছে। এছাড়াও দৈনিক সংবাদের সম্পাদক আহমেদুল কবীর, ভোরের কাগজের মালিক সাবের হোসেন চৌধুরী এবং আজকের কাগজের সম্পাদক শাহেদ আহমেদকে আওয়ামী লীগ মনোনয়ন দেবে বলে জানা গেছে। জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকেও আওয়ামী লীগ মনোনয়ন দিয়ে দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করছে। এ সব কিছু পরিকল্পনারই মূলে রয়েছে আগামী নির্বাচনে কমপক্ষে ২০০ আসনে জয়লাভ করার টার্গেট।

ভারতের শর্ত

আগামীতে ভারত আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় দেখতে চায়। তারা মনে করে গত ৫ বছরে বিএনপি'র কাছ থেকে যে সুবিধা আদায় করা গেছে, এরচেয়ে খুব বেশি আর বিএনপি'র কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন আওয়ামী লীগকে।

'সাপটা' চুক্তির পর অবাধ বাণিজ্যে ভারতের আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ২৫ বছরের চুক্তি নবায়নেরও তাদের আর প্রয়োজন হবে না। তবে তারা বাংলাদেশের উপর দিয়ে 'রেললাইন ট্রানজিট' সুবিধা চায়। ভারত মনে করে এটা আওয়ামী লীগের কাছ থেকেই আদায় করা সুবিধা হবে। এসব সুবিধা আদায়ের জন্য এবং আওয়ামী লীগকে জয়ী করার জন্য ভারত নির্বাচনী খরচ হিসেবে আওয়ামী লীগকে ৩০০ কোটি টাকা দেবে। কিন্তু আওয়ামী লীগকে ভারতের শর্ত পূরণ করতে হবে। '৭১-এ যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে এবং '৭৫-এ যারা শেখ মুজিবকে হত্যা করেছে, তাদের বাদ দিয়ে নির্বাচনী ঐক্য গড়তে হবে। পুরোনো আওয়ামী লীগার যারা বিভিন্ন দলে অবস্থান করছে, তাদের দলে ফিরিয়ে এনে এক সাথে নির্বাচন করতে হবে। আওয়ামী লীগ এ শর্ত পূরণের লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

হাসিনা-মিজানের সাথে দেব মুখার্জি

ভারতীয় হাই কমিশনার মি. দেব মুখার্জি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরীর সাথে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠক করেছেন। গত ১৮ এপ্রিল মিজান চৌধুরী এবং ১৯ এপ্রিল শেখ হাসিনার সাথে তিনি দেখা করেন। দেব মুখার্জি সম্পর্কে সবারই জানা আছে। তিনি একজন বিচক্ষণ কূটনীতিক। সহজ সরল বিষয় নিয়ে তিনি কারো সাথে কথা বলেন না। দেব মুখার্জির আলোচনার বিষয়বস্তু জানা সম্ভব হয়নি সত্যি। কিন্তু তিনি যে বর্তমান রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তাতে কারো সন্দেহ নেই।

'র' তৎপর

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বাংলাদেশে তৎপর রয়েছে। তারা আওয়ামী লীগের উপর আরোপ করা শর্ত পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনামাফিক কাজ করে যাচ্ছে। একইসাথে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা যাতে সফল হয় সে লক্ষ্যে 'র' কাজ করছে। পুরোনো আওয়ামী লীগাররা যাতে আওয়ামী লীগে আবার ফিরে আসে, সেই মানসিকতা তৈরীর টেকনিক্যাল কাজগুলো 'র' করছে। আর নির্বাচনী খরচ হিসেবে যে ৩০০ কোটি টাকা ভারত আওয়ামী লীগকে দেবে, সে টাকাটাও আসবে 'র'-এর মাধ্যমেই। ইতিমধ্যেই রাজশাহীতে দু'জন 'র'-এর এজেন্ট ধরা পড়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

অধ্যায়-৯
প্রামাণ্য তথ্যের আলোকে
বাংলাদেশে ‘র’ তৎপরতার ভয়াল চিত্র

[এই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ প্রতিবেদনগুলো ২০০০ সালের ডিসেম্বর ও ২০০১ সালের জানুয়ারী মাসে ধারাবাহিকভাবে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়েছে।]

প্রচারণা, পত্র-পত্রিকা, রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে উপস্থাপন করছে ভুল তথ্য ॥ উদ্দেশ্য জনমত ভারতের অনুকূলে নেয়া

পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ থেকে। এর প্রশাসন বাংলাদেশের। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রত্রিকাটির সংবাদ পরিবেশনে সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ্ সংশয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এতে অনেক ক্ষেত্রে এমনসব খবরাখবর ছাপা হয় যা দেখে যে কারেই মনে হবে পত্রিকাটি প্রতিবেশী ভারতের স্বার্থরক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, ভারত যা বলতে চায় সে কথাটিই যেন বলছে ঐ পত্রিকাটি। অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, যেহেতু ভারতের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ঢাকা মহানগরীতে ভারতীয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের শাখা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় তাই এদেশীয় তল্পীবাহকদের দিয়ে তারা সৃষ্টি করেছে একটি শক্তিশালী ‘মাউথপিস’। এই পত্রিকায় আবার একজন সাংবাদিক আছেন যিনি তার লেখনী, মতাদর্শে যতোটা না বাংলাদেশী তার চেয়ে বেশী ভারতের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত। ইনি প্রায়শই এমন সব ইস্যু সৃষ্টি করেন যা দেখে রীতিমত হতবাক হতে হয়। বিশেষ করে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তিনি অনেকটা ফ্রি হ্যান্ড পেয়ে যান। এখন কোন কোন এজেন্সী তাকে সন্দেহের চোখে দেখলেও তিনি যে প্রতিবেশী দেশের গুপ্তচর সংস্থার পক্ষে কাজ করেন তা এখন কোন এজেন্সীর পক্ষ থেকে সরকারের কাছে পেশ করা হয় না। যদিও আগে করা হতো এখন বরং উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশ না মানতে তিনি বিভিন্ন গোপনীয় তথ্যসূত্রে ঢু মারেন অহরহ। ভারত তার সরকারী ও বেসরকারী প্রচারণায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করে ঠিক সেসব অভিযোগের সত্যতা প্রমাণেই ওই সাংবাদিক মহাশয়কে জ্বালাময়ী সব রিপোর্ট করতে দেখা যায়। এদেশে পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ঘাঁটি গেড়ে বসেছে, প্রশিক্ষণ শিবির খুলে ট্রেনিং দিচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতাকামী গেরিলাদের বা ‘মৌলবাদী তালেবানী’ চক্রান্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন-এ ধরনের বহু প্রতিবেদন নামে-বেনামে প্রকাশিত হয়েছে তার। এছাড়া চট্টগ্রামের নূরুল আবছারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে রিপোর্ট প্রকাশ, কবি শামসুর রাহমান হত্যাকাণ্ডে তালেবান কানেকশন আবিস্কার ইদ্যাদি প্রসঙ্গেও তার সংশ্লিষ্ট থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতি সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাবের বিরুদ্ধে ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টও নাকি সেই বিশেষ সাংবাদিকের তৈরী এমন কথাও শোনা গেছে বিভিন্ন সূত্র থেকে। ‘র’-এর বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা নিয়ে এত লেখালেখি কেন-এ নিয়েও তিনি ‘মারাত্মক চিন্তিত’ হয়ে বহু জায়গায় ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত কাৎরিয়ে বেড়িয়েছেন, এ তথ্যও জানা গেছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র থেকে। এভাবে শুধু যে একজন সাংবাদিকই ওই বিশেষ

পত্রিকায় এ ধরনের প্রচারণা চালিয়েছেন তা নয়। বরং ওই পত্রিকার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট 'প্রগতিশীল সাংবাদিক'ও ভারতের স্বার্থরক্ষায় ১৯৯৯ সালে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন স্বনামে। 'ঘাদানি'র জন্মলগ্ন থেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এই সাংবাদিকের তৈরী করা এই প্রতিবেদনগুলো ছিল গত বছর সৃষ্ট কারগিল সংকট নিয়ে। পাশাপাশী কাশ্মীর যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পাকিস্তান প্রভাবিত 'মৌলবাদী চক্রান্তকারীগণ' সেখানে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে এ যুক্তির পক্ষেও ওই সাংবাদিক মহোদয় তার রিপোর্টে বিস্তার 'তথ্য প্রমাণ' উপস্থাপন করেন। ঢাকাতে বসে বা লোকমুখে শুনে যে তিনি এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন তা কিন্তু নয়। বরং এজন্য তাকে কাশ্মীর ও কারগিল এলাকা সফর করতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে একটি গোয়েন্দা সূত্র থেকে জানা যায়, কারগিল এলাকায় যখন কাশ্মীরী মুজাহিদরা ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে ব্যস্ত তখন বাংলাদেশের জনমত স্বভাবতই নির্যাতিত কাশ্মীরীদের পক্ষেই ছিল। কিন্তু ভারতীয় নীতি-নির্ধারকগণ সেটা সুনজরে দেখেননি। এ নিয়ে তারা যারপরনাই চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাই সে সময় ঢাকাস্থ 'র' চ্যালেন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ওই সাংবাদিকের সাথে যোগাযোগ করা হয়। জানা যায়, ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরত একজন মহিলা কর্মকর্তা যিনি কুটনীতিবিদের ছদ্মবেশে মূলত একজন 'র' অপারেটিভ, তিনি ওই সাংবাদিককে তরিঘড়ি ভিসা, বিমান টিকেটসহ যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেন। এছাড়া ভারতে গিয়ে কোথায়, কোনদিন, কোন হোটেলে তিনি থাকবেন, কার সাথে দেখা করবেন, কার কার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন এসবও অ্যারেঞ্জ করে দেয়া হয় ঢাকা থেকে। দেখা গেল, ওই সাংবাদিক কাশ্মীরের সব শীর্ষ পর্যায়ের রাজনীতিকসহ স্থানীয় সেনা কমান্ডার এমনকি ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধানের সাথে দেখা করে ফিরে এলেন বাংলাদেশে। এরপর সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় ছাপা হলো একটির পর একটি সরেজমিন প্রতিবেদন। বাংলাদেশে ঐ পত্রিকার পাঠক শ্রেণীর এক অংশ জানতে পারল কাশ্মীরী স্বাধীনতাকামী সবাই 'মৌলবাদী' 'সন্ত্রাসী' পাকিস্তানের স্পর্শই। পক্ষান্তরে ভারতীয় সরকার ওখানে একটি উদার, গণতান্ত্রিক পরিবেশ রচনায় তৎপর অবশ্য গোয়েন্দা বিশ্লেষকদের মতে, এগুলো নতুন কোন বিষয় নয়। বরং এ সবই গুপ্তচরবৃত্তির চিরাচরিত কৌশলমাত্র। এ ব্যাপারে বিশ্লেষকগণ 'র'-এর অন্যতম একটি 'কর্ম পদ্ধতি'র উল্লেখ করে বলেছেন, 'র'-এর কৌশলের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকা, গুজব, পঞ্চম বাহিনীভুক্ত রাজনৈতিক দলের সভা-সমিতি, আন্দোলনের মাধ্যমে 'ভুল তথ্য উপস্থাপন'-যার উদ্দেশ্য হচ্ছে টার্গেট-দেশের জনগণকে ভুল পথে পরিচালিত করা, জনগণকে হতবুদ্ধি, বিশৃঙ্খল বা প্রজ্জ্বলিত করা। এ ব্যাপারে ভারতীয় একজন গোয়েন্দা বিশ্লেষক অশোক রায়না আরো বলেন যে, সোজা কথায় এর অর্থ হচ্ছে প্রবঞ্চনা বা চাতুরির আশ্রয়ে কার্যসিদ্ধি করা। এক্ষেত্রে শত্রুদের মধ্যে ভুল তথ্যের অনুপ্রবেশ করানো হয় যার ফলশ্রুতিতে সে দেশের স্বার্থহানি ঘটে থাকে-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে টার্গেট দেশের জনগণকে নিজ দেশের ইচ্ছানুযায়ী কোন বিশেষ কিছুতে বিশ্বাস করানো। ওই বিশ্লেষকের মতে, "এ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ভুল গোয়েন্দা রিপোর্ট সংবাদ মাধ্যমে, কূটনৈতিক চ্যানেল অথবা রানীতিবিদ, সাংবাদিক ও অন্যান্য পেশাজীবীদের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করানো হয়, যাদের মতামত ভুল তথ্য

পরিবেশনের সূত্র ধরে নিজ দেশের ইচ্ছেনুযায়ী পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করার মত প্রভাব বিস্তারকারী। এভাবে ভুল তথ্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে 'র' বরাবরই তৎপর, যা এদেশের সহজ-সরল জনগণ প্রাথমিক স্তরে অনুধাবন করতে পারে না, কিন্তু যখন বুঝতে পারে ততদিনে যা ঘটার তার 'সবকিছু ঘটে গেছে'। অবশ্য একটি ঘটনা ঘটিয়েই 'র' চুপচাপ বসে থাকে না। বরং এ ধরনের প্রচারণা তারা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যায় পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশে কোন সশস্ত্র বাহিনী বা গোয়েন্দা সংস্থার প্রয়োজন নেই- এমন প্রচারণা ভারত থেকে যেমন অব্যাহতভাবে চালানো হয়, তেমনি বাংলাদেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, কলামিস্ট, সংবাদপত্রও প্রচারণা চালায় একই সুরে। জনমতকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে এরা এমনভাবে এসব কথা বলেন যা মূলত 'র'-এর তৈরী করা, কিন্তু প্রকাশিত হয় এদেশ থেকে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ১২ জুন '৯৬ সংখ্যা 'দি ডেইলী স্টার'-এ প্রকাশিত জনাব এএমএ মুহিত লিখিত একটি নিবন্ধের উল্লেখ করা যায়। 'A Menu for Action: Expectations from the new Government.' শিরোনামের ওই নিবন্ধে এরশাদ সরকারের এককালীন অর্থমন্ত্রী জনাব মুহিত প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর অর্থাৎ ডিজিএফআই বিলুপ্ত করে দেয়ার কথা উল্লেখ করেন। শুধু তাই নয়, এ জাতীয় নতুন কোন সংস্থাও কাম্য নয় বলে তিনি জানান। এছাড়া চিরাচরিতভাবে প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ঠিক একইভাবে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতা অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেল কাজী নূরুজ্জামানের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ১২ আগস্ট সংখ্যা দৈনিক জনকণ্ঠে। এখানেও তিনি ডিজিএফআই-এর কর্মকান্ড নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন জোরালোভাবে।

এভাবে গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার লক্ষ্যে এদেশে চলছে অব্যাহত প্রচারনা যার কোন বিরতি নেই বলেই মনে হয়। এ জন্যই দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক যিনি পূর্বোল্লেখিত পত্রিকায় প্রায়শই কলাম লিখে থাকেন, তিনি বিরামহীনভাবে সেনাবাহিনীবিরোধী প্রচালনা চালিয়ে আসছেন। 'ম' আদ্যাক্ষরের এই স্বঘোষিত 'প্রগতিশীল অধ্যাপক' এ ব্যাপারে এতটাই গতিসম্পন্ন যে, পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের শাসনামলে তিনি প্রকাশ্যে জয়ন্ত নামের একজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞের সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। এতে তারা উভয়েই মন্তব্য করেছিলেন, বাংলাদেশে কোন সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই। সশস্ত্র বাহিনীবিরোধী প্রচারনা বাংলাদেশের জনগণকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে তা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ না হলেও চলে। এক্ষেত্রে 'র' জনমত প্রভাবিতকরণে কতটুকু সফল হয়েছে সেটা (হয়ত) মারাত্মক পর্যায়ের না হলেও তা যে অ্যালার্মিং তা প্রায় নিশ্চিত। **(দৈনিক ইনকিলাব, ২৯/১১/২০০০)**

১৯৯৫-৯৬ সালে বিএনপি সরকার পতনের আন্দোলনে 'র'-এর বিশেষ প্রশিক্ষিত সদস্যরা নাশকতামূলক তৎপরতা চালায়

বাংলাদেশে ভারত কোন দলকে ক্ষমতায় দেখতে চায় এবং কিভাবে তাদের ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য দীর্ঘ ২১ বছর তৎপরতা চালিয়েছে তারা, সেটা অংকের সূত্র না হলেও

বোধের অগম্য নয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশী কোন বিশ্লেষকের মন্তব্য উল্লেখ না করে ভারতীয় সূত্রের উদ্ধৃতি দেয়াই যথেষ্ট। উল্লেখ্য ১৯৮১ সালের ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হওয়ার পর ভারত বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় কাদের আনতে চাইছিল সে রহস্য তদানীন্তন 'র' কর্মকর্তা পার্থ সারথি কোন রাখঢাক না করেই ফাঁস করে দেন তার এক লেখায়। জিয়া হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশে যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছিল সে সময় ২৯ আগস্ট '৮১ সংখ্যা ভারতীয় Mainstream পত্রিকায় 'Limits Of Diplomcy Bangladesh শিরোনামে তার এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য আঃলীগকে গোপনীয়ভাবে যাবতীয় সাহায্য প্রদান করতে হবে।" এ ধরনের গোপনীয় সাহায্য প্রদানে আবার সকল প্রকার নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দেয়ার মত ভয়ঙ্কর আহ্বানও জানান পার্থ সারথি। তিনি বলেন, "গোপন সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই যে কোন প্রকার নৈতিক সংস্থার বা নীতিকে বর্জন করতে হবে।" একজন 'র' কর্মকর্তা যিনি ছদ্ম পরিচয়ে এই নিবন্ধ লিখেছিলেন তার কথা বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষকগণ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন যে, ভারত আ'লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে তাদের স্বার্থরক্ষাকারী বলে মনে করে না। এই দলটিকে ক্ষমতায় আনার জন্যই তারা 'গোপনীয়' অনেক তৎপরতা চালিয়েছে দীর্ঘ প্রায় দু'দশক। এরই সর্বশেষ ধাপ ছিল বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলের শেষ দিনগুলোর নৈরাজ্য। এ সময় ১৯৯৪-১৯৯৫ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সর্কল বিরোধী দল আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবী কোন অযৌক্তিক দাবী ছিল না। পরবর্তীতে বিএনপি কর্তৃক সংসদে এতদসংক্রান্ত বিল পাস ঐ যুক্তিকেই সমর্থন করেছে। তবে, যেভাবে যে কায়দায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবীর আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া হয়েছে তা এক কথায় ভয়াবহ। পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও কোন দেশে নির্বাচিত সরকার পরিবর্তনের জন্য এরূপ আন্দোলন পরিচালনার ইতিহাস নেই। সে সময় যে হারে ও যে পর্যায়ে সহিংসতা, জ্বালাও-পোড়াও ও সর্বোপরি নাশকতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে, তা কখনই একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। বিশেষ করে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে প্রায় একুশ দিনব্যাপী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে 'আতঙ্কের অধ্যায়' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বলে গোয়েন্দা 'বিশ্লেষকগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ সময় ১৯৯৫ সালের শেষদিক থেকে ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা কিভাবে পর্দার অন্তরালে ভূমিকা পালন করেছে, সে বিষয়ে হয়তো প্রত্যক্ষ তথ্য প্রমাণ কখনই উপস্থাপন করা যাবে না। কিন্তু সচেতন কারও পক্ষে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬-এর সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত 'র' বাংরাদেশে একটি 'বন্ধুভাবাপন্ন সরকার' প্রতিষ্ঠায় মরণপণ লড়াই-এ মেতে উঠেছিল। ১৯৯১ সালে তাদের হিসাব-নিকাশ ভুল হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 'র' এমনভাবে অগ্রসর হয়, যাতে কোন পর্যায়ে ন্যূনতম কোন ভুল না হয় এবং যে কোন উপায়ে বিএনপির পতন ঘটানো যায়। এ জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের সুযোগে 'র' সকল পর্যায়ে তৎপর হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'র' ১৯৯৪-১৯৯৬ সালে

বিএনপির কফিনে শেষ পেরেক ঢুকে দেয়ার পূর্বে ১৯৯১ সাল থেকেই মূলত ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যায়। এ সম্পর্কে বিশ্লেষকদের অভিমত হচ্ছে যে, ১৯৯১ সালে সরকার গঠনের পর তাৎক্ষণিকভাবে বিএনপি সরকারের পতন ঘটানো বা পতনের ডাক দেয়া সম্ভব ছিল না। তাই ধীরে ধীরে জনমতকে প্রজ্বলিত করার পথে এগিয়ে যায় 'র'। এক্ষেত্রে প্রথমেই সৃষ্টি করা হয় দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা। এলাকাভিত্তিক পর্যায় থেকে শুরু করে দেশীয় পর্যায়ে চলতে থাকে পরিবহন ধর্মঘট শ্রমিক অসন্তোষ, শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, সীমান্তব্যাপী বিএসএফ-এর মাধ্যমে ব্যাপক হারে হামলা চালানো হয়। বাংলাদেশ সরকার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে শুরু হয় পুশইন চক্রান্ত। একই সাথে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বাহিনীর মাধ্যমে চলতে থাকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার প্রক্রিয়া। এ সময়েই লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুকে কথিত কতগুলো এনজিও ও মানবাধিকার সংগঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকীকরণ করা হয়। এছাড়া সমগ্র বিএনপি আমলে বাংলাদেশ সরকার শত চেষ্টা করার পরও 'র'-এর পরামর্শে শান্তি বাহিনী সমস্যা সমাধানে কোনরূপ চুক্তি সম্পাদন করতে দেয়া হয়নি। অন্যদিকে বঙ্গভূমি আন্দোলন, মোহাজির সংঘ গঠনের মাধ্যমেও অব্যাহতভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয় বিএনপি সরকারকে। এসব চাপ সৃষ্টি৬র লক্ষ্য ছিল- 'হয় পথে আস, না হয় এভাবে চাপ দেয়া হবে।' তৃতীয়ত, ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি গঠন ও অধ্যাপক গোলাম আযমের কথিত ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবী নিয়ে সৃষ্টি করা হয় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা। বিএনপি সরকারকে তীব্র চাপের মধ্যে রেখে, মানসিকভাবে দুর্বল করে দিয়ে জামায়াত এর কাছ থেকে সরিয়ে নেয়াই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। চতুর্থত, একই সাথে তসলিমা ইস্যু সৃষ্টি, জন্মাষ্টমীর মিছিলে হামলা ইত্যাদি ঘটনাকে পুঁজি করে বাংলাদেশ পরিচিত করা হয়, একটি সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে। বিশেষষ করে বিএনপি সরকারকে সংখ্যা লঘু নিপীড়নকারী হিসেবে চিহ্নিত করায় অহোরাত্রি ব্যস্ত হয়ে পড়ে একটি ভারতপন্থী গোষ্ঠী।

এসবের পাশাপাশি জাপানী পুঁজি বিনিয়োগসহ সকল সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে চালানো হয় সিনক্রোনাইজড তৎপরতা। শেষ পর্যায়ে আঘাত হানার লক্ষ্যে অবশেষে সৃষ্টি করা হয় তত্ত্বাবধায়ক 'সরকার ইস্যু'। রাজনৈতিক এই আন্দোলনের আড়ালে সে সময় এমনসব ঘটনা ঘটানো হয়, যাকে আপাতদৃষ্টিতে 'বিক্ষুব্ধ জনতা'র রুদ্ররোষ মনে হলেও সচেতন ও ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা নিয়ে ন্যূনতম জ্ঞানের অধিকারী কারও কাছে যেসব নিঃসন্দেহে প্রফেশনাল গুপ্তচরবৃত্তি বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিমানবন্দর, রেলস্টেশন গান পাউডার দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া, রেললাইন উপড়ে ফেলা, সমুদ্রবন্দরকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা, ব্যাপক মাত্রায়-জ্বালাও-পোড়াও-ভাঙচুর চালানো কখনও সাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচী হতে পারে কিনা যে কারও পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান, ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের কিছুদিন আগে থেকেই 'র'-এর বিশেষ কার্যক্রমে শাখা বা Special Service Bureau-র প্রায় শ' পাঁচেক প্রশিক্ষিত স্যাবোটিয়ার্স, যারা পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী ও দেখতে বাংলাদেশীদের মত, তাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে নিযুক্ত করা হয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য। উক্ত কর্মকর্তার দেয়া

তথ্য মতে, এরাই 'জনরোষ পজ্বলনকারী' বিভিন্ন রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সে সময়। স্যাবোটাজ হলেও আন্দোলনের উত্তাপে এসব কার্যক্রমকে চিহ্নিত করা হয় 'বিক্ষুব্ধ জনতা'র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। উল্লেখ্য, ১৯৭০-৭১ সালেও ওওঈ'র সদস্যরা আমাদের স্বাদীনতা আন্দোলনকালে এ ধরনের তপরতা চালিয়েছিল বলে জানা যায়। তবে সে সময় তা ছিল আমাদের স্বাধীনতা পক্ষে যা এখন সম্পূর্ণ বিপরীত।

এভাবে একদিকে যখন অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার পাশাপাশি এদেশীয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে চলছে সীমাহীন তাণ্ডব তখন অপরদিকে 'র'-এর নিজস্ব অপারেটিভ ও বাংলাদেশী এজেন্টদের তৎপরতাও লক্ষনীয় পর্যায়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সূত্র প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সে সময় ভারতীয় দূতাবাসে বিভিন্ন কূটনৈতিক পদের আড়ালে 'র' অপারেটিভদের তৎপরতা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যাপক ও বল্গাহীন। এক্ষেত্রে ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরত মি জেসি পান্থের 'র'-এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ যেমন রয়েছে, তেমনি আরএন বেতুরা বিষ্ণু প্রসাদ ইশ্বর সিং রাথোর, ব্রিগেডিয়ার চাক্কি-এদের সম্পর্কেও সতর্ক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন ১৯৯৫-'৯৬ সালে গোয়েন্দা সংস্থায় কর্মরত ক'জন সাবেক কর্মকর্তা। এছাড়া সে সময় রাজশাহী ও চট্টগ্রামস্থ ডেপুটি হাইকমিশনে কর্মরত ক'জন কূটনীতিবিদ সম্পর্কেও কূটনৈতিক কাজের বাইরে 'বিশেষ তৎপরতা চালানোর অভিযোগ করেছেন গোয়েন্দা সূত্র। এক্ষেত্রে চট্টগ্রামে কর্মরত 'র'- কর্মকর্তাবৃন্দ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর সংক্রান্ত বিষয়াদিতে যেমন নজর রাখতেন, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামে যোগাযোগ করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন বেশ ক'জন বাংলাদেশীকে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন 'উ' আধ্যাক্ষরযুক্ত একটি এনজিও'তে কর্মরত জনৈক 'আ.র'। এছাড়া আ'লীগের একজন প্রভাবশালী নেতাও সেখানে কন্ট্রাক্ট মেইনটেইন করতেন বলে সূত্র জানায়।

যা হোক, গুপ্তচরবৃত্তি অংকের কোন সূত্র নয় বলে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে আলোচ্য ভারতীয় কূটনীতিকদের বিশেষ বিশেষ তৎপরতাই সৃষ্টি করে সন্দেহ, সংশয়ের। বিশেষ করে বিএনপি সরকারের পতনের লক্ষ্যে 'র' যে অলআউট ওয়ার ডিক্লেয়ার করেছিল, তার প্রেক্ষিতে ভারত এদেশীয় দূতাবাসের পাশাপাশি সকল পর্যায়ে সহায়তা নিয়ে লড়ে গেছে উদ্দেশ্যী সিদ্ধির লক্ষ্যে। **(দৈনিক ইনকিলাব, ০৯/১২/২০০০)**

চীন-পাকিস্তানের পাশাপাশি বাংলাদেশেও বেতার যোগাযোগ ও টেলিফোনে আড়ি পাতছে 'র' ॥ প্রশাসন ও ব্যবসা খাতে এজেন্টদের মাধ্যমে সংগ্রহ করছে আগাম তথ্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্তা যেমন সরকারী নির্দেশনামতে নির্দিষ্ট টেলিফোন লাইনে আড়ি পেতে থাকে তেমনি ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থাও স্বাধীন এই দেশে দিব্যি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইলেট্রনিক সার্ভেইল্যান্স চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে 'র' অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যেমন বিভিন্ন বাংলাদেশী এজেন্সী, সশস্ত্র বাহিনীর বেতার তঙ্গ বা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন ইন্টারসেপ্ট করছে তেমনি গুরুত্বপূর্ণ অনেক ব্যক্তিত্বের টেলিফোন লাইনেও আড়ি পাতছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায় যে,

কূটনৈতিক ব্যাগ অর্থাৎ ডিপ্লোমেটিক ব্যাগ-এর সুযোগ গ্রহণ করে 'র' এতদসংক্রান্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি প্রতিবেশী সকল দেশেই নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। দূতাবাসের আড়ালে তারা এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তাদের ইচ্ছামত ইলেকট্রনিক গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে।

এমনকি পাকিস্তান, চীনের মতো দেশে যাদের শক্তিশালী গুপ্তরচ সংস্থা রয়েছে সেখানেও 'র' এ ধরনের তৎপরতা চালাতে সক্ষম হয়েছে বলে স্বয়ং ভারতীয় সূত্র থেকেই নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ ব্যাপারে ৩০ মার্চ '৯৭ সংখ্যান 'সানডে' পত্রিকায় বীর সাংঘবী 'দি সিক্রেট স্টেট' শিরোনামের এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, 'র' পাকিস্তানে ব্যাপক ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক সার্ভেইল্যান্স চালিয়ে থাকে। বীর সাংঘবীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী 'র' ১৯৭০ সালে জুলফিকার আলী ভূট্টোর মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের টেলিফোনেও আড়ি পাতায় সক্ষম হয়। এছাড়া 'র'-এর এজাতীয় তৎপরতা সম্পর্কে একই ধরনের তথ্য দিয়ে ভারতীয় সাংবাদিক সালামত আলী জানুয়ারী '৮৯ সংখ্যা 'যার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ' পত্রিকায় জানিয়েছেন যে, 'র' পার্শ্ববর্তী সকল দেশের সরকারী সব ধরনের বেতার তরঙ্গ মনিটর ও ক্ষেত্রবিশেষে জ্যাম করে থাকে।

তিনি এমন তথ্যও দিয়েছেন যেখানে তাঁর মতে, 'র' প্রতিবেশী দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতাদের টেলিফোনেও টার্গেট দেশে বসেই আড়িপাতার ক্ষমতা রাখে। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের টেলিফোনে 'র'-এর আড়িপাতায় সফলতা অর্জনের কথাও বলেছেন সালামত আলী।

এদিকে বাংলাদেশী একটি বিশ্বস্ত সূত্র মতে, 'র' যেখানে শক্তিশালী পাকিস্তানে সেদেশের টেলিফোনে আড়িপাতার ক্ষমতা রাখে সেখানে তুলনামূলক দুর্বল বাংলাদেশে এজাতীয় তৎপরতা চালানো তাদের কাছে ডাল-ভাত বৈ কিছুই নয়। সূত্র আরো জানায়, সাম্প্রতিক সময়ে 'র'-এর সংশ্লিষ্ট উইং বাংলাদেশের এনালগ ও ডিজিটাল ফোনে আড়িপাতার পাশাপাশি মোবাইল ফোনে আড়িপাতার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি গোপনে স্থাপন করেছে। এভাবে তারা যেমন একদিকে সকল সরকারী ওয়্যারলেস মেসেজ জেনে যাচ্ছে তেমনি রাজনৈতিক অঙ্গনের খুঁটিনাটিও সংগ্রহ করছে সকলের অগোচরে। বিশেষ করে বাংলাদেশী সংস্থাগুলোয় 'র'-এর মতো আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও কাউন্টার মেজার না থাকায় এক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্থা অনায়াসেই রাষ্ট্রযন্ত্রের সব গোপন সিদ্ধান্ত জেনে নিতে পারছে আগবাড়িয়ে।

শুধু এভাবে টেলিফোন বা ওয়্যারলেসে আড়িপেতেই যে 'র' তথ্য সংগ্রহ করছে তা নয়, বরং বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সকল স্তরে তারা অনুপ্রবেশেও সক্ষম হয়েছে ব্যাপক হারে। সরকারী প্রশাসনের এমন কোন স্থান নেই যেখানে 'র' তাদের ইচ্ছে মতো তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে 'র'-এর সংগৃহীত তথ্য যেমন ভারত সরকারকে বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ আহরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে সহায়ক করেছে তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতীয় পণ্যের বাজারেও পরিণত করেছে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যবসা বাণিজ্য খাতকে নিরীহ বলে মনে হলেও টার্গেট দেশের শিল্প কারখানা, বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকে প্রতিহত করে অর্থনৈতিক আগ্রাসনের পথ সুগম করে তোলাও গুপ্তচরবৃত্তির অন্যতম প্রকরণ বলে স্বীকৃত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি

আরো ভয়ঙ্করভাবে সত্য। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে যমুনা সেতু প্রকল্পে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পের পাথর যাতে ব্যবহৃত হতে না পারে এবং সে স্থানে ভারতীয় পাথর ব্যবহার করা যায় সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, ১৯৯৪ সালে যখন যমুনা সেতু প্রকল্পের কাজ শুরু হয় তখন যাতে মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা কাজে লাগানো যায় সেজন্য ১৯৯২ সালেই তদানীন্তন সরকার উত্তর কোরিয়ার সাথে একটি স্মারকে স্বাক্ষর করে। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য চক্রের কারসাজিতে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পের কাজ পরপর পিছিয়ে যায়। ফলে যমুনা ব্রিজের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকশ' কোটি টাকার পাথর আমদানী করতে হয় ভারত থেকে। আশঙ্কার কথা দীর্ঘ ৬/৭ বছরেও মধ্যপাড়া প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি এবং এই প্রকল্পে উত্তোলিত পাথরের বেশীর ভাগই অবিক্রিত পড়ে আছে ভারতীয় পাথর সহজ শর্তে আমদানী করতে দেয়ায়। ঠিক একইভাবে এক সময় এদেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাবনাও নস্যাৎ করে দেয়া হয় স্যাবোটাজের আশ্রয় নিয়ে। এই সম্ভাবনাময় দেশটিতে যাতে কোন সরকারই সুস্থিরভাবে অর্থনীতির দিকে নজর দিতে না পারে ও যাতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীরাও এদেশে পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন সে জন্য 'র' বরাবরই বিভিন্ন কৌশলে হরতাল, ধর্মগট নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড, শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদির আড়ালে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সম্ভবত কখনই বাংলাদেশ এই রাহু থেকে মুক্তি পাবে না। **(দৈনিক ইনকিলাব, ১৬/১২/২০০০)**

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের ভূমিকা পালনে 'র' তৎপর॥ স্পর্শকাতর পদেও পরিবর্তন ঘটায় অদৃশ্য নির্দেশনায়

কোন সরকারের সময় ঘটনাটি ঘটেছিল বলতে রাজি নয় সূত্র। তবে একটি নাজুক সময়ের ঘটনা সেটি। সে সময় পশ্চিমা একটি শক্তিধর দেশের ঢাকাস্থ দূতাবাসে কর্মরত জনৈক ডিফেন্স এ্যাটাশের বাসায় আয়োজন করা হলো ঘরোয়া এক পার্টির। আমন্ত্রিতের সংখ্যা সীমিত। পানাহার, হৈ-হুল্লোড়ের পর যে যার বাসায় ফিরে গেলেন। শুধু এ্যাটাশের কথামতো আরো কিছু দামী শ্যাম্পেনের লোভে থেকে গেলেন ভারতীয় দূতাবাসের জনৈক সিনিয়র কূটনীতিক। এ্যাটাশের আহবানে বিভিন্ন কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর পান করলেন কূটনীতিক ভদ্রলোক। এক পর্যায়ে চূর হয়ে গেলেন নেশায়। বাংলাদেশের সে সময়কার অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ ও নাজুক অবস্থান নিয়ে কথা হচ্ছিল দু'জনের মাঝে। পশ্চিমা দেশের ডিফেন্স এ্যাটাশে আসলে ভারতীয় কূটনীতিবিদকে নেশা করিয়ে, কৌশলে কথা আদায়ের জন্যই ঐ ঘরোয়া পার্টির আয়োজন করেছিলেন। তিনি জানতেন ভারতীয় ঐ কূটনীতিবিদ যিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন 'র' কর্মকর্তা তার কাছ থেকে স্বভাবতই বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক খোঁজ-খবর পাওয়া যাবে। এভাবে এর আগেও বহুবার গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য তিনি পেয়েছেন এই সূত্র থেকে। যাহোক, নেশাগ্রস্ত ভারতীয় কূটনীতিবিদের মুখে কথার খই ফুটলো এক সময়। তিনি বলে গেলেন বাংলাদেশের কোন কোন সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদে কে কে দলী হয়ে যাচ্ছেন- ভারতীয়দের জন্য 'স্বস্তিদায়ক' নয় বলে। তা কিভাবে সম্ভব? 'আপনারা বাংলাদেশের এসব জায়গায় পদ পরিবর্তনে সরকারকে রাজি করাবেন কিভাবে?'

এ্যাটাশে অনেকটা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন ভারতীয় কূটনীতিবিদের কাছে। 'কেন নয়? যেসব কর্মকর্তা আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে, যারা সরকারকে বাধ্য করছে ভারতের কথামতো না চলতে তারা কেউই থাকবে না। সব বদলী হয়ে যাবে।' অনেকটা তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর দিলেন ভারতীয় কূটনীতিবিদ। এরপর তিনি একে একে বলে গেলেন অনেক কর্মকর্তার নাম। এই লিস্টের শীর্ষে যার নাম ছিল তার কথা শুনে ভীষণ চমকে গেলেন এ্যাটাশে ভদ্রলোক। তিনি পরদিনই তার পূর্ব পরিচিত ঐ কর্মকর্তা যিনি একটি স্পর্শকাতর সংস্থার শীর্ষ পর্যায়ে কর্মরত ছিলেন তার সাথে দেখা করলেন। বললেন পূর্ব রাতের কথা। তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন বাংলাদেশী কর্তাব্যক্তি। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। কারণ সরকার প্রধান তার প্রতি খুবই আস্থাবান এমন মনোভাবই প্রকাশ করেছেন বরাবর। কিন্তু সপ্তাহখানেকের মাথায় পশ্চিমা দেশের ডিফেন্স এ্যাটাশের দেয়া তথ্যই সত্যে পরিণত হলো। বাংলাদেশী ঐ সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তাসহ আরো অনেকেই আকস্মিক বদলী হয়ে গেলেন কোন এক অদৃশ্য শক্তির কলকাঠি নাড়ার সূত্র ধরে। এভাবে বাংলাদেশে বহু ঘটনা অতীতে ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। এক সময় ১৯৯৫ সালে তো একবার বাংলাদেশের নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার একটি দৈনিকের সাথে সাক্ষাৎকারে প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের একটি ভূমিকা রয়েছে।' এবং এই একটি ভূমিকা পালনে 'র' থাকে সদা তৎপর। এ জন্য এই গুপ্তচর সংস্থার রয়েছে সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক অবকাঠামো ও স্থাপনা। যদিও 'র' সম্পর্কে স্বভাবতই প্রকাশ্যে কিছু জানা সম্ভব নয়। এমনকি সাধারণ ভারতীয় নাগরিকেরাও এ নিয়ে বিশেষ কিছু জানতে পারেন না। 'র' কত গোপনে কাজ করে থাকে সে সম্পর্কে ১৯৯০ সালে ভারতীয় সংসদের বিজেপি দলীয় এমপি যশবন্ত সিং একবার বলেছিলেন 'র'-এর সবকিছু এতই গোপনীয় যে, আমার মনে দৃঢ় সন্দেহ, এ এজেন্সী সম্পর্কে সরকারও ভালভাবে কিছু অবগত আছে কিনা?" তবে 'র' সম্পর্কে বিশেষ কিছু প্রকাশ্যে জানা সম্ভব না হলেও এটা জানা যায় যে, গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সংস্থা পৃথিবীর অপরাপর উল্লেখযোগ্য সংস্থার অনুসৃত কলাকৌশল অনুসরণ করে থাকে। এ ব্যাপারে অশোক রায়না রচিত "ইনসাইড 'র" বই থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশসহ অন্যান্য টার্গেট দেশে গোয়েন্দা অপারেশনের প্রধান অবলম্বন হলো একজন 'রাজ প্রতিনিধি' বা 'রেসিডেন্ট' যিনি সাধারণত দূতাবাসে কূটনীতিবিদের ছদ্মবেশে যাবতীয় অপারেশনের তত্ত্ব-তালাশ করে থাকেন। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য অপর একটি পদ অর্থাৎ 'স্টেশন চীফ' বা 'স্থাপনা প্রধান' হিসেবেও একজন গুপ্তরচর দূতাবাসে কাজ করেন 'লোক দেখানো' আবরণের আড়ালে। গোয়েন্দা বিশ্লেষকদের মতে, এ ধরনের আড়ল হতে পারে সাধারণত কালচারাল এ্যাটাশে, ভিসা কাউন্সেলর বা এ জাতীয় কোন সেকশনের ফার্স্ট সেক্রেটারী। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং এদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে কূটনীতিবিদের ছদ্মবেশে অনেক 'র' কর্মকর্তা, অপারেটিভ কাজ করে যাচ্ছেন বলে নিশ্চিত ধারণা পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে এক সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থায় কর্মরত ছিলেন এমন বেশ ক'জন কর্মকর্তা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশে বরাবরই 'র' একটি সুসংগঠিত সংগঠন পরিচালনা করে আসছে, যেখানে দূতাবাসে কূটনীতিকের ছদ্মবেশই হচ্ছে 'র' কর্মকর্তাদের জন্য নিরাপদতম আড়াল।

এছাড়া বিভিন্ন এনজিও, মাল্টিন্যাশনাল বাণিজ্যিক বা আর্থিক সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা এবং অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আড়ালেও 'র' অপারেটিভগণ গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করে আসছে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, অন্যান্য যে স্থাপনাতেই 'র' এর লোক থাকুক না কেন মূলত দূতাবাস থেকেই তাদের সকল কাজ পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বলতে গেলে কূটনৈতিক ইমউনিটির সুযোগ কাজে লাগিয়ে 'র'-এর গুপ্তচরগণ নিরাপদে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যান। এতে সুবিধা হচ্ছে কোন কারণে এদেশের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলো এদের তৎপরতা সম্পর্কে জানতে পারলেও কূটনীতিবিদের বিরুদ্ধে সরাসরি গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনতে পারে না।

এদিকে বাংলাদেশে ভারতের কূটনৈতিক বিস্তৃতি দেখে এর সাথে আপাত দৃষ্টিতে গুপ্তচরবৃত্তির সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করা সম্ভব না হলেও বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে এদেশে ভারত কেন ঢাকা ছাড়াও অপর দু'টো কনস্যুলেট স্থাপন করেছে তা অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে। উল্লেখ্য, ঢাকার মূল দূতাবাসের পাশাপাশি চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতেও রয়েছে ভারতের দু'টো কনস্যুলেট, যাকে ভারতীয়রা চিহ্নিত করেছে 'ডেপুটি হাইকমিশন' হিসেবে। পর্যবেক্ষকদের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে নজর রাখা ও গোপন কার্যক্রম পরিচালনার জন্যই চট্টগ্রামে কনস্যুলেট স্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে শান্তি বাহিনী সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ পার্বত্য এলাকায় যাতে উত্তর-পূর্ব ভারতের কোন গেরিলা এসে আশ্রয় নিতে না পারে সে জন্যই 'র' এখানে বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তৎপরতা চালিয়ে আসছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের জন্য রয়েছে রাজশাহীর কনস্যুলেট।

এদিকে সাম্প্রতিককালে এদেশে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতা এতোটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তারা এদেশীয় কোন প্রতিগোয়েন্দা কার্যক্রমের সম্মুখীন হচ্ছে বলে মনে হয় না। বরং একটি সূত্র মতে, বাংলাদেশের কোন একটি প্রতিগোয়েন্দা সংস্থাতেও তারা সাম্প্রতিককালে অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া সূত্র আরো জানায় যে, সরকারী প্রচ্ছন্ন অনুমোদনক্রমে তারা এখন সমন্বয়ের মাধ্যমেও 'কমন এনিমি' আইএসআই-এর বিরুদ্ধে তৎপরতা চালিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে 'র' যে শুধুমাত্র উত্তপূর্ব ভারত সংক্রান্ত বিষয়েই কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা নয় বরং এদের অদৃশ্য কলকাঠি নাড়ায় এখন সরকারের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে একটি 'ইনভিজিবল সরকারের'। মূলত এ চক্রের কারণেই এখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কোন কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলে তা বাস্তবায়ন হয় না। হঠাৎ করেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে হয় 'ভৌতিক পোস্টিং' যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে এই প্রতিবেদনের শুরুতে- অনেকটা সেরকমই। **(দৈনিক ইনকিলাব ১/১২/২০০০)**

এনজিও, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের আড়ালে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধেও 'র' গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে

'সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশনস্' একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে সম্পর্কযুক্ত দ্বিপাক্ষিক ও সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন

বিষয়ের ওপর গবেষণা করাই এই সংস্থার কাজ। ভারত সরকার প্রদেয় অনুদানেই চলে এর যাবতীয় কার্যক্রম। বাইরে আপাত নিরীহ প্রকৃতির গবেষণামূলক কাজ করলেও এই প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন তৎপরতা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বিস্তর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এমনকি আওয়ামী লীগকে ভারতের 'বন্ধু' বলা হলেও এ সরকারের শাসনামলেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি একটির পর একটি বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। এ ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ডে সন্দিহান বাংলাদেশী একটি শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা দীর্ঘ দশ পাতার 'অতি গোপনীয়' রিপোর্ট সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে প্রেরণ করেছে বলে জানা যায়। উক্ত গোয়েন্দা সংস্থা থেকে ১৯৯৯ সালের ১৪ জুন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সিএম শফি সামীকে প্রদত্ত এক প্রতিবেদনে 'সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশনস্'-কে সুনির্দিষ্টভাবে 'র'-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, ভারত সরকার পরোক্ষভাবে এই সংস্থাকে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে যেখানে গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট মতে, ১৯৯৮-'৯৯ অর্থবছরে উক্ত সংস্থা প্রায় ৪১ লাখ ৬৫ হাজার রুপি অনুদান পেয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্ক বজায় রাখলেও ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' যে আ'লীগকেও ছাড় দিতে রাজি নয় তারই প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশী গোয়েন্দা সংস্থা প্রণীত রিপোর্টে। এ ব্যাপারে উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, "ভারত সরকারের অনুদানে পরিচালিত কলিকাতাস্থ 'সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশনস্' নামক সংস্থাটি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করছে বলে জানা যায়। এ সংস্থা বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন দ্বিপাক্ষিক ও সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা করে বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। বিশেষ করে যেসব বিষয়ে দুই প্রতিবেশী দেশেরই সাধারণ স্বার্থ জড়িত রয়েছে সেসব বিষয় নিয়েই এ সংস্থা বেশী গবেষণা করে। দুই দেশের সাধারণ স্বার্থযুক্ত বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তারা ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণের উপর সমধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে এবং ভবিষ্যতে যাতে তাদের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুন্ন না হয় সেজন্য স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার সকল ধরনের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে সরকার ও জনগণকে সতর্ক করে দেয়ার প্রয়াস চালায়। নিজেদের স্বার্থ বড় করে দেখতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত ও কল্পনাপ্রসূত মন্তব্য করা হয়। এ কারণে তাদের এ ধরনের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদনের বক্তব্য, মন্তব্য ও তথ্যাদি অনেক সময় বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী হয়ে থাকে। এছাড়াও তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ এদেশের আভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে চলেছে এবং সময়ে সময়ে বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরণ করছে বলে জানা যায়।... উক্ত সংস্থা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত গঙ্গা পানি চুক্তির উপরও গত জুলাই '৯৭ মাসে "Study on the implications of the Ganga water treaty: Irrigation and impact on the local people" শীর্ষক একটি বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন তৈরী করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরণ করে বলে জানা যায়। এ প্রতিবেদনে গঙ্গা পানি চুক্তির ফলে গঙ্গাভাগীরথী অববাহিকা অঞ্চলে খরা মৌসুমে কৃষি কাজের জন্য সেচ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, যদিও এ

চুক্তির বিরুদ্ধে উক্ত এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়নি তথাপিও কৃষি ক্ষেত্রে পানির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কলিকাতা বন্দর ও স্থানীয় কলকারখানায় প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভবিষ্যতে পানি নিয়ে বিবাদ এড়ানোর লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন বলে এ প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।... উল্লেখ্য যে, 'সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশনস' ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। ভারত সরকার পরোক্ষভাবে এ সংস্থাকে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে বলে জানা যায়। কলিকাতাস্থ ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির মাধ্যমে বিগত অর্থবছরে এ সংস্থা ৪১ লাখ ৬৫ হাজার রুপি সরকারী অনুদান পেয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়।"

এখানে শুধুমাত্র 'সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশনস্'-এর উদাহরণ উপস্থাপন করা হলেও এ জাতীয় বহু এনজিও, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান বরাবরই বাংলাদেশে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা যায়, দু'দেশের সম্পর্ক, গণতন্ত্রের অবস্থান, পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের জীবনাচার, মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ 'গবেষণা'র কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গনেও এদের রয়েছে সরব উপস্থিতি। আপাতদৃষ্টিতে এসব সংগঠন, এনজিও, গবেষক 'উন্নয়নমূলক' তৎপরতায় জড়িত রয়েছেন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা 'র'-এর পক্ষে কৌশলগত গুপ্তচরবৃত্তিই পরিচালনা করে আসছেন। এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ আ'লীগ ক্ষমতায় রয়েছে নাকি বিএনপি সরকার পরিচালনা করছে তা 'র'-এর কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। বরং তাদের লক্ষ্য হচ্ছে সব সময় বাংলাদেশের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করা, এদেশকে নতজানু রাখা ও সকল পর্যায়ে নজরদারী অব্যাহত রেখে ভারত সরকারকে এমন পদক্ষেপ নেয়ায় সাজেশন দেয়া, যাতে বাংলাদেশ কোন ক্ষেত্রেই যেন ভারতের চেয়ে এগিয়ে যেতে না পারে। সবচেয়ে বড় রক্ষ্য হল, যে কোনভাবে বাংলাদেশকে আয়ত্তে রাখা যাতে চাপ প্রয়োগ করে হলেও চট্টগ্রাম বন্দর সুবিধা, ট্রানজিটসহ অপরাপর সুবিধা আদায় করে নেয়া যায়। আ'লীগও এর ব্যতিক্রম নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ সরকারের কাছ থেকে ট্রানজিট সুবিধা আদায় করার লক্ষ্যে ভারত প্রায়ই বিভিন্ন পথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে চাপ প্রয়োগ করে আসছে।

এদিকে এনজিও, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, শিল্প-সংস্কৃতিসহ সকল খাতেই যে 'র' গুপ্তচর নিয়োগ করে থাকে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকগণ অভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে তারা 'র'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে উল্লেখ করেছেন যে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা বিভিন্ন দেশী বিদেশী এনজিও বা আন্তর্জাতিক সংস্থা যেখানে ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ প্রভাব বিস্তারকারী পদে কর্মরত রয়েছেন সেগুলোর মাধ্যমে ভারতের অনুকূলে তৎপরতা চালিয়ে থাকে। এছাড়া ব্যবসায়ী, সংস্কৃতিকর্মী, ছাত্র, পর্যটক, বিমানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, এমনকি একজন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকদের আনাগোনা যেমন সব সময় 'র' বিশেষ প্রশিক্ষণ দানের পর পার্শ্ববর্তী দেশে বিশেষ সময় বা স্থায়ীভাবে প্রেরণ করে বলে জানা যায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বাংলাদেশে

অস্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে তেমনি নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনকালীন সময় এদের বাংলাদেশ সফরের মাত্রা বেড়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে হারে। আবার সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র মতে, বাংলাদেশের কৌশলগত গবেষণার অন্যতম প্রতিষ্ঠান বা থিঙ্কট্যাঙ্ক 'বিস'-এও (BIISS Bangladesh Institute of International and Strategic Studies) বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণের নামে প্রায়শই 'র' সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ এদেশ 'ভ্রমণে' আগমন করে থাকেন। এমনকি এক সময় 'র'-তে কর্মরত ছিলেন এমন একজন ব্যক্তির নামও 'বিস জার্নালে' এক সময় প্রদায়ক হিসেবে ছাপা হয়েছে বলে জানা যায়। এক্ষেত্রে সূত্র এক সময় ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামলে পাকিস্তান ও চীনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পার্থ সারথি ঘোষ, যাকে ইন্দিরা গান্ধী শ্রীলঙ্কা অপারেশন পরিকল্পনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তার নামও বিএনপি সরকারের শেষ দিকে এবং এ সরকারের প্রথমদিকে 'বিস জার্নালে' ছাপা হত বিশিষ্ট 'কন্ট্রিবিউটর' হিসেবে বলে জানিয়েছেন। অবশ্য দিল্লীস্থ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজ নামের একটি গবেষণা সংস্থার রিসার্চ ফেলো হিসেবেই তিনি পরিচিত হয়েছেন এক্ষেত্রে।

এভাবেই বাংলাদেশের চারপাশে অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরেছে 'র'। এক্ষেত্রে কেউই তাদের বন্ধু নয়। কারও প্রতি তাদের নেই ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ। ইন্টেলিজেন্সে এটা থাকার কথাও নয়। তবুও যারা এজেন্ট, তারা দায়শোধের লক্ষ্যে নির্লজ্জের মত লাফালাফি চালিয়ে যাচ্ছে অবিরত। কিন্তু একটি কথা তারা বিস্মৃত হচ্ছে যে, প্রয়োজন শেষে প্রতিটি এজেন্টকেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয় ব্যবহৃত টয়লেট পেপারের মত। কারণ, 'র'-এর নীতিনির্ধারকগণ ভালভাবেই জানেন- যে নিজ দেশকে ভালবাসে না সে অপর দেশের গুপ্তচর সংস্থার চিরস্থায়ী মিত্র হবে কিভাবে? **(দৈনিক ইনকিলাব, ৪/১২/২০০০)**

রেস্টুরেন্ট, কম্পিউটার ফার্মের আড়ালে চলছে তথ্য সংগ্রহ আদান-প্রদান 'র' কর্মকর্তারাও আসছেন ছদ্ম পরিচয়ে

'সেফ হাউস' বা 'ডেড লেটার বক্স' যাই বলা হোক না কেন, রেস্টুরেন্ট দু'টি আসলে তাই। আপাতদৃষ্টিতে সব ধরনের সুস্বাদু ভারতীয় খাবার পরিবেশনকারী এ দুটি রেস্টুরেন্টের একটি বনানী-গুলশান এলাকায়, অপরটি ধানমন্ডিতে। দু'টিরই নামের অদ্যাক্ষর 'এস'। এগুলোর খাবার-দাবার বেশ ব্যয়বহুল। সমাজের উচু স্তরের হোমরা-চোমরাদের পক্ষেই এই রেস্টুরেন্টগুলোতে ঢুঁ মারা সম্ভব। অবশ্য 'সাধারণ জনগণের মাঝে ভারতীয় খাবারের স্বাদ ছড়িয়ে দিতে' এর একটির আবার রয়েছে মোবাইল ভ্যান সার্ভিস। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র মতে, এটি ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় সারাদিন ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যায় এসে দাঁড়ায় ধানমন্ডিতে-১৫ নম্বর ও শংকর বাস স্ট্যান্ডের মাঝামাঝি একটি ভবনের কাছে। এ ব্যাপারে সূত্র জানায়, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই রেস্টুরেন্ট দু'টি 'র'-এর 'ডেড লেটার বক্স' অর্থাৎ তথ্য নির্দেশনা আদান-প্রদানের কন্টাক্ট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নির্দিষ্ট সময়ে বা খেতে যাবার ছলে বাংলাদেশী এজেন্টগণ এখানে তথ্য প্রদন করে আসেন; পক্ষান্তরে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ বা নির্দেশনাও 'র' অপারেটিভদের মাধ্যমে তারা এখান থেকে পেয়ে যান সময়মত। ক্ষেত্রবিশেষে 'কাট আউট' পদ্ধতিতেও তথ্য আদান-প্রদান করা হয় পরিস্থিতি

বুঝে। এছাড়া মাঝে মাঝে বিশেষ অপারেশনের পর নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বা কোন গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এর জন্যও এই রেস্টুরেন্টগুলোকে 'সেফ হাউস' বা নিরাপদ গোপনীয় স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে যদিও রেস্টুরেন্ট ছাড়া অন্য যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, হোটেল, ট্রাভেল এজেন্সী বা ভাড়া নেয়া বাড়িকেও 'সেফ হাউস' এবং 'ডেড লেটার বক্স' হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু রেস্টুরেন্টের সুবিধা হল এই যে, এখানে খাদ্য গ্রহণের নাম করে যে কোন সময় প্রকাশ্যে কারো সন্দেহের উদ্রেক না করে যাওয়া যায়। তার ওপর এখানে ইন্ডিয়ান ডিশ সার্ভ করা হয় বলে যে কোন ভারতীয়ও এখানে যখন-তখন যেতে পারেন এবং সাধারণভাবে সেটাই স্বাভাবিক।

এদিকে উল্লিখিত দু'টি রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে আরো জানা যায় যে, 'র'-এর বিভিন্ন কর্মকর্তা ও অপারেটিভ এগুলোতে বিভিন্ন পদে কর্মরত রয়েছেন যার মাধ্যমে তারা নিজেদের একজন হোটেল ব্যবসায়ী বা কর্মচারী হিসেবেই উপস্থাপনে সক্ষম হন। বনানী-গুলশান এলাকার আলোচিত রেস্টুরেন্টটিতে এভাবে 'র'-এর একজন ফিল্ড অর্গানাইজারের নিয়োজিত থাকার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সূত্র। তিনি আরো জানান, গুলশান বারিধারা এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিবিদদের ওপর নজর রাখা, এই রেস্টুরেন্টে খেতে আসায় তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলাতেও এই স্থাপনাটিকে ব্যবহার করছে 'র'।

এভাবে বাংলাদেশে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা বেশ নির্বিঘ্নেই সাধারণ কোন নাগরিকের সন্দেহের উদ্রেক না করে দিব্যি তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে শুধু যে গোপনীয়ভাবে আড়াল নিয়েই তারা থেমে গেছে তা নয়; বরং এ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ও সিবিআই-এর গোপন অফিস খোলার খবর নিয়ে এদেশে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। জানা যায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থানরত উত্তর-পূর্ব ভারতের কথিত গেরিলা গ্রুপগুলোর তৎপরতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া ও তাদের বাংলাদেশী সহযোগীদের নিষ্ক্রিয় করার লক্ষ্যেই এদেশের ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অফিস স্থাপন করা হয়। এমনকি এমন কথাও স্বাধীন একটি দেশে বসে এদেশের জনগণকে শুনতে হয় যে, বাংলাদেশের যেসব ভারতবিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী উত্তর-পূর্ব ভারতের গেরিলা গ্রুপগুলোকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সমর্থন জানিয়ে আসছেন, তাদের প্রতিও বিশেষ নজর রাখা হবে বাংলাদেশে স্থাপিত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অফিসসমূহ থেকে। এ ব্যাপারে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক 'দি নিউ নেশন'-এর ১৯ মে '৯৭ সংখ্যায় একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ১০ জুন '৯৭ তারিখে জাতীয় সংসদেও এ নিয়ে তীব্র বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার অফিস খোলা নিয়ে শুধু যে এদেশেই ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয় তা নয় বরং ভারতের পত্র-পত্রিকাতেও এ খবরের সত্যতা স্বীকার করে প্রকাশিত হয় একাধিক রিপোর্ট। নিঃসন্দেহে পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা দ্বিতীয়টি ঘটেনি। গোপনে বিভিন্ন আড়াল নিয়ে এক দেশের গুপ্তচর সংস্থা অপর দেশে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করে থাকে সেটা প্রকাশ না পেলেও সকলেই এ ব্যাপারে কম বেশী জানতে বা বুঝতে পারেন। কিন্তু বন্ধু দেশ হলেও পত্র-

পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে একটি স্বাধীন দেশে অপর একটি দেশের গোয়েন্দা অফিস খোলার কথা এক কথায় অস্বাভাবিক ও সকল প্রকার শিষ্টাচার বর্জিত। কিন্তু বাংলাদেশে ঠিক তাই ঘটে ১৯৯৭ সালে। আবার এ অভিযোগকে অসত্য বলে যে উড়িয়ে দেয়া যাবে তাও সম্ভব নয়, যেহেতু বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কখনই এই অভিযোগ খন্ডন করে কিছু বলা হয়নি।

এদিকে বাংলাদেশে প্রকাশ্য ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অফিস স্থাপন প্রসঙ্গে সরকারী পর্যায় থেকে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, 'র' ও সিবিআই (Central Bureau of Investigation) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অফিস খুলেছে সত্য। তবে তারা একেবারে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে কার্যক্রম চালাবার মত 'চরম চক্ষুলজ্জাহীনতার' কাজ অন্তত করেনি। বরং সূত্র মতে, তারা একটি বিখ্যাত কম্পিউটার কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে সেটার আড়ালেই তৎপরতা চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক্ষেত্রে কেউই তাদের আপাতত সন্দেহ করতে পারছে না। কারণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বা আইটি খাতে অহরহই প্রচুর প্রশিক্ষক আসছেন ভারত থেকে। এছাড়া অনেক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আবার সরাসরি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এদেশে কাজ করছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের আড়ালে কাজ করায় সুবিধা অনেক এর উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, একদিকে যেমন একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শাখা দেশের সকল উল্লেখযোগ্য স্থানে স্থাপন করা সহজ তেমনি এরূপ প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় আইটি খাতেও নজর রাখা সম্ভব। **(দৈনিক ইনকিলাব, ২/১২/২০০০)**

একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের অনেকেই বিনা ভিসায় ভারতে থাকতেন ॥ 'র' পুনর্গঠিত করেছিল কাদেরিয়া বাহিনীকে

নাম তার মহম্মদ সামসুদ্দিন। এটি তার আসল নাম কিনা সে বিষয় পুলিশের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তবে এ পুলিশ বাংলাদেশী নয়, ভারতীয় পুলিশ। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ২৪ অক্টোবর '৯৪ সংখ্যা দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়া ভারতে থাকার দায়ে পার্ক স্ট্রীট থেকে মহম্মদ সামসুদ্দিনকে গ্রেফতার করে কলিকাতা পুলিশ। ১৯৯৩ সাল থেকেই পার্ক স্ট্রীটের কারনানি ম্যানসনের ফ্ল্যাটে বসবসা করছিলেন ধৃত ব্যক্তি। বিনা পাসপোর্ট ও ভিসায় ভিন দেশে বসবাস করা গুরুতর অপরাধ। সেজন্য ভারতীয় পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও সিবিআই অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন সামসুদ্দিনকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অফিসারদের জেরার উত্তরে ধৃত এই বাংলাদেশী জানান, তিনি ভারত সরকারের একটি সংস্থার হয়ে 'বিশেষ কাজ' করেন এবং ওই সংস্থার কাছেই তার পাসপোর্ট জমা আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া অমৃতবাজারের রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায় যে, ভারতীয় বিশেষ সংস্থার পক্ষে 'বিশেষ কাজে' নিয়োজিত মহম্মদ সামসুদ্দিন বাংলাদেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। উক্ত রিপোর্টে ভারতীয় বিশেষ সংস্থার নাম উল্লেখ না হলেও এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ঐ সংস্থাটি হচ্ছে 'র' ও মহম্মদ সামসুদ্দিনের 'বিশেষ কাজ' হচ্ছে গুপ্তচরবৃত্তি।

এভাবে বাংলাদেশের 'প্রধান রাজনৈতিক দলের' অনেক সদস্যই ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার পক্ষে এ যাবৎ বিভিন্ন তৎপরতা চালিয়েছেন। (কাদেরিয়া বাহিনীর সম্পর্কিত তথ্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) (দৈনিক ইনকিলাব, ১১/১২/২০০০)

জাতীয়তাবাদী, ইসলামপন্থী- কেউ কেউ গড়ে তুলেছেন বিশেষ সম্পর্ক॥ দেশে বিদেশে গোপন যোগাযোগ; চলছে সিঙ্গাপুর কানেকশন

বিএনপি শাসনামল শেষে বর্তমান সরকারের শাসনামলেও জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থী এসব এজেন্ট তাদের তৎপরতা থামিয়ে দেননি। বরং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া না হলেও এদের অতি উৎসাহ এখনও স্তিমিত হয়নি। বরং এখন এদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আরও অনেকেই। তবে এক্ষেত্রে যাদের কথা জানা যায়, তারা বাংলাদেশের মাটিতে 'র' চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ করার চেয়ে তৃতীয় একটি দেশকেই বেছে নিয়েছেন নিরাপদ স্থান হিসেবে। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, অনেক সময় এজেন্টের সাথে যোগাযোগ গোপন রাখা ও নিশ্চিন্তে আলাপ-আলোচনা করার লক্ষ্যে তৃতীয় কোন দেশকেই বেছে নেয়া হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও 'র' কর্মকর্তাগণ 'থার্ড কান্ট্রি'-কে বেছে নিয়েছিলেন পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার জন্য। ইনসাইড 'র' বই থেকে জানা যায়, ১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পার্শ্ববর্তী কোন একটি দেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'র'-এর 'স্টেশন চীফ' সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স পরিচালকের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখেন। এর উদ্দেশ্য ছিল যে, 'জনসমক্ষে কোন কিছুর প্রকাশ না ঘটিয়ে যুদ্ধরত যে কোন পক্ষ যদি শান্তিপূর্ণ সমাধানে এসে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চায়, তবে তার ব্যবস্থা করা।' স্বাধীন বাংলাদেশে ভারতবিরোধী বলে পরিচিত জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থী দলের কতিপয় নেতার সাথেও এ ধরনের 'শান্তিপূর্ণ বন্ধুত্ব' গড়ে তোলার লক্ষ্যেই 'র' তৃতীয় একটি দেশে যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। অপরপক্ষে ভারতীয় লবি ঠিক রেখে নিজেদের নিরাপদ রাখা ও ভবিষ্যতে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ পরিষ্কার করার জন্যই এসব জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। তবে নগদ নারায়ণ লাভ ও আ'লীগ সরকার যাতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে ডিসটার্ব বা দুর্নীতির মামলা দায়ের না করে সেসবের নিশ্চয়তা পাওয়াও হচ্ছে এই বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায় যে, বিএনপির অন্তত দু'জন নেতা সাম্প্রতিক বছরগুলোয় 'র'-এর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে গড়ে তুলেছেন। এরা প্রায়শই সিঙ্গাপুরে যান ব্যবসা বা চিকিৎসার নাম করে। ভারতে না গিয়ে সিঙ্গাপুরে যাওয়ায় তারা যেমন সন্দেহের বাইরে থাকেন, তেমনি 'র' অপারেটিভগণও অনেকটা নিরাপদবোধ করেন তাদের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে। জানা যায়, একটি উন্মুক্ত দেশ হিসেবে সিঙ্গাপুরে রয়েছে 'র'-এর শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। থাইল্যান্ডের ব্যাংকক নগরীর পাশাপাশি এখান থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তৎপরতায় চালায় 'র'। এছাড়া এসব স্থানে রয়েছে প্রচুর প্রভাবশালী ভারতীয় ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি। তাই এদের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে কারো সন্দেহের উদ্রেক না করে

লিয়াজোঁ করা সম্ভব হয়। আলোচ্য দু'জন নেতার ক্ষেত্রেও তাই। সূত্র মতে গত বছরখানেকের মধ্যে সিঙ্গাপুর যাবার পর এদের সাথে 'র' কর্মকর্তারা সরাসরি দেখা না করে ভারতীয় দু'জন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। এছাড়া বাংলাদেশী একজন ব্যবসায়ী, যার সিঙ্গাপুরের নর্থ ব্রিজ রোডে অফিস রয়েছে, তিনিও মধ্যস্থতাকারীরূপে নেতৃত্বদ্বয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করেন বলে জানা যায়। মানি এক্সচেঞ্জের একজন বড় ব্যবসায়ী এই ভদ্রলোক, যার নামের আদ্যক্ষর 'জ', তিনি গত ক'বছরে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন অজানা সাহায্যের সূত্র ধরে। এদিকে ভারতীয় যে দু'জন ব্যবসায়ী জাতীয়তাবাদী নেতৃদ্বয়ের সাথে সিঙ্গাপুর কানেকশন গড়ে তুলেছেন সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এদের একজনের নামের একাংশ-'মোদি' যার অফিস সিঙ্গাপুরের 'শেলটন ওয়ে'-তে ও অপরজন একজন শিপিং ব্যবসায়ী, যার মূল অফিস রয়েছে হংকং-এর আলেকজান্দ্রা হাউসে। জানা যায়, এ দু'জন নেতা 'র' চ্যানেলে যোগাযোগ গড়ে তোলার পর থেকে উল্লেখ বিএনপি নেতৃদ্বয় বেশ নিরুপদ্রব জীবন কাটাতে পারছেন, আওয়ামীপন্থী পত্র-পত্রিকাতেও পাচ্ছেন বিএনপি'র প্রগতিশীল অংশ হিসেবে ব্যাপক কভারেজ এবং শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এদের একজন অতি শীঘ্র আবার সিঙ্গাপুরে যেতে পারেন এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। **(দৈনিক ইনকিলাব, ৫/১২/২০০০)**

ইরফান রাজাকে নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটলেও মুচকুন্দ দুবে, পট্টনায়েক, অজিত পাঁজাকে নিয়ে টুঁ শব্দটি হয়নি

ডেপুটি হাই কমিশনার ইরফান রাজাকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে পাকিস্তান। নিঃসন্দেহে ইরফান রাজা কূটনৈতিক শিষ্টাচার বর্জিত কাজ করেছেন। আঘাত দিয়েছেন এদেশবাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়। পাকিস্তানী এই কূটনীতিকের বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে এ ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক্ষমার অযোগ্য। ১৯৭১-এর যুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত একজন মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন, ইরফান রাজার কথা থেকেই বোঝা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক চক্র এদেশের জনগণ সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করত। কথাটি ঠিক। শতকরা একশ' ভাগ সত্য। ইরফান রাজা চলে গেছেন। আমরা সবাই খুশি। কিন্তু এক সময় প্রকাশ্য রাস্তায় বাংলাদেশী এক গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে চড় মেরেও ভারতীয় হাই কমিশনার মুচকুন্দ দুবেকে চলে যেতে হয়নি বাংলাদেশ থেকে। এজন্য ক্ষমাও চাননি তিনি। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই, পাকিস্তান ও ভারতের কূটনৈতিক মনোভাব প্রকাশে পার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে একটি গল্পের উল্লেখ করা যায়। একদিন গ্রামের রাস্তা দিয়ে এক আফগান খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার পায়ে বিধলো রাস্তার পাশের এক কাঁটাগাছের কাঁটা। আফগান তো মহাক্ষ্যাপা। পার্শ্ববর্তী এক গ্রাম থেকে একটি দা নিয়ে এসে কাঁটা গাছটি কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিল বেচারা। ক'জন দাড়িয়ে দেখল এ দৃশ্য। কিছুক্ষণ পর ঐ রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এনে একজন ভারতীয়। রীতিমত অহিংস বেশভূষা তার। 'পণ্ডিত' মানুষ। তারও পায়ে বিধলো অন্য একটি গাছের কাঁটা। না, মোটেও রাগ করলেন না পণ্ডিত মশায়। আস্তে করে পা থেকে কাঁটা তুলে আশপাশে দাঁড়ানো দর্শকদের বললেন, ক'সের চিনি নিয়ে আসার জন্য। চিনি আনা হল। পণ্ডিতজী ঘটা করে সবার সামনে চিনি ঢাললেন কাঁটাগাছের গোড়ায়। সবাই তো

অবাক। কোথায় পায়ে কাঁটা ফোটানোর অপরাধে গাছ কেটে ফেলবেন, তা না উল্টো গাছের গোড়ায় চিনি ঢাললেন ভারতীয় পণ্ডিত। সবার প্রশ্নের মুখে পণ্ডিতজী শান্ত-সুমিষ্ট স্বরে বললেন, আহা বেচারা কাঁটাগাছ। স্বভাব খুব তিতা। কিন্তু এটা তো ওর দোষ না। ওকে পরিবর্তন করতে হবে। তাই চিনি দিলাম ওর গোড়ায়। স্বভাব মিষ্টি হয়ে যাবে। চারদিকে ধন্য ধন্য রব উঠল। সকলেই তীব্র নিন্দা জানাল আফগানকে; সাধুবাদ দিল পণ্ডিত মশায়কে-অহিংস পথে সমস্যা সমাধানের জন্য। কিন্তু কেউ জানল না, চিনির জন্য গাছের গোড়ায় পিঁপড়া-পোকা ধরল ঝাঁকে ঝাঁকে। ওরা কুরে কুরে খেল কাঁটাকাছটি। তীব্র যন্ত্রণায় ভুগে ধীরে ধীরে মারা গেল বেচারা।

পাকিস্তানীদের আচরণের পাশাপাশি ভারতীয় আচরণের তুলনা করলে এ গল্পটির কথাই যেন ভাবতে হয় সর্বাগ্রে। আর ভাবতে হয় তাদের কথা, যারা পাকিস্তানী কূটনীতিক প্রত্যাহারে উল্লসিত হলেও ভারতীয়দের যাবতীয় বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতা নিয়ে টু শব্দটিও করেন না। অথচ ইরফান রাজা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে অপমানজনক কথা বলেছেন ভারতীয় পক্ষে তারচেয়ে কম কিছু করা হয়নি বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনা নিয়ে। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় সাত্তার-এরশাদ শাসনামলে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মুচকুন্দ দূবের কথা। '৮২ সালের প্রথম দিকে তিনি প্রকাশ্য রাজপথে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) সংস্থার একজন কর্মকর্তাকে চড় মেরেছিলেন। অথচ এ নিয়ে স্বাধীনতার কথিত 'পক্ষের শক্তি' টুঁ শব্দটিও কনি। ভারত সরকারকে মাফ চাওয়ার দাবীও তারা জানায়নি। বরং মুচকুন্দ দূবে আরও ক'বছর বাংলাদেশে দায়িত্ব পালন করে গেছেন দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে। এরপর ১৯৯১ সালের নির্বাচনের সময় 'ওপার বাংলা' থেকে এলেন আনন্দবাজার গ্রুপের 'পাক্ষিক সানন্দা' পত্রিকার সম্পাদিকা অপর্ণা সেন। তিনি নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসলেও বাংলাদেশের অন্যতম বড় দল বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করেননি। শুধুমাত্র শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করেই ফিরে যান কলিকাতায়। ২৭ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হলে মাথা খারাপ হয়ে যায় আনন্দবাজার গ্রুপের। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২ মার্চ '৯১ সংখ্যা 'দৈনিক আনন্দবাজার' পত্রিকায়। সেখানে বলা হয়, 'নিষ্ঠুর বাস্তবকে মানিতে হইলে বাংলাদেশের জনসাধারণের বরং উচিত হইবে ভারতের সহিত মিলিত হইবার দাবী উত্থাপন করা।' আশা করা গিয়েছিল, স্বাধীনতার চেতনার সোল এজেন্সী যাদের তারা অন্তত এ ধরনের দাবীর প্রেক্ষিতে ফুঁসে উঠবেন, দাবী জানাবেন আনন্দবাজার গ্রুপের 'সাপ্তাহিক দেশ' ও 'পাক্ষিক সানন্দা' পত্রিকা নিষিদ্ধের। কিন্তু সে ধরনের কিছুই হয়নি। বরং এর বছর খানেকের মাথায় যখন দেশ পত্রিকায় বাংলাদেশকে 'তথাকথিত' বলে চিহ্নিত করা হয় তখন উল্টো এই পত্রিকাটি নিষিদ্ধকরণে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ উঠেছে এই মহল থেকে। একই কারণে এরা নিশ্চুপ থেকেছে ভারতীয় নাট্য শিল্পী শাওলি মিত্র কর্তৃক বাংলাদেশীদের 'বাস্টার্ড' হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রেও এই মহল থেকে শাওলি মিত্র এ ধরনের মন্তব্য করলেও তাকে কলিকাতা ফিরে যাবার পূর্বে 'আন্তরিকতা পূর্ণ' বিদায় জানানো হয়। এ ধরনের আরও বহু ঘটনা ঘটেছে এদেশে। এমনকি একজন ভারতীয় কূটনীতিবিদ ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরের দরজায় লাথি মেরেও পার

পেয়ে যান। জানা যায়, ভারতীয় দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব (শিক্ষা) দীনেশ কুমার পট্টনায়েক এক অনুষ্ঠানে এসে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের দরজায় উপস্থিত দর্শকদের সামনে সজোরে লাথি মারেন। এ নিয় সে সময় তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি হলেও সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দূতাবাস বা কূটনীতিবিদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানানো হয়নি। এ প্রসঙ্গে '৯৭ সালে ২৫ এপ্রিল সংখ্যা দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায় যে, এ ধরনের 'বীরত্বসূচক' কাজের পুরস্কার হিসেবে মিঃ পট্টনায়েককে পদোন্নতি প্রদান করে ভারত সরকার। এছাড়া ঐ একই সময়ে ভারতীয় দূতাবাসে শিক্ষা উপদেষ্টার আড়ালে কর্মরত 'র' কর্মকর্তা বিষ্ণু প্রসাদ সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদকে অত্যন্ত শ্রুতিকটু ভাষায় ভারত ভ্রমণের লক্ষ্যে ভিসা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। প্রাপ্ত তথ্য মতে, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আজমীর শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভারতের ভিসা চাইলে তাকে 'ভারত বিরোধিতার' জন্য ভিসা প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো হয়। শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে বিষ্ণু প্রসাদের এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার কথা না থাকলেও তিনি কনস্যুলার বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন ব্যারিস্টার মওদুদকে অপদস্থ করার জন্য। এ জাতীয় ঘটনা পুরো জাতির জন্য অবমাননাকর হলেও এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার মওদুদের রাজনৈতিক আদর্শের বিরোধী সকলে 'আহ্লাদিত' হয়েছিলেন বলেই মনে হয় এবং যেহেতু একজন 'র' কর্মকর্তা ব্যারিস্টার মওদুদকে অপদস্থ করেছেন সে জন্য এদেশের 'ভবদীয় শিষ্যগণ' থেকেছেন স্পিকিটি নট।

ভারতীয় চ্যানেল মেইনটেইন করায় তারা হয়তো ভারতীয় পক্ষের এ ধরনের আচরণ ও আহবানকে 'অহিংস' বলেই ভাবেন যেমন ভাগ হয়েছিল এ প্রতিবেদনে উল্লেখিত গল্পের ভারতীয় 'পণ্ডিত মশাই'কে নিয়ে। আসলে হাজার মাইল দূরের পাকিস্তান বাংলাদেশ গ্রাস করছে, পাকিস্তানপন্থী স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে এ দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন-এমন প্রচার চালিয়ে বাংলাদেশে পরিচালিত তৎপরতা আড়াল করাই হচ্ছে 'র'-এর অন্যতম সাফল্য। এবং এক্ষেত্রে তারা যে পুরোপুরি সফল হয়েছে তা নিয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশেষ করে 'ডবল স্ট্যান্ডার্ড মাউথপিস' তৈরীতে 'র'-এর দূরদর্শিতায় মহল বিশেষের নর্তন-কুর্দন দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। (দৈনিক ইনকিলাব, ৬/১২/২০০০)

চারদলীয় জোটের আন্দোলন নস্যাত, রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ ও পত্রিকা প্রকাশের জন্য বিশেষ চ্যানেলে অর্থ জুগিয়েছে 'র'

কাওরান বাজারের একটি বেসরকারী ব্যাংকে এক ভদ্রলোক এলেন একাউন্ট খোলার জন্য। বিপুল অংকের টাকা রাখবেন চলতি হিসাবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চাইলেন, বললেন ইন্ট্রোডিউসার বা পরিচয় সত্যায়নকারীর স্বাক্ষর ও একাউন্ট নম্বর উপস্থাপন করতে হবে। রাজি হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার ভাবভঙ্গি ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি বিবেচনা করে বুঝতে পারলেন তার পরিচয়, ঠিকানা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তাই বেশ বড় অংকের টাকার কথা বলা হলেও তারা গড়িমসি করলেন একাউন্ট খোলার ব্যাপারে। কিন্তু ঐ ব্যাংকেই একজন গ্রাহক যিনি একটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলর 'কঠোর জাতীয়তাবাদী'

নেতা তিনি ইন্ট্রোডিউসার হিসেবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন 'ভদ্রলোকের' একাউন্ট খুলে দেয়ার জন্য। নামজাদা ব্যক্তি তিনি। এক সময় মন্ত্রীও ছিলেন। অতএব এক পর্যায়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ একাউন্ট খুলতে রাজি হলেন। যথারীতি একাউন্ট খোলা হলো। কোটি কোটি টাকা জমা হলো ব্যাংক হিসাবে। সে সময় কেবলমাত্র চারদলীয় জোট গঠিত হয়েছে। ২০০০ সালের জানুয়ারীতে ঈদুল ফিতর-এর পর তুমুল গণআন্দোলন গড়ে তোলার কথা শোনা যাচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। এ নিয়ে সরকার বিরোধী পক্ষে যেমন আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে, তেমনি ভারতীয় লবির নাওয়া-খাওয়াও হারাম হয়ে গেছে। ফলে এ মহলটি মরিয়া হয়ে ওঠে চারদলীয় জোট ভেঙে দেয়ার জন্য। নিদেনপক্ষে আন্দোলন কর্মসূচী শিথিল করার লক্ষ্যে বিরোধী দলগুলোয় অনুপ্রবিষ্ট এজেন্টদের প্রচুর পরিমাণে টাকা দিয়ে 'ঠান্ডা' করে দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, কাওরানবাজারের উল্লিখিত ব্যাংকে গচ্ছিত বিপুল অংকের টাকা সে সময় খরচ করা হয় তড়িঘড়ি করে। মাত্র মাসখানেকের মধ্যে ঐ একাউন্টে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। সূত্র মতে, এই টাকা ব্যয় করা হয়েছিল বিরোধী দলের কতিপয় নেতাকে হাত করা ও সংবাদ মাধ্যমে সমন্বিত প্রচারণা চালানোর জন্য। এক্ষেত্রে 'র' সফল হয়েছে বলেই ধারণা করা যায়।

অবশ্য এর আগেও 'র' বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য বিপুল অংকের টাকা গোপনে বিলি-বন্টন করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

গোয়েন্দা সংস্থার কর্মরত একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, নাশকতামূলক তৎপরতা চালানো ছাড়াও রাউন্ড দ্য ক্লক অর্থাৎ দিন-রাত ২৪ ঘন্টা দেশব্যাপী অসহযোগ কর্মসূচী নিশ্চিত করার জন্য কম টাকার প্রয়োজন হয়নি। বরং এ জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে বিএনপি সরকারের পতন ঘটাবার লক্ষ্যে। তার দেয়া তথ্য মতে, '৯৬ সালের নির্বাচন পর্যন্ত 'র' এদেশে প্রায় ৭-৮শ' কোটি টাকা খরচ করে। তিনি আরো জানান, '৯৬-এর অসহযোগ পরিচালনাকালীন সিলেট অঞ্চলের একজন রাজনীতিবিদের ভাগিনী ও একজন চিত্রনায়িকার মাধ্যমে 'র'-এর স্টেশন চীফ মিঃ পান্থ ব্যাংক থেকে টাকা তোলাতেন ও নির্দেশানুযায়ী সে টাকা বিলি করতেন উল্লিখিত দু'জন মহিলা।

এভাবে এক সময় এ দেশে একটি দৈনিক পত্রিকাকে দাঁড় করানোর জন্যও 'র' বিপুল পরিমাণ অর্থ গোপনে সরবরাহ করে থাকে যাকে ফান্ড রেইজিং-ও বলা যায়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১৯৯৩-৯৪ সালের দিকে 'র' তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যাপকভাবে জনমত প্রভাবিত করার কথা বিবেচনা করে। বিশেষ করে তাদের একটি মউথপিস তৈরী করাই ছিল 'র'-এর মূল লক্ষ্য। এ জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর অর্থের কিন্তু সরাসরি এত টাকা দেয়া সম্ভব ছিল না। তাই বিশেষ কৌশলের আশ্রয় নেন 'র' কর্মকর্তাগণ। পরিকল্পনা মতে, ভারতের একটি বহুল পরিচিত সাবান ও ডিটারজেন্ট কোম্পানীর সহায়তা নেন তারা। এক্ষেত্রে আন্ডার ইন ভয়েসিং অর্থাৎ ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার লক্ষ্যে সরকারী নথিতে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্য লেখা হয়। টাকা নগদ ভারতে পরিশোধ করার কথা তা করা হত না। পক্ষান্তরে ভারতীয় ঐ সাবান ও ডিটারজেন্ট উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে সে টাকা ক্যাশ করে নেয়া হত বাংলাদেশ থেকে। এছাড়া ঐ সাবানের বিজ্ঞাপন করার নামে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হত। তবে এক্ষেত্রে নগদ টাকা না

দিয়ে সমপরিমাণ টাকার পণ্য বিনামূল্যে সরবরাহ করত সাবান কোম্পানী। এরপর বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার অনেক কম টাকার বিজ্ঞাপন দেয়া হত রেডিও, টিভিতে। জানা যায়, ১০ কোটি টাকা বিজ্ঞাপন বাবদ বরাদ্দ করে খরচ করা হত ২/৩ কোটি টাকা। সাবান বিক্রি করে বাকী টাকা চলে যেত ঐ পত্রিকার ফান্ডে।

ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা যে এভাবে রাজনৈতিক দলকেই অর্থ জোগান দেয় তা নয় বরং বাংলাদেশের সকল খাতেই প্রভাব বিস্তার করার জন্য 'বিশেষ ভাতার' ব্যবস্থা তাদের রয়েছে। ১৯৯১ সালে উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগে 'র' এ দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক এমনকি প্রচারণা মাদ্যমেও কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে যেখানে তাদের লক্ষ্য হল মানসিকভাবে বাংলাদেশীদের ভারতীয়করণ করা। ১৯৯১-এরপর বেগম খালেদা জিয়ার সরকার সবকিছুতে 'অবাধ' নীতি অনুসরণ করায় 'র'-এর পক্ষে এ ধরনের পরোক্ষ বা উমভশণর্র তৎপরতা চালানো সহজ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছিল। খালেদা জিয়ার শাসনামলে 'র' এসব খাতে কত টাকা ব্যয় করে তার সুনির্দিষ্ট কোন হিসাব পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে।

এদিকে ১৯৯৪-৯৬ পর্যন্ত বিএনপি সরকারবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা, বিশেষ করে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের ব্যয়ভার মেটানোর জন্য কোটি কোটি টাকা বিশেষ চ্যানেলে বিতরণ করা হয় বলে জানা গেছে।

এভাবে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ঐ পত্রিকাকে দেয়া হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র উল্লেখ করে এবং এখনো এ ধরনের কৌশলে টাকা পেয়ে আসছে পত্রিকাটি। উল্লেখ্য, সে সময় ভারতীয় ঐ সাবান ও ডিটারজেন্টের বিজ্ঞাপনে বাংলাদেশের সকল অঞ্চল সয়লাব হয়ে গিয়েছিল। এক পর্যায়ে বেশ বাজারও পেয়ে যায় ঐ কোম্পানীর পণ্য। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো উল্লিখিত 'র' ভয়েস প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর কোন কারণ ছাড়াই ভারতীয় ঐ সাবান কোম্পানী এদেশে ব্যবসা গুটিয়ে নেয়। বিশেষ করে '৯৬- এর নির্বাচনের পর এক বছরের কম সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় বাংলাদেশে। এছাড়া সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য মতে, আলোচ্য পত্রিকাটির নাম ভারতের একটি বড় কোম্পানী রিলায়েন্স গ্রুপের অংশীদার হিসেবে মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জেও তালিকাভুক্ত ছিল। অবশ্য পরবর্তীতে এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি শুরু হলে সে নাম প্রত্যাহার করে নেয় রিলায়েন্স গ্রুপ। এদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে জন্মলগ্ন থেকেই উক্ত পত্রিকাটি যাবতীয় উপায়ে ভারতীয় পারপাস সার্ভ করে আসছে। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকগণ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টের উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, ১৯৯৭-'৯৮ সালে যখন ভারতের পারমাণবিক বোমা তৈরীতে ইসরাইলী সহায়তা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন এই পত্রিকাটির একটি লীড রিপোর্টে বলা হয়, 'পাকিস্তান পারমাণবিক বোমা তৈরী করেছ ইসরাইলী প্রযুক্তিগত সাহায্য নিয়ে। মূলত এই রিপোর্টের মধ্যমে বাংলাদেশের মুসলমানদের এটাই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল যে, পাকিস্তান মুসলিম দেশ হওয়ার পরও ইহুদীদের ঘনিষ্ঠ মিত্র। অথচ, ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। এভাবেই এই পত্রিকাটি অব্যাহতভাবে 'র'-এর মাউথপিস হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে যেখানে এরা খুব সাফল্যের সাথে গড়ে তুলেছে এক বিশাল সমর্থক শ্রেণী।

(দৈনিক ইনকিলাব, ১৩/১২/২০০০)

ইরফান রাজার মতো তাকেও বহিষ্কার করা উচিত
কূটনীতিক পরিচয়ের আড়ালে কে এই 'র' স্টেশন চীফ

এদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনায় বাংলাদেশস্থ 'র' প্রধানকে কেন তার কূটনৈতিক পরিচয় প্রকাশ করে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে না তা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এছাড়া কিভাবে সরকারী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সার্ভেইল্যান্সের মধ্যদিয়ে তিনি জেলখানায় প্রবেশের সুযোগ পেলেন তাও বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে সবার কাছে। তবে যেভাবে যে প্রস্তাব দিয়ে 'র' স্টেশন চীফ জেলখানা ঘুরে এসেছেন সে ক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তা ও সংশ্লিষ্টতা না থাকলে তা সম্ভব নয় বলেই ধরে নেয়া যায়। পর্যবেক্ষকদের মতে, কূটনীতিকের ছদ্মবরণে ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরত এই গোয়েন্দা কর্মকর্তার এ জাতীয় ঔদ্ধত্য নিঃসন্দেহে একপক্ষীয় ব্যাপার নয়, বরং তা দ্বিমুখী ব্যবস্থাপনারই ফসল। এদিকে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর বাংলাদেশস্থ স্টেশন চীফ সম্পর্কে একটি সূত্র জানায় যে, 'ম' আধ্যাক্ষরের এই ব্যক্তি ভারতীয় দূতাবাসে কাউন্সিলর পদে কর্মরত রয়েছেন। তবে এটি তার কভার পোস্টিং এবং তিনি মূলত ভারতীয় পাবলিক সার্ভিসের ইন্টেলিজেন্স ক্যাডার অর্থাৎ 'আরএএস' (RAS, Research and Analysis Service)-এর কর্মকর্তা। আরো জানা যায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে টোপে ফেলার জন্য তিনি তার স্ত্রীকেও নিয়োজিত করেছেন। যেমন এক সময় করেছিলেন ১৯৯১-৯৩ সালে ঢাকায় কর্মরত 'র' স্টেশন চীফ এস মহাপাত্র। অবশ্য, সূত্র মতে, মহাপাত্রকে যেখানে বাংলাদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ব্যাপক নজরদারী ও সরকারী প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কাজ করতে হতো সেখানে বর্তমান স্টেশন চীফ পাচ্ছেন উন্মুক্ত বিচরণের' পরিবেশ।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল বাংলাদেশের স্বকীয়তা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষার প্রশ্নে এই তথাকথিত কূটনীতিবিদকে এদেশ থেকে অবিলম্বে বহিস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে পাক কূটনীতিবিদ ইরফান রাজাকে স্বাধীনতা বিরোধী মন্তব্য করায় সরকার তাকে বহিস্কার করে যে বিজ্ঞজনোচিত কাজ করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে ভারতীয় দূতাবাসে কূটনীতিকের পরিচয়ে কর্মরত 'র' স্টেশন চীফকেও বহিষ্কার করা উচিত। (দৈনিক ইনকিলাব, ২১/৩/২০০১)

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে ভারতের অপপ্রচার ॥ আইএসআই কানেকশন আবিষ্কারের চেষ্টা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা-ডিজিএফআই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যের গেরিলা তৎপরতায় ইন্ধন জুগিয়ে আসছে এ ব্যাপারে ভারত হঠাৎ সোচ্চার হয়ে ওঠে ১৯৯৩-'৯৪ সালে। সে সময় বিভিন্ন ভারতীয় পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রচারণা চালানো হয় যে, পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সহায়তায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই 'সাতকন্যার' স্বাধীনতাকামী গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ও সমরাস্ত্র

সরবরাহ করছে। এমনকি ভারতের সরকারী পর্যায় থেকেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠানো হয়। এ ব্যাপারে ১৯৯৪ সালের ২৩ জানুয়ারী ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে আইএসআই ভারত বিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছে। মন্ত্রী উল্লেখ করেন, তার কাছে এই সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণাদিও রয়েছে। সে সময় ভারত সরকার এই অজুহাতে নাগাল্যান্ড ও মনিপুরসহ ভারতের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে কথিত ভারতবিরোধী তৎপরতার অজুহাতে 'সতর্কাবস্থায় থাকার' নির্দেশ প্রদান করে। তবে এসবের উদ্দেশ্য যে বাংলাদেশকে 'বলির পাঠা' বানানো ও বিশেষ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে 'ডিফেম' করা তা নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অপপ্রচার সম্পর্কে মার্চ '৯৪-এ ঢাকার সাপ্তাহিক আগামী' পত্রিকায় বলা হয়, "বাংলাদেশ ভারতীয় অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে ভারতীয় সকল প্রচার প্রচারণা সর্বৈব মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, প্রতিবাদ জানানোর পরও ভারতীয় মিথ্যা ও বিদ্বেষ প্রসূত প্রচার-প্রচারণা দুঃখজনক। এদিকে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় এ ব্যাপারে ভিন্নমত প্রকাশ করা হয়েছে। সম্প্রতি ভারতের প্রভাবশালী দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়া এক সংবাদ বিশ্লেষণে বলেছে, বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্য থেকে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ভারতবিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে বলে যে সব প্রচার-প্রচারণা চলছে এর সপক্ষে কোনো প্রমাণাদি নেই। বিশ্লষণে বলা হয় ভারতের আগামী বাজেটে গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধির পক্ষে যুক্তি দেখানোই এই প্রচার প্রচারণার আসল উদ্দেশ্য। ঢাকার কর্মকর্তারা জানান, আনুষ্ঠানিকভাবে অচিরেই ভারতের নিকট এর প্রতিবাদ জানানো হবে। ইতিপূর্বে ভারতের পানি সম্পদ মন্ত্রী মিঃ শুকলা অভিযোগ করেছিলেন, বাংলাদেশ আসামের বিদ্রোহী উলফা গেরিলাদের সহযোগিতা করছে। এ অভিযোগও ভারত প্রমাণ করতে পারেনি। বিদ্রোহ দমনের অভিযোগ তুলে ভারত মূলত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আগ্রাসন চালাতে চায়। ধারণা করা হচ্ছে ভারত এ ব্যাপারে বর্তমানে প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যতো বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ ঘটার কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করে ভারত পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করতে চাচ্ছে।"

এদিকে আ'লীগ সরকারের সময়ও ভারতের এ সংক্রান্ত প্রচারণা থেমে থামেনি। এব্যাপারে দৈনিক দিনকালে ১৯৯৭ সালে লেখকের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়ঃ কূটনৈতিক ও কৌশলগত পর্যায়ে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার যাবতীয় উপায়ে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করে চললেও ভারত এখনো অব্যাহতভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সেনা গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও বিপরীতে সেই

সরকারেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের বিষোদগার সংশ্লিষ্ট মহলে যুগপৎ সংশয় ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতর বা ডিজিএফআই নিয়ে ভারতীয়দের সাম্প্রতিক মাথাব্যথা বেশ রহস্যজনক বৈকি।

১২ জুন '৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলোয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই-এর বিরুদ্ধে যে হারে অপপ্রচার চালাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়ার একটি সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় ১৮ এপ্রিল '৯৭ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন এ আশঙ্কাকে আরো বদ্ধমূল করেছে। 'Looking for Peace' শিরোনামে প্রকাশিত উক্ত প্রতিবেদনে কোন রাখঢাক না রেখেই বলা হয় 'আইজ্যাক মুইভা'র নেতৃত্বাধীন ন্যাশনালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড এর বেশ ক'টি ঘাঁটি রয়েছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতর বা ডিজিএফআই পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স বা আইএসআই-এর সাথে মিলিতভাবে উপরোক্ত গেরিলা গ্রুপগুলোকে সহায়তা করে আসছে। যদিও আলোচ্য প্রতিবেদনে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর ভারতীয় গেরিলা দলগুলোকে বাংলাদেশে সরকারিভাবে সাহায্য করছে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এ সাথে এখনো ডিজিএফআই-এর তত্ত্বাবধানে অনেক ক্যাম্প বাংলাদেশে রয়েছে বলে উল্লেখ করতেও উক্ত পত্রিকাটি পিছপা হয়নি।

এবারই যে ভারতীয় পত্রিকায় ডিজিএফআই ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানী আইএসআই-এর সঙ্গে জড়িয়ে অপপ্রচার চালানো হয়েছে তা নয় বরং এর বিরুদ্ধে ভারতীয় চক্রান্ত অনেক পুরানো। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ক্ষমতায় এসে যখন স্বতন্ত্র স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষানীতি অনুসরণ করা শুরু করে ঠিক তখন থেকেই ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় এমনকি সরকারি মহল থেকেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে উত্তর-পূর্ব ভারতের গেরিলাদের সহায়তার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। বিশেষ করে ডিজিএফআই-এর সাথে 'ঘনিষ্ঠ' সম্পর্ক রাখার কথা সেবারই প্রথম আলোচনায় উঠে আসে। তদানীন্তন সরকার এসবের কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে সন্দেহজনক এলাকায় বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষণ চালানোর আহবান জানালেও ভারত সরকার কখনোই বাংলাদেশের আহবানে সাড়া দেয়নি। বরং অব্যাহতভাবে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে এতদসংক্রান্ত একটির পর একটি নিত্য নতুন অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে। সে সময় ভারত কিভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল তার একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ অশোক এ বিশ্বাস-এর একটি উদ্ধৃতি। ভারতের ইন্সটিটিউশন অফ স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট উক্ত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের 'দি নিউ নেশন' পত্রিকার ৩১ আগস্ট '৯৪ তারিখে প্রকাশিত

RAW's role in furthering India's foreign policy শিরোনামের এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আইএসআই-এর সাথে সংশ্লিষ্টতার হুজুগ তুলে সেনাবাহিনীতে 'এন্টি-পাকিস্তান' প্রেপাগান্ডা উসকে দিচ্ছে।

এদিকে গত সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারত বর্তমান সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচারণায় তারা একটুও বিরতি দেয়নি। বরং বর্তমান সরকারের ভারতমুখী অবস্থান তাদের অপপ্রচারণার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বলে ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট হতে বোঝা যায়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিমূলক একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৩ আগস্ট '৯৬ সংখ্যা দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায়। 'খালেদা পন্থী ফৌজি কর্তাদের হাসিনা ঢাকা থেকে হটালেন' শিরোনামের উক্ত প্রতিবেদনে আগস্ট '৯৬-এ সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের যাদের ঢাকা থেকে অন্যত্র বদলি করা হয় তাদের সবাইকেই আওয়ামী লীগ বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে উক্ত সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলা হয়, "তারা বিএনপি বিরোধী আন্দোলন চলাকালে শুধু আওয়ামী লীগের তীব্র বিরোধিতাই করেনি বরং তারা নাকি আওয়ামী লীগের সাথে ঘনিষ্ঠ ক'জন জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ারকে গুলি করার ইন্ধন যুগিয়েছিলেন।" এ ধরনের চরম মিথ্যাবাদিতা ও উসকানির আশ্রয় নেয়া ছাড়াও ভারতের পত্র-পত্রিকাগুলোতে সেনাবাহিনী সম্পর্কে এমন কৌশলে রিপোর্ট প্রকাশ হয় যা খুব সুক্ষ্মভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সেনাবাহিনীর কথিত অবাধ্যতার দিকে আলোকপাত করে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত।

অন্যদিকে বর্তমান সরকার প্রধান শেখ হাসিনা নিজে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকার পরও তার উদ্ধৃতি দিয়ে গত ১৯ ডিসেম্বর '৯৬ সংখ্যা 'দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় 'Will Bangladesh now cut off support to Northeast Insurgents' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তদানীন্তন ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আইকে গুজরালের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মাটিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের গেরিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও লজিষ্টিক সুবিধা প্রদানের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তার দেশে ভিনদেশী গেরিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে কথিত অভিযোগ প্রকাশ্যে স্বীকার করতে পারেন কিনা এবং এতে নিজ দেশের স্বার্থ কতখানি সংহত হয় সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও বাস্তবে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তার এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত।

এদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের ব্যাপারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই-এর কথিত সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি খোদ ভারতীয় পার্লামেন্টেও উত্থাপন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এ নিয়ে লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে তদানীন্তন

ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ইন্দ্রজিত গুপ্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই'কে অভিযুক্ত করে বলেন 'পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সংশ্লিষ্টতা ছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে বাংলাদেশী গুপ্তচর সংস্থা বিশেষ করে ডিজিএফআই-এর প্রত্যক্ষ ইন্ধন রয়েছে।' অবশ্য ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ ধরনের সরকারী বিবৃতি প্রদানের প্রায় মাস খানেক পূর্বে গত '৯৬ সালের নভেম্বরে ভারতীয় বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তাদের 'রেইজিংডে'তে উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই-এর কথিত সংশ্লিষ্টতা নিয়ে ১০ পৃষ্ঠার একটি 'প্রেস নোট' প্রকাশ করে। এই প্রেসনোটে বলা হয়, 'বাংলাদেশী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সক্রিয় সহায়তায় থাইল্যান্ড থেকে আনীত অস্ত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো গেরিলা দলগুলোর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।.... এবং আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এসব গেরিলা সংগঠনকে করে যাচ্ছে অপার সহযোগিতা।'

সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই-এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সাথে সম্পর্ক রাখার অভিযোগ উত্থাপন করে ভারত মূলত বাংলাদেশের স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা কাঠামোকে ধ্বংস করে দিতে চায়। এটা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, বর্তমান ভারতপন্থী আওয়ামী লীগ সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতের গেরিলা তৎপরতাসহ অন্যান্য ইস্যুতে ভারতের স্বার্থের অনুকূলে পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও ভারতের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর উদ্দেশ্য হলো গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মাঝে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবস্থান নড়বড়ে করে দেয়া। তবে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হলো এ নিয়ে বর্তমান সরকারের নিশ্চুপ অবস্থান গ্রহণ। সরকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সরকারকে 'ওভারলুক' করে অপপ্রচারের অন্তর্নিহিত রহস্য কি, তাই এখন সচেতন মহলকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলছে।

অধ্যায়-১০

বাংলাদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত 'র' কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড

মিঃ মহাপাত্র ও তাঁর ড্যান্সার স্ত্রী

১৯৯১ সালের পর বাংলাদেশে 'র'-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন মি. মহাপাত্র। ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসে কূটনীতিকের ছদ্মাবরণে তিনি ছিলেন ইন্টেলিজেন্স ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা[১]। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয়তাবাদী সরকারকে যাবতীয় কৌশলে দূর্বল করে তোলার গোপন উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ব্যাপকাকারে তার তৎপরতা পরিচালিত করেছেন। এমনকি তার গুপ্তচরবৃত্তিতে সহায়তা করার জন্য তার স্ত্রীকেও নিয়োজিত করেছিল 'র'। এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় যে, 'র' প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী অপারেটিভের স্ত্রীকেও গুপ্তচরবৃত্তিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে[২]। একইভাবে মি. মহাপাত্রের স্ত্রীও ছিলেন একজন সুপ্রশিক্ষিত গুপ্তচর। এছাড়া এই মহিলা খুব ভাল কথক নাচ নাচতে পারতেন। মিসেস মহাপাত্রকে কিভাবে গুপ্তচরবৃত্তিতে কাজে লাগানো হতো সে সম্পর্কে একটি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক মহাপরিচালক জানান, ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত বিএনপি সরকারের শাসনামলে প্রায়শই ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে কথক নাচের আয়োজন করা হতো। সেখানে মি. মহাপাত্রের সুপ্রশিক্ষিত স্ত্রী থাকতেন আসরের মধ্যমনি। পৃথিবীখ্যাত ভারতীয় কথক নাচের ঐসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হতো দেশবরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে বিরোধী দল এমনকি সরকারের বহু হোমরা চোমড়া মন্ত্রীদের। আপাত নিরীহ নাচ দেখার জন্য সেখানে দাওয়াত কবুল করতে বিএনপি'র কোন মন্ত্রী আপত্তির কিছু দেখতেন না। সরল বিশ্বাসে এরা উপস্থিত হতেন কথক নাচ দেখার জন্য। অথচ, এই নাচের ফাঁকে ফাঁকে বা আপ্যায়নের সময় মি. মহাপাত্রসহ ভারতীয় কূটনীতিকদের ছদ্মাবরণে থাকা 'র' অপারেটিভগণ মন্ত্রী, এমপি'দের কাছ থেকে আলাপছলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন লাভ করতেন তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গেও ভারতের অনুকূলে আদায় করতেন অসংখ্য সুবিধা। এভাবে চলেছে বেশ ক'দিন। পরবর্তীতে বাংলাদেশী গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের নজরে আসার প্রেক্ষিতে সরকারি উচ্চপর্যায়ে এনিয়ে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয় এবং একপর্যায়ে এধরনের অনুষ্ঠানে সরকারি দলের সদস্যদের যোগদান বন্ধ হয়ে যায়। তবে তাই বলে যে কথক নাচের আসর সহ বিভিন্নরূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আড়ালে 'র' তার কার্যক্রম স্থগিত করে দিয়েছিল তা কিন্তু নয়। বরং অসংখ্য নাট্যশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, বুদ্ধিজীবী, কলামিস্ট যারা জ্ঞাতসারে বা অবচেতনভাবে 'র'-এর চক্রে জড়িয়ে গিয়েছিলেন তাদের আনাগোনা এসব অনুষ্ঠানে মোটেও হ্রাস পায়নি। তথ্য আদান প্রদান, করণীয় সম্পর্কিত নির্দেশ,

---

১। ১৯৯১ থেকে '৯৬ পর্যন্ত এনএসআই-এর মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত দু'জন উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তার সাথে লেখকের সাক্ষাতকার

২। Asoka Raina, *Inside RAW : History of India's Secret Service*, Chapter-4

লেনদেন ইত্যাদি রুটিন ওয়ার্ক চলেছে স্বাভাবিকভাবেই।

এদিকে এই মহাপাত্রের সাথে তদানীন্তন বিরোধী দলের চিহ্নিত কিছু নেতা যেমন সক্রিয় যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন তেমনি সরকার দলীয় অর্থাৎ বিএনপি'র ক'জন শীর্ষ নেতার সাথে ভারতীয় দূতাবাস কর্মকর্তার গড়ে উঠে বিশেষ সখ্যতা। এব্যাপারে প্রাক্তন একজন শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান[৩] বিএনপি'র দু'জন প্রভাবশালী মন্ত্রীর[৪] সাথে মি. মহাপাত্রের মাখামাখি ছিল ওপেন সিক্রেট। এ দু'জন মন্ত্রীর একজন তো প্রকাশ্যেই মি. মহাপাত্রকে তার বাসায় আমন্ত্রণ জানাতেন আলাপ করার জন্য। এদিকে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী মি. মহাপাত্রকে সার্ভেইল্যান্সে রাখতো ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলো। প্রাত্যহিক নজরদারীর একপর্যায়ে একদিন মি. মহাপাত্রের গাড়ি ফলো করে দেখা গেল তিনি যাচ্ছেন উক্ত মন্ত্রীর বাসায়। এর কিছুক্ষণ পর ঐ মন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে ফোন করলেন অনুসরণকারী অপারেটিভদের সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানকে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানতে চাইলেন কেন মি. মহাপাত্রকে ফলো করা হয়েছে? সংস্থা প্রধান বিনয়ের সাথে কারণ ব্যাখ্যা করলেও মন্ত্রী মহোদয় বেশ চড়া স্বরে উল্টো বললেন, তিনি একজন রাজনীতিবিদ ও অন্যতম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাই তাঁর সাথে 'ওদের' দেখা সাক্ষাতের ব্যাপার থাকতেই পারে।

এভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনের সবদিকে চ্যানেল মেইনটেইন করার পাশাপাশি মি. মহাপাত্র এদেশে সংঘটিত অনেক অঘটনের পিছনেও অদৃশ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ করে একটি কথিত নির্মূল কমিটি গঠন, তসলিমা নাসরীন ইস্যু সৃষ্টি, শান্তিবাহিনী সমস্যাকে যে কোন অজুহাতে সমাধানে বিলম্ব করা ও বাংলাদেশ ভূখন্ড থেকে আই এস আই উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উস্কানী দিচ্ছে এ প্রচারণা চালানোয় মি. মহাপাত্র অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেন।

তত্ত্বাবধায়ক আন্দোলন, বিএনপি শাসনামলের শেষধাপে 'র' তৎপরতাঃ ভারতীয় কূটনীতিকের ছদ্মাবরণে

মি. জে. সি. পান্থের 'র'–বাংলাদেশ ইন চার্জ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ

১৯৯৪-'৯৫ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সকল বিরোধী দল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে গঠিত হয় আ'লীগ-জাপা-জামায়াত ঐক্যজোট। এই তিন বিরোধী দল সে সময় রাজনৈতিক দাবী আদায়ের আন্দোলনে কি ভূমিকা পালন করেছিল তা বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন করে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু'তে কিভাবে আ'লীগের সাথে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির সখ্যতা গড়ে উঠলো তা হয়তো সময়ের ব্যবধানে কোন একসময় প্রকাশিত হবে। কারণ, রাজনীতির সাধারণ সূত্রে আ'লীগের সাথে অন্ততঃ জামায়াতে ইসলামীর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা নয়। এক্ষেত্রে

৩। লেখকের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

৪। এরা দু'জন পরস্পর আত্মীয়

আদর্শিক ক্ষেত্রে দু'টি দলের অবস্থান যেমন দু'মেরুতে তেমনি জামায়াত এর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমকে আ'লীগ কর্তৃক গণআদালত গঠন করে ফাঁসির রায় ঘোষণার প্রসঙ্গ কখনো ঐক্য গঠনের অনুকূল ছিল না। কিন্তু বিএনপি'র আনাড়িপনার কারণেই হোক আর গোপন রাজনীতির কোন অনুষঙ্গের জন্যই হোক আ'লীগ বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে খুব সহজেই জামায়াতে ইসলামীকে কাছে টেনে নেয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবী কোন অযৌক্তিক দাবী ছিল না। পরবর্তীতে বিএনপি কর্তৃক সংসদে এতদসংক্রান্ত বিল পাস ঐ যুক্তিকেই সমর্থন করেছে। তবে যেভাবে, যে কায়দায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবী'র আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া হয়েছে তা এক কথায় ভয়াবহ। পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো কোন দেশে নির্বাচিত সরকার পরিবর্তনের জন্য এরূপ আন্দোলন পরিচালনার ইতিহাস নেই। সে সময় যে হারে ও যে পর্যায়ে সহিংসতা, জ্বালাও-পোড়াও ও সর্বোপরি নাশকতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে তা কখনোই একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। বিশেষ করে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে প্রায় একুশ দিনব্যাপী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে 'আতঙ্কের অধ্যায়' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

এসময় ১৯৯৫ সালের শেষদিক থেকে ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা কিভাবে পর্দার অন্তরালে ভূমিকা পালন করেছে যে বিষয়ে হয়তো প্রত্যক্ষ তথ্য প্রমাণ কখনোই উপস্থাপন করা যাবে না। কিন্তু সচেতন কারো পক্ষে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ এর সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত 'র' বাংলাদেশে একটি 'বন্ধুভাবাপন্ন সরকার' প্রতিষ্ঠায় মরণপন লড়াই-এ মেতে উঠেছিল। ১৯৯১ সালে তাদের হিসেব নিকেশ ভুল হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 'র'-এমনভাবে অগ্রসর হয় যাতে কোন পর্যায়ে ন্যুনতম কোন ভুল না হয় ও যে কোন উপায়ে বিএনপি'র পতন ঘটনো যায়। এজন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের সুযোগে 'র' সকল পর্যায়ে তৎপর হয়ে উঠে। এক্ষত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'র' ১৯৯৪-'৯৫-'৯৬ সালে বিএনপি'র কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়ার পূর্বে ১৯৯১ সাল থেকেই মূলত ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যায়। এ সম্পর্কে সাধারণ বিশ্লেষণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখের দাবী রাখে ঃ

১। ১৯৯১ সালে সরকার গঠনের পর তাৎক্ষণিকভাবে বিএনপি সরকারের পতন ঘটানো বা পতনের ডাক দেয়া সম্ভব ছিল না। তাই ধীরে ধীরে জনমতকে প্রজ্বলিত করার পথে এগিয়ে যায় 'র'। এক্ষেত্রে প্রথমেই সৃষ্টি করা হয় দেশব্যাপী বিশৃংখলা। এলাকাভিত্তিক পর্যায় থেকে শুরু করে দেশীয় পর্যায়ে চলতে থাকে পরিবহন ধর্মঘট, শ্রমিক অসন্তোষ, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ইত্যাদি।

২। সীমান্তব্যাপী বিএসএফ–এর মাধ্যমে ব্যাপকহারে হামলা চালানো হয়। বাংলাদেশ সরকার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে শুরু হয় পুশইন চক্রান্ত। একইসাথে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর মাধ্যমে চলতে থাকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার প্রক্রিয়া। এসময়েই লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুকে কথিত কতগুলো এন.জি.ও ও

মানবাধিকার সংগঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকীকরণ করা হয়। এছাড়া সমগ্র বিএনপি আমলে বাংলাদেশ সরকার শত চেষ্টা করার পরও 'র'-এর পরামর্শে শান্তিবাহিনী সমস্যা সমাধানে কোনরূপ চুক্তি সম্পাদন করতে দেয়া হয়নি। অন্যদিকে বঙ্গভূমি আন্দোলন, মোহাজির সংঘ গঠনের মাধ্যমেও অব্যাহতভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয় বিএনপি সরকারকে। এসব চাপ সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল– 'হয় পথে আস, না হয় এভাবে চাপ দেয়া হবে।'

৩। এদিকে ঘাতক–দালাল নির্মূল কমিটি গঠন ও অধ্যাপক গোলাম আযমের কথিত ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবী নিয়ে সৃষ্টি করা হয় ব্যাপক বিশৃংখলা। বিএনপি সরকারকে তীব্র চাপের মধ্যে রেখে, মানসিকভাবে দুর্বল করে দিয়ে জামায়াত-এর কাছ থেকে সরিয়ে নেয়াই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

৪। একইসাথে তসলিমা ইস্যু সৃষ্টি, জন্মাষ্টমীর মিছিলে হামলা ইত্যাদি ঘটনাকে পুঁজি করে বাংলাদেশকে পরিচিত করা হয় একটি সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে। বিশেষ করে বিএনপি সরকারকে সংখ্যালঘু নিপীড়নকারী হিসেবে চিহ্নিত করায় অহোরাত্রি ব্যস্ত হয়ে পড়ে একটি ভারতপন্থী গোষ্ঠি।

এসবের পাশাপাশি জাপানী পুঁজি বিনিয়োগসহ সকল সম্ভাবনার দ্বার রূদ্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে চালানো হয় সিনক্রোনাইজড্ তৎপরতা। শেষ পর্যায়ে আঘাত হানার লক্ষ্যে অবশেষে সৃষ্টি করা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু। রাজনৈতিক এই আন্দোলনের আড়ালে সেসময় এমনসব ঘটনা ঘটানো হয় যাকে আপাতদৃষ্টিতে 'বিক্ষুদ্ধ জনতা'র রুদ্ররোষ মনে হলেও সচেতন ও ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা নিয়ে ন্যুনতম জ্ঞানের অধিকারী কারো কাছে সেসব নিঃসন্দেহে প্রফেশন্যাল গুপ্তচরবৃত্তি বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিমান বন্দর, রেলস্টেশন গান পাউডার দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া, রেললাইন উপড়ে ফেলা, সমুদ্র বন্দরকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা, ব্যাপক মাত্রায় জ্বালাও-পোড়াও-ভাংচুর চালানো কখনো সাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচী হতে পারে কিনা তা যে কারো পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

এভাবে একদিকে যখন অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার পাশাপাশি এদেশীয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে চলছে সীমাহীন তান্ডব তখন অপরদিকে 'র'-এর নিজস্ব অপারেটিভ ও বাংলাদেশী এজেন্টদের তৎপরতাও লক্ষ্যণীয় পর্যায়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মধ্যেই 'র' প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ এজেন্ট তৈরীতে সক্ষম হয়।[৫]

এসব এজেন্টরা অর্থ বা আদর্শের জন্য 'র'-কে যাবতীয় উপায়ে তথ্য সরবরাহ করে যেমন সহায়তা করেছে তেমনি মাঠ পর্যায়েও 'র'-কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা মতো তৎপরতা চালিয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সময়কালে এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দলের ক'জন শীর্ষ নেতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিতরের কথা 'যথাশীঘ্রি সম্ভব' স্থানীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত 'র' কর্মকর্তা

৫। লেখকের সাথে একজন প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্মকর্তার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

বা কন্টাক্টকে অবগত করতেন। এমনকি এসব এজেন্টরা নিজ দলের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বা কর্মসূচীর কথাও পৌছে দিতেন 'র'-এর কাছে। এক্ষেত্রে এসব এজেন্ট নেতা 'র' কর্মকর্তার সাথে দেখা করার জন্য কতগুলো গোপন স্থান নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। এগুলোর আবার ছদ্মনাম থাকতো এবং দেখা করার সময়-ক্ষণও তারা সাংকেতিক ভাষায় টেলিফোনে ঠিক করে নিতেন। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থী দলগুলোতে যেসব এজেন্ট ছিল তারা খুবই কৌশলে যোগাযোগ রাখতেন ভারতীয় দূতাবাসের বিশেষ কর্মকর্তার সাথে। এমন ঘটনাও সে সময় ঘটেছে যেখানে জাতীয়তাবাদী একটি বৃহৎ দলের একজন শীর্ষ নেতা একবার 'র' কর্মকর্তার সাথে নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করার জন্য অদ্ভুত এক কৌশলের আশ্রয় নেন। জানা যায়, তাঁকে 'সন্দেহজনক' ভেবে বাংলাদেশ ইন্টেলিজেন্স যখন নজর রাখা শুরু করে তখন প্রথম দিকে তিনি ততোটা বুঝতে পারেননি। কারণ, তিনি ভেবেছিলেন, তার দল ক্ষমতায় তাই তাঁকে ফলো করবে কে? কিন্তু একসময় তিনি আঁচ করতে পারলেন যে তাঁকে সার্ভেইল করা হচ্ছে। এদিকে একদিন 'র'- কর্মকর্তার সাথে তার দেখা করার কথা। অথচ, বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে একটি মটর সাইকেল নজরে এলো তার। বুঝলেন দেশী সংস্থার 'টিকটিকি' লক্ষ্য রাখছে তার উপর। তাই গোপনে বাড়ি থেকে বের হবার জন্য তিনি বের হলেন পিছন দরজা দিয়ে দেয়াল টপকিয়ে। তার গাড়ি পড়ে থাকলো গাড়ি বারান্দায়। এমন একটা ভাব যে তিনি বাড়িতেই আছেন। এদিকে 'র' কর্মকর্তাকে ফলো করে ঐ একই গোয়েন্দা সংস্থার অপারেটিভ দেখলো ঐ বিশেষ জাতীয়তাবাদী নেতা ভারতীয় দূতাবাস কর্মকর্তার সাথে দেখা করছেন। অথচ, তার (নেতার) বাড়ির দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়ে থাকা অপর অপারেটিভ রিপোর্টে বললো- নেতা বাড়িতেই আছেন!

এভাবে শুধু 'জাতীয়তাবাদী' নেতৃত্বের মধ্যেই নয় অনেক ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলেও 'র' এজেন্টদের সক্রিয় তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে বিএনপি শাসনামলে। এমনকি যে দলটির নেতাকর্মী নির্বিশেষে সকলেই ভারতবিরোধী বলে সুপরিচিত সেই ইসলামপন্থী দলটির শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মাঝেও 'র' এজেন্ট তৈরীতে সক্ষম হয়। একে ঘুড়িয়ে এভাবেও বলা যায় যে, বিএনপি সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে ভারতীয় সহায়তা না নিয়ে উপায় ছিল না কারো! আলোচ্য এই দলটির একজন শীর্ষ নেতা সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি পোশাকে আশাকে, আদবে-লেহাজে আপাদমস্তক ইসলামপন্থী। মুখে দাঁড়িও আছে তার। ভারত বিরোধিতার আগুন ঝড়ে তার বক্তৃতা-বিবৃতিতে। অথচ ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত এই 'পাকিস্তানপন্থী' নেতাই ভারতীয় দূতাবাসের মি. জে. সি, পান্থ-এর সাথে যোগাযোগ রাখতেন স্বাভাবিক সম্পর্কের বাইরে। যে কোন সময় যে কোন তথ্য আদান প্রদান করার জন্য পূর্ব নির্ধারিত স্থানে এরা মিলিত হতেন টেলিফোনে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে [৬]।

যাহোক, সে সময় ভারতীয় দূতাবাসে বিভিন্ন কূটনৈতিক পদের আড়ালে 'র' অপারেটিভদের তৎপরতা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যাপক ও বল্গাহীন।

৬। লেখকের সাথে একজন প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার

এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে এরা তখন অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী একটি দলের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষার সময় এরা কোন রাখঢাক রাখতো না। তবে এই দলটির সবাই যে 'র'-এর স্বার্থ রক্ষা করে চলতেন তা কিন্তু নয়। বরং একটি অংশের নেতৃবৃন্দই ছিল 'র'-এর তাঁবেদার। অবশ্য একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এদলের মাঝেই 'র' সবচেয়ে বেশী মাত্রায় অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়েছিল।

এদিকে উপরোক্ত রাজনৈতিক দলের কতিপয় শীর্ষ ও মাঝারি আকারের নেতা ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ঢাকাস্থ 'র' কর্মকর্তাদের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা শুরু করেন। গোপন সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে এরা যেমন যোগাযোগ রক্ষা করতেন তেমনি প্রকাশ্যেও দেখা সাক্ষাৎ করতেন বাংলাদেশী ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভদের সামনে। ভাব ছিল এমন-যদি ক্ষমতা থাকে তো কিছু করো দেখি! এদেরই একজন নেতা প্রায়শই মি. পান্থ-এর সাথে প্রকাশ্যে দেখা করতেন। বহুদিন যাবত তিনি সন্দেহভাজনের তালিকায় থাকায় স্বভাবতই তার পিছু নিত বাংলাদেশী বিভিন্ন সংস্থার অপারেটিভগন। একবার এমনিভাবে মি. পান্থকে দেখা গেলো তার বাসভবনে। বাংলাদেশী সংস্থার লোক সবকিছু লক্ষ্য করছিল বাইরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ঐ নেতা মি. পান্থকে নিয়ে সদর দরজা খুলে এগিয়ে এলেন অনুসরণকারীর দিকে। যাচ্ছে তাই ভাষায় গালাগাল করে বললেন, 'আরে ব্যাটা ভারত বিশাল দেশ, ওদের সাথে লাগতে এসে পারবি?!' এরকম শুধু একজন নয়, বহুজন ছিলেন এবং এখনো আছেন-বহাল তবিয়তে।

এদিকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক অঙ্গনেই 'র'-এর এজেন্টরা ১৯৯৪-'৯৬ সালে তৎপর ছিল তা নয়। বরং শিল্প-সংস্কৃতি, চলচ্চিত্রসহ প্রতিটি স্তরেই ছিল দীর্ঘদিন লুকিয়ে থাকা এজেন্টদের সরব উপস্থিতি। এদের মাঝে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র নায়িকা, তাঁর স্বামী, একজন বিখ্যাত নজরুল সঙ্গীত ও পুরনো দিনের গানের গায়িকা, একজন 'ঘাদানি' সমর্থক সাংবাদিক, বেশক'জন বিমানবালা, একজন আইনজীবীর স্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা,[৭] সিলেটের একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদের ভাতিজি, 'শ' আদ্যাক্ষরের একজন আপাত নিরীহ সঙ্গীত শিল্পী, একজন বুদ্ধিজীবীর বিধবা স্ত্রী, বিএনপি'র প্রথম সারির এক সিনিয়র নেতার ভাগিনী (টিভি শিল্পী), দেশের প্রয়াত একজন শীর্ষ ব্যবসায়ীর কন্যা ও আরো অনেকে।

উল্লেখ্য, 'র'-এর বাংলাদেশ শাখায় দায়িত্বে ছিলেন বলে যার নাম পাওয়া যায় তিনি হলেন মি. জে. সি. পান্থ[৮]। প্রাপ্ত তথ্য মতে, এই ভদ্রলোক ছিলেন অসম্ভব নারীলিপ্সু। শিক্ষিকা হতে শুরু করে বিমানবালাদের সাথে পর্যন্ত তিনি 'বিশেষ' সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এই মি. জে. সি. পান্থ-এর পুরো নাম হলো-জগদীশ চন্দ্র পান্থ। ভারতের রানিখেতে ১৯৫৪ সালের ১৫ আগস্ট জন্মগ্রহণকারী এই 'র' কর্মকর্তা ঢাকাস্থ ভারতীয়

৭। যিনি ১৯৮১-'৮৩ সময়কালে ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন

৮। একজন সাবেক মহাপরিচালক, ডিজিএফ আই-এর সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার

দূতাবাসের 'প্রথম শিক্ষা সচিব' (First Secretary-Education) হিসেবে বাংলাদেশে আসেন ১৯৯২ সালের ২৪ জানুয়ারী তারিখে। পূর্ববর্তী অন্যান্য 'র' কর্মকর্তার মতো মি. জে. সি. পান্থও দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হন। তবে তার পূর্বসূরীদের চেয়ে তার সুবিধা ছিল অনেক। বিশেষ করে বিএনপি সরকারের অদক্ষতা, অপটু রাষ্ট্রপরিচালনা মি. পান্থকে অনেকটা নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়। এছাড়া অন্যদের চেয়ে তিনি একারণেই ব্যতিক্রম যে, ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত 'র' কর্মকর্তা বাংলাদেশে 'বন্ধুভাবাপন্ন' সরকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হননি। কিন্তু মি. পান্থ দীর্ঘ একুশ বছর বিরতির পর ভারতের পছন্দনীয় একটি সরকারকে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন করায় সফলতা লাভ করেন। এদিকে জে.সি. পান্থের তৎপরতা সম্পর্কে সে সময় বাংলাদেশের একটি শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থায় কর্মরত ক'জন কর্মকর্তার সাথে আলাপকালে জানা যায় যে তিনি আ'লীগের শীর্ষ পর্যায়ে যেমন বেশ ক'জন নেতার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন তেমনি বিএনপি'র একটি অংশের সাথেও ছিল তার সখ্যতা। এক্ষেত্রে আ'লীগের অন্ততঃ ৬/৭ জন ও বিএনপি'র ৩/৪ জন 'নেতা'র সাথে মি. পান্থ নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এছাড়া শিল্প-সংস্কৃতি অঙ্গনের এজেন্টদের সাথে কন্টাক্ট করা ও তথ্য আদান প্রদান করার লক্ষ্যে তিনি মাঝে মাঝেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। এক্ষেত্রে ধানমন্ডির স্টার কাবাব-এর উপরে অবস্থিত 'ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে'ই বেশীরভাগ সময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। এরকম একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ২৩ নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে। মওলানা আবুল কালাম আজাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পূর্বোল্লেখিত টিভি নাট্যশিল্পী, গায়িকা, চলচ্চিত্র নায়িকাসহ আরো অনেকেই আসেন আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। আপাতদৃষ্টিতে একটি নিরীহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে কারো কোন সন্দেহের কারণ নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব অনুষ্ঠানের আড়ালেই চলে 'র'-এর এজেন্টদের তথ্য আদান প্রদান, ঘটে মহাসম্মিলন।

এদিকে মি. পান্থ ব্যতীত আরো ক'জন ভারতীয় দূতাবাস কর্মকর্তাকেও তখন 'র'-এর আন্ডার কভার এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এদের মাঝে একজন শীর্ষ ভারতীয় কূটনীতিক ছাড়াও ভিসা সেকশনের প্রথম সচিব পদে কর্মরত একজন কর্মকর্তাকে 'র'-এর অপারেটিভ বলে সনাক্ত করা হয়েছিল। এরাও সমন্বিত পরিকল্পনামতে বিভিন্ন কন্টাক্ট মেইনটেইন করতেন। আবার ভিসা সেকশনে কর্মরত কর্মকর্তাটি গড়ে তুলেছিলেন এক দক্ষ নারী বাহিনী যাদের প্রায় সকলেই ছিলেন 'নিবেদিত প্রাণ ভারতপ্রেমিকা'। এদের মাঝে ছিল অতি স্মার্ট বিমানবালা, নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সুন্দরী ছাত্রী থেকে শুরু করে পর্যটন কর্পোরেশনে কর্মরত মহিলা, নামকরা সঙ্গীত ও নাট্য শিল্পীবৃন্দ। সহজে ভিসা পাওয়া ও বিনা খরচে ভারত ভ্রমণ এবং শপিং এর বিনিময়ে এসব 'নারী বাহিনী' সদস্যারা 'র' কর্মকর্তার নির্দেশ মতো উচ্চপদস্থ সরকারী আমলার সাথে যেমন 'বিশেষ সম্পর্ক' গড়ে তুলতো তেমনি ব্যবসায়ী মহলেও

এরা কাজ করতো টোপ হিসেবে।

জে. সি. পান্থের উল্লেখযোগ্য কিছু তৎপরতা

'র' সব সময়ই বাংলাদেশে তৎপর ছিল এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ১৯৯৬ সালে, বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলনের সময় 'র'-এর মিশন নিয়ে কতিপয় চিহ্নিত ভারতীয় দূতাবাস কর্মকর্তা অতি তৎপর হয়ে উঠেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। শুধু পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টের উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

'র'-এর মিশন নিয়ে দূতাবাস কর্মকর্তার অবাধ বিচরণ!

"কূটনৈতিক শিষ্ঠাচার লংঘন করে ভারতীয় দূতাবাসের উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তা বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টিতে মদদ জুগিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় দূতাবাসের ১ম সচিব পদমর্যাদার মি. জে সি পান্থ নামের উক্ত কর্মকর্তা শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলেও এদেশে 'র'-এর নেটওয়ার্ক পরিচালনার দায়িত্ব তার উপর বলে বিভিন্ন মহলের ধারণা। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, পান্থ বাবু গোপন মিশন নিয়ে বাংলাদেশের এক জেলা থেকে আরেক জেলায় ছুটে বেড়াচ্ছেন হন্যে হয়ে। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া ও শিমুলিয়া থেকে পাথরিয়া পর্যন্ত তার এ বিশাল নেটওয়ার্কের দায়িত্ব পালনকালে উক্ত কর্মকর্তা দেশের কতিপয় বিতর্কিত এনজিও প্রধান, দু'টি বিশেষ রাজনৈতিক দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতা-নেত্রী ও সীমান্ত ব্যবসায়ী নামে খ্যাতদের (চোরাকারবারী) সাথে একের পর এক বৈঠক করে চলেছেন। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এ ধরনের রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও অদ্যাবধি উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে, পান্থ বাবু কূটনৈতিক ছদ্মাবরণে যে সব গোপন বৈঠক করছেন তার পেছনে কি ধরনের কারণ লুকায়িত? দ্বিতীয়তঃ কাদের নিয়ে তিনি এসব বৈঠক করছেন? তৃতীয়তঃ ভারতীয় দূতাবাস কর্মকর্তাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সব সময় রাজনৈতিক গোপন সভায় মিলিত হচ্ছেন কেন? এসব নানাবিধ কারণে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এদেশের রাজনৈতিক সংকট ভারতীয় 'র'-এর ইন্ধনে হচ্ছে কিনা?

গত ৯০ দিনে মি. পান্থ বাবু এডাব, ব্র্যাক, ফেমাসহ বেশ কয়েকটি এনজিও প্রধানের সাথে বৈঠক করেছেন। জানা গেছে, এডাবের কাজী ফারুকের সাথে বৈঠক শেষে ভারতপন্থী বিভিন্ন এনজিওকে একত্র করে রাস্তায় নামানোর নেতৃত্ব তার হাতে দেয়া হয়। এছাড়াও নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ফেমা নামের একটি সংগঠনকে নামানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিকল্প হিসাবে সংগঠনটি ফলাফল প্রচার করে নির্বাচন কমিশনকে বেকায়দায় ফেলা এবং নির্বাচনের পর ফলাফল নিয়ে একটি বিতর্কের ঝড় তোলাই এ সংগঠনটির কাজ বলে অনেকেই ধারণা করছে।

উল্লেখ্য যে, মিঃ পান্থ অসহযোগ আন্দোলনের সময় গত ২২ মার্চ সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় ইস্কাটন রোডস্থ একটি বিশেষ দলের নেতার বাসভবনে যান। উক্ত বিশেষ দলের প্রথম সারির আরও কয়েকজন নেতাও ঐ বাড়ীতে ছিল। প্রায় ৩০ মিনিটব্যাপী বৈঠক শেষে পান্থ বাবু ইন্ডিয়ান স্টেট ব্যাংক-এর ম্যানেজার ডি কে জৈনের বাসভবনে যান।

সূত্রমতে, সেখানে গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক হয়। বৈঠকে মিঃ জৈন ছাড়াও ভারতীয় দূতাবাসের বিষ্ণু প্রসাদ, দেবাশীষ এবং সুরেন্দর সিং উপস্থিত ছিল বলে জানা যায়। সূত্রটি জানায়, এ বৈঠকের পর 'জনতার মঞ্চ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৩ মার্চ মিঃ পান্থ বাবু এরশাদের একজন আইনজীবীর সিদ্ধেশ্বরীরস্থ ইস্টার্ন এপার্টমেন্টে যান এবং প্রায় ২ ঘন্টা বৈঠক করেন। ৩ মার্চ তিনি বিষ্ণু প্রসাদকে সাথে নিয়ে পুনরায় এরশাদের ঐ আইনজীবীর সাথে দেখা করেন। এর কয়দিন পরই ভারতীয় দূরদর্শনে এরশাদকে ফলাও করে প্রচার করতে দেখা যায়। ১ এপ্রিল রাত সাড়ে ৮টায় এরশাদের ছোট ভাইয়ের উত্তরাস্থ বাসভবনে যান এবং রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত মিঃ পান্থ বাবু বৈঠক করেন।

১ এপ্রিল পান্থ বাবু বিকালে ৫টা ৫০ মিনিটে একটি বিশেষ দলের একজন নেতার বাসভবনে যান এবং গোপন বৈঠক শেষে জাতীয় পার্টির উচ্চ পর্যায়ের একজন নেতার বাসভবনে যেয়ে দেখা করেন। ৭ এপ্রিল বিষ্ণু প্রসাদ ও তার স্ত্রী এরশাদের আইনজীবীর সাথে দেখা করেন। রাত ৮টা ২০ মিনিট থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত তারা সেখানে অব স্থান করেন। ৮ এপ্রিল বিষ্ণু প্রসাদ এরশাদের ছোট ভাইয়ের বাসভবনে যান। সকাল ৭টা ৪০ মিনিট থেকে ৯টা ২০ মিনিট পর্যন্ত উক্ত বাসভবনে তিনি অবস্থান করেন। গত ১৩ এপ্রিল ভারতীয় চর হিসাবে খ্যাত এক সময়কার চিত্রনায়িকার দ্বিতীয় স্বামীর গাড়ীতে করে পান্থ বাবু শের-শাহ্ সূরী রোডের জনৈক 'পীর'-এর বাসভবনে যান। সেখানে তিনি প্রায় এক ঘন্টা সময় অতিবাহিত করেন। একই দিন অফিসার্স ক্লাবে অনুষ্ঠিত জাতীয় পার্টির শীর্ষস্থানীয় একজন নেতার মেয়ের বিয়েতে যোগ দেন।

১৪ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিট থেকে রাত ৮টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত একটি বিশেষ দলের প্রভাবশালী নেতার সাথে বৈঠক করেন। সেখান থেকে উক্ত দলের এককালীন ছাত্রনেতা জনৈক বোসের বাসায় যান। রাত ৯টা ১০ মিনিট থেকে ১১টা পর্যন্ত ঐ বাসায় অবস্থান করেন। ২২ এপ্রিল রাত ৯টা ৪০ মিনিটে ঐ বিশেষ দলের কলাবাগানের ও ইস্কাটনের দু'জন শীর্ষস্থানীয় এবং প্রভাবশালী নেতা মিঃ পান্থের বাসভবনে যান। রাত ১টা পর্যন্ত তারা বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাথে জড়িত জনৈক একজন অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন। পরে তাকে ভারতীয় দূতাবাসের গাড়ী করে তার লালমাটিয়াস্থ বাসভবনে পৌঁছে দেয়া হয়।

নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর ভারতীয় হাইকমিশনার মি. দেব মুখার্জীর নেতৃত্বে ১২ জুনের নির্বাচন সংক্রান্ত কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মি. পান্থকে একটি বিশেষ দলের পক্ষে মাঠ পর্যায়ে জরিপ চালানোর নির্দেশ দেয়া হয় বলে সূত্র জানায়। সে মোতাবেক মি. পান্থ কোথায় কাকে কাজে লাগাবেন তার একটা ছক তৈরী করেন। উক্ত ছক অনুযায়ী গত ২৩ এপ্রিল ভারতীয় দূতাবাসের ২য় সচিব নিরঞ্জন চক্রবর্তী পটুয়াখালী যান এবং কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও চোরাকারবারী নামে খ্যাত স্নেহাংশু সরকার ওরফে কুট্টি সরকার ও মোস্তাক হোসেনের সাথে বৈঠক করেন। রাতভর বৈঠক শেষে তিনি বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

ভারতীয় দূতাবাস কর্মকর্তাদের কূটনৈতিক ছদ্মবেশে এ ধরনের কর্মকান্ড কতটুকু আইনসিদ্ধ তা অবিলম্বে সরকারকে তদন্ত করে দেখা উচিত। না হলে ভারতীয়

কূটনীতিকদের এহেন নীতিবিগর্হিত কর্মকাণ্ডের খেসারত জাতিকে কড়ায়-গন্ডায় দিতে হবে বলে বিভিন্ন মহলের অভিমত।"[৯]

এছাড়াও সে সময় অপর ছয়জন ভারতীয় দূতাবাস কর্মকর্তার আচরণ নিয়েও বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে অভিযোগ করা হয়। উল্লেখ্য, জে. সি পান্থ ছাড়াও এসব কর্মকর্তা সংসদ নির্বাচনের পূর্বে দেশের বিভিন্ন জেলা সফরে বের হন এবং একটি রাজনৈতিক দল কোথায় কিরূপ ফলাফল করবে সে ব্যাপারে বাংলাদেশী প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে প্রকাশ্যে খোঁজ খবর নেয়া শুরু করেন।

যেভাবে এরশাদ বিএনপি'র সাথে কোয়ালিশন গঠনে ব্যর্থ হলেন

২০ শে মে '৯৬-এ তদানীন্তন সেনা প্রধান লে. জে. এ.এস.এম. নাসিম অভ্যুত্থান সংঘটনের যে উদ্যোগ নেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু এঘটনা ও এর পরবর্তি প্রতিক্রিয়া নিয়ে আ'লীগ এবং বিএনপি উভয় দলের মাঝেই সৃষ্টি হয় নতুন মেরুকরণের। বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশাসনের এক বিরাট অংশ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষভাবে লে. জে. নাসিম-এর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করায় এটা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ১২ জুন '৯৬-এর নির্বাচনে এ মহলটি আ'লীগের পক্ষাবলম্বন করবে। এছাড়া দীর্ঘদিন যাবত পরিচালিত বিএনপি বিরোধী আন্দোলনের ফলে নির্বাচনে স্বভাবতই 'জনতার মঞ্চ' অনুগত কর্মকর্তাদের একটা ভূমিকা বিবেচনা করা হয়। এসময় বিভিন্ন সূত্র থেকে বিএনপি হাইকমাণ্ডের কাছে এ তথ্য প্রদান করা হয় যে, প্রশাসনিক মারপ্যাচের কারণেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক বিএনপি'র পক্ষে কখনোই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব নয়। এবং আ'লীগ যে ভাবেই হোক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করতে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করা সম্ভব না হলেও ন্যূনতম সমঝোতার ভিত্তিতে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বিএনপি শীর্ষ মহলকে অনুরোধ করা হয়। বলা হয়, আসন বন্টনের ক্ষেত্রে যেন জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও ই,শা আন্দোলনের সাথে আলোচনা করে প্রার্থী মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নেন বিএনপি নেতৃবৃন্দ। অর্থাৎ যেসব আসনে জাপা, জামায়ত-এর প্রার্থী শক্তিশালী সেখানে বিএনপি মনোনয়ন দিবে দুর্বল প্রার্থী অপরদিকে বিএনপি যেখানে জয় প্রত্যাশী সেখানে জাপা, জামায়াত কোন কাউন্টেবল প্রার্থী দিবে না এমনটি নিশ্চিত করা সম্ভব হলে নিঃসন্দেহে বেশীরভাগ আসনে বিএনপি, জাপা, জামায়াত প্রার্থী জয়লাভ করতে সক্ষম হতো। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য কারণে, হয়তো ওভার কনফিডেন্ট থাকার জন্যই বিএনপি নেতৃবৃন্দ এদিকটায় খুব একটা পাত্তা দিতে চাননি। অথচ, সেসময় জাপা, জামায়াত-এর পক্ষ থেকে এব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখানো হয়। যাহোক এধরনের উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর নির্বাচনে যা ঘটার তাই ঘটে যায়। অর্থাৎ আ'লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়, যদিও তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। সে সময় নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১২ জুন '৯৬-এর সংসদ নির্বাচনে আ'লীগ পায় ১৪৬ টি, বিএনপি ১১৬টি, জাপা ৩৩টি, জামায়াত ০৩টি, ইশা আন্দোলন ০১টি, জাসদ (রব) ০১ টি ও স্বতন্ত্র ০১টি। এপর্যায়ে সরকার গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে অর্থাৎ ১৫১ জন সংসদ সদস্যের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য আ'লীগ মরিয়া হয়ে উঠে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী শক্তির শুভাকাংখীগণ এ

৯। দৈনিক মিল্লাত ২৭ মে ১৯৯৬ সংখ্যা

পরিস্থিতিতে বিএনপি-জাপা-জামায়াতের সমন্বয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তখন অবস্থা এমন যে, কেবলমাত্র জাতীয় পার্টির সমর্থন পেলেই সরকার গঠন করা সম্ভব ছিল। এক্ষেত্রে জাতীয় পার্টি কাকে সমর্থন দিবে তা নির্ভর করছিল জাপা চেয়ারম্যান এরশাদের সিদ্ধান্তের উপর। কিন্তু তিনি ছিলেন জেলে। তাই তার পক্ষে পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক বিশেষ করে দলের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা ভারত অনুগত অংশকে নিষ্ক্রিয় না করে বিএনপি'র প্রতি সমর্থন জানানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তাই তিনি যে কোন মূল্যে তাঁকে প্যারোলে একদিনের জন্য হলেও মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থা করতে বলেন আলোচনাকারীদের। এখানে উল্লেখ্য যে, ঐক্য প্রচেষ্টাকারীদের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার জন্য ইতোমধ্যে বিশেষ ব্যবস্থায় জে. এরশাদের সাথে বেগম রওশন এরশাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ সাক্ষাতের সময়ই জে. এরশাদ তার প্রতি প্রদর্শিত সকল প্রতিহিংসামূলক আচরণের কথা ভুলে বিএনপি'কে সমর্থন জানানোর লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। এমনকি ঐক্য প্রক্রিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত একটি সূত্র এব্যাপারে জানায় যে, বিএনপি'র সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে আগ্রহ প্রকাশ করে জে. এরশাদ একটি কাগজে নিজ হাতে লিখেন যে, দেশ ও সশস্ত্রবাহিনীর বৃহত্তর স্বার্থে তিনি যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। এক্ষেত্রে তিনি (জে. এরশাদ) ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রাক্তন সদস্য হিসেবে নিজেকে 'Tiger' রূপে উল্লেখ করে বলেন, 'Tiger' কখনো 'Betray' করে না। জে. এরশাদের সাথে বিস্তারিত আলাপ করে রওশন এরশাদ বেগম খালেদা জিয়ার সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে তাঁর (খালেদা জিয়ার) ক্যান্টনমেন্টস্থ বাসভবনে এসে উপস্থিত হন।

এদিকে যখন এভাবে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া চলছিল তখন জাপার অভ্যন্তরের 'র' চক্রটিও চেষ্টা চালাতে থাকে যাতে যে কোনভাবে এধরনের কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আ'লীগের সাথে সমঝোতায় উপনীত হওয়া যায়। একই সাথে বিএনপি'র অভ্যন্তরের কুচক্রী মহলটিও উদ্যোগ নেয় যাতে রওশন-খালেদা আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়।

অন্যদিকে এ পরিস্থিতিতে একটি সূত্র থেকে 'র' চক্রটি জানতে পারে যে, এরশাদকে মুক্তি দেয়া ও বিএনপি-জাপা কোয়ালিশন সরকার গঠনের একটি উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এ খবর পাবার সাথে সাথেই সর্বপ্রথম জে. এরশাদ যাতে জেল থেকে ছাড়া না পান সে ব্যবস্থা নেয়া হয় ও জাপা'র 'র' চক্রের সাথে আ'লীগ-এর তরিৎ বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে জানা যায় যে, ধানমণ্ডিতে বসবাসকারী একজন রহস্যময় কিন্তু অসম্ভব প্রভাবশালী 'পীরের' বাসায় আ'লীগের একজন নেতার সাথে বৈঠকে বসেন জাপা'র 'ম' ও 'অ' অদ্যাক্ষরযুক্ত দু'জন শীর্ষ পর্যায়ের নেতা। এ বৈঠকে 'র'-এর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত ঐ পীর পালন করেন মুখ্য ভূমিকা। অবশ্য ভারতীয় দূতাবাসের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা যিনি ছিলেন মূলত 'র'-অফিসার তিনিও ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। এর পরপরই তড়িঘড়ি করে জাপার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও মহাসচিব আ'লীগের প্রতি সমর্থনের ঘোষণা প্রদান করেন। পাশাপাশি বিশেষ ব্যবস্থায় জাসদের আ স ম রবকেও ম্যানেজ করতে সক্ষম হয় আ'লীগ। অথচ, বিপরীতে তখন বিএনপি নেতৃবৃন্দের 'দেখি না কি হয়' জাতীয় মনোভাবের কারণে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়নি। তবে জাপা যাতে বিএনপি'র সাথে জোট বাঁধতে না পারে সে লক্ষ্যে মূলতঃ 'র'-ই পালন করে মুখ্য ভূমিকা।

অধ্যায়-১১
দূতাবাস, এনজিও এবং মিশনারী ভিত্তিক গুপ্তচরবৃত্তি

[গুপ্তচরবৃত্তির পরিধি কত ব্যাপ্ত, বিশেষ করে একমেরু বিশ্বে এখন কিভাবে সরাসরি গুপ্তচর সংস্থার পাশাপাশি এনজিও ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগানো হচ্ছে তা নিয়ে লেখকের এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে-মাসিক নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট-এ]

১৯৯৩ সালের ২রা মার্চ সংখ্যা দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটি খবরের শিরোনাম ছিল 'উপজাতীয়দের বিচ্ছিন্নতার প্রতি মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের সবুজ আলোর সংকেত'। অর্থাৎ সুদূর আমেরিকার কংগ্রেস-দক্ষিণ এশিয়ার ভারতে কাশ্মীর সমস্যা, শ্রীলংকায় তামিল সমস্যা ও বাংলাদেশে বার্মিজ রোহিঙ্গাদের অবহেলা করে হঠাৎ বাংলাদেশের চাকমাদের নিয়ে মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো যে, ওরা শান্তিবাহিনীকে সবুজ সংকেত দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় Excuse দেখানোর মত তথ্য উপাত্ত পেলো কোত্থেকে বা অন্য কথায় ওদের উস্কে দিল কারা? এর উত্তরে ১৩ই এপ্রিল '৯৩ সংখ্যা দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদানের হেতু কি?' শিরোনামে একটি রচনায় বর্ণিত তথ্যসমূহের উল্লেখ করা যায়। ঐ রচনায়[১] উল্লেখ করা হয় যে, "ষড়যন্ত্রকারীরা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরীহ, নিরস্ত্র, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেই ক্ষান্ত নয়, তারা বাংলাদেশ সরকারের ভাবমূর্তি যাতে ক্ষুণ্ন হয় সে ব্যাপারে মনগড়া রিপোর্ট তৈরী করে বিশ্বে প্রচার করছে। এ মহলটি বিদেশ থেকে ম্যানেজ করে নিয়ে আসছে তদন্ত কমিশন। তদন্ত করার রীতিমাফিক নিয়মের তোয়াক্কা না করে এ কমিটি, 'কমিশন' নিজেদের মতো তদন্ত করছে। এসব রিপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত ঘটনাই উপেক্ষিত হচ্ছে না বরং বিদেশীদেরকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে। এছাড়াও এনজিও এবং কিছু মানবতার ফেরিওয়ালা রাজনীতিক সমন্বয়ে গঠিত উক্ত রিপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্তশাসনের সুপারিশসহ অ-উপজাতি বসতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা হয়।" এ কমিশনের রিপোর্টটিই পরবর্তীতে সারা বিশ্বে এনজিওদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে যা শেষ পর্যন্ত মার্কিনীদের নজর কেড়ে নিয়ে সবুজ সংকেত প্রদানে উৎসাহিত করে। এখানে উপরোক্ত রিপোর্টগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র এনজিও এবং বিভিন্ন কূটনৈতিক পরিমন্ডলের গুপ্তচরবৃত্তির উপর আলোচনা শুরু করার পূর্বে একটি 'লিংক স্টোরি'র মাধ্যমে বাস্তব গুপ্তরচরবৃত্তির প্রমাণ দেয়ার জন্য। একটি উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন এনজিওর অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক প্রথাসিদ্ধ কূটনৈতিক মিশন থাকা বিচিত্র কোন ব্যাপার নয়। তবে এর সাথে সাথে এ সমস্ত আপাত ভদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোও যে ইন্টেলিজেন্সের প্রধানতম আধার ও পরিচর্যাকারী তা সাধারণত বোঝা যায় না, আর বোঝা গেলেও আপাতঃ করার কিছুই নেই।

গুপ্তচরবৃত্তির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কীয় বিখ্যাত লেখক Miles copeland তাঁর 'The Real world of spies' বইয়ে উল্লেখ করেছেন, যে কোন পর্যায়েই কর্মরত থাকুন না কেন যখন কোন কর্মকর্তা সরাসরি গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন তখন তাকে একজন

১। যদিও তা ইনকিলাবে প্রকাশিত সংবাদের পর দিনকালে প্রকাশিত হয়, কিন্তু দিনকালে প্রকাশিত রিপোর্টটি পূর্বেই সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত

ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা বলা যায়। এ সমস্ত কর্মকর্তা হতে পারেন রাষ্ট্রদূত, এ্যাটাশে (সামরিক, নৌ, বিমান, সংস্কৃতি বিষয়ক), সিভিল এভিয়েশন, বাণিজ্যিক, পেট্রোলিয়াম অথবা কৃষি সংক্রান্ত অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রের কর্মকর্তা। এমনকি প্রশাসনিক ও উপদেষ্টার কাজে নিয়োজিত ছাড়া সকল দূতাবাস কর্মকর্তা/ কর্মচারীই ইন্টেলিজেন্স-এর সাথে জড়িত থাকতে পারেন। অর্থাৎ একটি দূতাবাসকে একটি 'গুপ্তচর আখড়া' বলা অন্যায় কিছু নয়। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে যেসব দেশে কোন দেশ দূতাবাস স্থাপন করে সেখানে ঐসব দূতাবাস নিয়মিত তথ্য সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, কেন ও কিভাবে দূতাবাসগুলোকে ইন্টেলিজেন্স-এর ব্যাপারে কাজে লাগানো হয়?

ক) কূটনৈতিক সুবিধা ও সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া

এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে, কোন দেশ সে দেশে অবস্থিত ভিন্ন কোন দেশের দূতাবাস এলাকায় সার্বভৌমত্বের দাবীদার নয় বরং ঐসব দূতাবাস তাদের স্ব-স্ব দেশের সার্বভৌম এলাকা বলে স্বীকৃত। যে কোন দূতাবাস কর্মকর্তা বা কর্মচারী ছোট-বড় যে কোন পদ নির্বিশেষে Diplomatic Immunity'র অধিকারী। তিনি যদি গুপ্তচর হিসেবে চিহ্নিতও হয়ে যান বা ধরা পড়েন তবুও তাকে বড়জোর বহিস্কার করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার থাকে না। এ সুবিধা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় উপর মহল হতে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্যের মহারথীদের সাথে সুসম্পর্ক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিতান্ত গোবেচারা সেজে ভাবে গদগদ হয়ে জড়িত হওয়া অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। লক্ষ্যণীয় যে, প্রভাব বিস্তারকারী সব দেশেরই বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও প্রকাশনা থাকে, যেমন মার্কিনীদের ইউসিস ও ভারতীয় দূতাবাসের প্রকাশিত ভারত বিচিত্রা। এসব জায়গায় লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, উচ্চ পর্যায়ের সব লোকজন বিভিন্ন সেমিনার, আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান ইত্যাদি উপলক্ষ্যে হাজির থাকেন বা আমন্ত্রিত হন। সেখানে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক মেলামেশার সুযোগে উক্ত দূতাবাসের ছদ্মাবরণধারী কোন অপারেটিভের পক্ষে অতি সহজেই অনেক তথ্য আদায় করা সহজ এবং কোন বিশেষ অপারেশনের পরিকল্পনা করা বা সমন্বয় সাধন করা নিরাপদ।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, সকল প্রকার তথ্য তা প্রকাশ্য বা গোপনীয় যাই হোক না কেন তা একটি দেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ (অনুমিত) ও বাদবাকী পঞ্চাশভাগ প্রতিরক্ষা বা রণনীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। এ দুটো ক্ষেত্রের বিশেষ প্রকৃতিই তাদের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্কের সৃষ্টি করে থাকে। এটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় স্টেশন চীফ বা কেস অফিসারের সাধারণ কার্যপ্রণালী যেখানে তিনি দূতাবাসের কোন কর্মকর্তার পরিচয়ের আড়ালে কাজ করে থাকেন, সেখানে তার এ কূটনৈতিক কাজের একটি সুনির্দিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য সুবিধাজনক অবস্থান সৃষ্টি করে। কূটনৈতিক ছদ্মাবরণ শুধুমাত্র কূটনৈতিক ব্যাগের (Diplomatic Bag) সুবিধা গ্রহণেই সহায়তা করে না বরং এমনসব নিষিদ্ধ জায়গায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে যা অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়। এসব কর্মকান্ডের ফলে অন্যান্য বন্ধুপ্রতীম, ততোধিক বন্ধুপ্রতীম নয়, এমনকি শত্রুদেশের ইন্টেলিজেন্স প্রধানদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তবে পারস্পরিক সুবিধার উপর নির্ভর করে তারা এ ধরনের কার্যক্রম অস্বীকার করে বসতে পারেন।

সময় বিশেষে একজন রাষ্ট্রদূত বা দূতাবাসে কর্মরত স্টেশন চীফ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও

দ্রুত বিভিন্ন ঘটনার সমন্বয় সাধন করতে পারেন। 'ইনসাইড র' গ্রন্থে লেখক অশোকা রায়না স্বীকার করেছেন যে, "১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এমনও হয়েছে যেখানে পাকিস্তানের পার্শ্ববর্তী কোন একটি দেশের স্টেশন চীফ সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স পরিচালকের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল যে, জনসমক্ষে কোন কিছুর প্রকাশ না ঘটিয়ে যুদ্ধরত যে কোন পক্ষ যদি শান্তিপূর্ণ সমাধানে এসে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চায় তবে তার ব্যবস্থা করা।" একবার ভেবে দেখুন অবস্থাটা কি?

এদিকে সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত নিজ দেশের ইন্টেলিজেন্স সদর দফতরে প্রেরণের জন্য কূটনৈতিক ব্যাগ সবচেয়ে নিরাপদ মাধ্যম বলে স্বীকৃত। এছাড়াও প্রতিটি দূতাবাসের ছাদে বসানো বড় বড় এন্টেনা, ওয়্যারলেস সংযোগ গুপ্ত সাংকেতিক বার্তা আদান প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। দৈনন্দিন স্বাভাবিক বার্তা প্রেরণের সাথে সাথে পাঠানো গুপ্ত বার্তার রহস্য উদঘাটিত হলেও আন্তর্জাতিক আইনে ওয়্যারলেস ও স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়া কূটনৈতিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী।

কূটনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কিত আলোচনা শেষে একটি বহুল আলোচিত ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। একসময় অনেক পত্র-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল যে, জেনারেল এরশাদ স্বীকার করেছিলেন, তিনি ভারতের সাথে যোগাযোগ করার পরই ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সামরিক আইন জারি করেন। তখন ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার ছিলেন এরশাদের প্রাক্তন প্রশিক্ষক [২] মিঃ মুচকুন্দ দুবে। ধারণা করা হয় তৎকালীন রাজনৈতিক রঙ্গালয়ে এ ভদ্রলোকের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

খ। এন.জি.ও এবং বিভিন্ন মিশনারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি

এককালে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বাংলাদেশে সাহায্যের নামে কত যে এন.জি.ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এন.জি. ও-দের মারফত গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা ও এজেন্ট নিয়োগ পূর্বক তথ্যাদি সংগ্রহ অত্যন্ত সহজ। কারণ প্রথমতঃ এন.জি.ও-দের সু-সমন্বিত তৃণমূল পর্যায়ের সাংগঠনিক ভিত্তি ও দ্বিতীয়ত ঃ গ্রহীতা দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতার 'নির্লজ্জ' সুযোগ গ্রহণের সুবিধা। যদি উপজাতিদের ভাগ্য উন্নয়নের ঢাকঢোল পিটিয়ে কোন এন.জি.ও সুবিধাভোগী কিছু দেশীয় প্রভাবশালী বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে মাঠে নামেন তাহলে বাংলাদেশের মত দুর্বল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাদের কার্যক্রমকে বাধা দেয়ার কিছু থাকে না। তখন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন' নামে অনেক কিছু সম্পাদন করা পানির মত সহজ কাজ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ঐ একই তথ্য নিয়মিত কোন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী তাদের অপারেটিভ ও এজেন্টদের দিয়ে অতোটা সহজে আদায় করতে পারতো না।

ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের একটি হচ্ছে "বিভিন্ন গোত্রের বিপুল সংখ্যক ভারতীয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করে আসছেন, যারা ঐসব দেশে একটি জোড়ালো অবস্থানে আসীন এবং এ সমস্ত ভারতীয়দের প্রভাবে ও চাপে তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় ভারতের অনুকূলে দৃঢ় সমর্থন জোগাতে পারে।" এ থেকে সহজেই আঁচ করা যায় যে, বিশ্বব্যাংকের ও এডিবি'র বেশীরভাগ ভারতীয় কর্মকর্তা

২। ১৯৭৪ সালে ভারতের National Defence College-এর প্রশিক্ষণের সময়

কেন আমাদের যমুনা সেতুতে রেললাইন সংযোগ দানে সাহায্যে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। কারণ ভারত আমাদের দেশের উপর দিয়ে রেল ট্রানজিট সুবিধা আদায়ের জন্য তাদের স্বদেশীয় কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এ ধরনের পরোক্ষ চাপ প্রয়োগ করে। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাকে ইন্টেলিজেন্স কাজে লাগানোর এ ধরনের উদাহরণ শুধু একটি নয়, বরং তা সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসীরূপে প্রতিনিয়ত পরিচালিত হচ্ছে।

খৃষ্টপূর্ব ৩২১ সাল হতে ৩০০ খৃষ্টপূর্ব সালের মধ্যে রচিত কৌটিল্যের[৩] 'অর্থশাস্ত্রে' 'পুরোহিত' ও 'সন্ন্যাসীনি' গুপ্তচরদের বিবরণ পাওয়া যায়। সে ধারাবাহিকতায় আজও ধর্মপ্রচারক, বিভিন্ন আশ্রম ও মিশনারীর মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি চালানো হয়। ধর্ম মানুষের একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল পবিত্র অনুভূতি বলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রচারকারী সংস্থা ও প্রচারকদের বিশেষ সম্মান করা হয়। সে সুযোগে এরা নির্বিঘ্নে সক্রিয় থাকে। পোল্যান্ডের কমিউনিজমের পতন ও গণতন্ত্রায়ন অর্থাৎ পুঁজিবাদে দীক্ষিতকরণে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান খৃষ্টান ধর্মগুরু পোপকে কাজ লাগিয়েছিলেন। তিব্বতের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের উদগাতা 'দালাইলামা' 'তথাকথিত মানবাধিকারের' প্রশ্রয়ে চীনের প্রতি একটি ভয়ংকর ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। অথচ পরণে গেরুয়া বসন চুলবিহীন এ ধর্মগুরু অত্যন্ত ব্যাপক পরিসরে 'অহিংস' গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে মিশনারী তৎপরতা ও অন্যান্য কিছু সংগঠনও যে ইন্টেলিজেন্সের সাথে জড়িত নয় তা নিশ্চিত করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

দূতাবাস কর্মকর্তারা কিভাবে গুপ্তচরবৃত্তির সাথে জড়িত থাকেন বা ডিপ্লোমেটের ছদ্মবেশে গুপ্তচর সংস্থার কর্মকর্তা কিভাবে ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা পরিচালনা করেন তার একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন সাপ্তাহিক বিক্রমের জনৈক পত্রলেখক। ৯-১৫ই আগস্ট '৯৩ সংখ্যা সাপ্তাহিক বিক্রমে ঐ পত্রলেখক উল্লেখ করেন, "কর্মশালার শেষ দিন ইন্দোনেশিয়া থেকে আগত সে দেশের বিখ্যাত মোহাম্মদীয়া পার্টির বৈদেশিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোঃ হাবীব খিরজিন আমাদেরকে তসলিমা নাসরিনের ঠিকানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা সবাই অবাক হলাম। কারণ সুদূর ইন্দোনেশিয়ার এই ইসলামী নেতা বাংলা ভাষার এই নবীন লেখিকাকে চিনলেন কিভাবে? পরে তিনিই আমাদেরকে জানালেন যে, সেখানকার ভারতীয় দূতাবাসের এক ডিপ্লোমেটের সাথে কর্মব্যাপদেশে তার পরিচয় ঘটে এবং তিনি বাংলাদেশে কর্মশালায় যোগ দিতে আসছেন জেনে ঐ ভারতীয় ডিপ্লোমেট তাকে তসলিমা নাসরিনের নাম দিয়ে বলেছেন যে, সময় করে তিনি যেন তসলিমার সাথে দেখা করেন। ....তসলিমা শুধু কলকাতার নয় বরং ভারতের সরকারী এজেন্ট এবং ভারত তাকে শুধু দুই বাংলায় নয় বরং আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চায় এবং তার পটভূমি হিসাবে তাঁকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত করাতে চাচ্ছে। ভারতীয় ডিপ্লোমেটের এই নগ্ন তৎপরতা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।"

৩। যিনি চানক্য নামে সমধিক পরিচিত

অধ্যায়-১২

গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক মহাপরিচালকদের সাক্ষাৎকার

(গোয়েন্দা বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ বিরোধী 'র' তৎপরতা শিরোনামে একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় দৈনিক ইনকিলাবে ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় লেখক ডিজিএফআই ও এনএসআই-এর সাবেক কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে সক্ষম হন। এখানে ছ'জন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার পত্রস্থ করা হলো।)



ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আমিনুল হক, বীর উত্তম

সকল স্তরেই 'র' ক্রমাগত থাবা বিস্তার করে চলেছে। বাংলাদেশে ভারতের লক্ষ্য সর্বব্যাপী, তাই অন্যান্য গুপ্তচর সংস্থা থেকে 'র'-এর তৎপরতা অনেক, অ-নে-ক বেশী

ব্রিগেডিয়ার (অব.) আমিনুল হক, বীর উত্তম, সাবেক মহাপরিচালক, এন এস আই

পৃথিবীর প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী এদেশে গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে থাকে। তবে সি. আই. এ. রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স, বৃটিশ এম আই-৬ বা আই এস আই যেই হোক না কেন কারো স্বার্থ এদেশে 'র'-এর মতো ব্যাপক ও সরাসরি নয়। যেহেতু বাংলাদেশে ভারতের লক্ষ্য সর্বব্যাপী তাই স্বভাবতই অন্যান্য দেশের গুপ্তচর সংস্থা থেকে 'র'-এর তৎপরতা এদেশে অনেক, অ-নে-ক বেশী। বাংলাদেশ বিরোধী গুপ্তচরবৃত্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে এ মন্তব্য করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা অর্থাৎ এন এস আই-এর সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আমিনুল হক, বীর উত্তম। মুক্তিযুদ্ধ ও সাত নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ব্রিগেডিয়ার (অব.) আমিনুল হক ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে '৯৬-এর মার্চ পর্যন্ত এন এস আই-এর কর্ণধার হিসেবে এদেশে পরিচালিত 'র' তৎপরতা সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। 'র'-এর কর্মপরিধি ও অনুপ্রবেশের মাত্রা নিয়ে তার রয়েছে সুস্পষ্ট অভিমত। এ ব্যাপারে দৈনিক ইনকিলাবের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, বাংলাদেশে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে 'র' হাত বাড়ায়নি। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক সেক্টর ছাড়াও সামরিক এমনকি ধর্মীয় পর্যায়েও 'র' থাবা বিস্তার করেছে বলে তিনি মনে করেন।

এখানে তার সাক্ষাতকারের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা হলো ঃ

প্রশ্নঃ আপনি একসময় বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা এন এস আই-এ মহাপরিচালক পদে নিয়োজিত ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এদেশে 'র'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কি বলে আপনি মনে করেন?

ব্রিগেডিয়ার আমিনুলঃ এদেশে 'র' এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ব্যাপক। তবে মূল উদ্দেশ্য হলো–ভারতের বাংলাভাষী রাজ্য পশ্চিম বাংলা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ আক্রান্ত 'সাতকন্যা'র মাঝে অবস্থিত বাংলাদেশকে তার (ভারতের) প্রভাব বলয়ে রাখা, যাতে সেখানে ভারত

বৈরী কোন শক্তির সাথে এমন কোন সম্পর্ক গড়ে না উঠে যা এ অঞ্চলে ভারতের আধিপত্য বিস্তারের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য ভারত এজন্য সবসময় 'বন্ধুভাবাপন্ন' বাংলাদেশের কথা বলে। আসলে এই 'বন্ধুভাবাপন্ন' কথার অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ এমন পররাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি গ্রহণ করুক যা ভারতের নীতি আদর্শের সমান্তরাল। এরকম হলে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্য ভারতের অনুকূলে রাখার অন্যতম পরিপূরক। ভারত যে বাংলাদেশের গৃহীত আদর্শকে তাদের পক্ষে দেখলেই কেবলমাত্র সন্তুষ্টি প্রকাশ করে থাকে তার অন্যতম উদাহরণ হতে পারে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতীয় সংসদে প্রদত্ত ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য। উল্লেখ্য, '৭১-এর শেষ দিকে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় পার্লামেন্টে বলেছিলেন, 'আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, বাংলাদেশ সরকার ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র-কে তাদের সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে।' বলার অপেক্ষা রাখে না এ চার নীতি ছিল ভারতীয় সংবিধানে অনুসৃত নীতির অনুরূপ।

এসব অবস্থা বিশ্লেষণ করে সংক্ষিপ্তকারে এটাই বলা যায় যে, ভারত চায় বাংলাদেশ তাদের পক্ষে থাকুক। এদেশের পররাষ্ট্রনীতি হোক ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির অনুকূল। এজন্য দরকার একটি 'বন্ধুপ্রতিম' বাংলাদেশ সরকার। এবং সেরকম একটি সরকার গঠন বা ভারতের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণে চাপ প্রয়োগের দায়িত্ব হচ্ছে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা- 'র'-এর।

প্রশ্নঃ 'র' বাংলাদেশে কোন কোন সেক্টরে কাজ করে থাকে?

ব্রিগেডিয়ার আমিনুলঃ 'র' কোন কোন সেক্টরে কাজ করে সেটা না বলে বরং এ প্রশ্ন করাই এ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে যে, 'র'-কোন সেক্টরে কাজ করে না? আমার অভিজ্ঞতা বলে, এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে 'র' হাত বাড়ায়নি। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক সেক্টর ছাড়াও সামরিক এমনকি ধর্মীয় পর্যায়েও বাংলাদেশে 'র' তার থাবা বিস্তার করেছে।

এক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গনে যেমন 'র' সবসময় ভারতীয় আদর্শের সমান্তরাল মতাদর্শ বিস্তারে তৎপর তেমনি শিল্প-সংস্কৃতি-প্রচারণা মাধ্যমেও 'র' তৈরী করেছে 'ভারতীয় মাউথপিস'। এসব সেক্টরে আবার অনিয়মিত এজেন্ট ছাড়াও মাসিক নিয়মিত ভাতা পেয়ে থাকে এধরনের এজেন্টর সংখ্যাও কম নয়। যেমন সংবাদ মাধ্যমে 'র'-এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে, এক্ষেত্রে কতিপয় সংবাদপত্রকে তারা ('র') বিভিন্ন গোপন উপায়ে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন কলামিস্টকেও 'র' ভাতা দিয়ে, বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়ে বা সম্মানসূচক খেতাব প্রদানের মাধ্যমে তাদের পক্ষে কাজ করিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে 'র' বা ভারত যা বলতে চায় এসব বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে সে কথাটাই তারা বলিয়ে নেয়। আবার ভুল-তথ্য পরিবেশনা, প্রপাগান্ডা চালানোতেও 'র' এদের কাজে লাগায়। যেমন, ভারত কখনো চায় না বাংলাদেশের কোন শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী থাকুক। এজন্য ভারতীয় পত্র-পত্রিকা, বুদ্ধিজীবী, কলামিস্ট এরা অনেক কথাই বলেন। কিন্তু আমাদের জনগণ সেসব মন্তব্যকে বৈরী দৃষ্টিকোন থেকেই বিবেচনা করে থাকে। অথচ 'র' এদেশের কলামিস্ট, বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে যখন ঐ একইরূপ কথা

বলায় তখন আমাদের জনগণ তাকে অনেক সহজে গ্রহণ করে। এভাবে বাংলাদেশে 'র' খুব সাফল্যের সাথে শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী বিরোধী সেন্টিমেন্ট তৈরীতে সক্ষম হয়েছে।

এদিকে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সেক্টরের পাশাপাশি 'র' বহুদিন যাবত আমাদের সশস্ত্রবাহিনী ও ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীগুলোয় অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে আসছে। এক্ষেত্রে তারা কতটুকু সফল বা ব্যর্থ হয়েছে সে প্রসঙ্গে না গিয়েও বলা যায় যে, 'র' এদেশের সকল খাতেই ক্রমাগত থাবা বিস্তার করে চলেছে।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলেই 'র'-এর এজেন্ট রয়েছে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। এক্ষেত্রে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলে 'র'-এর অনুপ্রবেশ বেশী বলে আপনি মনে করেন?

ব্রিগেডিয়ার আমিনুলঃ একথা ঠিক বাংলাদেশের ছোট বড় প্রায় সব রাজনৈতিক দলেই 'র'-এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অবশ্য অন্যান্য গুপ্তচর সংস্থা যেমন সি আই এ, আই এস আই-এর অনুপ্রবেশও এসব দলে লক্ষ্য করা যায়। একসময় তো সোভিয়েত সাম্রাজ্য বহাল থাকার সময় এদেশের সমাজতান্ত্রিক দলগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কেজিবি'র নির্দেশনা ও সহায়তায় চলতো। পরবর্তিতে কম্যুনিস্ট পার্টির একজন শীর্ষ নেতা এব্যাপারে 'গোপন ইতিহাস' প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। তবে একথা বলতেই হবে যে, সি আই এ, কেজিবি বা আই এস আই যেই হোক না কেন কারো স্বার্থ এদেশে 'র'-এর মতো ব্যাপক ও সরাসরি নয়। যেহেতু বাংলাদেশে ভারতের সর্বব্যাপী লক্ষ্য আছে তাই স্বভাবতই অন্যান্য দেশের গুপ্তচর সংস্থা থেকে 'র'-এর তৎপরতা এদেশে অনেক, অ-নে-ক বেশী। এক্ষেত্রে আবার রাজনৈতিক অঙ্গনে সবদিকে চ্যানেল ঠিক রাখার জন্য 'র'-প্রায় সব উল্লেখযোগ্য দলেই অনুপ্রবেশ করেছে। অবশ্য একটি বিশেষ দলে অর্থাৎ আ'লীগে 'র'-এর অনুপ্রবেশ ঐতিহাসিক কারণেই সবচেয়ে বেশী। লক্ষ্যণীয় যে তদানীন্তন পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানে যখন স্বাধিকার আন্দোলন দানা বেধে উঠে তখন 'শত্রুর শত্রু বন্ধু' এ থিয়োরীতে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স পাকিস্তান বিরোধীদের একাংশের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে। এভাবে একপর্যায়ে ১৯৬২ সালে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে যে সংগঠনটির জন্ম হয় তার সাথে তদানীন্তন ভারতীয় আই,বি'র ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পরবর্তিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় তো 'র'-এর এস এস বি (স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরো) মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। অবশ্য সে সময় একটি বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবেই ভারত লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট দিয়েছে এবং অস্বীকার করার উপায় নেই, তাদের ঐকান্তিক সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া অতো অল্প সময়ের মধ্যে জয়লাভ করা সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চাইনীজ অস্ত্রের (যা বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরা পাক বাহিনী থেকে বিদ্রোহ করার সময় নিয়ে এসেছিল) জন্য প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ চেকশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ড থেকে সংগ্রহ করে দিয়ে যুদ্ধের গতিকে তরান্বিত করেছেন। তবে যুদ্ধের পর বোঝা যায়, ভারত এসব করেছে কেবলমাত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য নয় বরং পাকিস্তানকে ভাঙ্গার জন্য। এছাড়া মুজিব বাহিনী নামে একটি কট্টর ভারতপন্থী বাহিনীও তারা গড়ে তোলে সংগোপনে মে. জে. উবানের নেতৃত্বে।

এমনকি আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম তারাও জানতাম না মুজিব বাহিনী সম্পর্কে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীনতা প্রিয় দেশবাসী অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে মুজিব বাহিনীর কথিত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রভাব প্রতিপত্তি। এও সবাই দেখলো যে, এদের নিয়েই গঠন করা হলো রক্ষিবাহিনী। এদের প্রশিক্ষকও এলো ভারত থেকে। এমুহূর্তে মেজর রেড্ডির নাম মনে পড়ছে। অথচ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ছিল যাদেরকে সরকার সেসময় প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে পারতো।

এভাবে আমরা যদি ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো যে, একসময় স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আ'লীগের মধ্যেই 'র' অধিকমাত্রায় অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল যার রেশ এখনো রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে দল হিসেবে আ'লীগকে যতোটা দায়ী করা যাবে তারচেয়ে বেশী দোষী করতে হবে ঐ দলের কতিপয় ক্ষমতা ও অর্থলিপ্সু নেতাকে। কারণ, এরা মনে করে ভারতের সাহায্য ছাড়া ক্ষমতায় যাওয়া ও টিকে থাকা সম্ভব নয়। এজন্য এরা সহজেই 'র'-এর খপ্পরে পড়ে যায়। এবং 'র'-ও এদেরকে অনেক সময় প্রকাশ্যে সহায়তা করে থাকে। ১৯৭৫-এর পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এভাবেই কাদেরিয়া বাহিনীকে অস্ত্র, শেল্টার দিয়ে সহায়তা করেছিল 'র'। অশোকা রায়না লিখিত Inside RAW বইয়ে এব্যাপারে বিশদ বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যাবে। বেগম জিয়ার শাসনামলেও দেখা গেছে 'র'- এইসব এজেন্টদের মাধ্যমে বিভিন্ন কমিটি, ফোরাম দাঁড় করিয়েছে বাংলাদেশকে চাপের মধ্যে রাখার জন্য।

এদিকে আ'লীগ ছাড়া যে অন্যান্য দলে 'র'-এর অনুপ্রবেশ নেই তা নয়। বরং অপরাপর বড় দলগুলোর শীর্ষ পর্যায়েও 'র'-অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রশ্নঃ এদেশের একজন জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট হত্যা, শান্তিবাহিনী, বঙ্গভূমি ইত্যাদি ইস্যু সৃষ্টির পিছনে 'র'-এর ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

ব্রিগেডিয়ার আমিনুলঃ একথা মানতেই হবে যে, প্রেসিডেন্টে জিয়াউর রহমানের দৃঢ় নেতৃত্ব ভারত কখনো পছন্দ করেনি। বিশেষ করে তার প্রবর্তিত জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ, ভারতীয় প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের ক্ষেপিয়ে তোলে। এজন্যই প্রেসিডেন্ট জিয়াকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় বলে ভারতীয় পত্র-পত্রিকাতেই বিভিন্ন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

এদিকে শান্তিবাহিনী বা বঙ্গভূমি ইস্যুর তো 'র'-এর সাহায্য ছাড়া অস্তিত্ব থাকারই কথা নয়। শান্তিবাহিনীর অস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদ পত্র এসবের সোর্স বা উৎস কোথায়–এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই ভারতের নাম চলে আসে। বঙ্গভূমি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাই। একসময় এটা ছিল 'কাল্পনিক কাহিনী'। কিন্তু পরবর্তিতে 'র'-এর সক্রিয় সাহায্য, সহযোগিতায় এটি মহীরূহে পরিণত হয়।

প্রশ্নঃ ডি জি এফ আই ও এন এস আই মূলতঃ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তৎপরতার সাথেই জড়িত। এক্ষেত্রে বৈদেশিক বা স্ট্রাটেজিক গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনায় বাধা কোথায়?

ব্রিগেডিয়ার আমিনুলঃ আসলে আমাদের দেশে ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট

নীতিমালা না থাকায় বিভিন্ন এজেন্সীর কর্মপরিধি কতটুকু তা বরাবরই বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণেই ইন্টেলিজেন্স তৎপরতার সীমানা কতটুকু হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয় এ নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ মূলতঃ তার বিরুদ্ধে পরিচালিত তৎপরতা চিহ্নিত ও প্রতিহত করার জন্যই কাজ করে থাকে, কোন দেশের প্রতি আগ্রাসী তৎপরতা চালায় না। তবে 'টিকে থাকার জন্য' আমাদেরও বৈদেশিক বা স্ট্র্যাটেজিক গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা উচিত। এক্ষেত্রে সরকার পরিচালনাকারী রাজনীতিবিদদের আগে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে নীতিমালা প্রণয়ন করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অর্থ, লোকবল বরাদ্দ দিতে হবে। যেখানে 'র'-এর বাৎসরিক বরাদ্দ একহাজার কোটি রূপীর বেশী সেখানে এর শতভাগের একভাগ অর্থ দিয়ে আমরা কি করতে পারি?

প্রশ্নঃ বিসিএস ক্যাডারের মতো পৃথক ইন্টেলিজেন্স ক্যাডারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা?

ব্রিগেডিয়ার আমিনুলঃ হ্যাঁ, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীগুলোর জন্য পৃথক ইন্টেলিজেন্স ক্যাডার রয়েছে। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এরা একই পেশায় নিয়োজিত থাকে। আমারও ব্যক্তিগত মত হচ্ছে কার্যকর গুপ্তচরবৃত্তি চাইলে ভিন্ন ক্যাডার থাকা উচিত। তবে এজন্য দরকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও সুদূর-প্রসারী লক্ষ্য।

বাংলাদেশে 'র'-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনে ভারতের উপর নির্ভরশীল করে তোলা

মেজর জেনারেল (অব.) গোলাম কাদের, পিএসসি, সাবেক মহাপরিচালক-এনএসআই



মেজর জেনারেল (অব.) গোলাম কাদের, পিএসসি

পাকিস্তান বা আই এস আই-এর সাধারণভাবে এমন কোন ক্ষমতা নেই যাতে তারা বাংলাদেশের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে। এছাড়া এদেশে তাদের স্বার্থও হচ্ছে খুবই সীমিত পর্যায়ের। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তান যেভাবে তার নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় মহাব্যস্ত সেখানে হাজার মাইল দূরের বাংলাদেশে এসে ভজঘট পাকানো তাদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু বিপরীত দিকে বাংলাদেশের সীমানার তিনদিক বেষ্টনকারী বিশাল ভারতের পক্ষেই কেবল প্রত্যক্ষভাবে সবদিক থেকে এদেশের প্রতি বৈরীতা প্রদর্শন সম্ভব। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভারতের স্বার্থও যেমন অত্যন্ত বিস্তৃত তেমনি ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক মিল থাকায় তাদের পক্ষে এদেশে গুপ্তচরবৃত্তি চালানোও অনেক সহজ। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে পরিচালিত বিদেশী গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে এ মন্তব্যই করেছেন এনএসআই অর্থাৎ জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার ভূতপূর্ব মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) গোলাম কাদের।

১৯৯১ সালের প্রথম দিক থেকে ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেশের অন্যতম গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্বপালনকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে 'র' ও এর বাংলাদেশী এজেন্টদের 'ভিনডিকটিভ' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেছেন, ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা এদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিল্প, গ্যাস, পানিসহ এমন কোন খাত নেই যেখানে তার থাবা বিস্তার করেনি। এব্যাপারে দৈনিক ইনকিলাবকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মে.জে. গোলাম কাদের গোয়েন্দা সংস্থায় দায়িত্বপালনকালীন তার অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে জানান যে, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে 'র' তার জন্মলগ্ন থেকে বিশেষ করে ১৯৭১-এর পর বাংলাদেশে বিস্তৃত পরিসরে গুপ্তচর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে যার মাত্রা বিগত বছরগুলোয় বৃদ্ধি পেয়েছে আশঙ্কাজনকহারে।

এ উপমহাদেশের ক্ষমতার ভারসাম্য, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মেরুকরণের প্রকৃতি বিবেচনায় বাংলাদেশে 'র'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মে.জে. কাদেরের অভিমত হলো– ভারতীয় নীতি নির্ধারক মহলের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৌশলগত প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে 'র' গোপন সহায়তা প্রদান করে থাকে। তার মতে, দক্ষিণ এশিয়ায় একাধিপত্য বিস্তারে ভারতীয় কৌশলবিদগণ এ্যাকাডেমিক্যালি যে চিন্তা চেতনা পোষণ করেন 'র'-এর দায়িত্ব হচ্ছে সেসবের বাস্তবায়নে ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে 'র'-এর সর্বপ্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সকল পর্যায়ে বাংলাদেশকে ভারতের বাধ্যগত রাখা যাতে এদেশে সরকার গঠন, দেশ চালনা থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতিসহ সবক্ষেত্রেই ভারতের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এব্যাপারে মে. জে. কাদের-এর দৃঢ় বিশ্বাস যে, এদেশে 'র'-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশকে দূরে সরিয়ে আনা, বন্ধুহীন করে তোলা। যাতে একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশকে ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মৌলবাদ, তালেবান, উত্তর-পূর্ব ভারতে আইএসআই তৎপরতা ইত্যাদি ইস্যু সৃষ্টি করে বাংলাদেশীদের মধ্যে অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে 'র' তৎপরতা চালিয়ে আসছে বলে মে. জে. কাদের-এর ধারণা।

এসব লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'র' কোন কোন সেক্টরে কাজ করে থাকে এ সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাক্তন এনএসআই ডিজি জানান যে, এদেশে 'র'-এর রয়েছে নিজস্ব নেটওয়ার্ক। এছাড়া এজেন্টও রয়েছে অনেক। যাদের মাধ্যমে 'র' বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক খাতের সকল স্তরেই অনুপ্রবেশ করেছে বলে মে. জে. কাদের-এর অভিমত। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর অনেক নেতা, তাদের আত্মীয়-স্বজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'র'-এর সাথে জড়িত রয়েছে। এসব রাজনীতিবিদ ছাড়াও সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়িক, সরকারী প্রশাসনিক ও প্রচারণা মাধ্যমে নিয়োজিত এজেন্টদের মাধ্যমে 'র' খুব সহজেই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন গার্মেন্টস, পাট, তেল, গ্যাস সকল প্রকার খনিজ সম্পদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে অনেকটা বাধাহীনভাবে। এরূপ তথ্য আদায়ের ক্ষেত্রে এমনও লক্ষ্য করা গেছে যেখানে 'র'- দূতাবাস কর্মকর্তাদের স্ত্রীকেও কাজে লাগিয়েছে

প্রশিক্ষিত অপারেটিভ হিসেবে। এ পর্যায়ে তার কার্যকালে বাংলাদেশে 'র'-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্ত্রী'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মে. জে. কাদের বলেছেন, 'র'-প্রায়শই কর্মকর্তাদের স্ত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে গুপ্তচরবৃত্তিতে কাজে লাগায়। ১৯৯১-এর পর বাংলাদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত 'র'-কর্মকর্তা যিনি কূটনীতিবিদের আবরণে কাজ করতেন তার স্ত্রীকেও সেসময় অনেক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতে দেখা যেতো। তিনি ভাল নাচতেও পারতেন। ফলে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সরকারী ও বিরোধী দলের অনেকের সাথে পরিচিত হওয়া সেই কর্মকর্তা ও তার স্ত্রীর পক্ষে সহজ হয়ে উঠতো। এভাবেই তারা কৌশলে পেয়ে যেতেন বিভিন্ন তথ্য, বুঝতে পারতেন সরকারের মনোভাব। আবার ক্ষেত্রবিশেষে সম্পর্ক তৈরী করে একসময় ভারতীয় বাণিজ্যিক স্বার্থ আদায় করে নিতেন কোন মন্ত্রী বা এম.পি'র কাছ থেকে। মোটকথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে 'র' এদেশের শীর্ষ পর্যায়ে যোগাযোগ গড়ে তুলতো কারো সন্দেহের উদ্রেক না করে।

এদিকে শুধু যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পর্যায়েই 'র' অনুপ্রবেশ করেছে তা নয় বরং মে. জে. কাদের-এর দেয়া তথ্য মতে, ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা বরাবরই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ। এক্ষেত্রে সশস্ত্রবাহিনীর নতুন কোন স্থাপনা, গবেষণামূলক তৎপরতা, কর্মকর্তা-সৈনিকদের মনোভাব, সমরাস্ত্র সংগ্রহ, ভারত বৈরী দেশের সাথে সামরিক চুক্তি ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহে 'র' ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে থাকে। তবে তিনি মনে করেন, সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরীরত সদস্যদের মধ্যে 'র' কখনোই সাফল্যের সাথে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। তাই তারা ('র') অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনেককে ব্যবসা পাইয়ে দিয়ে বা ভিন্ন কোন পথে সুবিধা দিয়ে তাদের পক্ষে কাজ করাতে চেষ্টা চালিয়ে থাকে। সশস্ত্রবাহিনীর পাশাপাশি 'র' যে বাংলাদেশী ইন্টেলিজেন্সেও অনুপ্রবেশ করেনি তা নয়। সীমিত হলেও লোয়ার লেবেলে 'র' অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে বলে মে. জে. কাদের মনে করেন।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে 'র'-এর অনুপ্রবেশ, বিশেষ করে কোন দলে অনুপ্রবেশের মাত্রা বেশী কিনা, প্রশ্ন করা হলে মে. জে. কাদের 'সঙ্গত কারণেই' খোলাখুলিভাবে কোনরূপ মন্তব্য না করলেও এমত প্রকাশ করেন যে, প্রায় সকল রাজনৈতিক দলেই কমবেশী 'র'-এর এজেন্ট রয়েছে। তবে তিনি বলেন, এদের সংখ্যা একটি বিশেষ দলে সবচেয়ে বেশী যেখানে 'র' প্রায়শই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এক্ষেত্রে একটি সংসদ নির্বাচনে ঐ দলের এম.পি মনোনয়ন দেয়ায় 'র' একজনের পক্ষে সুপারিশ করে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অবশ্য এ সম্ভাবনাও তিনি উড়িয়ে দেননি যে, জাতীয়তাবাদী বলে চিহ্নিত রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যেও 'র'-অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়েছে।

এদিকে এন এস আই ও ডি জি এফ আই বাংলাদেশে মূলতঃ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা চালালেও বৈদেশিক বা কৌশলগত গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনায় বাধা কোথায় এসম্পর্কে জানতে চাইলে মে. জে. কাদের বলেন, আমাদের সে যোগ্যতা থাকলেও মূলত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত না থাকায় এব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। কারণ, এন এস আই বা ডি জি এফ আই এর প্রধান বা এর কর্মকর্তারা তো

নিজ থেকে এধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। বরং সরকারী নির্দেশনা বা আরো ব্যাপকার্থে এতদসংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা থাকলেই কেবল বৈদেশিক বা কৌশলগত পর্যায়ে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে সম্পদের সীমাবদ্ধতা বা প্রয়োজনীয় ফান্ডের অভাবও একটি অন্যতম কারণ। সবচেয়ে বড়কথা এজেন্সীগুলোকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার না করে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় কাজে লাগালে এধরনের সমস্যার স্বাভাবিকভাবেই সমাধান হয়ে যায়।

সবশেষে মে. জে. কাদের বাংলাদেশে পরিচালিত 'র' তৎপরতার ব্যাপকতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা ও এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশপ্রেম এবং দায়িত্ববোধের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'র'-তাদের দেশের স্বার্থ রক্ষায় জাতীয় নীতি নির্ধারকদের প্রণীত পরিকল্পনানুযায়ী নিষ্ঠার সাথে কাজ করে থাকে যা তাদের দেশপ্রেমের পরিচায়ক। এছাড়া ভারতীয় পররাষ্ট্র ক্যাডারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও 'র'-কে যাবতীয় উপায়ে সাহায্য সহযোগিতা করে বলে তিনি জানান। অথচ, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মতে, বাংলাদেশে এমন সহযোগিতামূলক পরিবেশ এখনো সৃষ্টি হয়নি।

'র'-এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামপন্থীদের স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে

মেজর জেনারেল (অব.) এম এ হালিম, পিএসসি, সাবেক মহাপরিচালক-ডিজিএফআই



মেজর জেনারেল (অব.) এম. এ. হালিম, পিএসসি

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি ও বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে ডিজিএফআই-এর মহাপরিচালকসহ ঐ সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকারী মেজর জেনারেল (অব.) এম এ হালিম, পিএসসি বলেছেন, বাংলাদেশে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর লক্ষ্য হল বাংলাদেশে ভারতীয় প্রভাব বিস্তার করা ও সব ব্যাপারে বাংলাদেশকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা মে. জে. হালিম আরও মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করলেও 'র' বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণকে ভারত অনুরাগী করে গড়ে তুলে তাদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসায় ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া তার মতে, ইসলামপন্থীদের স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি হিসেবে প্রচার করার পাশাপাশি বাংলাদেশকে মুসলিম দেশসমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখাও হচ্ছে 'র'-এর অন্যতম লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অন্যতম গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই বা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকারী মে. জে. হালিম বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে ১৯৯৬

সালের ১৯ আগস্ট মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ডিজিএফআই-এর এই শীর্ষপদে ১৪ সেপ্টেম্বর '৯৮ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি ১৯৯৪ সালের ৩১ আগস্ট থেকে ১৭ এপ্রিল '৯৫ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকরূপে বাংলাদেশে 'র'-এর তৎপরতার অনেক গোপন বিষয় জানার সুযোগ লাভ করেন। অবশ্য ১৯৪৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণকারী ও '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ৮ নম্বর সেক্টর এবং জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রণকারী মে. জে. হালিম ইতোপূর্বে ১৪ ডিসেম্বর '৯১ তারিখে ডিজিএফআইতে যোগদান করেন পরিচালক এফএসআইবি হিসেবে। পরবর্তীতে তিনি পালাক্রমে পরিচালক সিআইবি (কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো), উপ-মহাপরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশে বিদেশী গুপ্তচর সংস্থাসমূহের তৎপরতা সম্পর্কে জানতে পারেন বিস্তৃত পরিসরে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে পরিচালিত 'র'-এর তৎপরতা সম্পর্কে জানতে চাইলে মে. জে. এম এ হালিম দৈনিক ইনকিলাবকে একটি বিস্তৃত সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এখানে সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ উপস্থাপন করা হল-

প্রশ্নঃ আপনি একসময় বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা-ডিজিএফআইতে মহাপরিচালক পদে নিয়োজিত ছিলেন। সে অভিজ্ঞতার আলোকে এদেশে 'র'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কি বলে আপনি মনে করেন?

মে. জে. হালিমঃ ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' সংগঠিত হয় ১৯৬৮ সালে। 'র' সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বহির্বিশ্বে, বিশেষ করে ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা ও তার বিশ্লেষণ করা। ভারত আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার হিসেবে সবসময়ই তার প্রতিবেশী দেশসমূহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বলয় সৃষ্টি করতে চায়। সে আরও চায় এতদঞ্চলে 'বড় ভাই'-এর ভূমিকা পালন করতে। ভারতের এই যে সম্প্রসারণবাদী নীতি-তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই 'র' কার্যক্রম চালিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ভারতের পার্শ্ববর্তী একটি ক্ষুদ্র দেশ, তিনদিকে ভারত দ্বারা বেষ্টিত। এখানে 'র'-এর লক্ষ্য হল প্রভাব বিস্তার করা ও বাংলাদেশকে তাদের বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসা। মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করলেও 'র' চায় বাংলাদেশকে সব ব্যাপারে ভারতের ওপর নির্ভরশীল করে তুলতে, যেখানে জনগণও হয়ে উঠবে ভারতের প্রতি অনুরাগী। এছাড়া 'র'-এর অন্যতম লক্ষ্য হল এদেশের ইসলামপন্থীদের স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা ও বাংলাদেশকে মুসলিম দেশসমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা।

প্রশ্নঃ 'র' বাংলাদেশে কিভাবে, কোন সেক্টরে কাজ করে থাকে ?

মে. জে. হালিমঃ আমাদের দেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে 'র' তাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। 'র' তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সেক্টরভেদে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য সেক্টর হচ্ছে-মিডিয়া, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প বাণিজ্য খাত। অতিসূক্ষ্মভাবে 'র' এসব সেক্টরে অনুপ্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে সকল পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করে। দেখা গেছে, 'র' তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য

রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের বেছে নেয় এবং বিভিন্ন কৌশলে এদের 'ক্রয়' করে। এধরনের কৌশলের মধ্যে রয়েছে খেতাব প্রদান, ডিগ্রী প্রদান, বৃত্তি প্রদান, কম খরচে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করে তাঁকে বিশেষ সম্বর্ধনা দেয়া ইত্যাদি..... ইত্যাদি।

আবার অনেককে 'র' ভাতাও প্রদান করে থাকে। এসব ব্যক্তিবর্গ 'র'-এর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে এবং 'র'-এর দেয়া নীতি-আদর্শ প্রচার করে। প্রচার মাধ্যম হিসেবে তারা ব্যবহার করে নিউজ মিডিয়া, জনসভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, লিফলেট, বই-পুস্তক প্রভৃতি। এসব মাধ্যমে 'র' নির্দেশিত এমন প্রচারণাই চালান হয়, যা আমাদের দেশের প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, প্রথা ও বিশ্বাস-যার উপর সমাজ দৃঢ়ভাবে গঠিত হয় সেসবকে হেয় প্রতিপন্ন করে এবং তার পরিবর্তে বিজাতীয় ('র'-এর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী) প্রচলিত ব্যবস্থা ও বিশ্বাসকে বড় করে দেখায়।

এছাড়া 'র' ও তার এজেন্টরা দেশের নিরাপত্তা বাহিনী সম্পর্কেও অপপ্রচার করে থাকে। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনীর ছোট-খাট ভুলভ্রান্তি খুব বড় করে জনসম্মুখে উপস্থাপন করে জনগণকে নিরাপত্তা বাহিনী সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে তোলা হচ্ছে 'র'-এর অন্যতম অপকৌশল। এদিকে ভারত কখনও চায়নি যে, স্বাধীন বাংলাদেশে কোন সামরিক বাহিনী থাকুক। আজকাল প্রায়ই কিছু বুদ্ধিজীবী, কলামিস্ট, রাজনীতিবিদকে বলতে শোনা যায়, বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর কোন প্রয়োজন নেই। মজার ব্যাপার হল এই শ্লোগানটি হচ্ছে 'র'-এর; কিন্তু উচ্চারিত হচ্ছে বাংলাদেশীদের মুখ থেকে।

এদিকে সাম্প্রতিকালে 'র' উত্তর-পূর্ব ভারতের গেরিলা তৎপরতায় বাংলাদেশ সহায়তা দিচ্ছে এমন প্রচারণা চালিয়ে আসছে। বাংলাদেশে ভারতীয় গেরিলাদের প্রশিক্ষণ শিবির আছে এ জাতীয় অভিযোগ তুলে তারা মূলত আমাদের মাঝে অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলতে চায়। আমি যখন ডিজি, ডিজিএফআই তখন ভারতীয় পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, বাংলাদেশের কিছু চিহ্নিত এলাকায় উলফা গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প আছে। কিন্তু পরবর্তীতে তদন্ত করে দেখা গেছে, এসবই ভুল ইনফর্মেশনের ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ অস্বীকার করার উপায় নেই 'র'- '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছে। কিন্তু '৭১-এর পর এরা এতটা বৈরিতা শুরু করল কেন?

মে. জে. হালিমঃ মুক্তিযুদ্ধে 'র'-এর সাহায্যে আমরা উপকৃত হয়েছি এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে এই সাহায্য ছিল একটি পূর্বপরিকল্পিত, সমন্বিত গোয়েন্দা কার্যক্রমের অংশবিশেষ। মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতের স্ট্রাটেজিক প্ল্যান অনুযায়ী 'র' বাংলাদেশের জন্য ইন্টেলিজেন্স প্ল্যান প্রণয়ন করে। সেক্ষেত্রে 'র' স্বতঃস্ফূর্তভাবে, বিনা স্বার্থে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। বরং বাংলাদেশকে স্বাধীন করার চাইতে চির শত্রু পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করায় ভারত অধিকমাত্রায় সচেষ্ট ছিল। ভারত চেয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশে তার প্রভাব বলয় সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে ভারতমুখী ও তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করবে যেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে ভারত প্রদত্ত নীতিমালার অনুসরণ করবে বাংলাদেশ। কিন্তু স্বাধীনতা প্রিয় এ জাতি সেটা মেনে নেয়নি। সে জন্যই দু'দেশের সম্পর্কের বৈরিতা শুরু হয়েছে '৭১-

এর পর থেকে।

প্রশ্নঃ এ দেশের একজন জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট হত্যা, শান্তিবাহিনী, বঙ্গভূমি ইত্যাদি ইস্যু সৃষ্টির পিছনে 'র'-এর ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

মে. জে. হালিমঃ কোন কোন মহল থেকে শোনা যায় যে, প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার নেপথ্যে 'র'-এর ভূমিকা ছিল। এমনও জনশ্রুতি আছে যে, ইন্দিরা গান্ধীর সময় জিয়া হত্যার পরিকল্পনা করা হয় এবং মোরারজী দেশাই'র সময় সে পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় এসে পরিকল্পনাটি পুনর্জীবিত করে। তবে এসব বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন তথ্য বা প্রমাণাদি নেই যাতে নিশ্চিত করে বলা যাবে যে, প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যায় নেপথ্যের ভূমিকায় ছিল 'র'।

শান্তিবাহিনী এবং বঙ্গভূমি আন্দোলন নিঃসন্দেহে 'র'-এর সৃষ্ট।'র' এদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে থাকে। এর স্বপক্ষে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ রয়েছে। শান্তিবাহিনী ও বঙ্গভূমির কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনা 'র'-এর দায়িত্বে হয়ে থাকে। এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তিবাহিনী এবং বঙ্গভূমির স্বপক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার জন্যও 'র' সভা, সেমিনারের আয়োজন করে থাকে।

প্রশ্নঃ আমরা জানি বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই 'র'-এর এজেন্ট রয়েছে। এক্ষেত্রে কোন বিশেষ দলে এদের অনুপ্রবেশ বেশী বলে আপনার ধারণা?

মে. জে. হালিমঃ সত্যি কথা বলতে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ভেতরেই 'র'-এর এজেন্ট রয়েছে। যেসব রাজনৈতিক দল বা যেসব সংগঠনের মতাদর্শ বা মনোভাব ভারতের মতাদর্শ বা মনোভাবের অনুকূলে তাদের সঙ্গে 'র'-এর খুব সহজে Interaction গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে কষ্ট করে বা খড়কুটো পুড়িয়ে এজেন্ট দিয়ে অনুপ্রবেশ করার কোন প্রয়োজন হয় না। এদিকে এ দেশের সচেতন সবাই জানে যে, '৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগের অনেক নেতা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে ও দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করেন। এদের মধ্য থেকেই 'র' সৃষ্টি করে কাদেরিয়া বাহিনী যাদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, অর্থ দিয়ে সাহায্য করে ভারত। এছাড়া আরও অনেকের সাথেই তখন 'র'-এর যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

প্রশ্নঃ জানা মতে ডিজিএফআই ও এনএসআই মূলত কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা চালিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বৈদেশিক বা স্ট্রাটেজিক গুপ্তচরবৃত্তি চালানোয় বাধা কোথায়?

মে. জে. হালিমঃ কোন বাধা নেই। ডিজিএফআই এবং এনএসআই'তে একটি শাখা রয়েছে এই ধরনের কার্যক্রম চালানোর জন্য। কিন্তু এদের কার্যক্ষমতা খুবই সীমিত। দক্ষ জনবলের অভাব ও আধুনিক যন্ত্রপাতির স্বল্পতার কারণে এই শাখার কার্যক্রম খুব একটা আশানুরূপ নয়। বৈদেশিক গুপ্তচরবৃত্তি চালানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। এখানে প্রতিকূল পরিবেশে ও অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যে কাজ করতে হয়। এ জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের প্রয়োজন। তাছাড়া কোন সরকার গোয়েন্দা সংস্থার এই দিকটায় কখনো কোন মনযোগ দেয়নি। তারা সরকারবিরোধী রাজনীতির খবরাখবর নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এছাড়া বৈদেশিক গোয়েন্দা কার্যক্রম নির্ভর করে একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি, দেশের Geo Political Situation এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মনোভাবের ওপর। এই

সকল বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে জাতীয় নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করা হয়। গোয়েন্দা সংস্থা সেই নীতির আলোকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। কিন্তু আমাদের দেশে গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এই রূপ কোন সরকারী নীতি বা নির্দেশনা নেই। সুষ্ঠু গোয়েন্দা কার্যক্রমের জন্য এই রূপ নীতি থাকা খুবই প্রয়োজন।

আওয়ামী লীগের মধ্যে 'র'-এর অনুপ্রবেশ সবচেয়ে বেশী

'র' সর্বপ্রথমে অনুপ্রবেশ করেছে সংস্কৃতির মায়াবী পথ ধরে, তারপর ক্রমশঃ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে শিক্ষাঙ্গনে এবং কালক্রমে তার ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটেছে আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে

মেজর জেনারেল (অব.) এম এ মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি, সাবেক মহাপরিচালক-ডিজিএফআই



মেজর জেনারেল (অব.) এম. এ. মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি

বর্তমান পৃথিবীতে সরাসরি সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্র দখল করে নেয়ার পরিবর্তে পরম হিতাকাংখী বন্ধু সেজে একই উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল এখন আধিপত্যবাদী শক্তির মোক্ষম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আর সে কৌশলের অংশ হিসেবেই আধিপত্যবাদী শক্তি সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের আজ্ঞাবহ এক পুতুল সরকার এবং ক্রমান্বয়ে তাদের মাধ্যমেই সে দেশের রাজনীতি, অথনীতি সংস্কৃতিসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা হয় অচলাবস্থার। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে পরিচালিত 'র' তৎপরতা সম্পর্কে জানতে চাইলে এ মন্তব্য করেন ডিজিএফআই বা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) এম এ মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি। বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির এক চরম ক্রান্তিলগ্নে যখন ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতা সকল সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল তখন তিনি ডিজিএফআই-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ১৯৯৬ সালের ৭ মার্চ। তাই স্বভাবতই তাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে 'র' পরিচালিত আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির সকল স্তর। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে 'র'-এর অনুপ্রবেশ নিয়েও মে. জে. মতিনের রয়েছে সুস্পষ্ট অভিমত। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রণকারী এই সেনা কর্মকর্তা মনে করেন এ দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যেই 'র'-এর এজেন্ট রয়েছে এ কথা নির্মম সত্য। তবে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলে 'র'-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সীমাহীন এবং তাঁর মতে সেই দলটি হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে দাবীদার আওয়ামী লীগ।

বাংলাদেশে পরিচালিত 'র' তৎপরতা সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাবের পক্ষ থেকে মে. জে. মতিনের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি এ ব্যাপারে একটি বিস্তৃত সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

প্রশ্নঃ আপনি এক সময় বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা 'ডিজিএফআই'-

তে মহাপরিচালক পদে নিয়োজিত ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এ দেশে 'র'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি বলে আপনি মনে করেন?

মে. জে. মতিনঃ আমি খুব কম সময়ের জন্য (মার্চ থেকে আগস্ট '৯৬) এ দেশের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা 'ডিজিএফআই'-এর মহাপরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। আমার নিয়োগকাল দীর্ঘ না হলেও সময়টা ছিল ঘটনাবহুল, আর তাই আমার অভিজ্ঞতার প্রসার বা ব্যাপ্তি ছিল ব্যাপক। একজন প্রাক্তন 'ডিজি, ডিজিএফআই' হিসেবে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলতে চাই, আমাদের দেশে 'র'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সাময়িক ও সুদূরপ্রসারী এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সাময়িক উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ এ দেশের মাটি ও মানুষকে ভারতমুখী ও ভারতনির্ভর করে তোলা এবং একই সাথে এ দেশকে বাইরের কোন শক্তি বিশেষ করে পাকিস্তানের প্রভাব বলয় থেকে সদা মুক্ত রাখা। অন্যদিকে সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য হচ্ছে To implement the Indian version of the Monroe Doctrine which New Delhi has been pursuing in practice in order to spread an Indian umbrella on the plea of regional security over all of South Asia অর্থাৎ আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নামে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব বলয়ের বিস্তার সাধনকল্পে 'মনরো ডকট্রিন' (১৮১৭-'২৫ সাল পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো কর্তৃক অনুসৃত মতবাদ)-এর অনুরূপ নিউ দিল্লী কর্তৃক অনুসৃত ডকট্রিন বা মতবাদকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেকে সামনে রেখে কাজ করা।

প্রশ্নঃ 'র' বাংলাদেশে কিভাবে, কোন সেক্টরে কাজ করে থাকে ?

মে. জে. মতিনঃ সময়ের পরিবর্তনের সাথে আধিপত্যবাদী আগ্রাসী শক্তি কর্তৃক দুর্বল ও অপেক্ষাকৃত ছোট প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণের কলাকৌশলও পাল্টে গেছে। সরাসরি সৈন্য সামন্ত পাঠিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্র দখল করে নেয়ার পরিবর্তে পরম হিতাকাংখী বন্ধু সেজে একই উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল এখন আধিপত্যবাদী আগ্রাসী শক্তির মোক্ষম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আর সে কৌশলের অংশ হিসেবেই আধিপত্যবাদী শক্তি সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের আজ্ঞাবহ এক পুতুল সরকার এবং ক্রমান্বয়ে তাদের মাধ্যমেই সে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা হয় অচলাবস্থার। শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে সে দেশের জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরানোর পাশাপাশি জাতিকে বিভক্ত করে তাকে পারস্পরিক হানাহানি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত করার মাধ্যমে মনোবল তথা প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বিনষ্ট করা হয়। এমনি অবস্থায় আগ্রাসী শক্তির আজ্ঞাবাহীরা সিন্দাবাদের ভূতের মতই জাতির ঘাড়ে দৃঢ়ভাবে চেপে বসে। ফলে এমন এক সময় আসে যখন আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা অসহায় সে জাতি নিজের অজান্তেই নিজেকে সঁপে দেয় আধিপত্যবাদী শক্তির ইচ্ছার কাছে। এমনিভাবে এক অস্থিতিশীল কৃত্রিম রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিকিমকে গ্রাস করেছিল।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, কোন স্বাধীন দেশের পরাধীনতা শুরু হয় সে দেশের ভেতর থেকে। সিকিমের স্বাধীনতা কোন বিদেশী বিকিয়ে দেয়নি, বিকিয়ে দিয়েছিল সে

দেশেরই সন্তান লেন্দুপ দোর্জি ও তার কতিপয় সহযোগী নির্বাচিত সংসদ সদস্য। ১৯৬৭ সালে নির্বাচনের পর ১৮টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে 'সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস' ৮টি আসনে জয়লাভ করে, 'সিকিম ন্যাশনাল পার্টি' ৫টি এবং ভারতের অনুগত 'সিকিম স্টেট কংগ্রেস' ১টি এবং অন্যান্য দল ৩টি আসন লাভ করে। এছাড়া 'চোগিয়াল'-এর হাতে থাকে ৬টি আসনে মনোনয়ন প্রদানের ক্ষমতা। এ ফলাফল ভারতের মনপুত হয়নি। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' সিকিমে সক্রিয় হয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে সংগ্রাম। 'র' এজেন্টরা তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক সরকার' প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত ব্যক্তিবর্গের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে। সিকিমের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষায় লড়াইরত 'চোগিয়াল' (ধর্মরাজ)-কে অপসারণের দাবীতে জনগণকে উসকানি প্রদান করা হয়। সিকিম স্টেট কংগ্রেস-এর নেতা কাজী লেন্দুপ দোর্জি তখন 'র'-এর হাতের পুতুল। তথাকথিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে 'চোগিয়ালকে' ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে সিকিমে রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালের ২৩ এপ্রিল সিকিমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সহযোগিতায় কাজী লেন্দুপ দোর্জির 'সিকিম স্টেট কংগ্রেস' ৩২টি আসনের মধ্যে ৩১টি আসন লাভ করে। লেন্দুপ দোর্জি মুখ্যমন্ত্রী হন। মন্ত্রিসভা গঠনের পর পরই তিনি সিকিমকে ভারতের হাতে তুলে দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ১৯৭৫ সালের ১০ এপ্রিল সিকিমকে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে তুলে দেয়ার লক্ষ্যে সিকিম জাতীয় পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয়, 'এখন থেকে চোগিয়ালের পদ বিলোপ করা হল এবং এ মুহূর্ত থেকে সিকিম ভারতের সাংবিধানিক অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে।' পরিশেষে ১৯৭৫ সালের ২৬ এপ্রিল ভারতীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক পাসকৃত ৩৮তম সংশোধনী বলে সিকিম ভারতের ২২তম অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিগণিত হয়।

সিকিমে পরিচালিত অপারেশনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিবেশী ভারত বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কৌশল অনুসরণ করছে বলে মনে হয়। সিকিমে তারা জনসাধারণকে বাদ দিয়ে প্রথমে ক্রয় করেছিল সে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা বা পলিটিক্যাল এলিটদের। কারণ, সিকিমের মত পশ্চাৎপদ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তারাই ছিল রাজনীতির মূল খেলোয়াড়। তবে রাজনৈতিক কেনাবেচার বাজারে সিকিমের চেয়ে আমাদের দেশের অবস্থা কিছুটা ভিন্নতর। এখানে পলিটিক্যাল এলিটদের পাশাপাশি আমাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বুদ্ধিজীবী নামধারী এলিটরাও গুরুত্বের দিক থেকে মোটেই পিছিয়ে নেই। এ দেশের বুকে ভারতীয় প্রভাব বলয় ও আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ভারতীয় কুখ্যাত গুপ্তচর সংস্থা 'র' অত্যন্ত সূক্ষভাবে সর্বপ্রথম অনুপ্রবেশ করেছে আমাদের কালচার বা সংস্কৃতির মায়াবী পথ ধরে, তারপর ক্রমশ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে এবং কালক্রমে তার ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটেছে আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে। আর তাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, আধিপত্যবাদী মনোভাবাপন্ন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিনিয়োগের পাশাপাশি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলসহ মিডিয়া জগতে বিনিয়োগ করে যাচ্ছে মুক্ত হস্তে। ফলশ্রুতিতে এ দেশের রাজনৈতিক, আর্থ-

সামাজিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ মিডিয়া অঙ্গনে ভারত পরম যত্নে গড়ে তুলেছে তাদের তল্পীবাহী স্বার্থান্বেষী দোসর ও একান্ত সুবিধাবাদী সহযোগী চক্র, যাদের সক্রিয় সহযোগিতায় এ দেশের শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, এমনকি তাহজীব ও তমদ্দুনের ওপর নিরন্তর আঘাত হানা হচ্ছে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অপশাসন, অপকৃষ্টি ও অপসংস্কৃতিতে দেশ আজ ছেয়ে গেছে। নানা ফন্দি-ফিকির ও চক্রান্তের বেড়াজালে এ দেশকে আটকিয়ে পরমুখাপেক্ষী করে তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারতের তাঁবেদার সৃষ্টির লক্ষ্যে 'র' এদেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে আমাদের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের মাঝে বিজাতীয় সংস্কৃতির বীজ রোপণ করে যাচ্ছে অবিরত। একাত্তরে বন্ধুবেশে এ দেশে আগমনের প্রেক্ষিতে আমাদের প্রতিবেশী রোপিত সে বীজ কালক্রমে অঙ্কুরিত হয়, ক্রমশ তা চারদিকে ডালপালা ও শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আজ আকার ধারণ করেছে এক মহীরুহের, পরিণত হয়েছে এক বিশাল বটবৃক্ষে। তাই তো আজ আবার দুই বাংলা এক হওয়ার আবেগময় ভাষণ শোনা যাচ্ছে, 'সীমান্ত পার হয়ে এসো' গান শোনা যাচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে দেশের স্বাতন্ত্র্যকে মুছে ফেলার জন্য দেশের এক দশমাংশ ভূখণ্ড (পার্বত্য চট্টগ্রাম)-কে অন্যের দখলদারিত্বে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ দেশের বুকের উপর দিয়ে ভারতের মত আগ্রাসী শক্তিকে করিডোর দেয়ার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হচ্ছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ভারত অনুসৃত কথিত কৌশলের পথ ধরেই আজ আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি চিহ্নিত অংশ বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনী রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার প্রয়াসে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই তাদেরকে বলতে শোনা যায় আমাদের কোন শত্রু নেই, ফলে প্রয়োজন নেই কোন মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার। তারা প্রকাশ্যেই বলছেন, আমরা বিশাল ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত, ভারতের রয়েছে বর্তমান বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সশস্ত্র বাহিনী। ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ ছোট ও দুর্বল বিধায় সম্মুখ সমরে বাংলাদেশ কোনদিনই টিকে উঠতে পারবে না, তাই সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস করে তারা কথায় কথায় সেনাবাহিনীকে ছেঁটে ফেলার উপদেশ বিতরণ করে থাকেন। এছাড়াও ভারতের বিরাগভাজন না হওয়ার জন্য ভারতের সাথে বিদ্যমান সকল সমস্যা কূটনৈতিক পর্যায়ে সমাধানের 'সহজ-সরল' উপদেশ খয়রাত করে থাকেন। এসব হালকা ধরনের কথাবার্তার আসল ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা। লজ্জার মাথা খেয়ে তারা আরও বলেন, বৃটিশ সরকার এ উপমহাদেশে বিভক্তি চাপিয়ে দিয়েছিল, আর তাই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে কৃত ১৯৪৭-এর ভারত পার্টিশন ভুল ছিল। আসলে ভাশুরের নাম মুখে না আনার মতই তারা বলতে চান না যে, তাদের পূর্বপুরুষ মুসলমানরা এই উপমহাদেশে বর্ণ হিন্দুদের পদানত ও অস্পৃশ্য হয়ে বাঁচতে চায়নি বলেই ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগ প্রয়োজন হয়েছিল। আসলে এসবই হচ্ছে 'র'-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্ররোচনায় এ দেশের বুকে পরম যত্নে সৃষ্ট উক্ত মহল বিশেষ কর্তৃক দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে নিবেদিত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার। 'র'-এর প্রত্যক্ষ সাহায্য ও মদদপুষ্ট হয়ে এসব এজেন্ট

ভারতীয় বিজেপি ও তার সংঘ পরিবারের স্বার্থে আমাদের ইতিহাস বিকৃত করছেন। তারা ভারতীয় বিজেপি, শিবসেনাদের মেনিফেস্টো এ দেশে বাস্তবায়িত করার সুদূরপ্রসারী অভিলাষকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রশ্নঃ অস্বীকার করার উপায় নেই, 'র' একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। কিন্তু একাত্তরের পর এরা এতটা বৈরিতা শুরু করল কেন?

মে. জে. মতিন ঃ একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী ভারত আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল সত্য, তবে তাকে কোনক্রমেই নিঃস্বার্থ সহযোগিতা বলা চলে না। কারণ, কথিত সাহায্য, সহযোগিতার পেছনে তাদের বিশেষ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল যা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ্য করছি। আর তাই বলা চলে, যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে তারা আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছিল, সে আশা পূরণ হয়নি বলেই ভারত আজ বাংলাদেশকে বৈরী প্রতিবেশী বলে ভাবতে শুরু করেছে। ভারত আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী। ভারতের সাথে আমাদের অবশ্যই সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তবে, পারস্পরিক সমঝোতা এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধই হবে সুসম্পর্কের মূল ভিত্তি।

প্রশ্নঃ আপনি কি মনে করেন, 'র' অনেক সময় ভারত সরকারের সমান্তরাল ভূমিকা পালন করে থাকে?

মে. জে. মতিন ঃ সারাবিশ্বেই গোয়েন্দা সংস্থাগুলো স্বীয় রাষ্ট্র বা জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখেই দায়িত্ব পালন করে থাকে। সে জন্য তাদের কর্মপরিধি সংক্রান্ত নীতিমালাসমূহও সেভাবেই প্রণীত হয়। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ভারত সরকারের সমান্তরাল ভূমিকা পালন করে না। বা করতে পারে না, বরং ভারত সরকারের নির্দেশক্রমে, ভারত সরকার প্রদত্ত পলিসি অনুসারে ভারতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখার প্রয়াসে চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য 'র' স্বীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে।

এছাড়া প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'র' এমনভাবে সংগঠিত যে, তাদের কাজে সরকারের অহেতুক Interference বা হস্তক্ষেপ যেমন প্রত্যাশিত নয়, তেমনি সরকার কর্তৃক দলীয় প্রয়োজনে কোন 'খালেক-মালেক'কে তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে দলে টেনে আনার মতো হীন ও গর্হিত কাজে এ সংস্থাকে ব্যবহারেরও কোন সুযোগ নেই। তাই 'র'-কে কখনও নিজ দেশের অভ্যন্তরে আমাদের প্রতিরক্ষা বা জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের মতো সরকারদলীয় কার্যক্রমের সাথে জড়িত হতে অথবা সরকার দলীয় অঙ্গসংগঠনে পরিণত হতে দেখা যায় না।

প্রশ্নঃ এ দেশের একজন জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট হত্যা, শান্তিবাহিনী, বঙ্গভূমি ইত্যাদি ইস্যু সৃষ্টির পেছনে 'র'-এর ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

মে. জে. মতিন ঃ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে 'র'-এর প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার কোন প্রমাণ আমাদের হাতে না থাকলেও ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে অনেক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে Sunday পত্রিকায় জনতা দলের সাবেক এমপি সুব্রামনিয়াম স্বামীর লেখা থেকে দেখা যায় যে, জিয়া হত্যায় 'র' জড়িত ছিল। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা ও অখণ্ডতাকে বিনষ্ট করার প্রয়াসে এ দেশের বুকে

তথাকথিত শান্তিবাহিনী, বঙ্গভূমি ইত্যাদি ইস্যু সৃষ্টির পিছনেও 'র' বরাবরই active role তথা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে।

এ কথা আমাদের কারোই অজানা নয়, 'র'-এর সক্রিয় সাহায্য ও মদদপুষ্ট হয়েই তথাকথিত শান্তিবাহিনী নামধারী পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী চাকমারা ভারতের অভ্যন্তরে ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত তেত্রিশটিরও অধিক ক্যাম্পে অবস্থান করেছে দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে। সেখানে ভারতীয় বিএসএফ-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কার্য পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। এসব ক্যাম্প ছিল তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এসব ক্যাম্প থেকেই বিদ্রোহী চাকমারা ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কার্য পরিচালনা করেছে, পাবত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙ্গালী উৎখাতের নামে শত শত বাঙ্গালীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মিজোরাম সীমান্তে তিন কিলোমিটার অভ্যন্তরে স্থাপিত (বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন) এমনি একটি ক্যাম্প থেকেই ১৯৯৬ সালের ১৫/১৬ ডিসেম্বর রাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি ছোট্ট দল ক্ষিপ্রগতিতে এক দুর্ধর্ষ ঝটিকা অভিযান চালিয়ে দুই সপ্তাহ আগে ২ কোটি টাকা মুক্তিপণ (ransom) আদায়ের লক্ষ্যে তথাকথিত শান্তিবাহিনী কর্তৃক অপহৃত বান্দরবান জেলার নড়াইছড়ি উপজেলার 'টিএনও' (উপজেলা নির্বাহী অফিসার) আজিম উদ্দিন আহমেদসহ অপর সাতজনকে ক্যাম্পে রক্ষিত বন্দীদশা থেকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে।

অনুরূপভাবে এ দেশের স্বতন্ত্র সত্তাকে মুছে ফেলার অভিপ্রায়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে এ দেশের বুকে গড়ে উঠেছে 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ' নামে একটি অতি উগ্র সাম্প্রদায়িক ভারতকেন্দ্রিক মৌলবাদী সংগঠন। এ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার নামে এ সংগঠনটি ১৯৮৮ সালে জন্মের পর থেকে কারণে-অকারণে বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি করে এ দেশের স্বাধীন সত্তাকে নস্যাত করার ষড়যন্ত্রে রয়েছে সদা তৎপর। এতদিন 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ'-এর দত্ত বাবুরা কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের নামে বিবিধ দাবী-দাওয়া উত্থাপন করে আসছিলেন, অথচ এবার তারা এ দেশের মুসলমানদের মৌলিক পরিচিতি ও অস্তিত্বকে মুছে ফেলার ব্রতকে সামনে রেখে মাঠে নেমেছেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, পরিস্থিতির সুযোগে কথিত পরিষদের কতিপয় উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী নেতা ঔদ্ধত্যের সব সীমা ছাড়িয়ে গত ১৪ জুলাই ২০০০ তারিখে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে এ দেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে সংবিধান থেকে 'রাষ্ট্র-ধর্ম ইসলাম' এবং 'বিসমিল্লাহ'-কে পরিহার করার মতো দাবী উত্থাপনের দুঃসাহস দেখিয়েছেন। তারা আরও দাবী তুলেছেন, বাংলাদেশের মুসলমানদের নামের আগে 'আলহাজ্ব', 'মুহাম্মদ' ইত্যাদি 'সাম্প্রদায়িক' শব্দের ব্যবহার করা চলবে না। নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে সংবিধানের ৫ম সংশোধনী 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম' ও ৮ম সংশোধনী 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'-কে অবৈধ আখ্যায়িত করে ১৯৭২ সালের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান পুনর্বহালের দাবী

জানিয়েছেন। তাদের এ দাবী অনতিবিলম্বে বাস্তবায়িত না হলে তারা বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে ৬টি জেলা নিয়ে পৃথক হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের হুমকিও দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এর আগেও গত ৬ জুন ২০০০ তারিখে শহীদ মিনার চত্বরে 'শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন বাতিল' বিলটি জাতীয় সংসদে উত্থাপন ও পাসের দাবীতে আয়োজিত সমাবেশেও 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ'-এর এসব উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী ব্যক্তি অনুরূপ উস্কানিমূলক সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রেখেছিলেন। এসব উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী হিন্দু নেতা কর্তৃক এ দেশকে খণ্ডিত করে এ দেশের বুকে স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এহেন হুমকি-ধমকি প্রকারান্তরে আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি জেলা নিয়ে তথাকথিত 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের কথারই প্রতিধ্বনি মাত্র। দত্ত বাবুদের এ আস্ফালনকে তাই হালকা করে দেখার কোন অবকাশ নেই। তাদের সব কর্মকাণ্ড অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর আধিপত্যবাদী ভারতের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিবেদিত। এসব ভারতীয় এজেন্ট এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের সরলতার সুযোগ গ্রহণপূর্বক সাম্প্রদায়িক ও উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে এ দেশে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে এ দেশের বিপন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন রক্ষার ছদ্মাবরণে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পথকে সুগম করার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশ্নঃ আমরা জানি, বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই 'র'-এর এজেন্ট রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন্ বিশেষ দলে এদের অনুপ্রবেশ বেশী বলে আপনার ধারণা?

মে. জে. মতিনঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত বিবেচনায় বাংলাদেশ বিষয়ে আমাদের প্রতিবেশী ভারতের স্বার্থ সর্বব্যাপী। কাজেই সঙ্গত কারণেই আমাদের ভূখণ্ডে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বেশ কর্মতৎপর হবে এবং শক্তিশালী নেটওয়ার্ক বিস্তার করে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে–এটাই স্বাভাবিক। ধানমণ্ডিস্থ ভারতীয় দূতাবাসের অভ্যন্তরে কূটনীতিক হিসেবে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকেই 'র'-এর সক্রিয় সদস্য। 'র' এ দেশে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া এবং একই মতাদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মিডিয়া জগতে সৃষ্ট বুদ্ধিজীবী নামধারী একটি চিহ্নিত মহল বিশেষের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে নির্বিঘ্নে এবং বেশ খোলামেলাভাবেই তাদের সকল অবৈধ কর্মতৎপরতা চালিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যেই 'র'-এর এজেন্ট রয়েছে– এ কথা নির্মম সত্য। তবে এ কথাও আমাদের কারোই অজানা থাকার কথা নয় যে, আমাদের দেশে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলে 'র'-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব (অনুপ্রবেশ না বলে আমি বরং তাকে বলব 'প্রভাব' কেননা, অনুপ্রবেশ সাধারণত অজ্ঞাতে ঘটে) সীমাহীন এবং সে দলটি হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে দাবীদার বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। এদের দেশ পরিচালনা থেকে দলীয় কর্মকাণ্ড সব কিছুতেই রয়েছে 'র'-এর খবরদারী। এ প্রসঙ্গে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এখানে একটি ছোট্ট ঘটনার অবতারণা করতে চাই। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। আওয়ামী লীগ তার কাউন্সিল অধিবেশন সম্পন্ন করেছে মাত্র। উক্ত অধিবেশন সম্পন্ন হওয়ার পরদিন আওয়ামী লীগের একজন অতি

বয়োজ্যেষ্ঠ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ভারতীয় দূতাবাসে ফার্স্ট সেক্রেটারী হিসেবে কর্মরত মিঃ জে সি পান্থ (প্রকৃতপক্ষে তিনি 'র'-এর কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন)-কে টেলিফোন করে তার কাছ থেকে পরদিন তার অফিসে সাক্ষাৎ করার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। সাক্ষাৎ প্রদানে রাজি হয়ে মিঃ জে সি পান্থ সাক্ষাৎকালীন আলোচ্যসূচী সম্পর্কে জানতে চাইলে উক্ত নেতা তাকে জানান যে, You know, Mr. Panth we have just concluded our annual Council meeting. I just want to appraise you about the important decision we have taken in the meeting, this is just for my satisfaction or words to this effect. সেমতে তিনি পরদিন ভারতীয় দূতাবাসে গমন করেন এবং মিঃ জে সি পান্থকে তাদের কাউন্সিল মিটিং-এর কার্যাবলী এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যথারীতি অবহিত করেন। শুধু তাই নয়, ১৯৯৬-এর নির্বাচনের মাসাধিককাল পূর্ব থেকেই ভারতীয় দূতাবাসের প্রায় সকল কর্মকর্তা দেশের ৪টি বিভাগীয় সদর ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জেলা সদরে পরিকল্পিত সফর করেছেন ব্যাপকভাবে। আমাদের পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমেই সেসব সফর সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষে সহায়ক শক্তি হিসেবে নির্বাচনে Positive role play (নিশ্চিত ভূমিকা পালন) করার লক্ষ্যেই নিবেদিত ছিল ভারতীয় দূতাবাস নামের এই বিদেশী দূতাবাসের কর্মকর্তাদের এতসব অবৈধ কর্মতৎপরতা। সে জন্যই আমি বলছি যে, আওয়ামী লীগের ওপর 'র'-এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব ব্যাপক এবং সীমাহীন। তারা একে অপরের সম্পূরক।

প্রশ্নঃ আমরা জানি 'ডিজিএফআই' ও 'এনএসআই' মূলত কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা চালিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বৈদেশিক বা স্ট্র্যাটেজিক গুপ্তচরবৃত্তি চালানোয় বাধা কোথায়?

মে. জে. মতিনঃ কোথাও কোন বাধা নেই, নেহায়েত সদিচ্ছার অভাব। ঐ যে আমি বলেছি 'খালেক-মালেক' দের মত লোকদের সরকারী দলে ভিড়ানোর মত অকাজেই কেটে যায় আমাদের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের অতি মূল্যবান সময়। আসল কাজ চালানোর মত সুযোগ ও সময় তাদের আসবে কোত্থেকে? প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকাণ্ডের পরিধি বেশ ব্যাপক। এ সংস্থার কর্মকাণ্ড রাষ্ট্র এবং জাতীয় স্বার্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে থাকে। কেননা, দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনীকে শত্রুর গোয়েন্দা কার্যক্রম মুক্ত রাখা (to counter enemy-intelligence) ছাড়াও সীমিত উপায়ে বৈদেশিক গোয়েন্দাবৃত্তি যেমন, সীমান্তের অপর পারে অবস্থিত প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরে তাদের সশস্ত্র বাহিনীসমূহ সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা কার্যক্রম (transfrontier intelligence) পরিচালনা উক্ত সংস্থার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহ কর্তৃক ব্যবহৃত সমর সম্ভার, প্রশিক্ষণের মান, যুদ্ধ তথা অপারেশন কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতিসহ তাদের উদ্দেশ্য (Intention) সম্পর্কে উক্ত সংস্থাকে অবশ্যই ওয়াকেবহাল থাকতে হবে এবং সংগৃহীত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের অবগতি ও যথাযথ কার্যক্রমের জন্য যথাসময়ে অবহিত রাখতে হবে। তাই এ সংস্থার কর্মকাণ্ডের সাথে প্রতিরক্ষা ছাড়াও পররাষ্ট্র এবং অর্থনীতিসহ কতিপয় অতিগুরুত্বপূর্ণ

জাতীয় পর্যায়ের বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট। সরকার পরিবর্তনের সাথে তাদের কর্মকাণ্ড তথা কর্মকৌশলে কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হওয়া স্বাভাবিক হলেও অত্র সংস্থা কখনও নিজেকে সরকারদলীয় কার্যক্রমের সাথে জড়িত করতে অথবা দলীয় অঙ্গসংগঠনে পরিণত করতে পারে না। কেননা এতে করে সংস্থার কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।

অবশ্য এ কথা দিবালোকের মতই সত্য যে, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাদের দেশের জনগণের তেমন কোন ধারণা নেই বললেই চলে। তবে তাদের অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য এ দেশের খুব কম লোকই এর সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এ সবই হচ্ছে বাস্তব সমস্যা। যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তারাই রাষ্ট্রীয় স্বার্থে নয় বরং দলীয় স্বার্থে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছে এ সংস্থাকে। অথচ তেমনটি হওয়ার কথা নয়। কেননা সারা বিশ্বেই গোয়েন্দা সংস্থাগুলো স্বীয় রাষ্ট্র বা জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখেই দায়িত্ব পালন করে থাকে। সে জন্য তাদের কর্মপরিধি সংক্রান্ত নীতিমালাসমূহও সেভাবেই প্রণীত। সরকার পরিবর্তনের সাথে মূলনীতিসমূহের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতার পর গত আড়াই দশকেও আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কোন নীতিমালা বা দিকনির্দেশনা প্রণীত হয়নি। আর তাই গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের ওপর চলে সরকার প্রধানের সার্বক্ষণিক খবরদারী। বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে ঢেলে সাজানো, শুধুমাত্র জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে যুগোপযোগী ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি সরকারদলীয় প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবী।

জাতীয় ঐক্যের সাথে দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর সচেতন সমর্থনকে দুর্বল করাই হচ্ছে 'র'-এর লক্ষ্য

মেজর জেনারেল (অব.) মহব্বত জান চৌধুরী, সাবেক মহাপরিচালক-ডিজিএফআই


মেজর জেনারেল (অব.) মহব্বতজান চৌধুরী

১৯৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর যখন সীমান্তে কাদেরিয়া বাহিনীর হামলাসহ সশস্ত্র বাহিনীতে একটির পর একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হচ্ছিল সে সময় ১৯৭৭ সালের ৮ অক্টোবর ডিজিএফআই-এ মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেজর জেনারেল মহব্বত জান চৌধুরী। দেশের সকল পর্যায়ে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ভারতীয় হুমকি মোকাবিলায় তখন 'র'-এর মতো একটি বিশাল সংস্থার বিরুদ্ধে অমিত দেশপ্রেম নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হয়েছিল প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরকে। তাই এই সংস্থার মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের এই সময়কে মে. জে. মহব্বতজান চৌধুরী চিহ্নিত করেছেন 'র'-এর সাথে বুদ্ধির যুদ্ধকালীন (Battle of wits) সময় বলে। ১৯৫৫ সালে কাকুলস্থ পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমী থেকে সিগন্যাল কোরে কমিশনপ্রাপ্ত এই

সেনা কর্মকর্তা গুপ্তচরবৃত্তির জগতে দীর্ঘদিন বিচরণ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ডিজি-ডিজিএফআই হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির পর থেকে ১৮ আগস্ট '৮২ তারিখে অবসর নেয়ার দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের পরিচালিত বৈদেশিক গুপ্তচর সংস্থার কার্যক্রম খুব কাছ থেকে অনুধাবন করার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। তবে তাঁকে সবদিক থেকে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থাকেই মোকাবিলা করতে হয়েছে সবচেয়ে বেশী এবং সে সময় তার দাবী মতে, বাংলাদেশে মর্যাদা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, জাতীয় ঐক্য এবং জিয়াউর রহমানের বিপুল জনপ্রিয়তা এদেশে 'র'-এর কার্যক্রমের জন্য দুরূহ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করলেও মে.জে. মহব্বত জান চৌধুরী দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বরাবরই অত্যন্ত সচেতন। তাই বাংলাদেশে পরিচালিত 'র' তৎপরতা সম্পর্কে তার মতামত জানতে চাইলে বিদেশ গমনের পূর্ব মুহূর্তে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও তিনি একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন দৈনিক ইনকিলাবকে।

প্রশ্নঃ আপনি এক সময় বাংলাদেশের অন্যতম গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই-এ মহাপরিচালক পদে নিয়োজিত ছিলেন। অভিজ্ঞতার আলোকে এদেশে 'র'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কি বলে আপনি মনে করেন?

মে. জে. মহব্বত জানঃ আমি ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পটভূমিতে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের প্রধান হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হই। সে সময়টা ছিল জাতির জন্য একটি ক্রান্তিকাল। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর শৃংখলা রক্ষা করা, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও দেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা তখন ছিল অত্যন্ত জরুরী। সে সময়ে সেনাবাহিনীতে বিশৃংখলা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশকে একটি ভয়াবহ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য বিশেষ গোষ্ঠী অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। একটি শক্তিশালী, সুশৃংখল, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলা ছিল তখন আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায় যে, আমাদের তখনকার প্রচেষ্টা বাংলাদেশকে যারা তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চায় তারা সুনজরে দেখেনি। ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' (Research and Analysis Wing) তখন তাদের দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ সত্ত্বেও প্রতিবেশী বাংলাদেশে একটি স্বাধীনচেতা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি। তবে ভারতে জরুরী অবস্থা জারি ও তারও আগে জয় প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গণআন্দোলন ও পরবর্তীতে দেশাই সরকারের বাংলাদেশের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণের কারণে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি ঘটে। তবে তাই বলে তারা নিশ্চুপ বসে থাকেনি বরং দেশাই সরকার পতন পরবর্তী ক'টি বছর মূলত 'র'-এর সাথে চলে বুদ্ধির যুদ্ধ (Battle of Wits)। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের যোগ্য নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশের মর্যাদা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সর্বপরি জাতীয় ঐক্য এবং জিয়াউর রহমানের বিপুল জনপ্রিয়তা তখন বাংলাদেশে 'র'-এর কার্যক্রমের জন্য দুরূহ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা কোন হঠকারী প্রচেষ্টার জন্য শক্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে ১৯৮১ সালে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার

ইস্যু তুলে ও শেখ হাসিনার দেশে ফেরার উপলক্ষ্য ধরে আমাদের দেশে আবারও অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে 'র'-এর ভূমিকা কতখানি ছিল ও কিভাবে সেটা প্রতিরোধ করা যায়, তা ভেবে ওঠার আগেই প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শহীদ হন।

এর পরে আমি একটি বছর গোয়েন্দা সংস্থায় থাকি নানা রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মাঝে। একটি বাক্যেই বলতে পারি, আমাদের জাতীয় ঐক্যের সাথে দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর সচেতন সমর্থনকে দুর্বল করাই হচ্ছে 'র'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এটি আগেও ছিল, এখনও আছে।

প্রশ্নঃ 'র' বাংলাদেশে কিভাবে, কোন্ সেক্টরে কাজ করে থাকে?

মে. জে. মহব্বত জানঃ 'র' কোন সেক্টরে কিভাবে কাজ করে এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হচ্ছে যেখানে তাদের প্রয়োজন ও যেভাবে তা হাসিল করা যায়, সেখানেই তারা সক্রিয়। এ ব্যাপারে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। সব দেশের গোয়েন্দা সংস্থাই, বিশেষ করে যারা অফেন্সিভ ইন্টেলিজেন্স পরিচালনা করে, তারা টার্গেট দেশের স্পর্শকাতর এলাকাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ অস্বীকার করার উপায় নেই 'র' ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। কিন্তু ১৯৭১-এর পর তারা এতটা বৈরিতা শুরু করল কেন?

মে. জে. মহব্বত জানঃ 'র' তাদের দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা বা প্রসারের জন্য কাজ করে। স্বাভাবিকভাবেই ১৯৭১ সালের পরে একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে চাওয়ায় দুটি দেশের স্বার্থের সংঘাত ঘটতেই পারে। আমাদের স্বার্থ আমরা বজায় রাখার চেষ্টা করব, তারা তাদেরটা। বাংলাদেশের জনগণ ও সরকার যতদিন নিজেদের সার্বভৌমত্ব সুমুন্নত রাখার চেষ্টা করবে ততদিনই 'র' বৈরী থাকবে। তবে একথা ভাবার কারণ নেই যে, 'বন্ধুভাবাপন্ন সরকার' প্রতিষ্ঠিত হলে তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে। বরং বশংবদ সরকার থাকলেও তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ এদেশের একজন জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট হত্যা, শান্তিবাহিনী, বঙ্গভূমি ইত্যাদি ইস্যু সৃষ্টির পিছনে 'র'-এর ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

মে. জে. মহব্বত জানঃ আমার মনে হয় না আমি এ ব্যাপারে নতুন কোন তথ্য দিতে পারব। তবে সবকিছুর পেছনে 'র'-এর হাত খোঁজার প্রচেষ্টায় অনেক সময় আমাদের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করাতে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। কিছু কিছু ইস্যু হয়তো সরাসরি 'র'-এর সৃষ্টি, কিছু আমাদের তৈরি করা জটিলতা-যা 'র'-কে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এগুলোর ক্ষেত্রেও তাই।

প্রশ্নঃ আমরা জানি বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই 'র'-এর এজেন্ট রয়েছে। এক্ষেত্রে কোন্ বিশেষ দলে এদের অনুপ্রবেশ বেশী বলে আপনার ধারণা?

মে. জে. মহব্বত জানঃ এ প্রশ্ন একটি সহজ সমীকরণ এর ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে। আমরা দল বিশেষকে সরাসরি কোন রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট হিসাবে চিহ্নিত করতে ভালোবাসি। কিন্তু সকল পক্ষেই আসলে এজেন্ট থাকে। তবে স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর সব গোয়েন্দা সংস্থাই চাইবে তার দেশের বিরোধী এমন দলের মাঝে এজেন্ট

তৈরী করতে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, সে দেশের প্রতি দুর্বল এমন দলের মাঝে তারা কাজ করবে না।

প্রশ্নঃ আমরা জানি ডিজিএফআই ও এনএসআই মূলত কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা চালিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বৈদেশিক বা স্ট্র্যাটেজিক গুপ্তচরবৃত্তি চালানোয় বাধা কোথায়?

মে. জে. মহব্বত জানঃ বাংলায় একটি কথা আছে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ডিজিএফআই বা এনএসআই মূলত কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা চালায়–এটি সাধারণভাবে স্বীকৃত। তবে মাঝে মাঝে এদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে। যারা রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকেন তারাই সিদ্ধান্ত নেন গোয়েন্দা সংস্থা কোন কাজটি করবে। বাংলাদেশের মত একটি দেশের বৈদেশিক নীতি, আর্থিক সংগতি ও সরকারের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তার ইন্টেলিজেন্স-এর কৌশল। তাত্ত্বিকভাবে এর সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। বরং দেশের সীমিত সম্পদ ও সবচেয়ে বেশী করণীয় দিকগুলোর মাঝে সমন্বয় করে নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

প্রশ্নঃ অন্যান্য বিসিএস ক্যাডারের মত পৃথক ইন্টেলিজেন্স ক্যাডার থাকার কি প্রয়োজন আছে?

মে. জে. মহব্বত জানঃ বিদেশে অনেক উন্নত দেশ ছাড়াও প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানে পৃথক ইন্টেলিজেন্স ক্যাডার রয়েছে। ভাল মেধা আকৃষ্ট করার জন্য যেমন সিভিল সার্ভিস-এর বিভিন্ন ক্যাডার রয়েছে, তেমনি দেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্বে নিয়োজিত পেশার জন্য একটি ইন্টেলিজেন্স ক্যাডার সার্ভিসের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিভিন্ন বাধার কারণে এ ব্যাপারে সফলকাম হইনি ও অনেক প্রতিভাবান অফিসারকে গোয়েন্দা সংস্থার চাকরি ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যেতে দেখেছি। আশা করি দেশ পরিচালনাকারী রাজনীতিবিদগণ এ দিকটায় নজর দিবেন।

আগামী নির্বাচনে বর্তমান সরকারের জয়লাভ অনিশ্চিত হওয়ায় 'র' সকল দলেই প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে

মেজর জেনারেল (অব.) জেড এ খান, পিএসসি,
সাবেক পরিচালক-আইবি, ডিজিএফআই



মেজর জেনারেল (অব.) জেড.এ. খান, পিএসসি

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ডিজিএফআই-এর পরিচালক আইবি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মেজর জেনারেল (অব.) জেড এ খান পিএসসি বলেছেন, বাংলাদেশের প্রায় সকল সেক্টরে থাবা বিস্তার করলেও বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের মাঝে 'র' সবচেয়ে বেশী মাত্রায় অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়েছে। তাই ভারত যা বলতে চায়

বাংলাদেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবী জনমত গঠনে ঠিক তাই বলেন অকপটে। অবশ্য মে. জে. জেড এ খানের মতে, 'র' সম্প্রতি সশস্ত্র বাহিনীতেও অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে। এক্ষেত্রে যদিও প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা, সৈনিকগণ তার দৃষ্টিতে দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী তবুও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, 'র' ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে যে কোনভাবে অন্তত একটা Dent গড়ে তুলতে পারে।

তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বালুচ রেজিমেন্টে কমিশনপ্রাপ্ত মে. জে. জেড এ খান তার চাকরি জীবনে বরাবরই একজন মেধাবী অফিসার হিসেবে বিভিন্ন সেনা প্রশিক্ষণ স্থাপনায় ইন্সট্রাক্টরের দায়িত্ব পালন করেছেন এক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন হিসেবে যেমন কোয়েটাস্থ পাকিস্তান স্কুল অফ ইনফ্যান্ট্রিতে ট্যাকটিকসের প্রশিক্ষক ছিলেন তেমনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইনফ্যান্ট্রি স্কুলেও নিয়োজিত ছিলেন ইন্সট্রাকটর হিসেবে। এছাড়া সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের ডিএস (ডিরেক্টিং স্টাফ) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন উচ্চ পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ। এসবের পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমীর চীফ ইন্সট্রাক্টর, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ড্যান্ট ও একটি পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার-এর পদেও নিযুক্তি লাভ করেন। বর্তমান সরকারের শাসনামলে অকালে অবসর গ্রহণ করলেও আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে মে. জে. জেড. এ. খান ডিজিএফআই-এ পরিচালক-আইবি'র দায়িত্ব পালনকালে এদেশে পরিচালিত 'র' তৎপরতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হন। বিশেষ করে বঙ্গভূমি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে তার রয়েছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এসবরের আলোকেই তিনি বাংলাদেশ বিরোধী 'র' তৎপরতা সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাবকে একটি বিস্তৃত সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন।

প্রশ্নঃ ডিজিএফআই-তে পরিচালক-আইবি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে 'র'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কি বলে আপনি মনে করেন?

মে. জে. জেড এ খান ঃ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পর মুহূর্ত থেকেই বাংলাদেশের জনগণ একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বিদেশী প্রভাব বলয়ের বাইরে স্বকীয় নীতি অনুসরণে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এদিকে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তখন 'র' এর পিছনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল–তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে সেক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মূলত যে কোনভাবে তদানীন্তন পাকিস্তানকে ভেঙে দু'টি দেশ করা-যাতে পাকিস্তানের যে শক্তি তা খর্ব করা যায়। 'র' ধারণা করেছিল যদি পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশে পরিণত করায় তারা সফল হয় তাহলে এর উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে এক সময় অঙ্গরাজ্যে পরিণত করতে পারবে। আর অঙ্গরাজ্যে পরিণত করতে না পারলেও অন্তত ভারতনির্ভর করতে সক্ষম হবে। কিন্তু যখন দেখল স্বাধীনচেতা বাংলাদেশীরা 'র'-এর আশা কিছুতেই পূরণ হতে দেবে না বলে পণ করেছে, তখন 'র' তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে নতুনভাবে সাজাল। এক্ষেত্রে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে 'র'-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে- কি করে বাংলাদেশকে ভারতের প্রভাব বলয়ে রাখা যায় এবং কিভাবে বাংলাদেশকে চাপ দিয়ে

ভারতের অর্থনীতিকে সাপোর্ট দেয়া যায়। এই লক্ষ্যে তারা বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে প্রভাব ফেলার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে যদি শিক্ষিত সমাজে পেনিট্রেট করতে হয় তাহলে সবচেয়ে সহজ রাস্তা হচ্ছে আমাদের সংবাদ মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করা এবং এ লক্ষ্যে 'র' এর সাফল্য উল্লেখ করার মত। আরেকটা ব্যাপার আমি উল্লেখ করতে চাই–কৌশলগতভাবে ভারত চাইবে আমাদের দেশকে তাদের পণ্যের বাজারে পরিণত করতে। আমাদের দেশের মাধ্যমে এক প্রান্ত অর্থাৎ মূল ভারত থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে মালামাল, সামরিক সরঞ্জাম এবং প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীকে NEFA-তে নিয়ে যেতে। এতে ওখানে যে Insurgency চলছে তা দমন সহজ হবে বলে তারা মনে করে। এছাড়া ভারতের আরেকটা স্ট্রাটেজিক লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরগুলো ব্যবহার করা এবং যেহেতু এ অঞ্চলে ভারতের কলিকাতা বন্দর আগের মত কার্যকরভাবে কাজ করতে বা Load নিতে পারছে না; তাই তারা ভাবছে চট্টগ্রাম ও চালনা নৌ বন্দরের ব্যবহার যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে তাদের কাজ যেমন সহজ হবে তেমনি স্থলবেষ্টিত উত্তর-পূর্ব ভারতেও তারা সহজে পণ্য বা সমরোপকরণ পাঠাতে পারবে।

প্রশ্নঃ তাহলে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন ভারতীয় নীতিনির্ধারকগণ ধীরে ধীরে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাচ্ছে?

মে. জে. জেড এ খানঃ অনেকটা তাই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেও ৪৭ সালে যখন ভারত ভাগ হয়ে গেল, তখন ভারতীয় নীতিনির্ধারকগণ তা মেনে নিতে পারেনি। বরাবরই তাদের লক্ষ্য হলো অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করা। এ মর্মে প্রথম থেকেই তারা অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। যখন দেখল স্বাভাবিক পথে পারছে না তখন তারা ঠিক করল যদি পাকিস্তানকে দুটো ছোট ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে পাকিস্তান দুর্বল হয়ে যাবে, যাদের প্রয়োজনে যে কোন খাতে পরাভূত করা সহজ হবে। এছাড়া ছোট রাষ্ট্র হলে প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসা যাবে যে কোন মুহূর্তে। এতে ভারতের বহু কাংক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন বা অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়নের পথও হবে সুগম। 'র'-এর মাধ্যমে সে পথেই এগিয়ে যাচ্ছে ভারত।

প্রশ্নঃ 'র' এদেশে কোন্ কোন্ সেক্টরে কাজ করে থাকে বলে আপনি মনে করেন?

মে. জে. জেড এ খানঃ 'র' বর্তমানে বাংলাদেশে মোটামুটি সব সেক্টরেই কাজ করছে। কেননা, যদি কোন একটা সেক্টরকে বাদ দেয় তাহলে ওখানে গ্যাপ থেকে যাবে বলে তারা মনে করে। তবে আমার মনে হয় 'র' বিশেষভাবে উদ্যোগ নিচ্ছে আমাদের সংবাদ মাধ্যম, শিক্ষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সেক্টরে যাতে তারা ধীরে হলেও জনমত সৃষ্টি করে প্রভাব বলয় বিস্তারে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ তারা সম্প্রতি সেনাবাহিনীতেও অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে। যদিও আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রে 'র'-এর কাজটি খুবই কঠিন হবে। কারণ, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার ও সদস্যদের বেশীরভাগই ন্যাশনালিস্ট এবং কোন বিদেশী চক্র যাতে এদেশে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সে ব্যাপারে তারা সজাগ। তবুও তারা ('র') চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে যে কোনভাবে যে কোন পর্যায়ে অন্তত একটা 'Dent' গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। অন্য একটি উল্লেখযোগ্য সেক্টর হচ্ছে আমাদের বুদ্ধিজীবী সেক্টর। এক্ষেত্রে তারা এতটাই সফল

হয়েছে যে, এখন ভারত তার স্বার্থে যা বলতে চায় আমাদের কতিপয় বুদ্ধিজীবী জনমত গঠনে ঠিক তাই বলেন। যেমন-ট্রানজিটের স্বপক্ষে এরা এমনভাবে কথা বলেছেন যা ভারতীয় Purpose-কেই সার্ভ করেছে। আর্মি থাকার প্রয়োজন নেই– এ ধরনের বক্তব্য থেকেও এসব বুদ্ধিজীবীর প্রকৃত মুরুব্বী কারা তা বোঝা যায়।

আবার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সেক্টরেও 'র' বিশেষভাবে কাজ করছে বলে আমরা সবাই জানি এবং এতে আমার ধারণা–তারা কেবল একটি দলকে লক্ষ্য করে রাজনৈতিক অঙ্গনে Intervene করছে না বরং সকল দলেই তাদের লোক পুশ করার চেষ্টা করছে। এছাড়া ধর্মীয় সেক্টরেও 'র' ব্যাপকভাবে কাজ করছে। আমি এক সময় শুনেছি যে, ভারতে প্রতিবছর বিজেপি রোজার সময় ইফতার পার্টির আয়োজন করে, যেখানে বাংলাদেশের কোন এক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব হয়ে থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তি, পীর এদের মধ্যেও 'র' অনুপ্রবেশ করেছে। এসব ধর্মীয় ব্যক্তিদের কাছে সমাজের উঁচু স্তরের অনেকেই আসেন যাদের ঐ ধর্মীয় ব্যক্তির মাধ্যমে মটিভেট করা সহজ হয়।

প্রশ্নঃ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ৭১-এ 'র' মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে তারা এতটা বৈরিতা শুরু করল কেন?

মে. জে. জেড এ খানঃ '৭১-এর 'র' আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে কথাটা সত্য। তবে ১৬ ডিসেম্বরের আগে ভারত যে পরিকল্পনা করেছিল, সেই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল যদি বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তাহলে এখানে 'র' একটা স্থান করে নিতে পারবে। কিন্তু এদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণ যেমন পূর্বেও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের প্রভাব বরদাশত করেনি, তেমনি বাংলাদেশ হওয়ার পরও চায়নি ভারত তাদের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করুক। 'র' এটা জানত। তবুও তারা মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল একটাই উদ্দেশে যে, একটা শক্তিশালী দেশকে ভেঙে দু'টি দুর্বল দেশ করতে পারলে তা ভারতের এ এলাকায় বিরাট প্রভাব বলয় সৃষ্টিকে নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশ হওয়ার পর ভারতের সেনাবাহিনী যেভাবে লুটপাট করেছে বা যেভাবে ভারত আমাদের প্রশাসনে তাদের নিজস্ব লোক বসিয়ে প্রশাসন চালাতে চেয়েছে তা দেখে বাংলাদেশীরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাদের আশঙ্কা জাগে যদি 'র'-কে বাধা দেয়া না হয়, তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের বাংলাদেশকে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে গ্রাস করতে তারা উদ্যোগ নেবে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধে পাকিস্তান যখন আত্মসমর্পণ করল তখন যেসব সমরাস্ত্র তাদের ছিল তার পুরোটাই নিয়ে গেল ভারত একচেটিয়াভাবে। এতে জনগণ ক্ষুব্ধ হয়। আর 'র'-এর এসব সিদ্ধান্তের পিছনে মুখ্য ভূমিকা রাখায় জনগণ এদের বৈরী হয়ে ওঠে। এছাড়া জনগণ যখন আন্দোলনের মাধ্যমে তদানীন্তন সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তখন মূলত 'র' পরামর্শকদের পরামর্শেই সরকার একটির পর একটি কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। জনগণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল। এসব শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার আগেকার কথা। এরপর শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে এসে যখন ভারতীয় বাহিনীকে চলে যেতে বললেন, তখন প্রথমে ভারত থমকে যায়। এখানে প্রশ্ন আসে, ভারত কেন শেখ মুজিবের ফিরে আসার আগে সৈন্য সরিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নেয়নি?

আসলে ভারত এদেশে কিছু একটা ভজঘট পাকানোর জন্যই সে সময় সৈন্য সরিয়ে নেয়নি। আমার ধারণা 'র' একটা ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে ভারত সরকারকে প্ররোচিত করেছে উল্লেখিত ভূমিকা পালনের জন্য। এরপর ১৯৭১-এর পর ভারত সরকার যেসব মেজর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে 'র'। কারণ '৭১-এ 'র' অপারেট করেছে গ্রামগঞ্জে, অলিতে-গলিতে। এছাড়া যুদ্ধের সময় অনেক যুবক মুক্তিবাহিনী সদস্য হিসেবে ভারতে গিয়েছিল, এদের আরও বিশেষ করে বললে বলতে হয়, মুজিবাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে 'র' নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে এসে তাদের মাধ্যমে কাজ করেছে। এরপর যখন দেখা গেল সমাজে অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছে অপশাসনের কারণে, যখন শেখ মুজিব একটির পর একটি গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন দেশ শাসনের ক্ষেত্রে তখন কিছু পত্রিকা ও ভারত তাকে বাহবা দিতে শুরু করল। এতে বোঝা গেল যে, বিশেষ করে যেসব পত্রিকা তাকে বাহবা দিচ্ছিল সেগুলো 'র' প্রভাবিত। এখনও এ ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চাটুকারিতা, বাহবা দেয়া লক্ষ্য করা যায় সংবাদ মাধ্যমে। এখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলা যায়। আমি যখন '৭৩ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসি তখন দেখলাম বাস্তবে যা ঘটছে অনেক পত্রিকাতেই লেখা হচ্ছে তার উল্টোটা, গুণকীর্তন ছাড়া ভিন্ন কিছু নেই। তখন প্রথমে ভাবলাম সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পায় বলেই হয়ত কিছু পত্রিকা এ ধরনের ভূমিকা রাখছে। কিন্তু সবগুলোই তো সরকারী আনুকূল্য বা টাকা পেত না। তাহলে তারা এ কাজটি করছে কেন? কারণ, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এগুলো 'র' Financed প্রভাবিত। সে সময় আমি মাঝে মধ্যে পরিচিত অফিসারদের কাছে একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে হয়ত দু'একটি মন্তব্য করতে চাইতাম। তখন অনেকেই বলতেন, কোনরূপ ভারতবিরোধী কথা না বলতে। কারণ, আশপাশেই 'র'-এর লোক আছে, একথা বলতেন সবাই।

অর্থাৎ 'র' আমাদের সমাজে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুপ্রবেশ করেছিল। ফলে সকল ডিসিশনের ক্ষেত্রে 'র'-এর প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছিল। সবচে' বড় প্রমাণ হল–জাতীয় রক্ষিবাহিনী (জেআরবি) গঠন যা ছিল 'র'-এর Brain child এই জেআরবি ভারতবিরোধী দেশপ্রেমিকদের ওপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়েছিল। এর কর্মকর্তারাও ছিলেন সব ভারতমুখী। কারণ তাদের নির্বাচন, প্রশিক্ষণ দিয়েছিল ভারতীয় অফিসাররা। এর সদস্যদেরও বেশীরভাগ ছিল মুজিববাহিনীর।

প্রশ্নঃ আমরা জানি প্রায় সব রাজনৈতিক দলেই 'র' অনুপ্রবেশ করেছে। এক্ষেত্রে কোন বিশেষ দলে এই অনুপ্রবেশ বেশী বলে আপনার ধারণা?

মে. জে. জেড এ খানঃ হ্যাঁ, একথা ঠিক যে 'র' বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড খুবই তৎপর। এখন যেহেতু নির্বাচন কাছে এসে গেছে, তাই তারা চাইবে এমন একটা দল ক্ষমতায় আসুক যাতে তারা ('র') তাদের চলমান প্রভাব বিস্তারকে অব্যাহত রাখতে পারে। তবে যেহেতু সবাই বুঝতে পারছে যে, বর্তমান সরকার গণবিরোধী সরকারে পরিণত হতে যাচ্ছে তাই শুধু একটি দলের সাথে সম্পর্ক রাখলে যদি সে দল নির্বাচনে জয়ী না হয় সেজন্য 'র' চেষ্টা করছে যাতে সব দলেই তাদের প্রভাব বজায় থাকে। আমার ধারণা 'র' বেশীরভাগ কাজ করছে একটি দলের সাথে যাদের

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বাংলাদেশের জন্য নিবেদিত, কিন্তু তাদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে-প্রতিবেশী দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। এক্ষেত্রে ঐ দলটি অর্থনৈতিকভাবে অথবা আঞ্চলিক প্রভাবলয় সৃষ্টিতে সেই প্রতিবেশীকে যেমন সাহায্য করছে, তেমনি সে (প্রতিবেশী) যাতে বিচ্ছিন্নতাবাদে আক্রান্ত না হয় সেদিকটিতেও লক্ষ্য রাখছে। কি কূটনীতি, কি সমরনীতি সবক্ষেত্রেই এই বিশেষ দলটি পালন করছে প্রতিবেশী অনুসৃত নীতির পরিপূরক ভূমিকা। তবে প্রায় সব দলেই 'র' কমবেশী অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে 'র' যেহেতু একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, তাই স্বভাবতই প্রথমে তারা চেষ্টা করবে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে প্রভাবিত করতে। এখানে একটা বিশেষ দলের কথা তো Open Secret. এর বাইরে অন্যান্য দলে এমনসব ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে 'র' কাজ করছে যাদের সম্পর্কে কেউ কখনও ধারণাই করতে পারবে না যে, তিনি বা তারা 'র'-এর এজেন্ট।

প্রশ্নঃ এক্ষেত্রে এজেন্ট নিয়োগে প্রভাবিত করায় 'র'-এর কৌশল কি?

মে. জে. জেড এ খানঃ কৌশল তিন-চার রকম হয়ে থাকে। একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা। তবে অর্থ দেয়া হয় কিন্তু ব্ল্যাকমেইল করার জন্য, সহযোগিতার লক্ষ্যে নয়। এখানে ছোট হলেও একটা না একটা প্রমাণ তারা রাখবে, প্রয়োজনবোধে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোড়ানোর জন্য। তখন ব্ল্যাকমেইলিং-এর ভয়ে বাধ্য হয়েই অর্থ গ্রহণকারী 'র'-এর পক্ষে কাজ করে। এ পর্যায়ে হয়ত অর্থগ্রহণকারী 'সম্মানিত ব্যক্তি' সম্মান রক্ষার জন্য বাধ্য হয়েই তথ্য পাচার থেকে শুরু করে গুপ্তচরবৃত্তির বেড়াজালে জড়িয়ে যায়।

অর্থের বাইরে নারী, সুরা এ দুটোর লোভে পড়েও অনেকে ফেঁসে যায়। আবার বিভিন্ন সম্মান লাভ, ভ্রমণের ব্যবস্থা করা, হয়ত পিএইচডি করার ইচ্ছে আছে পয়সা নেই এ অবস্থায় অর্থের জোগান দেয়া, সপরিবারে বিশ্বের লোভনীয় স্থানগুলো দেখার ব্যবস্থা করে দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে টোপ ফেলে 'র'। মোটকথা, চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে সেদিকেই বড়শি ফেলা হয়। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এটি হল অর্থ। এছাড়া আরেকটি দিকে 'র' বিশেষ নজর দিয়ে থাকে। এটি হল সংবাদ মাধ্যম ও পত্রিকার কলামিস্ট। কারণ, জনমত গঠন বা প্রভাবিত করায় কলামিস্টদের ও সাংবাদিকদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। তাই এই সেক্টরে 'র' বিশেষভাবে তৎপর। একথা সবাই জানে যে, একজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব বা কলামিস্টের কথা সহজ-সরল জনগণ অকপটে বিশ্বাস করে। তাই এদেরই একটি অংশের মাধ্যমে 'র' তাদের ('র') কথাটাই প্রচার করে প্রয়োজনমত।

প্রশ্নঃ প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যা, শান্তিবাহিনী ও স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের পিছনে 'র'-এর হাত রয়েছে-এটি কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?

মে. জে. জেড এ খানঃ এখানে প্রথমে আমি বঙ্গভূমির কথায় আসি। আমি যখন ডিজিএফআইতে ছিলাম তখন এই ইস্যু নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। সে সময় আমি নিজে বাগেরহাট, সাতক্ষীরা গিয়েছিলাম পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করতে। যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত চালানোর সময় বিভিন্ন ঘরে গিয়েছি, বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলেছি, তাতে আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, বঙ্গভূমি সম্পূর্ণরূপে 'র'-এর একটি

প্রকল্প এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ওসব এলাকায় 'র'-এর এজেন্ট বা অপারেটিভ রয়েছে। একদিন তো আমরা এক অপারেটিভকে ধরেই ফেলতে পারতাম, কিন্তু কোন এক কারণে অল্পের জন্য তাকে ধরা যায়নি। এখানে স্পষ্টতই বলা যায় যে, বঙ্গভূমি তৎপরতার সাথে স্থানীয় প্রশাসনেরও অনেকে জড়িত ছিলেন, এখনও থাকতে পারেন। বঙ্গভূমি সম্পর্কে আমার কোনরকম সন্দেহ নেই যে, 'র'-এর সাথে জড়িত।

এরপর আসা যাক শান্তিবাহিনী প্রসঙ্গে। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন কাজ করেছি। আমার ও আমার অন্যান্য সহকর্মীর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, শান্তিবাহিনী-সমস্যা তৈরীর পিছনে 'র'-এর হাত রয়েছে। দেখা যেত নিউইয়র্কে জাতিসংঘ দপ্তরে যখন সভা হত বা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যখন মানবাধিকার সংক্রান্ত সেমিনার বা আলোচনা সভা হত, সেখানে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা প্রচার পুস্তিকা, লিফলেট নিয়ে হাজির হত যার প্রায় সবগুলোই ছাপা হত ভারতে। প্রশ্ন হচ্ছে–ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া ও প্রচারণা চালানোর অর্থ তারা কোত্থেকে পেত? এছাড়া তারা বাংলাদেশী পরিচয়ে যেত না, যেত অন্য পরিচয়ে। এই পরিচিতি কারা দিত? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই পাওয়া যাবে 'র'-এর নাম। একইভাবে একসময় ময়মনসিংহ অঞ্চলে গারোল্যান্ড প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু ডিজিএফআই ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার ত্বরিত ভূমিকার জন্য সেটি বিস্তৃত হতে পারেনি। তারপর কাদেরিয়া বাহিনীর প্রসঙ্গও তোলা যায়। '৭৬-৭৭ সালে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন এই বাহিনী যখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, ঘটনাচক্রে তখন আমার পোস্টিং ছিল টাঙ্গাইলে। আমি অনেক অপারেশন করেছি কাদেরিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে। তখন ওদের কারা সহযোগিতা করেছে, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র দিয়েছে তা তো সবারই জানা। এদিকে জিয়া হত্যায় তো অনেকেই বলেন যে, 'র' এতে জড়িত ছিল। ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা যদি চিন্তা করি যে, জিয়া হত্যার বেনিফিশিয়ারি কারা হয়েছে, তাহলেই বুঝতে পারব এর পিছনে কারা আছে। এটা আমার ধারণা, জেনারেল জিয়া যদি Continue করতে পারতেন তাহলে আজ বাংলাদেশের চেহারা অন্যরকম হতে পারত। ভারতের পাশে একটা শক্তিশালী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান হতে পারত। কিন্তু ভারতের লক্ষ্য ছিল, তারা কিছুতেই বাংলাদেশকে শক্তিশালী হতে দেবে না। ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, এর পিছনে 'র'-এর হাত থাকার সম্ভাবনা আছে।

এ প্রশ্নের উত্তরে শেষে একটা কথা বলব যে, একসময় জে. জিয়া, এরশাদ ও বেগম জিয়ার শাসনামলে বঙ্গভূমি, শান্তিবাহিনী তৎপরতা জোরদার হয়ে উঠেছিল। তারপর আ'লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিন্তু সব চুপচাপ। কেন এমন হল? আসলে ভারত বর্তমান সরকারকে হয়ত ডিসটার্ব করতে চায় না। কারণ তাদের (ভারত) স্বার্থে এ সরকার বহু কিছুই করছে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সরকার যদি ক্ষমতাহারা হয় তাহলে ঐসব ইস্যু আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য। বিশেষ করে শান্তিবাহিনী সমস্যার পুনর্জাগরণের সমূহ সম্ভাবনা আছে। কেননা, শোনা যায়, পিসিজিএস-এর প্রীতি গ্রুপকে ভারত এখনও আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। থাকতে দিচ্ছে ভারত ভূমিতে।

প্রশ্নঃ ডিজিএফআই ও এনএসআই মূলত কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা চালিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কৌশলগত বা বৈদেশিক গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনায় বাধা কোথায়?

মে. জে. জেড এ খানঃ আসলে বাধা নেই। এর বেশী কিছু বলা ঠিক হবে না। তবে আমাদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতাও ভেবে দেখতে হবে। অবশ্য এই দক্ষিণ এশিয়ায় তথ্য পাওয়া খুব একটা কঠিন নয়। বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে তথ্য পাওয়া যায়।

প্রশ্নঃ না সেটা বলছি না। বলতে চাচ্ছি আমাদের ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলো বিরোধী দলের খোঁজ-খবর রাখতেই বেশী ব্যস্ত থাকে। অথচ সংস্কৃতি, শিল্প, প্রচারণা ইত্যাদি খাতে যে অনেক কিছু করা যায় বা করছে ভারত সেদিকে কোন লক্ষ্যই নেই। এ সম্পর্কে আপনি কি মনে করছেন...?

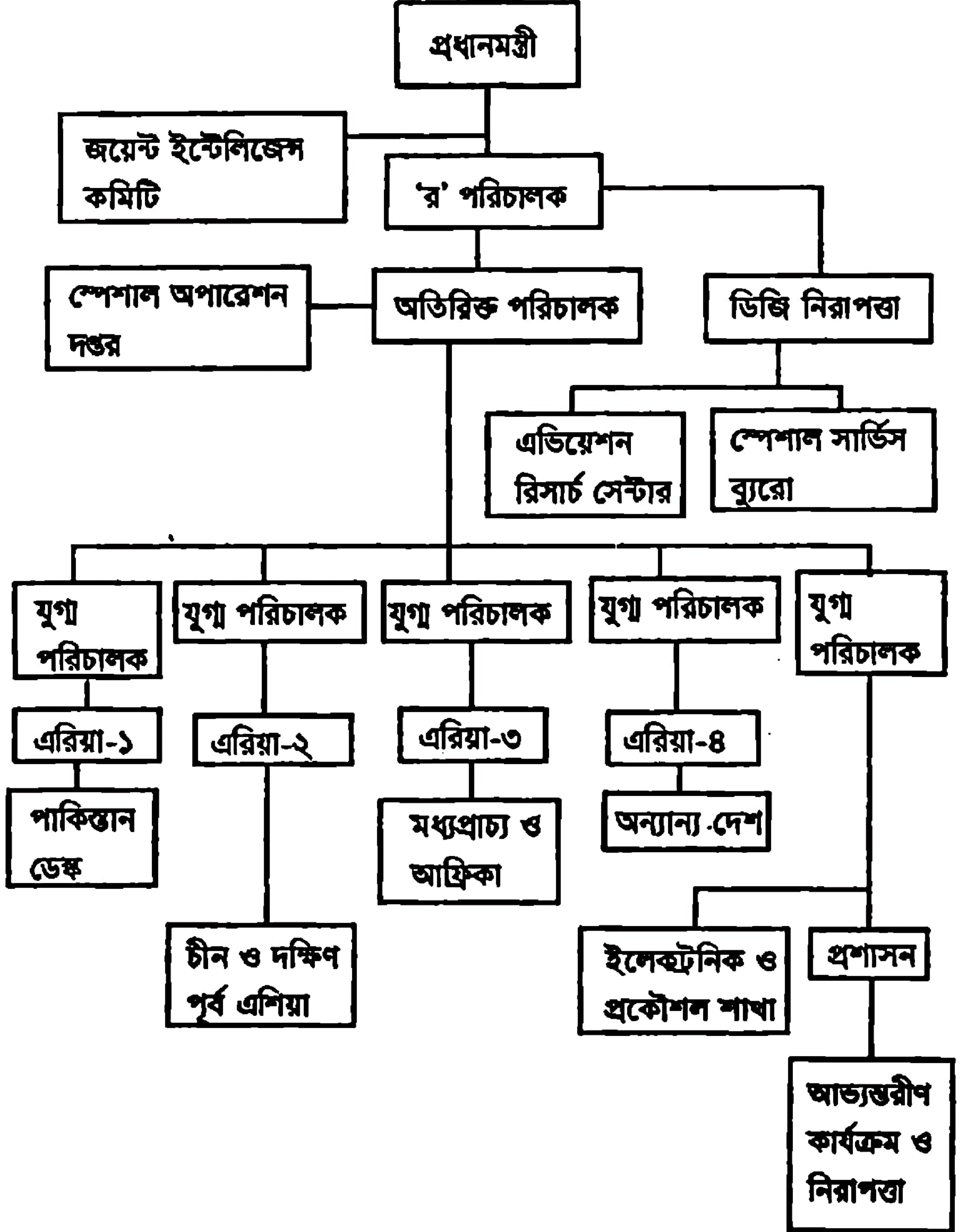
মে. জে. জেড এ খান ঃ আসলে আমরা তো কোন Aggressive nature-এর ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা চালাচ্ছি না। আমাদের পররাষ্ট্রনীতিও তার অনুমোদন দেয় না। কিন্তু সিআইএ বা 'র'-এর ক্ষেত্রে অবস্থাটা ভিন্ন। তবে দেশের মধ্যে আমরা বিদেশী যে কোন কৌশলগত গুপ্তচরবৃত্তির বিরুদ্ধে স্ট্রাটেজিক কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা অবশ্যই চালাতে পারি। অবশ্য এখানে একটা কথা বলে নেয়া ভাল যে, ভারত যেভাবে অরুচিকর প্রোগ্রাম দেখিয়ে স্যাটেলাইট চ্যানেল জনপ্রিয় করতে পারে, আমাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির জন্য সেরকম ব্যবস্থা নেয়া কিন্তু সম্ভব নয়। তাই আমাদের কালচারকে অপরের উপর চাপিয়ে দেয়া, যাকে একালচারেশন বলে সেটা আমাদের জন্য সহজসাধ্য নয়।

প্রশ্নঃ অন্যান্য দেশে ইন্টেলিজেন্স ক্যাডার থাকে অন্যান্য পাবলিক সার্ভিস ক্যাডারের মতো যা বাংলাদেশে নেই। আপনার কি ধারণা, স্বতন্ত্র ইন্টেলিজেন্স ক্যাডার থাকা প্রয়োজন?

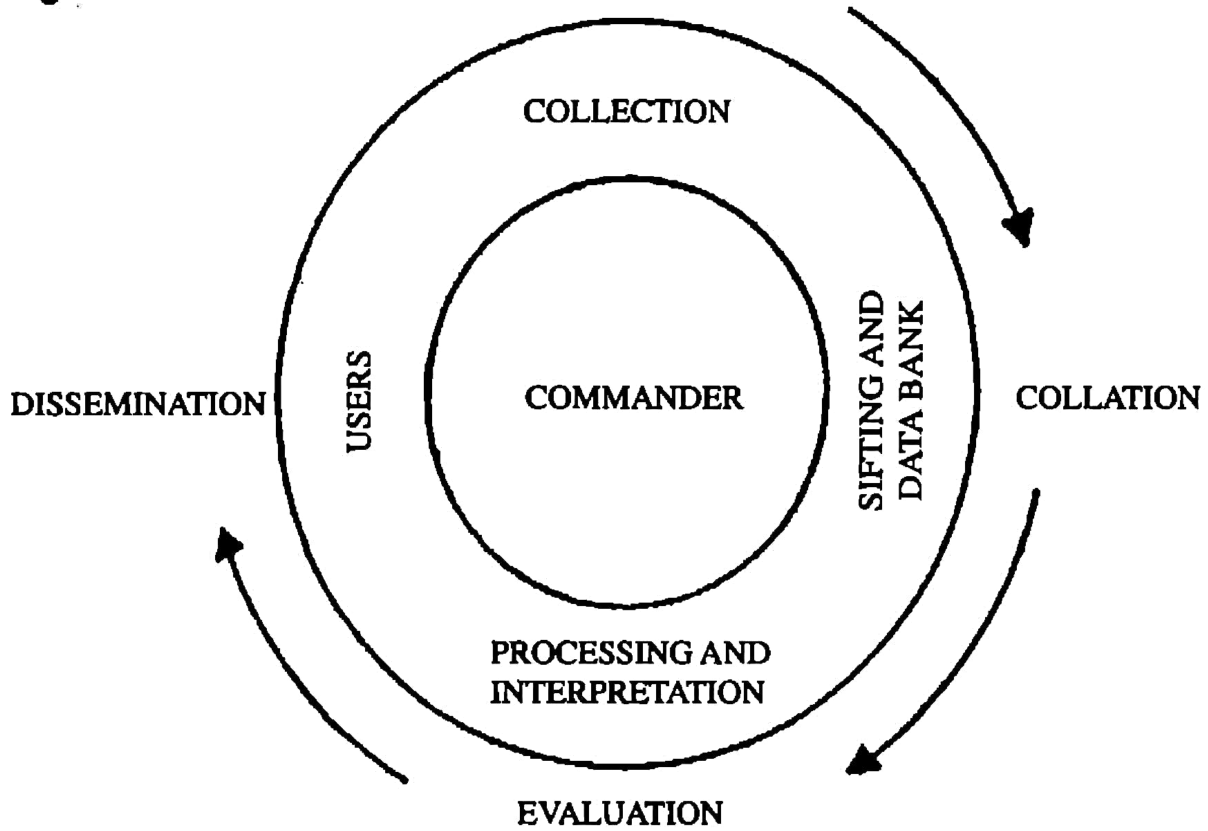
মে. জে. জেড এ খানঃ এ ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা দুটোই আছে। সুবিধা হল এতে কন্টিনিউয়েশন বা ধারাবাহিকতা থাকে। চাকরি জীবনের শুরু থেকে একটি সুনির্দিষ্ট পেশায় থাকলে ঐ ব্যাপারে যেমন অভিজ্ঞতা বাড়ে, তেমনি একাগ্রচিত্তে কাজও করা যায়। কিন্তু এখন যেভাবে ডিজিএফআই, এনএসআই-এর বিভিন্ন পোস্টে সশস্ত্রবাহিনী বা পুলিশ থেকে ডেপুটেশনে নিয়োগ দেয়া হয় তাতে কেউই মূল প্রফেশনকে উপেক্ষা করে ইন্টেলিজেন্সে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারেন না। যেমন একজন আর্মি অফিসার ডিজিএফআইতে বদলি হয়ে এসে চিন্তা করে তাকে আবার আর্মিতে ফেরত যেতে হবে। তাই সে 'ঝামেলায়' জড়াতে চায় না। মোটামুটিভাবে ৩/৪ বছর নিরুপদ্রবে কাটাতে চায়। আরও ভাবে, বেশী অ্যাকটিভ হলে যদি শীর্ষমহলের কারও বিরাগভাজন হতে হয় তাহলে আর্মির ক্যারিয়ার শেষ। এজন্য প্রফেশনালি অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আবার যদি ক্যাডার সার্ভিস তৈরী করা হয় তাহলেও অসুবিধা হতে পারে। দীর্ঘদিন এক জায়গায় কাজ করায় একবার যদি বৈরী গুপ্তচর সংস্থা তাকে হাত করতে পারে তাহলে সর্বনাশ। তবে সার্বিকভাবে বলব-স্কিলড ইন্টেলিজেন্স সংস্থা গড়ে তুলতে হলে স্বতন্ত্র ক্যাডার থাকা ভাল। এছাড়া আমাদের দেশে ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য একটা জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স সেল বা সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন সেল তৈরী করা উচিত। অবশ্য একবার এরকম করাও হয়েছিল। কিন্তু কি কারণে জানি না সেটা বেশীদিন চলেনি।

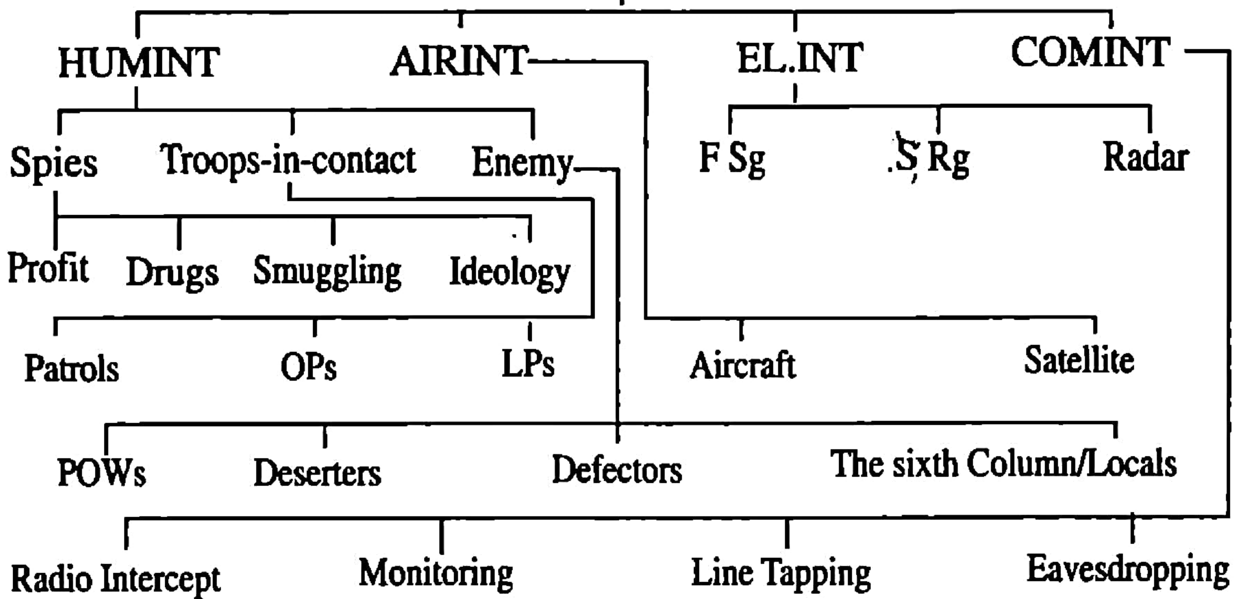
'র'-এর সাংগঠনিক ছক


প্রধানমন্ত্রী
জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটি
'র' পরিচালক
স্পেশাল অপারেশন দপ্তর
অতিরিক্ত পরিচালক
ডিজি নিরাপত্তা
এভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার
স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরো
যুগ্ম পরিচালক
যুগ্ম পরিচালক
যুগ্ম পরিচালক
যুগ্ম পরিচালক
যুগ্ম পরিচালক
এরিয়া-১
এরিয়া-২
এরিয়া-৩
এরিয়া-৪
পাকিস্তান ডেস্ক
মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা
অন্যান্য দেশ
চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া
ইলেকট্রনিক ও প্রকৌশল শাখা
প্রশাসন
আভ্যন্তরীণ কার্যক্রম ও নিরাপত্তা

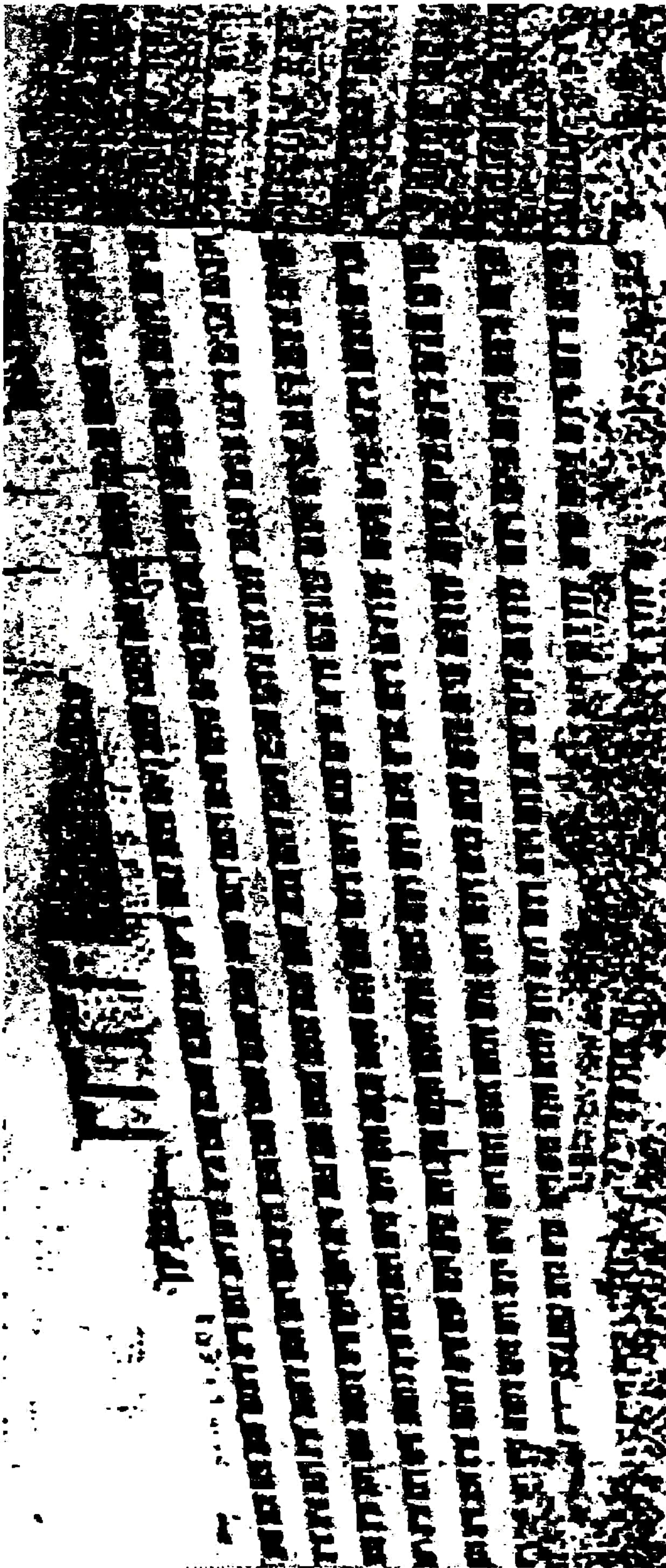
'র'-এর গুপ্তচরবৃত্তির পদ্ধতি



গুপ্তচরবৃত্তির চক্র **(Intelligence Cycle)**



গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের উপায় সমূহ



দিল্লীর বসন্ত বিহার এলাকায় অবস্থিত 'র'-এর ১১ তলা বিশিষ্ট হেডকোয়ার্টার



দিল্লীর বসন্ত বিহার এলাকায় অবস্থিত 'র'-এর প্রশিক্ষণ স্কুল



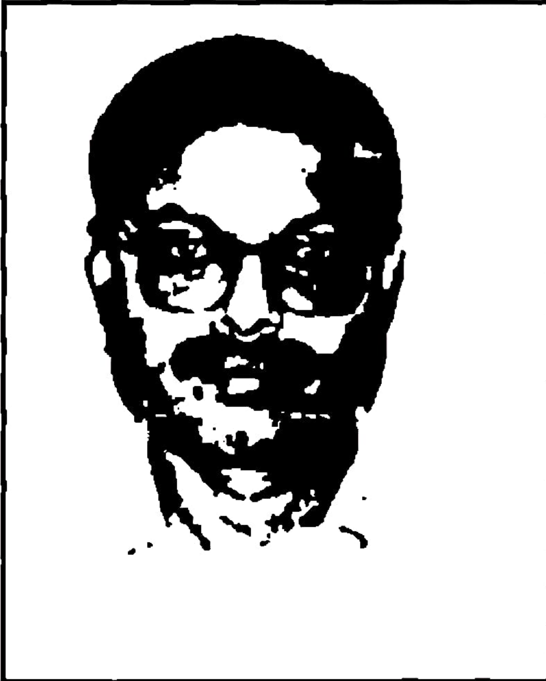
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে 'র'-এর প্রশিক্ষক মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

সূত্র ঃ ভারতীয় সাংবাদিক অশোকা রায়না লিখিত 'ইনসাইড -র'।

বাংলাদেশে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন ক'জন 'র' কর্মকর্তা



১৯৯৪ থেকে '৯৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত 'র'-এর স্টেশন চীফ জে. সি. পান্থ। তিনি শিক্ষা সচিব পদের আড়ালে কর্মরত ছিলেন।



বিষ্ণু প্রসাদ। ১৯৯৪ থেকে '৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে 'র'- কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। '৯৭ সালে মদ পানরত অবস্থায় গুলশানের একটি রেস্টুরেন্টে মৃত্যুবরণ করেন। ধারণা করা হয় শিক্ষা উপদেষ্টা পদের আড়ালে তিনি ছিলেন ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অপারেটিভ।



ইশ্বর শিং রাথোর। ভারতীয় দূতাবাসে স্টাফ মেম্বার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে মূলতঃ 'র'-এর সাথেই সম্পৃক্ত ছিলেন (১৯৯১-'৯৩)।



'র'-এর প্রাক্তন স্পেশাল সেক্রেটারী
আর. স্বামী নাথন



১৯৯২-৯৩ সালে 'র'-এর এজেন্ট হিসেবে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
পাচারের অভিযোগে রাজশাহীতে ধৃত
ডিপ্লোমা ইঞ্জিঃ আয়েজ উদ্দিন (বামে) এবং অপর তিনজন
(বাঁ থেকে) রামপদ সরদার, সঞ্জীব রায় মিন্টু ও বলরাম মাহাতো।



'র'-এর তত্ত্বাবধানে গঠিত 'মুজিব বাহিনী'র সংগঠক ভারতীয় মেজর জেনারেল এসএস উবান-এর বায়ে বঙ্গবন্ধু তনয় শেখ জামাল ও ডানে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের পুত্র আশরাফ

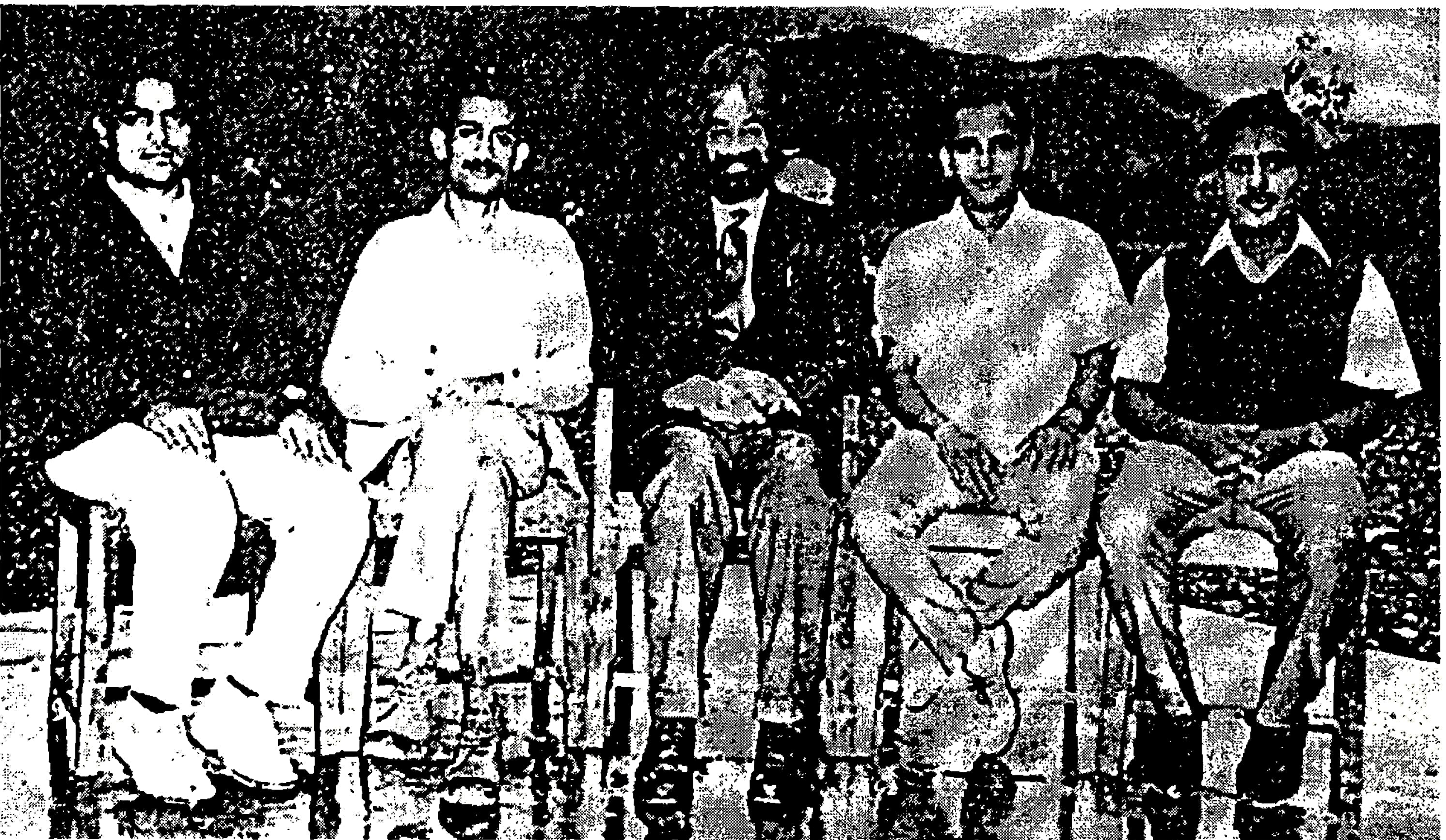
সূত্র : মে. জে. উবান রচিত 'ফ্যান্টমস্ অফ চিটাগাং'



মেজর জেনারেল এসএস উবান-এর সাথে আসম আব্দুর রব (ডানে)



'র'-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৭১ সালে 'মুজিব বাহিনী' গঠন করা হয়। এর দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর জেনারেল এসএস উবান-এর উপর। ছবিতে উবানের সাথে (বা থেকে) আব্দুর রাজ্জাক, শেখ হাসিনা, বেগম মুজিব, শেখ রাসেল, শেখ ফজলুল হক মনি।
তথ্য সূত্র ঃ মে. জে. উবান রচিত 'ফ্যান্টমস্ অব চিটাগাং'



মে. জে. উবান-এর সাথে মুজিব বাহিনীর 'স্তম্ভ' (বা থেকে) সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমদ ও আব্দুর রাজ্জাক
তথ্য সূত্র : মে. জে. উবান রচিত 'ফ্যান্টামস্ অব চিটাগাং'



মুজিব বাহিনীর সদস্যদের সাথে মে.জে. এসএস উবান
তথ্য সূত্র ঃ মে.জে. উবান লিখিত ফ্যান্টমস্ অফ চিটাগাং



মুজিব বাহিনীর সংগঠক মে.জে. এসএস উবান রাঙামাটি দখলের পর পরিদর্শনে যান। স্থানীয় কর্মকর্তা ও ভারতীয় বাহিনীর সদস্যরা তাকে স্বাগত জানান।

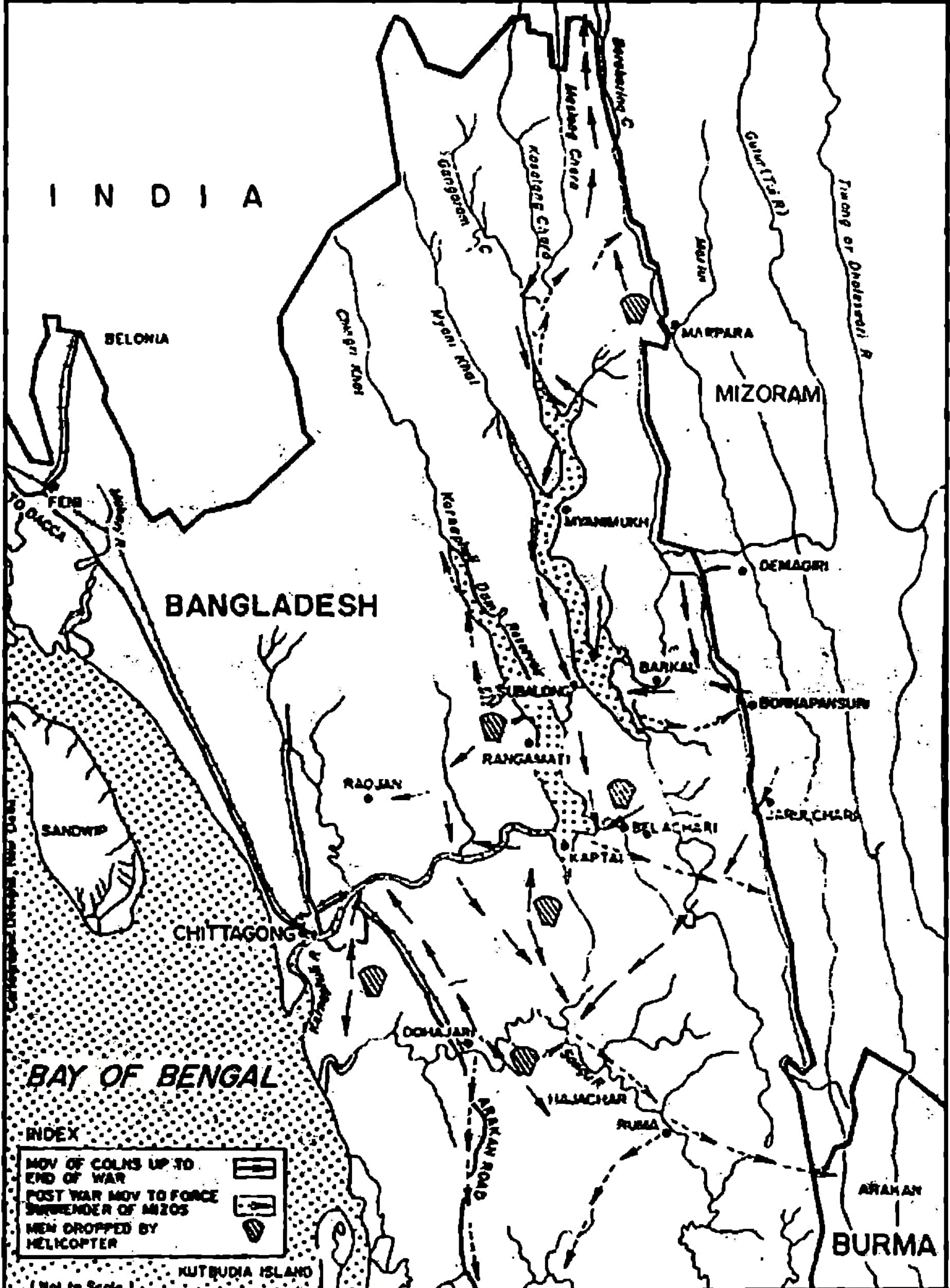


মে.জে. এসএস উবান-এর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স (এসএফএফ) পার্বত্য চট্টগ্রামে মিজো গেরিলাদের বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনাকালীন আহত সৈনিককে বহন করছে।

তথ্য সূত্র ঃ মে.জে. উবান লিখিত ফ্যান্টমস্ অফ চিটাগাং

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতীয় কমান্ডো দল পরিচালিত

অপারেশন ঈগল



মুজিব বাহিনী সংগঠক মেজর জেনারেল এসএস উবান যিনি 'র'-এর প্রধান আরএন কাও-এর তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত মিজো গেরিলা দমনের নামে 'অপারেশন ঈগল' পরিচালনা করেন। এটি ছিল মূলতঃ শান্তি বাহিনী তৈরীর প্রথম ধাপ।
তথ্যসূত্র ঃ মে.জে. উবান লিখিত ফ্যান্টমস্ অফ চিটাগাং বই থেকে নেয়া

'র' সৃষ্ট শান্তি বাহিনীর নৃশংসতার চিত্র



শান্তি বাহিনীর সদস্যরা এভাবেই বাংলাভাষী শিশুদের বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করেছে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতার কথা বলা হলেও এ হত্যাকান্ড কি সেরূপ বর্বরতার স্বাক্ষ্যই বহন করে না। কিন্তু এ জন্য কেউ ঘাতক নির্মূল কমিটি গঠন করেনি। বলেনি মানবাধিকার লংঘনের কথা।



খাগড়াছড়িতে বাংলাভাষী বসবাসকারীদের পাইকারী হারে হত্যা করে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা।



'র' সৃষ্ট শান্তি বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের চিত্র



২৯শে এপ্রিল ১৯৮৬ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার তাইনদং বাজারে শান্তি বাহিনী বাঙালি এলাকায় নৃশংস হত্যালীলা চালায়। আগুনে পোড়া একজন বাঙালির মাথার খুলি রোদে চকচক করতে দেখা যাচ্ছে।



১৭ নভেম্বর ১৯৯৩ তারিখে রাঙামাটি জেলার নানিয়ার চরে শান্তি বাহিনীর হাতে এসব হতভাগ্য বাঙালি নিহত হয়।

REPORT ON

CHAKMA BUDDHISTS REFUGEES IN INDIA & THEIR REPATRIATION



INDIAN BUDDHISTS CO-ORDINATION COMMITTEE

(Regd. under Societies Registration Act XXI of 1860)

भारतीय बौद्ध समन्वय समिति

Buddha Vihara, Mandir Marg, New Delhi-110001

দিল্লি থেকে প্রকাশিত শান্তি বাহিনীর একটি প্রচার পুস্তিকার প্রচ্ছদ। এ ধরনের বহু বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার পুস্তিকা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিলি করা হয়। জানা যায়, শান্তি বাহিনীর যেসব নেতা-কর্মী ভারতে থাকতেন তারা 'র'-এর অর্থায়নে এ জাতীয় প্রচার পুস্তিকা, পোস্টার, লিফলেট তৈরী করে বিলি করতেন।



ভারতের অভ্যন্তরে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ

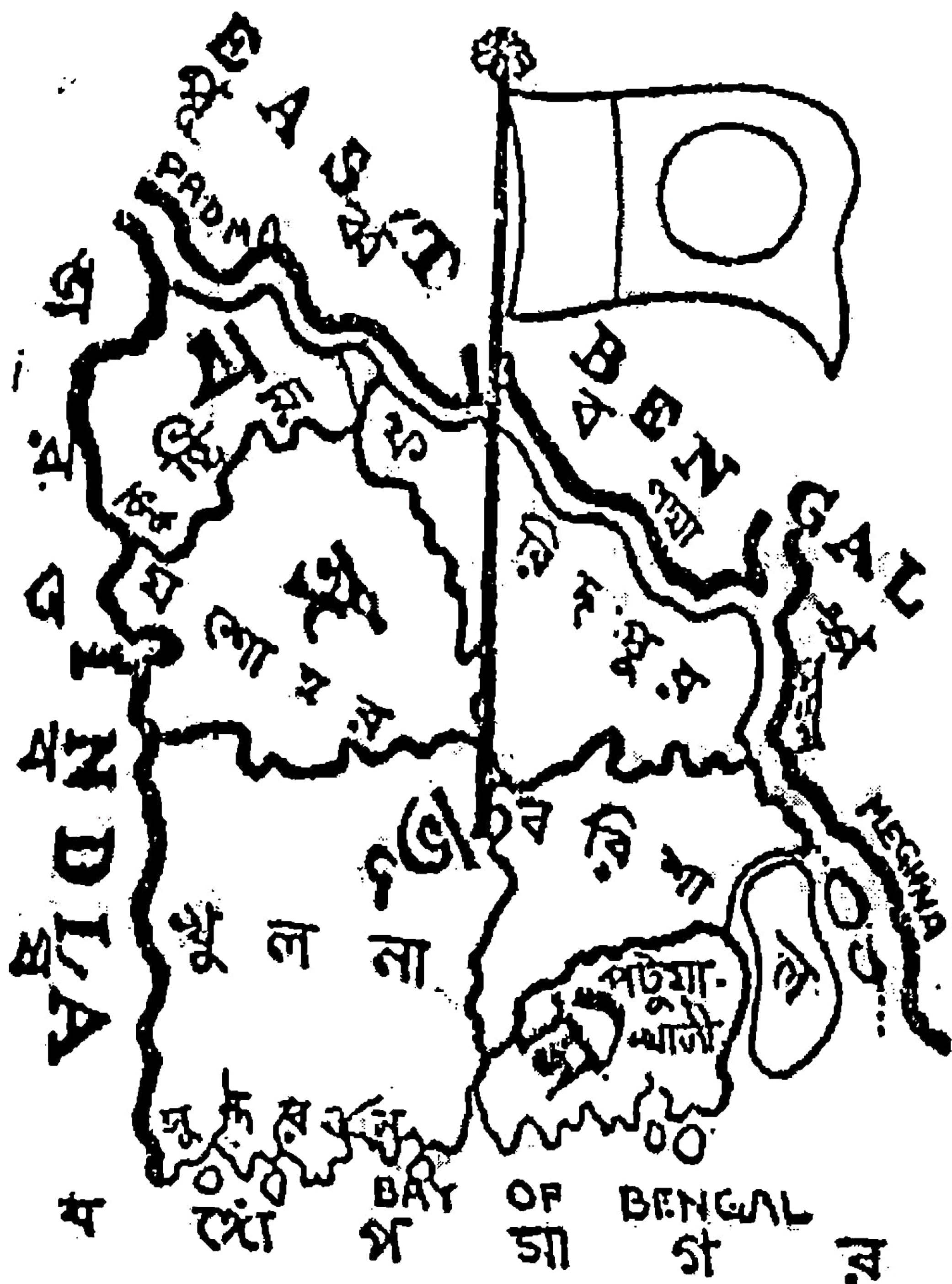


ভারতীয় সেনাবাহিনীর জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার স্কুল-ডাইরেভিতে প্রশিক্ষণরত কয়েকজন শান্তিবাহিনী সদস্য

MAP OF BANGABHUMI

Government of Bangabhumi
Samantanagar Mukltibhaban
25 . 3 . 82

বঙ্গভূমি



তথাকথিত 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত বঙ্গভূমি'র ম্যাপ ও পতাকা



তথাকথিত 'স্বাধীন বঙ্গভূমি'র পতাকা

এক নজরে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি'

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২০,০০০ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' রাষ্ট্র পরিকল্পিত।

১৯৮২ সালের ২৫শে মার্চ স্বাধীন বঙ্গভূমি সরকার ঘোষিত হয়।

রাষ্ট্রপতিঃ পার্থ সামন্ত

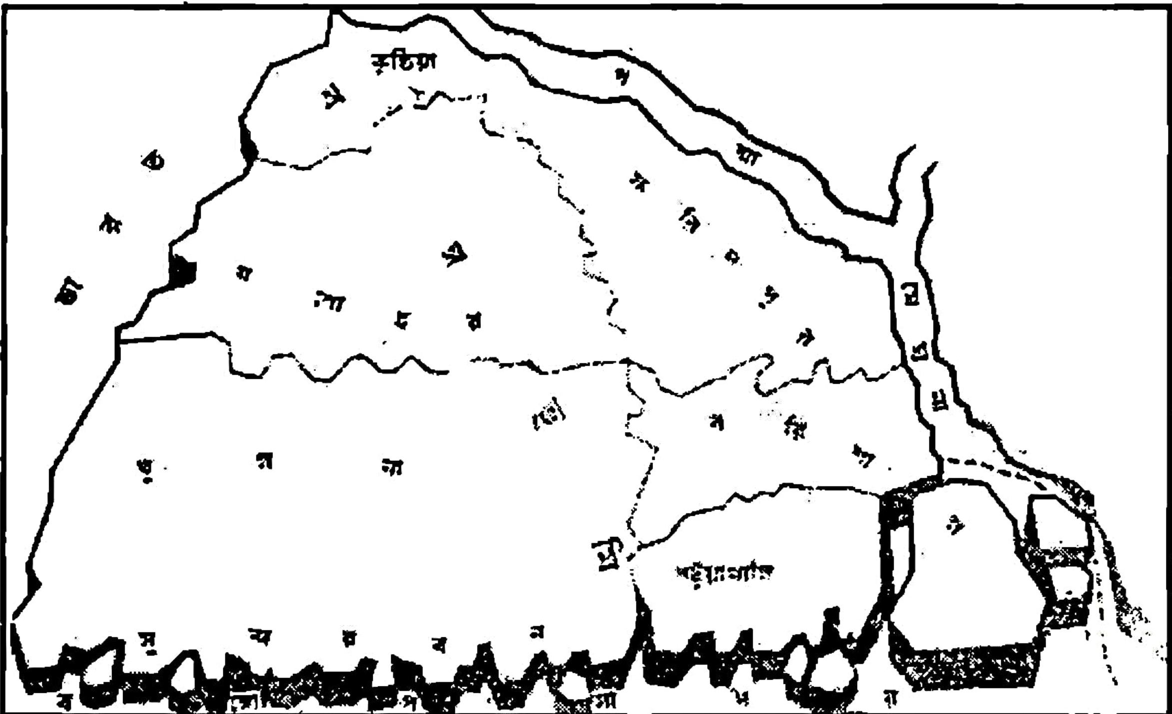
রাজধানীঃ সামন্ত নগর

পতাকাঃ সবুজ ও গৈরিক রঙের মাঝখানে সূর্যের ছবি।

জাতীয় সঙ্গীতঃ 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা...'

সীমানাঃ উত্তরে পদ্মা, পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে ভারত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর

অবস্থানঃ খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও পটুয়াখালী।



তথাকথিত 'স্বাধীন বঙ্গভূমি'র মানচিত্র



'বঙ্গভূমি'র নেতা কালিদাস বৈদ্য



'বঙ্গসেনা'দের মিছিল

বঙ্গভূমি সরকার

বঙ্গসেনা বাহিনী

বঙ্গভূমি নেতা ডাঃ কালিদাস বৈদ্য স্বাক্ষরিত 'বঙ্গসেনা বাহিনীর' পরিচয়পত্র

BANGA SENA

(NIKHIL BANGA NAGARIK SANGHA)

Calcutta-700075 W.B. INDIA

Dr. KALIDAS BAIDYA

Date 27.10.93

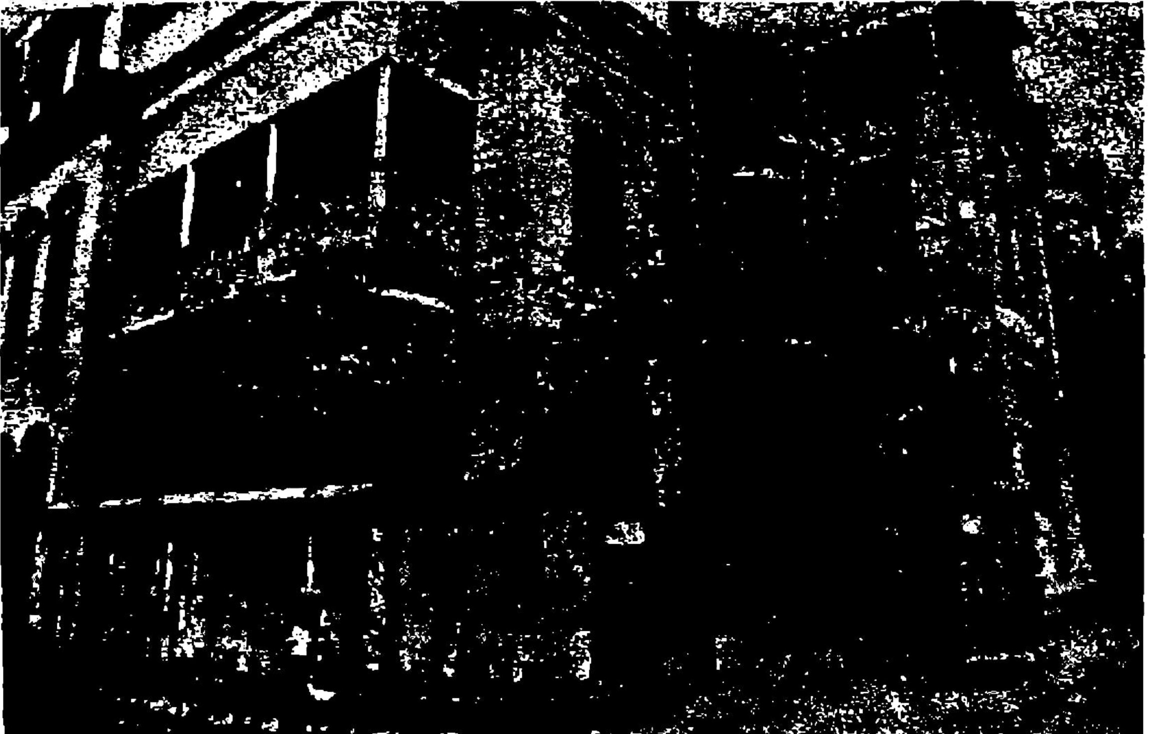
একজন কর্মীর কাছে লেখা ডাঃ কালিদাস বৈদ্য'র চিঠি, যা পাঠানো হয়েছিল ২৭-১০-৯৩ তারিখে।



মোহাজির সংঘ ও বঙ্গভূমি চক্রান্তের অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী সুশান্ত সাহা



তথাকথিত মোহাজির সংঘের প্রেসিডেন্ট রইসউদ্দিন ও তার রিকশা। এর বাড়ি যশোর হলেও তিনি এখন কলকাতায় 'দাদা'দের কব্জায় বসবাস করছেন।



কলকাতার ভবানীপুরের 'সানি ভিলা'। এটি বঙ্গভূমি ও মোহাজির সংঘের যাবতীয় কর্মকান্ডের সুতিকাগার। বঙ্গভূমি নেতা চিত্তসুতার এ বাড়িতেই বসবাস করেন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে বিদেশী গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতা গোপন ব্যাপার হলেও এর বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই। এক্ষেত্রে আবার ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা-'র' এদেশে সবচেয়ে বেশী তৎপর। কারণ বাংলাদেশে অপরাপর দেশের যে স্বার্থ রয়েছে ভারতের স্বার্থ নিঃসন্দেহে তারচেয়ে বেশী। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক এজেন্ট তৈরীর পাশাপাশি ট্রানজিট ও চট্টগ্রাম বন্দর সুবিধা আদায় করা ব্যতীত ভারতের সামনে কোন পথ খোলা নেই। এছাড়া বাণিজ্যিক ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটি সমান্তরাল বা পরিপূরক বাংলাদেশ ভারতের কাম্য। মূলতঃ এ লক্ষ্যেই ভারতীয় নীতি নির্ধারকগণ 'র' কে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতায় নিয়োজিত করেছেন।

এ বইটি 'র'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বাংলাদেশে পরিচালিত তৎপরতার এক প্রামাণ্য দলিল। তবে এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ডিজিএফআই ও এনএসআই-এর মতো প্রধান দু'টি বাংলাদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের সাক্ষাৎকার। উল্লেখ্য, দক্ষিণ এশিয়ায় কোন দেশেই এযাবৎ গোয়েন্দা সংস্থা প্রধানদের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়নি।

এছাড়াও বইটিতে রয়েছে বাংলাদেশে 'র'-এর স্টেশন চীফসহ বহু দুর্লভ ছবি।

প্রকাশনায় ঃ জিনাফ

পরিবেশক ঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা